আহ্বান করিলেন। রাজা তাহাদের সম্ভ্রমানুসারে বাসভবন প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন। সমস্ত রাজগণকে নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হইল। অন্যান্য রাজগণকে সংবাদ দিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরিত হইল।

নতু কেকয় রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ।
ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্॥

শতদ্রু পার হইয়া কেকয় রাজ্যে পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে, মিথিলাও দূর অথচ কাল বৃহস্পতি বার—কল্যই রাজ্যাভিষেক হইবে।

(ক্রমশঃ)

১৩২৬ বর্ষ সূচী।

উৎসব।

"আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৪শ বর্ষ। } সন ১৩২৬ সাল, বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা।

নববর্ষে জাগরণ।

জাতির জাগরণ আর ব্যক্তির জাগরণ একের সঙ্গে অন্যটি থাকিবেই। যেমন নর নারীর হৃদয়ে যখন তুমি উপবেশন কর তখন যেমন নর-নারী ধন্য হইয়া যায় তেমনি জাতির হৃদয়ে যখন তুমি জাগিয়া উপবেশন কর তখন জাতিও অতি অদ্ভুত কর্ম্ম করে। তোমাকে জাগাইতে না পারিলে ব্যক্তি বা জাতি কখন মহৎ কর্ম্ম করিতে পারে না। সমষ্টির জাগরণে ব্যষ্টির জাগরণ আবার ব্যষ্টির জাগরণেও সমষ্টির জাগরণ।

এই জাগরণটি কি? জাতির জাগরণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার হাত আছে। তুমিই এমন ঘটনা ঘটাইয়া দাও যাহাতে জাতি একজন মানুষের মত কার্য্য করে। একতা অদ্ভুতরূপে সংঘটন হয়। এ জাগরণ রোধ করিবার শক্তি কাহারও থাকে না, কারণ তুমি যাহা করিবে মানুষ শত চেষ্টাতেও তাহা দমন করিতে পারে না। আমরা জাতির জাগরণের সঙ্গে জড়িত যে ব্যক্তির জাগরণ—যে জাগরণটি মানুষের পুরুষকারের উপরে নির্ভর করে—এখানে তাহার কথাই

আলোচনা করিতেছি। সেই জন্যই বুঝিতে চাই জাগরণটা কি?

হৃদয়পুরে শয়ান যিনি তিনি পুরুষ। ইনি যখন হৃদয়ে উঠিয়া বসেন তখনকার অবস্থাকে বলে জাগরণ। আমরা নিদ্রাভঙ্গের পরের অবস্থাকে জাগরণ বলি। কিন্তু জাগে কে?

চৈতন্যের ত নিদ্রা নাই। চিৎ ত সদা জাগ্রত। চিতের সম্বন্ধে তবে জাগরণ কথার ব্যবহার করা যায় না। আবার জড়টা কখন জাগে না। জড় ত জড়ই। সেটা জাগিবে কি? তবে জাগরণটা কার হয়? চিজ্জড়মিশ্রিত যিনি—চিদ্যুক্ত যে জীব তাঁহার সম্বন্ধেই জাগরণ কথার ব্যবহার হয়। জীব যখন জড়বিষয় লইয়া ব্যস্ত হয় তাহা জীবের জাগরণ নহে। জীব যখন জড় বিষয় হইতে সরিয়া আসিয়া আপনার চিৎস্বভাবে আইসেন, তখনকার অবস্থাকে বলে জাগ-রণ। তবেই হইল ঈশ্বরের দিকে জাগাই জাগা। জাতি যখন ঈশ্বরের দিকে যাইবার কার্য্য করে—ঈশ্বরমুখী হইবার পথের যে বিঘ্ন তাহা ঠেলিয়া ফেলিতে প্রাণপণ করে, তখন বলা যায় যে জাতি জাগিতে চেষ্টা করিতেছে।

নর নারী যখন স্বধর্ম্মমত কর্ম্ম করে, তখনই তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা-পালনরূপ তাঁহার প্রিয়কর্ম্ম করিবার পথে জাগ্রত হয়। যখন সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া করিতে পারে, তখন বলা হয় নরনারী জাগিয়াছে।

হৃদয়ের রাজা বা হৃদয়ের রাণী হৃদয়ে উপবেশন করিয়াছেন আর শয়ান নাই ইহা দেখিয়া দেখিয়া যে মানুষ ভাবনা, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে পারে, সেই মানুষ জাগ্রত পুরুষের সঙ্গ করেন বলিয়া জাগ্রত। এইরূপ নর-নারীর সকল কর্ম্ম—তাঁহার উপাসনার জন্য কৃত হয়। সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম সমস্ত বৈদিক কর্ম্ম তখন নিরন্তর তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া সম্পাদিত হয় বলিয়া এরূপ লোকের কর্ম্মে একদিকে জগতের অভ্যুদয় হয় অন্যদিকে নিজের নিঃশ্রেয়স্ হয়।

সমকালে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধন জন্যই সর্ব্বদা শ্রীভগবানের

স্মরণ করা চাই। শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বদা লইয়া থাকাই—সর্ব্বদা তাঁহার নাম জপে তাঁহার স্মরণ অভ্যাস করাই জীবের যথার্থ উন্নতি।

হৃদয়ের রাজা—হৃদয়ের রাণী হৃদয়ে উঠিয়া বসিয়াছেন তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার নাম করিতেছি, তাঁহার যশোকীর্ত্তন করিতেছি ইহা-কেই সর্ব্বদার কার্য্য করিয়া ফেলিতে হইবে। জপ অনেকেই করেন কিন্তু তাঁহার কাছে বসিয়া, তাঁহাকে শুনাইয়া জপ যদি না করা হয়, তবে জপ ফাঁকা ফাঁকা হইয়া যায়—জপ জমাট বাধেনা। তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া ডাকিতে পারিলে ডাকা জমাট বাঁধে—সাধকেরা ইহাকেই শুক্তার মত ডাকা বলেন। এই ডাকায় সাড়া পাওয়া যায়। এই ডাকার একদিকে থাকে বৈরাগ্য, অন্যদিকে থাকে অনুরাগ। নববর্ষে জাগরণের জন্য দুইটি ভজন গান আমরা দিতেছি। বুঝিয়া অভ্যাস করিলে নিরন্তর আমরা নাম করিতে পারিব, ক্রমে দোষমুক্ত হইয়া —রাগদ্বেষশূন্য হইয়া চিত্তশুদ্ধি করিতে পারিব, তখন তাঁহাকে জানিয়া স্বরূপ-বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিব। এই ভাবে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া যিনি দশের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য পরিশ্রম করেন, তিনিই দেশের প্রকৃত কল্যাণ কি তাহা জানেন।

ভজন গীত ১।

ভজহুঁ রে মন সো রঘুনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে।
দুর্লভ মানুষ জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভবসিন্ধুরে॥
শীত আতপ বাতবরিখ এ দিন যামিনী জাগিরে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লব লাগিরে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল দলজল জীবন টলমল ভজহুঁ হরিপদ নিতরে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস্যরে।
পূজন ধেয়ান আত্ম-নিবেদন গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥

[নন্দনন্দন স্থানে আমরা এক বলিয়া সো রঘুনন্দন করিয়া দিয়াছি। শেষের প্রভাতীর সঙ্গে এক ভাব রাখাও উদ্দেশ্য]।

ভজন-প্রভাতী ১।

জাগিয়ে কৃপানিধান পঞ্ছীগণ বোলে।
শশীকি কিরণ মন্দ ভয়ী চকই পিয়া মিল ন গয়ী
ত্রিবিধ মন্দ চলত পবন পল্লব দ্রুম ডোলে।
প্রাতর্ভানু প্রগট ভয়ো, রাজনীক তিমির গয়ো
ভৃঙ্গ করত গুঞ্জগান কমলন দল খোলে॥
তুলসীদাস অতি আনন্দ, নিরখিয়ে মুখারবিন্দ
দীনন কো দেত দান, ভূষণ বহু মোলে॥

নববর্ষে স্বরূপ-বিশ্রান্তির পথে।

(১)

মস্তক বিশ্রামের স্থান, আর হৃদয় লীলাক্ষেত্র। বিশ্রান্তি সকলে ধরিতে পারে না—ইহা জ্ঞানমার্গে কিন্তু লীলাচিন্তা ভক্তিমার্গে। লীলার পরেই বিশ্রান্তি। আমরা হৃদয়ের কথাই বলিতেছি, কারণ ভক্তিমার্গ অবলম্বন না করিয়া কিছুতেই জ্ঞানে স্থিতিলাভ করা যাইবে না। জ্ঞানমার্গের শেষ কথা এই যে আমি চৈতন্য। চৈতন্যের কোন কর্ম্ম নাই। কর্ম্ম যাহা কিছু আমি তাহার সাক্ষী ও দ্রষ্টা। যাহা কিছু হইতেছে আমি সাক্ষিস্বরূপে তাহা দেখিয়া যাইতেছি মাত্র। সর্ব্বদা জপই কর, বা প্রাণায়ামাদিই কর বা শ্রীভগবানের যশোকীর্ত্তন বা লীলা ভাবনাই কর—এই সমস্ত সাধনা কেবল এই সমস্ত ব্যাপারের সাক্ষিরূপে থাকিবার সুবিধার জন্য। বিষয়-চিন্তায় চৈতন্য পুনঃ পুনঃ হারাইয়া যায়, সেই জন্য বিষয় চিন্তায় সাধনা হয় না। কিন্তু জপে, শ্বাসে শ্বাসে জপে, লীলা-চিন্তায় আপনি আপনি ভাবটি ধরিবার সুবিধা হয়। শেষে আর কোন কর্ম্ম থাকে না—থাকে আপনি আপনি ভাবটি। এই আপনি আপনি ভাবটী স্থায়ী করিবার জন্য আত্মবিচার চাই, তত্ত্বমস্যাদির বিচার স্মরণ, মনন, ধ্যান চাই।

জগৎকে উন্নত করিবার বহু পন্থা আছে। নিজের মন ঠিক রাখিবার কার্য্য করিতে করিতে যখন জগতের কার্য্য করা যায়, তখনই জগৎটার একটা স্থায়ী উন্নতির আশা করা যায়। আত্মোন্নতি ও জগৎচক্র পরিচালন সমকালে, ইহাই ভারতের ঋষিগণের ক্রম। মানুষকে ঠিক করিয়া জগতের জন্য খাটাইতে পারিলে বড় ভাল হয়। মানুষকে ঠিক করিবার কথাই বলা হইতেছে।

পুরুষ হও বা প্রকৃতি হও হৃদয়কে যদি শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র করিতে পার তবে সহজে ভাল হইতে পার।

দেবীলীলা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা—ভারতে এই তিনের লীলার প্রচারই অধিক। অন্য জাতির লোকেও যখন তাহাদের হৃদয়কে তাহাদের ইষ্টদেবতার লীলাক্ষেত্র করিতে পারে, তখন তাহারাও সুন্দর অবস্থা লাভ করে।

একসঙ্গে অনেক লাল গোলাপ দেখিতে দেখিতে মনে হয় যেন হৃদয়টা লাল হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ দেবতার লীলা ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়টাও যেন ভারতলীলায় লাল হইয়া যায়।

চৈতন্যই দেব আর শক্তিই তাঁহার দেবী। এই উভয়ের খেলাই লীলা। হৃদয়কে এই উভয়ের লীলাক্ষেত্র যদি করিতে পার, তবে সহজেই সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার পথে চলিতে পারিবে, জগৎকেও উন্নত করিতে পারিবে।

তোমরাই হৃদয় জুড়িয়া শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশ দেবাধিদেব শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার বক্ষেই তাঁহার আদ্যাশক্তি ক্রীড়া করিতেছেন। তুমি আপন চক্ষু মহাদেবের চক্ষে স্থির কর করিয়া শুভ্র জ্যোতির বক্ষে কালাম্ভোধর কান্তিরূপিণী মায়ের চক্ষে একবার চক্ষু রাখিতে চেষ্টা কর, দেখ দেখি কত সহজে তোমার চিত্ত রসে ডুবিয়া যায়। ভিতরের কথা একবারে বুঝিতে যদি না পার বাহিরে শিবের চক্ষে চক্ষু রাখিয়া শিবার রূপরাশি একবার দেখ। প্রতিদিনের নিত্যকার্য্যের পরে ইহার অভ্যাস কিছুদিন কর—বাহিরে স্থূলে দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত

করিয়া ভিতরে তাহাই ভাবনা কর করিয়া দেখ কি হয়। ইহা শুধু রূপ-চিন্তা। ইহার সহিত লীলাময়ীর লীলা ভাবনা কর। তোমার হৃদয়েই মধুকৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ নিশুম্ভ বধের লীলা চলুক, দেখ কি রমণীয় হয়। ইহার পরে আর লীলা থাকে না—থাকে স্বরূপ-বিশ্রান্তি। এই স্বরূপ-বিশ্রান্তির জন্য রূপ-ভাবানার পর গুণ-ভাবনার পর—কর্ম্মভাবনার পর স্বরূপের ভাবনা কিরূপ তাহা শুনা চাই তাহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস চাই। করিয়া দেখ—নিশ্চয়ই সুন্দর একটি অবস্থার অনুভব করিবে।

সত্যের পরে ত্রেতার লীলা। তোমারই হৃদয়ে পাষাণীর উদ্ধার হইতেছে, তোমারই হৃদয়ে রত্নাকরের "মরেতি জপ সর্ব্বদা" হইতেছে, তোমারই হৃদয়ে "বন্দে লঙ্কা ভয়ঙ্করম্" ইঁহার লীলা হইতেছে তোমারই হৃদয়ে সারমেয়-মধ্যাগতা বনহরিণী নিরন্তর রাম রাম করিতেছেন—তোমারই হৃদয়ে গঙ্গাধর পঞ্চমুখে সর্ব্বদা রাম রাম করিতেছেন আর ভবানীর সহিত ৺কাশীক্ষেত্রে বসিয়া জীবের মুক্তি দিতেছেন। হৃদয়ক্ষেত্রকে ত্রেতা—প্রভুর লীলাক্ষেত্র এইরূপে করিয়া ফেল, দেখনা কি হয়?

তার পরে দ্বাপর লীলা। কলিঃ দুস্তরঃ সত্ত্বহরঃ। দুস্তর কলিযুগ মানুষের সত্ত্বগুণ নাশ করে। দ্বাপরের শেষ এবং কলির প্রথম আগমন—এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন।

এই কলিযুগে মানুষের আয়ু অল্প। যদি বা ভাগ্যক্রমে দীর্ঘায়ু কাহারও হয় তথাপি মানুষ প্রায়ই ধর্ম্মকর্ম্মে মন্দ—অলস—উৎসাহ হীন। যদি বা ধর্ম্মকর্ম্মে কাহারও উৎসাহ হয়—যদি কেহ বা সাধক হয়—এরূপ জনও মন্দমতি হইয়া পড়ে, বড় অহংকারী হয়, লোকের উপর বড় চাল ইহারা চালে। ইহাও যদি কোথাও না হয় তবে ইহারা বড় মন্দভাগ্য হয়। ইহারা সৎসঙ্গ পায় না, অসৎসঙ্গে পড়িয়া ইহারা বড় ক্লেশ পায়। যদিও কখন কখন ইহাদের ভাগ্যে সৎসঙ্গ জুটে, তথাপি ইহারা বেশী কিছু করিতে পারে না, কারণ ইহারা নানা প্রকারে

উপকৃত হয়। নিজেরও অন্যের রোগাদি উপদ্রব হেতু ইহারা সাধু-মুখে যাহা শ্রবণ করে—বহু উপদ্রবের জন্য তাহার অনুষ্ঠানে ইহারা অবসর পায় না।

প্রায় লোকেই এখানে তপস্যার স্থান পায় না। এমন কি ঋষি-গণও এই অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন। সাধনার স্থান প্রাপ্তির জন্য ইঁহাদিগকেও তপস্যা করিতে হইয়াছিল। আর তুমি আমি কলির জীব—যেখানে সেখানে তপস্যার স্থান পাইব তাওই কি হয়? ইহার জন্যও তোমাকে আমাকে নিত্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

তার পরে হৃদয়কে যদি কৃষ্ণলীলা-ক্ষেত্র করিতে পার, তবে নিশ্চয়ই শুভপথে গমন হইবে। তোমারই হৃদয়ক্ষেত্রে দেবকী কাঁদিতে কাঁদিতে ভাগ্যবতী যশোমতীকে শত ধন্যবাদ দিতেছেন। তোমারই হৃদয়ে শ্যামসঙ্গিনী. সংসার-আয়ানকে ভুলাইয়া অভিসারে যাইতেছেন। তোমারই হৃদয়ে মথুরা-লীলা দ্বারকা-লীলা হইতেছে—এই সব যদি ভাবিতে পার, তবে তোমার অলভ্য কিছুই থাকে না।

এই ভাবে রূপ, গুণ, কর্ম্মের সঙ্গে স্বরূপ চিন্তা কর, নিশ্চয়ই স্বরূপ-বিশ্রান্তির পথে চলিতে পারিবে।

হরিলীলা।

এক জন বিনা আনে   না চাও নয়ন কোণে
এবে দেখি বিচিত্র বিধান।
সাগরে নদীর মত   নিরবধি শত শত
মিশে তোঁহে কতই পরাণ॥
হরি হরি কে বুঝিবে তুমি বা কেমন।
এই তুমি শ্রীভবনে   যে খেলা খেলিয়াছিলে
আজ এই লীলা বৃন্দাধামে॥
যে এক, সে থাকে এক   আন যে সদা অনেক
অনেকে মিলায়ে একে, একা খেল তুমি।
যে বুঝেছে এই খেলা   সে দেখিছে হরিলীলা
সে আর মজিবে কিসে বলি "আমি" "আমি"॥

নববর্ষে-হিন্দু কে—হিন্দুর কর্ত্তব্য কি?

(১)

যে ভাবে নবীন সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতাকে গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে তাহাতে শঙ্কা হয় বুঝি আমরা বা আমাদের জাতীয়ত্ব হারাইয়া ফেলি। ভয়ের লক্ষণও ত চারিদিকে দেখা যাইতেছে। অধিকাংশ লোকই আজ-কাল মুখে হিন্দু বলিয়া আস্ফালন করিতেছেন, কিন্তু কার্য্যে তাঁহারা হিন্দু নহেন। কি করিলে হিন্দু থাকা যায় তাহাই অনেকে ধারণা করিতে পারেন না। হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব যাহা, তাহাই উন্নতির বিরোধী—এই কথা অন্যের মুখ হইতে শিখিয়া আমাদের দেশের গণ্য মান্য লোকেও তাহাই বলিতে শিখিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাহাই শিখিয়াছেন এবং দেশে তাহাই প্রচার করিতেছেন।

ধর্ম্মে, আচারে, আহারে, হিন্দু থাকা যায়। উপস্থিত সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলে কে? আচার পালন ত সুদূরপরাহত; আহার ত যথারুচি। ধর্ম্ম, আচার, আহার ইহার কোনটিই যদি না মানা যায়, তবে হিন্দু রহিল কে? ধর্ম্ম, আচার, আহারও কিন্তু অন্য একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন জন্য। এই মুখ্য কার্য্যটি হইতেছে মনকে ঈশ্বরে সর্ব্বদা লাগাইয়া রাখিতে প্রাণপণ করা। "পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ" ইহা যদি না হয় তবে মানুষের জীবনধারণ বৃথাই হয়। শ্রীভগবানে মন লগ্ন করিবার জন্যই "তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনং" ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য-সাধন করা আবশ্যক হয়। গত বৎসরে আমরা দেখাইয়াছি যে, যেমন ঈশ্বরকে লোকে মনগড়া করিয়া ফেলিতেছে, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য কি, তাহা বুঝিতে মানুষ ভুল করিতেছে। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলিয়া মানুষ নিজের মনগড়া কার্য্যই করিতে ছুটিতেছে ও লোককে তাহাই করাইতে চেষ্টা করাইতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যগুলি ঈশ্বরই বলিয়া দিয়াছেন; মানুষ দেখিতেছে সেগুলিকেই পশ্চিম-দেশবাসিগণ উন্নতির শত্রু বলিতেছেন, কাজেই ঈশ্বরের নির্দ্ধারিত কর্ম্মগুলি আর ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য নহে—ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য এখন আমার মনগড়া কার্য্য। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমিই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতেছি। ইহাকেই শ্রীগীতা আসুরিকবুদ্ধি বলিতেছেন।

যাঁহারা অন্যদেশের লোক তাঁহারা ত আমাদের ধর্ম্ম, আচার, আহার, পদ্ধতির কিছুই বুঝিবেন না—বুঝিতে পারেনও না; ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই কিন্তু আমাদের দেশের লোকও যে বিজাতীয় হইতেছেন এই ত আশ্চর্য্য। আমাদের দেশের লোকের মধ্যেও এমন লোক অনেকে আছেন যাঁহারা মুখে আপনাদিগকে হিন্দু বলেন কিন্তু কার্য্যে ইঁহারা বিজাতয়ীগণের অনুকরণে নিকৃষ্ট বিজাতীয় হইয়া যাইতেছেন।

আমাদের সমাজে যথার্থ হিত কামনা যাঁহারা করেন তাঁহারা উপদেশ করিতেছেন "স্বধর্ম্মে থাক"। কিন্তু স্বধর্ম্মে থাকার কার্য্য কি

তাহার আলোচনা ত প্রায়ই দেখা যায় না। আমরা বুঝিয়াছি স্বধর্ম্মে থাকা ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারিব না। তাই আমরা স্বধর্ম্মে থাকার কার্য্য কি তাহারই আলোচনা করিয়া থাকি। বহুভাবে আমরা স্বধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছি—এই নূতন বর্ষেও আবার নূতন করিয়া আলোচনা করিতেছি।

হারানিধি।

আহা! কার ভুলেরে ভুলিস্ এমন,
ওরে ঘরের ছেলে পরের মতন?
'মা' 'মা' বলে পথে পথ,
কেঁদে কেঁদে মনোরথে;
তোর আপন ঘরে পরশ রতন,
(হায়রে) দেখ্‌লি না'কো মেলি নয়ন
আঁখি মুদে দেখ্ বুঝে,
হারি নিধি তোরে খুঁজে;
তুই যে আপন বলি পরের করে,
কেন ও বিলিয়ে তারে খুঁজিস্ পরে!
(এখন) বেলা গেল সন্ধ্যা হল
ঘরের ছেলে ঘরে চল,
এযে তারি ব্যথা তোর বুকেতে বাজে।
কান্না ফুরালেই পাবি আপন কাজে॥

সার জন উড্রফ মহোদয়ের "ভারত কি উন্নত ?"

আমরা সার জন উড্রফ মহোদয়ের "ভারত কি উন্নত ?" পুস্তকের সম্বন্ধে চারিটি বিষয়ের সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(১) গ্রন্থকারের পরিচয়।
(২) গ্রন্থের উদ্দেশ্য।
(৩) গ্রন্থের পরিচয়।
(৪) গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্য সমালোচনা।

ইংরাজী শিক্ষিত অনেকেই সার জন উড্রফকে জানিলেও তাঁহার যাহা বিশেষত্ব সকলে তাহা নাও জানিতে পারেন আর সাধারণ লোকের নিকট তিনি আদৌ পরিচিত নাও হইতে পারেন, এই জন্য গ্রন্থকারের পরিচয় আমরা প্রথমেই দিতেছি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু গ্রন্থকারের পরিচয়ে তাঁহার উক্তির শক্তি কত তাহাই সকলের নিকটে প্রচার করা।

গ্রন্থকার কলিকাতা প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণের অন্যতম। ইনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ভারতে আসিয়াছেন। ইহার পুস্তকে আছে ইনি ৩০ বৎসর এই দেশে আছেন। ইনি বিদেশীয়-গণের পুস্তক পড়িয়া ভারতের বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। ইনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। শুধু সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াই ইনি ভারতের বিদ্যা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেছেন না। বইপড়া বিদ্যায় ভারতের বিদ্যা ঠিক করিয়া ধরা যায় না। ঋষিগণ বলেন—উপনিষদ্ শিক্ষা দিতেছেন—কর্ম্মশূন্য যে জ্ঞান অর্থাৎ অনুষ্ঠানশূন্য জ্ঞানালোচনা যাহা, তাহা মানুষের বুদ্ধিকে প্রকৃত উন্নতির পথে চালাইতে পারে না। এই দোষে আজকালকার শিক্ষিতের অনেকেই স্বধর্ম্মে না থাকিয়া ভয়াবহ পরধর্ম্মের দিকে ভারতকে টানিতে পারিলেই ভারতের উন্নতি হইবে মনে করিতেছেন। কিন্তু ভারতের শিক্ষা এই যে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। স্বধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যু হয় তাহাও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ইহলোক ও পরলোক

উভয় লোকেই ভয়াবহ। গ্রন্থকার বলিতেছেন। As the Gita says, each to his own Doharma. "Better one's own Dharma than that of anther however exalted" p. 85.

বলিতেছিলাম সার জন শুধু বই পড়িয়া ভারতের বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। সার জন সাধক—সাধনার জন্য এই মহাপুরুষ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি, শ্রদ্ধাস্পদ ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের নিকট ইনি সাধনা গ্রহণ করিয়াছেন। বিনা সাধনায় যথার্থ সত্য যাহা তাহার দিকে বুদ্ধির বিকাশ হয় না। সাধনা পুষ্ট করিবার জন্য যে স্বাধ্যায় আবশ্যক, মহামতি সার জন তাহারও যথেষ্ট পরিচয় দিতেছেন। ইনি আর্থার এভেলন নাম লইয়া বহু তন্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করিতেছেন। ভারতশক্তি, শক্তি ও শাক্ত, মন্ত্রময়ী শক্তি, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, শক্তিস্তোত্র [তন্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে ইনি ও ইঁহার সহধর্ম্মিণী এলেন এভেলন সংগ্রহ করিয়াছেন] ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের তন্ত্রসার, আনন্দলহরী, মহিম্নস্তোত্র মন্ত্রশাস্ত্র, তন্ত্রাভিধান, ষট্‌চক্রনিরূপণ, পাদুকাপঞ্চক, প্রপঞ্চসার তন্ত্র, কুলচূড়ামণি নিগম, কুলার্ণব তন্ত্র, কালিবিলাস তন্ত্র, তন্ত্ররাজ, কামকলাবিলাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ কোথাও ইনি নিজে সংকলন করিয়াছেন, কোথাও প্রাচীন টীকাকারগণের ব্যাখ্যা ও ইংরাজীতে নিজের মতামত, কোথায় মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর মত পণ্ডিতের দ্বারা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

ইনি নিজের মতের উপর তত শ্রদ্ধা দেখান নাই। যেখানেই কোন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই খানেই ভারতবাসী সাধকগণ শাস্ত্র যেভাবে বুঝিয়াছেন তাহাই উপস্থিত বিজ্ঞানের প্রদর্শিত যথার্থ সত্যের সহিত মিলাইয়া বলিয়াছেন। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের উপর ইঁহার যথেষ্ট আদর দেখা গেলেও কোথাও কোথাও কিছু কিছু বিরোধ দেখা যায়। ইহাতে আমরা সার জনের বিশেষ অবিচার হইয়াছে বলিতে পারিনা, কারণ দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ লইয়া একটা মতভেদ, বেদে না থাকিলেও সম্প্রাদায় রক্ষার

জন্য শাস্ত্রব্যাখ্যাকর্ত্তাগণ বহুভাবে দেখাইয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত শাস্ত্র বিশেষ যুক্তি দিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলেই এই বিবাদের মীমাংসা সহজেই হয়। অধিকারী বিচার, শাস্ত্রের বড় আবশ্যকীয় উপদেশ। প্রধানতঃ ছয় প্রকার অধিকারীকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা হইতে ব্রহ্মদর্শন করাইবার জন্য ষড়্‌দর্শন। মূল সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি বিষয়ে ষড়্‌দর্শনের কোন মতভেদ নাই। কিন্তু ছয় প্রকার অধিকারী কখন একভাবে ব্রহ্মদর্শন করিতে পারেন না বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্রহ্মের কথা আছে। সোপানগুলি ভিন্ন হইলেও শেষের গন্তব্য স্থান একটি মাত্র। সৃষ্টি সম্বন্ধেও এইরূপ একটা অধিকারী ভেদ আছে। পঞ্চদশী চিত্রদীপের ১৩০ শ্লোকে বলিতেছেন—

তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিক লৌকিকৈঃ॥

জ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎ তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে জগৎ অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে জগৎ বাস্তবিক—অধিকারী ভেদে জগৎ সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ মতামত থাকিবেই। ভগবান্ গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডুক্য কারিকাতে সৃষ্টি সম্বন্ধে আরও কত প্রকার মত আছে তাহার উল্লেখ করিয়া শেষ অধিকারীর নিশ্চিত মত যাহা তাহাই দেখাইয়াছেন। অরুন্ধতী দর্শন ন্যায়ে মিথ্যাকে মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধি জন্য সত্যমত বলা হইয়াছে, শেষে সত্য কথাটি প্রকাশ করা হইয়াছে। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব, ব্যাস দেব, শঙ্করাচার্য্য সকলেই দেখাইয়াছেন জ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎ কি? ভগবান্ শঙ্কর মায়াবাদের সৃষ্টি করেন নাই—মায়াই সৃষ্টি করেন অথবা সগুণ ব্রহ্মাই মায়াদ্বারা সৃষ্টি করেন—ইহা বেদেরই মত।

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ঋগ্বেদ সংহিতা

ইন্দ্রঃ মায়াভি কৃত্বা পুরুরূপো বহুরূপ ঈয়তে জায়ত ইত্যমুনা প্রকারেণ শ্রুতিব্যাপকং ব্রহ্মাবদতি। তন্ত্রশাস্ত্রও বেদের মতই প্রকাশ করিতেছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ যেখানে বলিতেছেন সেখানে পাওয়া যায়—

সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং অবাঙ্মনস গোচরং।
অসত্ত্রিলোকী সত্তাণং স্বরূপং ব্রহ্মণ স্মৃতম্॥
সমাধি যোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈ নির্ব্বিকল্পৈর্দ্দেহাত্মাধ্যাস বর্জ্জিতৈঃ॥

আবার তটস্থ লক্ষণে তাঁহার কথা বলা হইতেছে—

যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
তস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তৎব্রহ্ম লক্ষণৈঃ॥
স্বরূপ বুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
লক্ষণৈরাপ্তু মিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্॥

অসত্ত্রিলোকী ইহাও তন্ত্রশাস্ত্রের নিশ্চয়। ফলে দ্বৈত ভাব অবলম্বন না করিয়া কখন অদ্বৈত স্থিতিতে পৌঁছান যায় না ইহাই বেদের মত, কাজেই ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত। সার জন উড্রফের গ্রন্থ আমরা যতদূর দেখিয়াছি তন্মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এই কথা উল্লেখ ভিন্ন মতভেদের অন্য কিছুই আমরা আজ পর্য্যন্ত পাই নাই।

গ্রন্থকারের পরিচয় দিতে গিয়া আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যদি ভারতবাসী আজ এই ভাবে শাস্ত্র আলোচনা করেন তবে তাঁহারাও ভারতবর্ষকে সার জন উড্রফের মত ভাল বাসিতে পারেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্য মনীষী ইয়ুরোপীয়গণ যে ভারতকে ভাল বাসেন নাই তাহা নহে, কিন্তু ইয়ুরোপীয় জ্ঞানে ভারতকে ভালবাসা এক বস্তু আর সাধক হইয়া ভারতকে ভালবাসা অন্য বস্তু। যে ভালবাসিয়া লোকের উপকার করিতেছি মনে করা যায় সে ভালবাসাএক পদার্থ, আর ভালবাসিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেছি যেখানে, সেখানকার ভালবাসা অন্য পদার্থ। সার জন উড্রফকে আমরা মহাপুরুষ বলিতেছি। কারণ তিনি সাধক—বিনা সাধনায় যথার্থ মহাপুরুষ হওয়া যায় না। মহা পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহারও নিকটে বিদ্যা আত্মপ্রকাশ করেন না। সাধনা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সার জন ভারতের মহিমা অন্তশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছেন, নতুবা বলা যায় না—

India is thus in a literal and not merely figurative sense the mother and (as a form of her) the object of worship, that is God appearing as *India.*

ভারত সত্য সত্যই—রূপকভাবে শুধু নহে, জগজ্জননী এবং মায়ের এক মূর্ত্তি বলিয়া ইনি পূজার যোগ্যা, অর্থাৎ ঈশ্বরই ভারতরূপ ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন।

এইভাবে ভালবাসিতে সাধক ভিন্ন আর কে পারে? এই জন্য আমরা তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহি। তিনি ইহার পরেই বলিতেছেন—

Therefore true service of her is worship of Him :—ভারতের জন্য যাহা কিছু করা যায় তাহাই ঈশ্বরের পূজা। এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই সার জন ভারতের দিকে চাহিয়া ঈশ্বরেরই পূজা করিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকে যদি এই ভাবে ভারতের পূজা করিতে শিক্ষা করেন তবে বোধ হয় ভারতের নিন্দাবাদে কাহারও সামর্থ্য থাকে না। তখন বুঝি আমরাও ভারতের বিদ্যা, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের আচার, ভারতের শুদ্ধি, ভারতের ঐকাগ্র নিরোধের উপদেশ শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার মত বলিতে পারি they are a grand display of the power of God to whom alone all worship is due and who alone can be the inspiring principle of any effort towards rational or racial regenerntion and advancement. p. 36 Is India civilised ?

অন্য অন্য সাহেবও ভারতের এক এক ভাগ দেখিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন। যাঁহারা ভারতের জ্ঞান দেখিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন তাঁহাদের উল্লেখও ভারত কি উন্নত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

The celebrated French historian of Philosophy Victor Cousin wrote—"When we read with attention the poetical and philosophical monuments of the east, above all those of India, which are beginning

to spread in Europe, we discover there many a truth and truths so profound, and which make such contrast with the meanness of the results at which European genius has sometimes stopped that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the east and to see in this cradle of the human race the native land of the highest philosophy.

ইহা ভারতের সুখ্যাতি সত্য কিন্তু ইহা সার জনের ভারত উপাসনার কাছে কি দাঁড়াইতে পারে ?

Even the loftiest philosophy of the Europeans in idealism of reason, as it is setforth by the Greek philosophers appears in comparison with *abundant sight and vigour of oriental idealism* like a feeble Promethean Spark in the full bloom of heavenly glory of the noonday sun, fatering and feeble and ever ready to be extinguished. *The divine origin of man is continually inculcalated to stimulate his efforts* to return to animate him in the struggle and incite him to consider a re-union and re-corporation with Divinity as the one primary object of every action and exertion.

শোপেনহর বলেন—

In the whole world there is no study so benificial so elevating as the Upanishad. It has been solace of my life, it will be solace of my death.

Professar মোক্ষমূলার (by no means given to an uncritical admiration of things Indian and who has in several matters misjudged them) বলিতেছেন—

If these words of Schopenhauer required any endorsement I should willingly give it as the result of my own experience during a long life devoted to the study of many philosophies and many religions.

এই সকল উক্তি জগতে যাঁহারা প্রধান পুরুষ বলিয়া সভ্যজগতে পরিচিত তাঁহাদের, ; অন্যান্য অনেক সুখ্যাতির কথা সার জন এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন তথাপি আমরা বলি সার জনের মত ভারতকে ভাল বাসিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। ভারতের সেবায় শ্রীভগবানের সেবা হইতেছে এই কথাকেই আমরা তাঁহার বিশেষত্ব বলিতেছি। পুস্তকের পরিচয় দিবার সময় আমরা দেখাইব ভারতের এই দুঃসময়ে সার জন ঋষিগণের পদানুসরণ করিয়া ভারতবাসীকে বলিতেছেন "স্বধর্ম্মানুষ্ঠান" করিতে এবং শক্তি ভজিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে।

ক্রমশঃ

অর্দ্ধ-নারীশ্বর।

নূপুর নিক্কণে মাতে সুনীল অম্বর,
আজি কি পূর্ণিমা শোভা মুগ্ধ চরাচর।
নীলাকাশে হাসে শশী
তার মাঝে তুমি বসি,
প্রণবে জড়িত মূর্ত্তি অমি সুন্দর।
দ্বিদল কমল বাসে
মিলেছি তোমার পাশে
বিশাল সাগর-বক্ষে তটিনী সমান ;
যেই তুমি সেই আমি
দেখালে জগৎস্বামী
পূজা সাধে রাখিয়াছ 'আমি' ব্যবধান।
মিটায়ে দিয়েছ খেদ
অচিন্ত্য এ ভেদাভেদ
চৈতন্যে চৈতন্য মাখা আত্মারামে রাম।
নাই সে কলঙ্ক কালো

এ কে গো পূর্ণিমা আলো
ঘুচায়ে দিয়াছ আজি সব ব্যবধান।
ঊর্দ্ধে ভানু জ্যোতি ঢালে
অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভালে,
রজত ভূধর জিনি কম কলেবর।
তোমার আমিরে নিয়ে
তুমি এলে আমি হয়ে
চন্দ্রেতে চন্দ্রিকা আভা অৰ্দ্ধ-নারীশ্বর।
মৃদু হাসি সুধাধরে
অযুত অমিয়া ক্ষরে
সাধে কি পাগল হয় আনন্দে চকোর!
অহং বহুস্যাম্ ব'লে
বিশ্বরূপে সেজে এলে
তোমার জগৎবাসে পরিয়া অম্বর।
যত দেখি তত আশ
মিটেও না মিটে আশ
মেঘশূন্য নীলাম্বর ঘুচেছে বিপদ্।
দুটীপদ কোকনদ অতুল সম্পদ্॥

২৫।৭

বন্দে লঙ্কা ভয়ঙ্করম্।

(১)

ভগবানের মত ভক্তও সাধকের উপাস্য। কারণ ভক্ত-হৃদয়ে শ্রীভগবান্ নিরন্তর অবস্থান করেন। বিশেষ শ্রীমহাবীরের মত ভক্ত।

ভারত অসভ্য, কেননা ভারত বানরেরও পূজা করে। বিজাতীয়গণ ইহা প্রমাণ করিতে চান যে, ভারতবাসী বর্ব্বর। শুধু কি তাই? আমার দেশের লোকেও বিজাতীয়ের চক্ষে আমাদিগকে সভ্য দেখাইবার জন্য রামায়ণের বানর ও ভল্লুকগণকে মানুষ বলিতে চান। আরও এক কারণে ইঁহারা বলেন ভগবান্ বাল্মীকি যে অসভ্য মানুষকে বানর ও ভল্লুক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কারণ বাল্মীকির বর্ণনামতে বানরেরা মানুষের মত কথা কহিত; ব্যাকরণাদি পড়িত, বসন পরিধান করিত—বানরের পক্ষে ইহা কি কখন সম্ভব? অতএব বানরেরা অসভ্য মানুষ। আজকালকার মানুষের এইরূপ নিশ্চয় করা ভ্রান্তি মাত্র। কারণ ভগবান্ বাল্মীকি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন ত্রেতাযুগেই যে বানরের সৃষ্টি তাহা নহে। বানর জাতি পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কিন্তু দেবতাদিগের কার্য্যোদ্ধার জন্য ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবতাগণ বানরীর গর্ভে উৎপন্ন হয়েন। মহাদেব শ্রীমহাবীররূপে, ব্রহ্মা জাম্বুবানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা কামরূপীও ছিলেন। ইঁহারা ইচ্ছামত মানুষের আকার ধরিতে পারিতেন। এখনকার লোকে এ সকল কথা বিশ্বাস করিতে পারেনা বলিয়া রামায়ণের মনঃকল্পিত ব্যাখ্যা করে। এসব ব্যাখ্যা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

আমরা শ্রীমহাবীর কে ছিলেন এবং তিনি ভারতে পূজিত কেন হইতেছেন এবং চিরদিনই কি কারণে পূজিত হইবেন—ইহা শাস্ত্রমত দেখাইতেছি। যাঁহারা শাস্ত্র মানেন না তাঁহারা হিন্দু নহেন। কাজেই এই সব মানুষ সমাজে উৎপাৎই বাধাইবে।

দেবতাগণের মধ্যে রাবণ-বিনাশের পরামর্শ যখন হয়, তখন

নারায়ণ মহামায়াকে বলেন মাস্তরস্ব বিষ্ণুমায়ে! ব্রহ্মার অনুরোধে আমি রাবণ-বিনাশ জন্য মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইব ; দেবতাগণও ঋক্ষ-বানর যোনিতে অবতীর্ণ হইবেন।

কিন্তু ত্বং সেবিতানেন রাবণেন দুরাত্মনা।
অয়ঞ্চ পূজিতঃ শম্ভুর্যাবজ্জীবং দিনে দিনে॥
ত্বদ্ভক্তঃ শিবভক্তো বা মদ্ভক্তো বা কথং ময়া।
হন্তব্যঃ শৈলতনয়ে ন মাঞ্চ দ্বেষ্টি স ক্বচিৎ॥

হে শৈলতনয়ে! দুরাত্মা রাবণ আপনার সেবা করে এবং যাবজ্জীবন প্রতিদিন শিবপূজা করিয়াছে। যে শিবভক্ত সে আমারও ভক্ত। তবে কিরূপে রাবণ বধ হইবে? বিশেষতঃ সে আমাকে ত' দ্বেষও করে না। বিশেষতস্ত্বমেবাৎসে দেবী লঙ্কেশ্বরী শুভা বিশেষতঃ আপনি লঙ্কেশ্বরী মূর্ত্তিতে রাবণের শুভ বিধান করিতেছেন।

চণ্ডিকা তখন উপায় বলিয়া দিলেন "এধুনা স্ববিনাশায় লোকান্‌দ্বেজয়ত্যসৌ" রাবণ এখন নিজ বিনাশের জন্য লোকপীড়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে! কিন্তু আমি লঙ্কা ত্যাগ না করিলে তাহার নিধন হইবে না। দুরাত্মা আমার অন্য মূর্ত্তি ভগবতী জানকীকে অবজ্ঞা করিবে, ইহাই তাহার বিনাশের কারণ হইবে। তুমি এখন শম্ভুকে প্রসন্ন কর। তাহাই হইল।

শম্ভু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—

অহঞ্চাবতরিষ্যামি বানর্য্যাং পৃথিবীতলে।
ত্রৈলোক্য দুষ্করং কর্ম্ম করিষ্যামি মুদে তব॥

হে ভগবন্‌ আমি ভূতলে বানরযোনিতে অবতীর্ণ হইয়া তোমার আনন্দবিধানার্থ লোকদুষ্কর কর্ম্ম করিব। আমি বানর মূর্ত্তিতে লঙ্কায় গমন করিলে, দেবী লঙ্কাপুরী ত্যাগ করিবেন।

ময়ি যাতে তু লঙ্কায়াং দেবী ত্যক্ষ্যতি তাং পুরীম্‌॥

(২)

রাবণ ভগবতী জনকনন্দিনীকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে।

শ্রীসীতা রাবণের অন্তঃপুরের অশোক কাননে বন্দিনী। শ্রীমহাবীর দুর্লঙ্ঘ্য সাগর অতিক্রম করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছেন। শ্রীহনুমান সপ্ত-রাত্র লঙ্কায় পরিভ্রমণ করিয়া লঙ্কার অনেক রহস্য, অতি রহস্য স্থান দেখিলেন। কিন্তু মা কৈ ? ভাবিলেন জানকী মরিয়াছেন॥ "মৃতা চ জানকীতি বৈ"।

কিন্তু জগৎজননীর কি মৃত্যু আছে ? আবার অনুসন্ধান চলিল। ভক্ত যেমন ভগবানের অনুসন্ধান করেন, সেইরূপ মহাবীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন

অশোকালীবনং রক্তং পুষ্পিতং প্রদদর্শহ।
তদ্গতা রাক্ষসীমধ্যে স্থিতাং পরম সুন্দরীম্॥

রক্তপুষ্পিত অশোক কাননে রাক্ষসীমধ্যে মাতার দর্শন মিলিল। সাধ্বীচিহ্ন দেখিয়া সেই পরমা সুন্দরীকে হনুমান সীতা বলিয়াই অনুমান করিলেন। পরে রাবণ আসিল। তখন সমস্তই নিশ্চয় হইল। শ্রীসীতার সহিত হনুমানের কথাবার্ত্তা হইল। হনুমান রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরী দিলেন। মা যেন প্রাণপ্রাপ্ত হইলেন এবং হনুমানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহার পরে শ্রীমহাবীর লঙ্কেশ্বরীকে দেখিলেন। কোন কল্পের রামায়ণে শ্রীহনুমানের লঙ্কা-প্রবেশ কালেই লঙ্কেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। এ কল্পে, সীতা-দর্শনের পরে।

এই দর্শনের কথা বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধ। শ্রীহনুমান কেন ভারতে পূজিত এখন আমরা তাহাই বলিতেছি।

(৩)

বার হনুমান সীতাকে প্রণাম করিয়া সেই ঘোর নিশীথে পুনরায় লঙ্কা দর্শনের জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

শ্রীহনুমান সেই ঘোরদর্শন নিশীথে সেই ভীষণ লঙ্কাপুরে কি দেখিলেন ?

চরন্ দদর্শ তত্রৈব ঐশান্যাং সুমনোহরম্।
তিন্তিড়ীবন মধ্যস্থে স্বর্ণপীঠে চ পুষ্কলে।

ফুল্লমেকমশোকাখ্যং বৃক্ষং তস্য সমুত্তমে।
দদর্শ মন্দিরং চারু মণিমুক্তাদি নির্ম্মিতম্॥
তচ্ছৈলশিখরাকারং বৃহদ্দ্বার কবাটকম্॥

মহাবীর ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, লঙ্কার ঈশান কোণে এক তিন্তিড়ী বৃক্ষের বন। সেই বনভূমির ঠিক মধ্যদেশে এক অতি বৃহৎ ফুল্ল অশোক বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের মূলভাগের চারিদিকে এক বিস্তৃত স্বর্ণবেদিকা। দেখিলেন সেই অত্যুত্তম মূলদেশে মণিমুক্তাদি-নির্ম্মিত শৈলশিখরাকার বৃহদ্দ্বার কবাটযুক্ত এক সুচারু মন্দির।

মন্দিরের দ্বার কবাটরুদ্ধ ছিল না। সেই ঘোর নিশীথে চারিদিক অন্ধকারে আবৃত। তাহাতে আবার সেই মন্দির তিন্তিড়ী বৃক্ষাবৃত বনমধ্যে। মন্দিরের মধ্যের আলোকরাশি বাহিরে আসিয়া বাহিরের অন্ধকারের উপরে এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। মহাবীর দূর হইতে এই আলোক লক্ষ্য করিয়াই তিন্তিড়ীবনমধ্যস্থ মন্দিরদ্বারে আসিয়াছেন।

তস্মিংস্তু বিবৃতদ্বারে দদর্শ রুচিরাননম্।
শ্যামাং রুচির দোর্দ্দণ্ড চতুষ্কাং স ত্রিলোচনাম্॥
মুণ্ডৈর্ম্মন্দারপুষ্পৈশ্চ মালাঞ্চ দধতীং শুভাম্।
অট্টহাসাং দিগ্‌বসনাং যৌবনাভরণোজ্জ্বলাম্॥
অসংখ্যকামসংস্থানকটাক্ষাং শিঞ্জিনূপুরাম্।
নৃত্যন্তীং বাদয়ন্তীঞ্চ শঙ্খঘণ্টাদিকাঞ্চ তাম্॥
দিগম্বরাভিরষ্টাভিরষ্ট বর্ণৈস্তথাবিধৈঃ।
যোগিনীভিঃ পরিবৃতাং রাবণে কৃপয়ান্বিতাম্॥

উদ্‌ঘাটিত দ্বারে আসিয়া দেখিলেন মন্দিরমধ্যে উলঙ্গিনী এক রমণী আর আটজন উলঙ্গিনী যোগিনী পরিবৃতা হইয়া নৃত্য করিতেছে শঙ্খঘণ্টাদি শুভবাদ্য বাজাইতেছে আর রাবণের জয় হউক রাবণের জয় হউক বলিতেছে। এই রমণীর মুখকমল অতীব সুন্দর। ইনি শ্যামা চারুচতুর্ভুজা ত্রিনয়না। ইঁহার মুণ্ডমালার সহিত শুভ্র মন্দারকুসুমমালা

গলায় পরিয়াছেন। মুখে অট্ট অট্ট হাস," দিগ্‌বসনা এবং ইনি যৌবনাভরণে বড়ই কান্তিমতী। কটাক্ষে তাঁহার অসংখ্য কাম বাস করিতেছে। চরণে নূপুরের মনোহর শব্দ। সঙ্গের অষ্ট সঙ্গিনী শ্বেত্‌-পীতাদি অষ্টপ্রকার বর্ণশালিনী। ইঁহারাও দিগ্‌বসনা, ইহাঁরাও নৃত্য-পরায়ণা এবং ইহাঁরা শঙ্খঘণ্টা বাজাইতেছেন।

মারুতি ইহা দেখিয়া ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করতঃ সদর্পে লম্ফপ্রদান করিয়া সেইখানে আপতিত হইলেন এবং ভয়দ বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন "কে তুমি"? দিগ্‌বসনা ত্রিনয়না দেবী চকিত নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিলেন—যোগিনীদিগকে আশ্বস্ত করিলেন করিয়া মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পপ্রচ্ছ কো ভবানেবংবিধো বানর-রূপধৃক্" এবম্বিধ বানররূপ ধারী আপনি কে?

হনুমান্। আমি হনুমান্—বলবান্ প্রভঞ্জনসুত। "রামদাসত্ব-মাপন্নোহ ন্বেষ্টুং সীতাং সমাগতঃ" রামের দাস হইয়া তাঁহার সীতার অন্বেষণে এখানে আসিয়াছি—

দন্তৈশ্চর্ব্বয়িতুং শক্ত একেন কবলেন হি।
সমগ্রাং ধরণীং যুক্তাং সাগরৈঃ সাদ্রিকাননাম্॥

আমি এক কবলে ফেলিয়া সাগরভূধর কাননের সহিত সমগ্র পৃথিবীকে দন্তে দন্তে চর্ব্বণ করিতে সমর্থ।

ত্বং পুনঃ কাসি বদ মে রাবণে জয়মিচ্ছসি।

কিন্তু তুমি কে তাহাই আমায় বল—কে তুমি রাবণের জয় ইচ্ছা করিতেছ?

চণ্ডিকা। অহং হিমগিরেঃ কন্যা চণ্ডরূপা মহাভুজা।
ভক্ত্যা বশীকৃতানেন রাবণেন মহাত্মনা॥
নাম্নাহং চণ্ডিকা কালী পার্ব্বতীত্যাদি নামিকা॥

আমি হিমালয়ের কন্যা প্রচণ্ডরূপা মহাভুজা। মহাত্মা রাবণ ভক্তিতে আমাকে বশীভূত করিয়াছেন। চণ্ডিকা কালী পার্ব্বতী-ইত্যাদি বহু নামও আমার।

ত্বং পুনর্ভীমরূপস্ত্বং মহ্যং দর্শয় বানর।

বানর! তুমি তোমার ভীমরূপ আমাকে দেখাও?

এইরূপকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "বন্দে লঙ্কা ভয়ঙ্করম্"। কি এইরূপ—যেরূপে রাক্ষস-বানর সমন্বিত সীতারাম লক্ষ্মণ শ্রীমহাবীর আপন বিরাট্ দেহে দেখাইতেছেন! এই দেহের মধ্যে রাক্ষসের সহিত উজ্জ্বল লঙ্কাপুরী শ্রীমহাবীর দেখাইতেছেন। যে জীবন্ত মন্দিরে শ্রীভগবান্‌কে লীলার সহিত দর্শন করা যায় তাহার পূজা না করিয়া কে থাকিতে পারে?

চণ্ডিকার প্রার্থনা শুনিয়া কামরূপী বীর-হনুমান "বভুব ভীষণা-কারো ব্যাবৃতাক্ষো মহামুখঃ"—ভীষণাকার ধারণ করিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিস্তৃত হইল, মুখমণ্ডল অতি বৃহৎ হইল।

দদর্শ তস্য কায়ে সা শরীরাণি চ রক্ষসাম্।
নখদন্তাগ্রলগ্নানি কোটিশঃ কোটিলক্ষশঃ॥
তথাকারান্ মহাভীমান্ লোমসন্ধিষু বানরান্॥

চণ্ডিকা দেখিলেন শ্রীমহাবীরের শরীরে রাক্ষসগণের শরীর। নখে দন্তাগ্রে কোটি কোটি লক্ষ রাক্ষস দেহলগ্ন হইয়া আছে। তাহার রোমসন্ধিতে সেইরূপ মহাভয়ঙ্কর বানর অবস্থান করিতেছে।

শীর্ষে তস্য ধনুষ্পাণিং নবদূর্ব্বাদল প্রভম্।
মহাবলং মহাসত্ত্বং রামং কমললোচনম্॥
রাবণস্যেষু লগ্নস্য হরন্তং কিল জীবিতম্।
কুম্ভকর্ণং চাপমুষ্টৌ দধন্তং বামপাণিনা॥

হনুমানের মস্তকে ধনুর্ব্বাণধারী নবদূর্ব্বাদলকান্তি মহাবল মহাসত্ত্ব কমললোচন রাম শরবিদ্ধ রাবণের প্রাণহনন করিতেছেন, আর কুম্ভকর্ণকে বাম হস্তে শরাসনমুষ্টিতে ধারণ করিয়া আছেন।

হনুমতো ললাটে চ সা দদর্শ চ লক্ষ্মণম্।
জাজ্জ্বল্যমানং তিলকং রোচনায়া ইবাতুলম্॥
চাপমুষ্টৌ চ চরণাগ্রেঽতিকায়েন্দ্রজিতৌ সখি।

লক্ষ্মণস্য কিরীটে চ দদর্শ জনকাত্মজাম্॥
পশ্যন্তীং রামচরণৌ রাবণেন নিরীক্ষিতাম্॥
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে পুরীং লঙ্কাং জ্বলন্তীং রাক্ষসৈঃ সহ।
ততো দদর্শ কীশস্য হৃদয়ে তু বিভীষণম্॥
মূর্ত্তিমন্তং ভ্রাজমানং ধর্ম্মং লঙ্কাধিপং সখি॥

হনুমান ললাটদেশে উজ্জ্বল রোচনার তিলক মত লক্ষ্মণকে তিনি দেখিলেন। হে সখি জয়ে বিজয়ে! শ্রীলক্ষ্মণ রণভূমিতে অতিকায় ও ইন্দ্রজিতকে চাপমুষ্টিতে ধরিয়া আছেন। শ্রীলক্ষ্মণের কিরীটে জনকাত্মজা—রামহস্ত-ধৃত রাবণ তাঁহাকে দেখিতেছে তিনি কিন্তু রামচরণে বদ্ধদৃষ্ট। শ্রীহনুমানের ভ্রূমধ্যে রাক্ষসগণ সহ লঙ্কাপুরী প্রজ্বলিত হইতেছে। চণ্ডিকা আরও দেখিলেন শ্রীহনুমানের হৃদয়ে মূর্ত্তিযান্ ধর্ম্মস্বরূপ শ্রীবিভীষণ দীপ্তি পাইতেছেন।

শিবা এইরূপে হনুমানের অঙ্গে লঙ্কালীলার সমস্তই দর্শন করিলেন।

এই ভারতে এখনও কত লোক শ্রীহনুমানের পূজা করেন—করিয়া কত অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্য করিয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গ সহ শ্রীভগবান্‌কে মস্তকে ধারণ করিয়াও শ্রীহনুমান যদি বানর বলিয়া তোমার নিকটে অবজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন, তবে তুমি কি আর ভারবতবাসী আছ না তুমি আফ্রিকা দেশের কাঁটাগাছ হইয়া গিয়াছ?

এই হনুমানের সহিত তখন দেবীর কথা বার্ত্তা হইল। উভয়ে উভয়কে চিনিলেন। শ্রীহনুমান বলিলেন—

ব্রজ স্থানান্তরং লঙ্কাং ত্যক্ত্বা রাবণপালিতাম্।
সীতাঽবমানিতা যেন কি তস্য জয়মিচ্ছসি।

তুমি রাবণপালিতা লঙ্কা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাও, কারণ সীতার অবমাননা যে করে তুমি কি তাহার জয় ইচ্ছা করিতে পার? সত্যই—"সীতাবমানিতা যেন তেনাহমবমানিতা" সত্যই যে সীতার অবমাননা করে সে ত আমারই অবমাননা করিতেছে। তখন

শ্রীমহাবীর দেবীর স্তব করিলেন। দেবী লঙ্কা ত্যাগ করিলেন। শ্রীহনুমানও তখন রাক্ষসবধ ও লঙ্কাদগ্ধ-ব্যাপারে শ্রীদেবীর পূজা করিলেন। বড় সুন্দর এই পূজা!

শ্রীহনুমান অশোক কানন ভঙ্গ করিলেন। রাবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। মহাবীরকে বধ করিবার জন্য বহু রাক্ষস সেনাপতি—বহু রাক্ষস সেনা প্রেরিত হইল।

তেষাং রক্তৈস্তদা চণ্ড্যৈ পাদ্যার্ঘ্যাচমনান্যদাৎ
ক্ষিপন্ স পুষ্পান্ বৃক্ষৌঘান্ পুষ্পৈস্তাং সমপূজয়ৎ॥
অক্ষাদিকান্ রাজপুত্রান্ হত্বাবলীনিহাপ্যদাৎ॥

রাক্ষসগণের রক্তে শ্রীহনুমান চণ্ডীদেবীকে পাদ্যঅর্ঘ আচমনীয় প্রদান করিলেন। পুষ্পশোভিত বৃক্ষসমূহ ক্ষেপণ করিয়া পুষ্প দিয়াও তাঁহার পূজা করিলেন—পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় পুষ্প দ্বারা পূজা করা হইল। রাজপুত্র অক্ষাদিকে নিহত করিয়া চণ্ডীকে বলিদান করিলেন। বাকী রহিল ধূপদীপাদি।

শ্রীহনুমানের সহিত তখন রাত্রিকালে ইন্দ্রজিতের মহাযুদ্ধ হইল। শ্রীহনুমান ইচ্ছা করিয়া পাশবদ্ধ হইলেন, হইয়া রাবণের সহিত বহু কথা কহিলেন। তাহার পরে রাক্ষসপতি শ্রীহনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নিজ্বালিত করিলেন।

"হনুমান্ দীপ্তলাঙ্গুলো দেবি দীপং গৃহাণ মে"
ধূপাংশ্চ বিবিধানেবং ধ্যায়ে লঙ্কাং দদাহ সঃ॥

দেবি চণ্ডি! আমার পূজায় এখন ধূপ ও দীপ গ্রহণ কর—এইরূপ চিন্তা করিয়া দীপ্তলাঙ্গুলধারী শ্রীমহাবীর লঙ্কা দাহন করিলেন। শ্রীদেবী শ্রীহনুমানের পূজা গ্রহণ করিয়া কামরূপে গমন করিলেন।

ভাবনায় যিনি এই সমস্ত দেখিতে পারেন তিনি শ্রীভক্তের আরাধনায় সহজেই শ্রীভগবান্‌কে তাঁহারই প্রসাদে লাভ করিতে পারেন। ইতি।

তস্মাৎ ত্বমস্য শরণং।

(১)

সৎচিৎ আনন্দময় চিদানন্তরূপ
অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি সবার স্বরূপ
মায়াতে করেছ সৃষ্টি এ বিশ্বসংসার
মহেশ্বর, তব পায় নমি বার বার।

(২)

নিদারুণ ব্যাধিজ্বালা শীর্ণ কলেবর
চিত্ত সদা মত্ত মম কামের কিঙ্কর।
পাছে পাছে যে রে নিত্য দুরন্ত শমন
দীনবন্ধু! তব পদে লইনু শরণ।

(৩)

অনিত্য এ দেহ হেরি হ'ল না বিকার
বিষয় বিষের আশা করে বার বার
ক্ষণেক অভাবে চিতে কত দুঃখ পায়
দীনবন্ধু, দয়া করি দাও পদাশ্রয়।

(৪)

বিকট গর্জ্জনে জরা রাক্ষসীর প্রায়
এখন (ই) গ্রাসিবে আসি না দেখি উপায়
কাঁচা ঘটে বারি যথা জীবের জীবন
ত্রাণ কর দীনবন্ধো! অনাথ-শরণ।

(৫)

বুদ্ধি জ্ঞান হীনা নারী বুঝি না তোমায়
রিপুবশে ঘুরি ফিরি যথায় তথায়
সাজিয়া ধরিবে আসি দুরন্ত শমন
দীনবন্ধো! তাই যাচি যুগল চরণ।

(৬)

এ দেহেতে নাহি করি তব উপাসনা
কাটিতেছে কাল লয়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনা
ভ্রমে মনে তব নাম না হয় স্মরণ
দীনবন্ধু, দয়া কর সঙ্কটে এখন।

(৭)

বিবেক নাহিক আছি বিকারেতে ভরি
বিশ্বময় তবরূপ কেমনে গো! হেরি?
অসারে ভুলিয়া মন হারাল সকল
দীনবন্ধু! তব নাম ভরসা কেবল।

(৮)

রজস্তমে পূর্ণ হৃদি অন্ধকারময়
শুদ্ধ আঁলো সত্ত্বজ্ঞান জাগে না তথায়
তোমার উদয় তথা কেমনে হইবে?
(দীনবন্ধো!) তুমিই ভরসা মাত্র এ দুরন্ত ভবে।

(৯)

তব পূজা জপযজ্ঞ না করি কখন
হয় না রসেতে তব নাম উচ্চারণ
দুরন্ত এ চিত্ত পদে না হইল লয়
দীনবন্ধো দাও আজি ও পদে আশ্রয়।

(১০)

পুণ্যকর্ম্ম দয়া ধর্ম্ম কিছু নাহি হায়!
বিবেক-বিহনে জ্ঞান হল না উদয়
সাধন সম্বল মোর নাহি যে কিছুই
দীনবন্ধো! হয়ে দীন পদে যাচি তাই।

(১১)

শুনেছি ভকতসনে ভক্তি'দয় হয়।
অভিমানে সদা মত্ত না চাহি কাহায়

ভাই'ত পামরে জ্ঞান হল না উদয়
ভরসা এ দীনে নাথ! তব পদাশ্রয়।

(১২)

স্বভাবের দোষে মন্দ নিরখি সবায়
আত্মপরচিন্তা রোগে ঘিরিছে আমায়
শান্তি নাহি তিল মাত্র জ্বলি দিবানিশি
দয়াকর দীননাথ বড় দুঃখী দাসী।

(১৩)

অহং জ্ঞানাধার মাত্র এ দেহ আমার
সন্তোষ কোথায় পাবে? করে হাহাকার
পাপপুণ্য জানেনাকো না করে বিচার
(দীনবন্ধু) তুমি বিনে এ অধীনে কে করে নিস্তার।

(১৪)

বাহ্যবস্তু লয়ে ব্যস্ত ইন্দ্রিয় সকল
অন্তরে আনন্দমূর্ত্তি না হেরি কেবল,
আশার সংসারে র'ল পেলেনা'ক সুখ
চিত্ত-দশা হেরি নাথ! হয় বড় দুঃখ।

(১৫)

কুহকী মায়ার ঘোরে হয়ে আত্মহারা
সংসার বিষয়-বিষে হয়েছিনু সারা
(আজি) জুড়াতে এসেছি নাথ! ত্যজি সে সকল
দীনবন্ধু তব মায়া না করে বিকল।

(১৬)

ধনগৃহ পরিজন ঐহিকের সুখ
ভুঞ্জিয়া দেখিনু হায়! সবে দেয় দুখ
শান্তি তাহে হ'লনা'ক ক্ষণিকের তরে
দীনবন্ধু! দীননাথ! কর কৃপা মোরে।

(১৭)

প্রাণায়াম যোগধ্যান করিনি কখন
কেমনে হইবে শান্ত এ অশান্ত মান ?
অস্থির চিত্তেতে শান্তি কে পেয়েছে কবে ?
দীনবন্ধু শান্তি দাও এ অধম জীবে।

(১৮)

সেবি ভক্তি প্রেমরাগে শ্রীগুরুচরণ
লভে জীব অনায়াসে জ্ঞান মোক্ষধন
দুর্ভাগ্য অধমা হায়! না সেবি কখন
দীনবন্ধু প্রেমবিন্দু কর বিতরণ।

(১৯)

অশুদ্ধ এ চিত্তসনে ভ্রমি অবিরত
কভু তব লীলাস্থান না হেরিল চিত
অশুদ্ধ চেতার জ্ঞান হইবে কেমনে ?
দীনবন্ধু স্থান দাও যুগলচরণে।

(২০)

সদানন্দ প্রেমময় ভবভয়হারী
উমানাথ লক্ষ্মীপতি বৈকুণ্ঠবিহারী
ওপদ বিহনে জীবে নাহিক সম্বল
কর কৃপা নিজগুণে কাঙ্গাল দুর্ব্বল।

(২১)

শিবরাম আত্মারাম স্বরূপে সুন্দর
আত্ম-মাঝে খেলে এই বিশ্ব-চরাচর
আবরি স্বরূপে মায়া দেখায় কৌতুক
বাহিরে ফুটেছে দেখি অন্তরের রূপ।

জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই Pantheism সম্পূর্ণ ধর্ম্মের এক অংশ মাত্র। গীতা-শাস্ত্রে ৯।৪ শ্লোকে যে "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" বলা হইয়াছে তাহা হইতে এই Pantheism আইসে কিন্তু তাহার পরের শ্লোকেই গীতা বলিতেছেন "ন চ মৎস্থানি ভূতানি"। সাধারণ লোকে এই দুই মত বিরুদ্ধ বলিয়াই বুঝিবে। ফলে যিনি সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতার অথবা যিনি সমকালে তুরীয় সুষুপ্তি অভিমানী, স্বপ্ন অভিমানী ও জাগ্রৎ অভিমানী তাঁহার সগুণ ভাবে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বর বলেন মৎ-স্থানী সর্ব্বভূতানি আবার নির্গুণভাবে তিনি বলেন ন চ মৎস্থানি ভূতানি।

আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ যাঁহারা Pantheism গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন এই মতে all finite things and minds are evolved from the all-embracing energy and consciousness of God ইত্যাদি। এই মতে জীব হইতেছেন a reproduction of God himself অর্থাৎ জীব হইতেছে ঈশ্বরেরই পুনরাবৃত্তি। এই সম্বন্ধে শ্রুতি এবং জ্ঞান-গুরু বশিষ্ঠদেব যাহা বলিতেছেন তাহাও ইহাঁদের জানা আবশ্যক। শ্রুতি বলেন—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

অমূর্ত্ত ব্রহ্ম পূর্ণ। এই মূর্ত্ত জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া পূর্ণ। মূর্ত্ত পূর্ণ হইতে অমূর্ত্ত পূর্ণের উৎকর্ষ। পূর্ণের পূর্ণত্ব অঙ্গীকার পূর্ব্বক মিলন দ্বারা একীভাব প্রাপ্ত হইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন।

জগৎটা সাবধি পূর্ণ আর ব্রহ্ম নিরবধি পূর্ণ। এই জন্য ব্রহ্ম পূর্ণ হইতেও পূর্ণ, অতিশয় পূর্ণ। এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ অত্যন্ত গভীর।

এই জন্য আমরা বশিষ্ঠদেবের উক্তি দ্বারা ইহা বিশদ করিতেছি। বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

পূর্ণাৎ পূর্ণং প্রসরতি সংস্থিতং পূর্ণমেব তৎ।
অতো বিশ্বমনুৎপন্নং যচ্চোৎপন্নং তদ্দেব তৎ॥ ইত্যাদি

প্রশ্ন হইতেছে সমস্ত ব্রহ্ম হইতে খণ্ডজীব আইসে কিরূপে? অখণ্ডের পুনরাবৃত্তিতে অখণ্ডই হইবে। নিরাকার ব্রহ্ম হইতে সাকার জগৎ উৎপন্ন হয় কিরূপে?

এক আকারশিবিষ্ট শান্ত জল হইতে নানা আকার বিশিষ্ট উর্ম্মি বাহির হয়। ইহা সকলেই জানে। আকার বিশিষ্ট বস্তু হইতে আকার-বিশিষ্ট বস্তুই বাহির হয় সেইরূপ নিরাকার যাহা তাহা হইতে যদি কিছু বাহির হয় তাহা নিরাকারই হইবে। তবে জগৎকে যে আমরা আকার বিশিষ্ট দেখি তাহা ভ্রান্তিমাত্র। যদি জগৎ বলিয়া কিছু থাকে আর যদি তাহা নিরাকার ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা নিরাকারই হইবে। জগতের কারণ হইতেছে ব্রহ্ম। তবেই দেখা গেল আকার সম্বন্ধে জগৎ ও ব্রহ্মের—কার্য্য ও কারণের কোন ভেদ নাই। কিন্তু জগতের আকার নাই ইহা ত কেহ বলে না। তবে জগৎটা কি হইল তাহা বিচার করা উচিত নয় কি?

পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রসারিত হয়। যাহা পূর্ণ তাহা কিন্তু নিরাকার, কাজেই বলিতে হয় "অতো বিশ্বমনুৎপন্নং" ইত্যাদি। বিশ্ব যদি অনুৎপন্নই হইল তবে যাহা উৎপন্ন মত দেখা যাইতেছে—যাহা জগৎ-রূপে দাঁড়াইয়া আছে তাহা কি? যচ্চোৎপন্নং তাহা কি? "তদেব তৎ" তাহা তাহাই। ব্রহ্ম হইতে যাহা উৎপন্ন তাহা ব্রহ্মই।

জগৎ নাই ব্রহ্মই জগৎরূপে ভাসিতেছেন ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত কোন আধুনিক ব্যক্তি কি আমাদের দেশে আর আছেন? জগৎ না থাকিলেও আপনি আপনি ব্রহ্ম আছেন ইহা আমরা কতটুকু ধরিতে পারি? আমাদের সাধনাবৰ্জ্জিত ক্ষুদ্র বুদ্ধির যুক্তি দ্বারা আমরা দেখি "A subject without an object, a thought without

anything to think about, an act of willing without willing anything, a self-consciousness without a plurality of materials must be viewed as impossible" শুধু পুস্তক পাঠে যে স্বরূপ ধরা যায় না পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি ইহারই পরিচয় দেয়; কিন্তু সাধনা দ্বারা যাঁহারা জগৎকে স্বপ্নে লয় করিতে জানেন, স্বপ্নকে সুষুপ্তিতে লয় করিতে পারেন, তাঁহারা জানেন সুষুপ্তি অবস্থা কি? সুষুপ্তিতে থাকে কি? শ্রুতি বলেন যত্র সুপ্তো ন কাঞ্চন কামং কাময়তে ন কাঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। এই সুষুপ্তি অভিমানী যিনি তিনি আপন স্বরূপে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী ইত্যাদি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কথা হইয়া গেল। সংশয় বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি ছেদন করিতে গিয়া এতদূরে আমরা আসিয়া পড়িলাম। শ্রীযুক্ত অযোধ্যাপ্রসাদ পাঁড়ে মহাশয় যদি এতদূর পর্য্যন্ত দেখেন, তবে তাঁহার ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের শাস্ত্র-মীমাংসার দিকে কথঞ্চিৎ দৃষ্টি পড়িতে পারে। এখন আমরা ঈশ্বর ও জীবতত্ত্বের অভেদত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ লোকে যাহা জানে তাহাতে কি বলা যায় ঈশ্বর ও জীব অভেদ? অভেদ বলা যায় না। যদি অভেদই হইবেন, তবে ঋষিগণ জীবকে ঈশ্বরত্ব অথবা ব্রহ্মত্ব লাভ করিবার জন্য এত প্রয়াস পাইতে বলেন কেন? নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগ, বিহিত কর্ম্মগ্রহণ, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা, নিত্যানিত্য বস্তু বিস্তার, ইহা মুত্র ফলভোগ বিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি, মুমুক্ষুত্ব ইত্যাদি সাধনার পরে গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি বিচার এই সমস্ত সাধনা করিলে তবে জানা যায় জীবই ব্রহ্ম। যদি বলা যায় জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই তবে মনে করিলেই ত সকল জীব ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারেন। তাহা হয় কি? তাহা হয় না। তবে বলা হউক ভেদ আছে। যদি ভেদই থাকে তবে জীব কখন ব্রহ্ম হইতে পারেন না। অনেকে এই মত

পোষণ করেন। ইহা কিন্তু ভ্রম মাত্র। কারণ শ্রুতি যুক্তি দিয়া দেখাইতেছেন ঘটের মধ্যের আকাশটিই কিন্তু মহাকাশ, মহাকাশ কখন খণ্ডিত হন না। অথচ ঘটাকাশটা খণ্ড মতই বোধ হয়। সেটা উপাধি জন্য। ঘটটা আকাশকে যেন খণ্ডিত করে। দেহ ঘটটা চৈতন্য আকাশকে যেন খণ্ডিত করিয়াছে। ইহা অবিদ্যা দ্বারাই হইতেছে। এই অবিদ্যা বা ভ্রম জ্ঞান নাশ জন্যই বিদ্যাভ্যাস আবশ্যক। এই বিদ্যাভ্যাস হইতেছে আমি দেহ নহি, আমি আত্মা ইহারই অভ্যাস। এই বিদ্যা কি কোথাও অধীত হয়? বিদ্যাভ্যাস ত দূরের কথা। স্কুল কলেজ ইত্যাদিতে বিদ্যাভ্যাস কি হয় না, "আমি দেহ" এই অবিদ্যার আলোচনা ও অভ্যাস হয়? ইহার বিচার প্রশ্নকর্ত্তাই করিবেন। বলা হইল জীব ও ব্রহ্মে ভেদও নাই, অভেদও নাই, তবে কি আছে?

জীব ও ঈশ্বরে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে। চৈতন্য স্বরূপে উভয়েই অভিন্ন। ঈশ্বরকল্পনা দ্বারাই মায়াধীশ, জীবকল্পনা দ্বারাই মায়াধীন। মায়াধীশের কার্য্য কখন মায়াধীনের কার্য্য হইতে পারে না। ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং জীব ইঁহারা স্বরূপ চৈতন্যে অভিন্ন কিন্তু মায়িক অংশে ঈশ্বর ও জীবে ভেদ আছে। জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন "ময়ি জীবত্বমীশত্ব কল্পিতং বস্তুতো নহি"—এই কল্পনা করে৷ মায়া। মায়াটি তাঁহার আত্মশক্তি। এইটি বাদ দিলে সৃষ্টি বলিয়া কোন কিছুই থাকে না। যখন জীব বিদ্যাভাসে মায়া অতিক্রম করিতে পারেন, তখন জীবই স্বরূপে ব্রহ্ম থাকিয়াও কেবল অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া যে সুখদুঃখের বন্ধনে ছিলেন তাহা হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপ-বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারেন।

পাঁড়ে মহাশয় যদি সর[illegible] প্রাণে জিজ্ঞাসু হইয়া এই সমস্ত প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন, তবে শাস্ত্র নিশ্চয়ই তাঁহার উপর কৃপা করিবেন। তিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাধনা দ্বারা বিদ্যাতত্ত্বের সাহায্যে আত্মতত্ত্বকে শিবতত্ত্বে আনয়ন করিয়া তান্ত্রিক আচমনের সফলতা সম্পাদন করিতে পারিবেন। ইতি—

সমালোচনা।

নওগাঁ প্যারীমোহন বালিকা বিদ্যালয় কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত গার্হস্থ্যনীতি, নব স্তুতিমালা, মেয়েদের ইতিহাস প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক আমরা বহুদিন হইল সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মজুমদার এই বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে প্রাণপণ করিতেছেন। তাঁহার রচিত গার্হস্থ্য নীতি পুস্তকখানি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বালিকাদিগের সারাদিনের কার্য্য, গৃহকার্য্য ও চরিত্রগঠন পুস্তকের এই তিনটি অধ্যায়। পুস্তকখানি ২০৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পুস্তকখানি বালিকাদের বিশেষ উপকারে লাগিবে। বালিকা-জীবন গঠনে যাহা যাহা আবশ্যক এবং যেরূপে শিক্ষাকার্য্যে পরিণত করা যায় তাহার সকল কথাই পুস্তকখানিতে আছে। শুধু বিদ্যালয়ে কেন— বহু সংসারে ইহার প্রচার আবশ্যক। পুস্তকের মূল্য ॥৶০। নবস্তুতিমালা ।৶০, বালিকাদের জন্য ।০, মেয়েদের ইতিহাস ৶০।

(২)

নূতন-বর্ষে আবার নূতন করিয়া বাঁচিতে চেষ্টা করি এস। পারিবে না কেন? পারিবে। যেমন করিয়া জীবন কাটাইবে ভাবিয়াছিলে তেমন করিয়া পার নাই। বর্ষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমারও নূতন জন্ম হইল ভাবি এস। মরিয়া ত আবার জন্মিবে তবে জীবন্তেই নূতন জন্ম হইল ভাবনা করিতে দোষ কি? আর ঐ যে ভাবিয়া রাখিয়াছ আবার কি আমায় জন্মিতে হইবে— এই অপুনরাবৃত্তি জন্য পূর্ব্ব হইতে সেইরূপ কর্ম্ম করা চাই। শুধু মুখের ইচ্ছাতে অপুনরাবৃত্তি লাভ করা যাইবে না। তেমন খাটিতে পার হইবে। হয় ত ভালই, যদি তেমন খাটিতে না পার তবে ত জন্ম আবার হইবেই। তবে ভাবনায় আবার নূতন জন্ম লাভ করা ত অতিশয় ভাল।

নূতন জন্মে পূর্ব্বকথা কিছুই মনে থাকিবে না। কেবল কর্ম্মের

প্রবৃত্তি দেখিয়া বলিবে মাত্র পূর্ব্ব জন্মে কত কি করিয়া আসিয়াছিলাম। দুঃখ দেখিয়া বলিবে—অহো! আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বুঝি ভাল ছিল না। কিন্তু এই নববর্ষের জন্মের সঙ্গে যে জন্ম হইল সে জন্মে পূর্ব্বের দোষও জানা রহিল, পূর্ব্বের আলস্য অনিচ্ছাও জানা রহিল, পূর্ব্বের চেষ্টাও জানা রহিল। পূর্ব্বের আলস্যে অনিচ্ছায়, পূর্ব্বের রিপুর প্রশ্রয়ে, পূর্ব্বের আহারের যথেচ্ছাচারে, পূর্ব্বের অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করায়, পূর্ব্বের নিত্য কর্ম্ম না করায় কত অনিষ্ট হইয়াছে তাহা জানি। কাজেই সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই নববর্ষে যাহা গত হইয়াছে সে সব দোষ মনে করিয়া উদ্যম শিথিল করিও না আর ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাহা ভাবিয়াও উৎসাহে নিরুৎসাহে নাচিও না। গত ও ভবিষ্যৎ কোন চিন্তা করিও না। থাক উপস্থিত লইয়া। দেখদেখি এক বৎসরে জীবনে কত কাজ করিতে পার। সকলে একরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। তেঁতুল চারা হইতে আম ফলিবে না সত্য, কিন্তু যতদূর ভাল তেঁতুল হইতে পারে। সে জন্য দুঃখ করিবে কেন? যে যত অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে, উপরে উঠিতে তার তত কষ্ট হইবে যথার্থ কিন্তু উন্নতি নিশ্চয়ই হইবে। হউক না কষ্ট—সকল দিকেই ত কষ্ট হইতেছে; এ না হয় শুভকার্য্যে ক্লেশ করিলাম ইহাতে ক্ষতি কি? এস দেখি কাজ করা যাউক।

সকলের কর্ম্ম একরূপ হইতে পারে না। সকলকে একরূপ কর্ম্ম-করিতেও কেহ বলেন না। তবুও ঋষিগণের কর্ম্ম করাইবার প্রণালী এত সুন্দর যে তাঁহাদের মতে চলিতে পারিলে আমরা আপন আপন কর্ম্ম শৃঙ্খলার সহিত করিতে পারিব।

এই নববর্ষে এস আমরা স্বধর্ম্মমত কর্ম্ম করি। সধর্ম্ম সেবাশ্রমে না ফিরিলে আমরা ঋষিদের কথামত মানুষ হইতে পারিব না। যা তা লোকের কথা শুনিয়া যা তা ভাবে জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা, স্বধর্ম্ম-সেবাশ্রমে থাকিয়া শতবার মরাও ভাল।

কি করিতে হইবে জান? সমকালে নিজের উন্নতি ও তাহার অঙ্গস্বরূপ সমাজের উন্নতির পথে চলিতে হইবে। নিজের নিত্য কর্ম্ম বাদ দিয়া সমাজ সমাজ করিয়া আজ এই ঋষিদিগের বংশধরেরা বড়ই শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে। ঋষিদের মতে সকলে চলিবে না, বা চলিতে পারিবে না জানিও। এ স্রোতও সমাজে চলিবে। ইহারা ভাবিতেছে আমাদের রাজাদের সঙ্গে একরূপ আচার ব্যবহার, আহার ধর্ম্ম ইত্যাদি না করিতে পারিলে অন্য সভ্য জাতি আমাদিগকে কোন উন্নত জাতি বলিয়া মনেই করিবে না—যদি তোমরা তাই ভাবিয়া থাক তবে তাহাই কর। কিন্তু আমরা তাহা ভাবি না। আমরা যতই কেন হীন অবস্থায় আসি না আমরা জানি ঋষিগণের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। তাঁহাদের অভ্রান্ত কার্য্য দূরে ফেলিয়া অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন আজকালকার ব্যক্তির কথা আমরা কখনই শুনিব না। কারণ তাহা অসত্য। সত্য ত্যাগ করিয়া অসত্য পথে আমরা যাইব না। মরিতে হয় মরিব তথাপি অসত্য পথে চলিব না।

বলিতেছিলাম ব্রাহ্মণে সন্ধ্যা আহ্নিক করিবে না অথচ বলিবে আমরা হিন্দু—এ কথার মর্ম্ম আমরা বুঝি না। ব্রহ্মা তাঁহার রাত্রির পরে—দিবসোদয়ে যখন সৃষ্টি করেন তখন সন্ধ্যা করিয়াই সৃষ্টি করেন। ভগবান্ বশিষ্ঠদেবও পরমাত্মা রামকে সাক্ষাৎ জীবন্মুক্তির উপদেশ দিতে দিতেও বলেন—রাম এখন মধ্যাহ্ন কাল—এখন মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় যাও, শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজ্যস্থাপনকালে—যখন সন্ধ্যা হইতেছিল তখন জল অন্বেষণ করিতেছিলেন। যাদবেরা তাঁহার চেষ্টা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তুমি জল লইয়া কি করিবে—কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন এখন সায়ংসন্ধ্যার কাল। সন্ধ্যা করিতে হইবে।

শ্রীভগবান্ নিজে, সৃষ্টিকর্ত্তা আপনি এবং ঋষিগণ কেহই বলেন না—সন্ধ্যা বাদ দিতে। তাঁহাদের উপদেশে কোথাও ইহা পাওয়া যায় না। কিন্তু তুমি যে বল সন্ধ্যা নিম্নঅধিকারীর জন্য—ইহাতে কি বুঝিতে হয়? বুঝিতে কি হয় না তুমি বিকারগ্রস্ত? যাহা নিত্যকর্ম্ম তাহা

বাদ ত হইতেই পারে না। শাস্ত্র যেখানে ইহা বাদ দিয়াছেন (সন্ন্যাস আশ্রমে) তাহা ভিন্ন অন্য কোথাও—অন্য কাহারও ইহার বাদ চলিতে পারে না।

সন্ধ্যা করি না অথচ বলি আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ ইহা কি কথা—তাহার বিচার তোমারই উপর।

শক্তি সঞ্চয় কর ইহাও আমাদের মঙ্গলাকাঙ্খিগণ বলিয়া থাকেন। অতি সুন্দর উপদেশ। লোকসঙ্ঘ গঠন করিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে আবার প্রতি ব্যক্তির মধ্যেও শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে। ব্যক্তির শক্তিসঞ্চয়ে যখন সমাজ গঠিত হয় তখনই ইহা স্বাভাবিক। সেই জন্য আমরা ব্যক্তিগত শক্তিসঞ্চয়ের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া থাকি। 'স্বরূপ-বিশ্রান্তি পথে' প্রবন্ধে ইহারই একটি উপায় বলা হইয়াছে।

ব্যক্তির মধ্যে শক্তি জাগিবে কিরূপে? বিনা সাধনায় এইখানে শক্তি জাগিবে না। যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাঁহারাই লক্ষ্য করিতে পারেন যে, সাধনা দ্বারা মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও জাগাইয়া তুলা যায়। উপহাস না করিয়া একটি দিনও এক হাজার গায়ত্রী যেরূপে পার জপিয়া দেখ, আমাদের কথা সত্য কি না কথঞ্চিৎ বুঝিবে। ঠিক ঠিক কর, ঠিক ঠিক বুঝিবে।

যিনি স্বধর্ম্মে যথাযথভাবে থাকিতে চেষ্টা করেন, তিনি আর পাঁচ জনের উপকার না করিয়া আপন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে কিছুতেই সক্ষম নহেন। যজনের সঙ্গে যাজন চাই, অধ্যয়নের সঙ্গে অধ্যাপন চাই, প্রতিগ্রহের সঙ্গে দান চাই। এইরূপ অন্যান্যবর্ণ সম্বন্ধেও উপদেশ। ফলে যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া সমাজ গড়িতে চান, তাঁহারা হিন্দু নহেন। আমরা মহামতি সার জন উড্রফ সাহেবের ভারত কি উন্নত—এই প্রবন্ধে এই সমস্ত বিষয়ের কথা আর একবার আলোচনা করিব।

হিন্দুর জাতিভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হইতে পারিলেন না, তাঁহার কি ব্রাহ্মণ-বীর্য্যে জন্ম না হইলে ব্রাহ্মণত্বলাভ কদাচ সম্ভবপর হইত? এই ঘটনায় ত স্পষ্টই সূচিত হয় যে, বিশ্বামিত্র কেবল তপস্যায় ব্রাহ্মণ হন নাই; প্রত্যুত ব্রাহ্মণ-বীর্য্যে জন্মলাভই তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভের একমাত্র মূলীভূত কারণ; অথচ আবার ইহার সঙ্গে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলত আছেই; সুতরাং ইহা যে মণিকাঞ্চের যোগ তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? অতএব বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া যাঁহারা জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই আপত্তির কোন মূল্যই নাই। তারপর জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব বা জন্মগত জাতিভেদই যদি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত না হইবে তাহা হইলে জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে,—এমন কথাইবা শাস্ত্রে থাকিবে কেন? ভগবান্ মহাদেবই আদ্যাশক্তি-পার্ব্বতীর নিকট বলিতেছেন। জন্মই ব্রাহ্মণসংজ্ঞার কারণ এবং সংস্কারই দ্বিজসংজ্ঞার কারণ। জন্মগত ব্রাহ্মণও শাস্ত্রসঙ্গত সমীচীন সিদ্ধান্ত না হইলে কি ভগবান্ মনু "ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যাম-ধিজায়তে" এমন কথা কি কখনও কিছুতেই বলিতে পারিতেন? তবে "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্" ইহাও অবশ্য ভগবান্ মনুরই বচন বটে; কিন্তু ইহা যে জন্মগত জাতিরই বিরুদ্ধ পরিচায়ক তাহাত কিছুতেই হইতে পারে না। ইদানীন্তন অনেকেই এই বচনের প্রকৃত অর্থ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মহা গোলই পাকাইতেছেন। নানা শাস্ত্রীয় বচনের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দ্বারা এই বচনের অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়া হিন্দু-সমাজের আদর্শ ধর্ম্মপত্র বঙ্গবাসী লিখিয়াছেন—এই বচনের অর্থ এইরূপ নহে যে, শূদ্র এই জন্মেই ব্রাহ্মণ হইবে বা ব্রাহ্মণ এই জন্মেই শূদ্র হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণের অনুপযোগী হইবে। যদি ভগবান মনুর এই মত হইত, তবে মহাভারতের ভগবান ব্যাসদেব কখন

বলিতেন না অতি হীনবর্ণোদ্ভব শূদ্রও স্বীয় সৎকর্ম্ম প্রভাবে অনায়াসে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে জন্মিতে পারেন আবার ব্রাহ্মণ নীচবর্ণের অন্নভক্ষণ প্রভৃতি অসৎকর্ম্মপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে। ইহাতে দেখা যাইতেছে গুণশালী শূদ্র পরজন্মে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিবেন; এবং গুণহীন ব্রাহ্মণ পরজন্মে শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। কিন্তু ইহাতেই যে এই জন্মেই গুণহীণ ব্রাহ্মণকে লোকে শূদ্রবৎ দেখিবে ইহা শাস্ত্র উপদেশ করিতে-ছেন না। যদি তাহাই হইত তবে শ্রীভগবান্ কখনও বলিতেন না—অবিদ্যোবা সবিদ্যোবা ব্রাহ্মণো মামকী তনূঃ" অর্থাৎ মূর্খই হউন বা বিদ্বান্ই হউন ব্রাহ্মণ আমারই দেহ। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পতিত জাতি ব্রাহ্মণেরও পদ ধৌত করি-বার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। (বঙ্গবাসী হইতে উদ্ধৃত)। "ইহজন্মে জন্মই যে একমাত্র ব্রাহ্মণ্যের কারণ তাহাত এই সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ভগবদ্দৃষ্টান্ত দ্বারাই সুন্দর প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব শূদ্রো ব্রাহ্ম-ণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্" এই ভগবান্ মনুবচনের অর্থে এইরূপ নহে যে, কর্ম্মানুরারে শূদ্র এই জন্মেই ব্রাহ্মণ হইবে বা ব্রাহ্মণ এই জন্মেই শূদ্র হইয়া যজ্ঞোপবীতধারণের অনুপযোগী হইবে। এই সব শাস্ত্রীয় প্রমাণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্মানুসারে ইহজন্মে কিছুতেই জাতির বা সম্মানের ব্যত্যয় হয় না, কর্ম্মানুসারে জাত্যন্তর প্রাপ্তি বা উচ্চ নীচ হওয়া যে কেবল জন্মান্তর-সাপেক্ষ এতাবতা তাহাই স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। এই বচনের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য না করিয়াই বাবুর দল মহাগোল পাকাইতেছেন।

পরম ভক্তিভাজন স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, মহাশয়ও তাঁহার হিন্দুত্ব পুস্তকে লিখিয়াছেন—যাঁহারা ইউরোপীয় সাম্যবাদের পক্ষপাতী, তাঁহারা হয় ত এইখানে হিন্দুশাস্ত্রকারকে জিজ্ঞাসা করিবেন তবে কি শূদ্র কখনই এবং কিছুতেই বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না?

ক্রমশঃ

উৎসব।

—৹-*-৹—

স্বাত্মারামায় নমঃ।
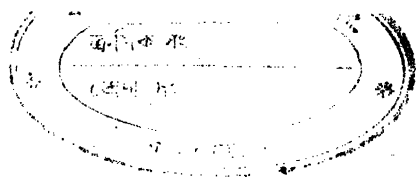
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৪শ বর্ষ। } সন ১৩২৬ সাল, জ্যৈষ্ঠ। { ২য় সংখ্যা।

অবতার।

(১)

সাগরের গর্ভ হতে প্রলয়ের কালে
শঙ্খাসুরে বধি যেবা বেদ উদ্ধারিলে
বেদরাশি ব্রহ্মাকে যে করিল প্রদান
আদিদেব মৎস্যরূপী চরণে প্রণাম।

(২)

বাসুকি ও মন্দরাদি মিলি দেবাসুরে
সমুদ্র মথন করে অমৃতের তরে
মথন বেগেতে ধরা বিঘূর্ণিত হয়
সে কালে যে কূর্ম্মরূপে হয়েন উদয়

ঘূর্ণিত ধরাকে পৃষ্ঠে যে করে ধারণ
স্মরণ করি সে আমি শ্রীবিষ্ণুচরণ।

(৩)

সমুদ্র যাঁহার কাঞ্চী নদী উত্তরীয়
মুকুট স্বরূপে যাঁর সুমেরু উদয়
দন্তাগ্রেতে বসুন্ধরা যে করে ধারণ
সে বিষ্ণু চরণে আমি লইনু শরণ।

(৪)

নরসিংহ রূপে যেবা মণিস্তম্ভ হতে
আবির্ভূত হইলেন প্রহ্লাদে রক্ষিতে
নখাগ্রে বিদীর্ণ করি, বধি দৈত্য রাজে
আর্ত্তভক্ত প্রহ্লাদের রহে হৃদিমাঝে
ভুলিবনা কভু আমি সে দেব চরণ
একান্ত ভজিয়া আমি লইনু শরণ।

(৫)

অলঙ্কৃত ধরা চতুঃ সমুদ্র ভবন.
রাখিতে হ'লনা স্থান একটি চরণ
দ্বিতীয় পদের স্থান হয়না ত্রিদিবে
ত্রিবিক্রম রূপী বিষ্ণু আছে সর্ব্ব ভাবে
তাঁহার শ্রীপাদ পদ্মে নমস্কার করি
নিখিল পালন কর্ত্তা জগতের হরি।

(৬)

নিঃক্ষত্র করিয়া ধরা তিন সপ্তবার
পুনঃ পুনঃ রাজগণে করিল সংহার

পরে তাহাদের সেই রক্তময় জল
পিতৃলোকে দিয়া যাহা তর্পণ করিল
বিষ্ণুরূপী আদিশূর শ্রীপরশুরাম
তাঁহার চরণে মোর সহস্র প্রণাম।

(৭)

রঘুবংশে জনমিয়া সমুদ্রের মধ্যে
সেতু নির্ম্মাইয়া শেষে লঙ্কেশ্বরে বধে
প্রণাম করিগো আমি সীতাপতিপদে
রাখ নাথ দীন হীনে এ ভব বিপদে।

(৮)

শ্রীকৃষ্ণের বলে যেবা হয়ে বলীয়ান
হলাঘাতে বধিলেন রাজগণপ্রাণ
চূর্ণ করিলেন সব প্রহারি মুষল
প্রণামি শ্রীকৃষ্ণরাম চরণ যুগল।

(৯)

সুরকুল দিয়া পূর্ব্বে অসুরের কুলে
বিজয় করিয়া সব করিলা নির্ম্মূল
সে কালে ধীবর বেশ করিয়া ধারণ
যে অমোঘ শাস্ত্ররাশি করে প্রণয়ণ
সেই বুদ্ধরূপী বিষ্ণু প্রণম্য আমার
যাঁর নামে ভবসিন্ধু হয়ে যাব পার।

(১০)

কল্প অবসান কালে ঘোটকে আরোহি
বিষম সে নিজ তেজে বিশ্ব লয় দহি

নিমেষ মধ্যেতে বিশ্ব করে সংঘটন
বিশ্বপতি কল্কিরূপী প্রণমি চরণ
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ শোভে
গরুড় আরূঢ় সদা মুনি মনোলোভে
বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন অপূর্ব্ব মহিমা
ভক্তাধীন ভক্তজনে বাড়াতে গরিমা
সমগ্র বিশ্বের আদিভূত ভগবান
সে তমালনীল বিষ্ণু হৃদে করি ধ্যান

শেষ ভাবনা--জীবনব্যাপী অয়োজন।

সমস্ত জীবন ধরিয়া ত অর্থ ও কামের ভাবনা ভাবিলাম। ঋষিগণের উপদেশ অনুসরণ করিয়া অর্থ ও কামকে ধর্ম্মের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করি নাই। জীবনব্যাপী আয়োজন ত হইয়াছিল কামিনী কাঞ্চন লইয়া। এখন কি আর শেষ ভাবনা হইবে? আর কি সময় আছে? এখন কিছু করিতে গেলে ত অসংবদ্ধ প্রলাপ বকি। আহ্নিক করিতে গিয়া মন্ত্র ভুলি—আবার ভাবি সূর্য্যার্ঘ্য কি দিয়াছি? ধ্যানটা 'বুঝি করি নাই। এইত হয়, তাই বলিতেছি শেষ ভাবনা কি হইবে? আর কি সময় আছে?

আছে! এখনও বিলক্ষণ সময় আছে। শাস্ত্রেও এমন লোকের কথা পাওয়া যায় যে যাঁহারা জীবনের বহু সময় অর্থ ও কাম লইয়া কাটাইয়াছিলেন, শেষে কিন্তু প্রবল বেগে শেষের ভাবনা ভাবিয়া বড় উচ্চগতি লাভ করিয়াছিলেন। তবেত আশা, এখনও আছে। আর যে কয়টা দিন আছে বেশ করিয়া লাগিয়া পড়। গতি লাগিবে। শাস্ত্র না আশা দিতেছেন—

নারায়ণেতি মন্ত্রোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে ঘোরে পতন্তীত্যেতদদ্ভুতম্॥

"নমো নারায়ণায়" মন্ত্রটি আছে, আবার বাক্য এখনও বশে আছে, কথা কহিতেও ত পারে—তথাপি যে মানুষ ঘোর নরকে পড়ে এই বড় অদ্ভুত। আশা কি জাগে না? নিশ্চয় জাগিবে।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটু আয়োজন করিয়া লও। একা ত স্থির হইতে পার না—তাই এদিক ওদিক চাও—এখানে সেখানে ঘোর—এ সাধু ও সাধুর কাছে ছোট—আর নূতন নূতন কথা শুনিয়া ঘাবড়াইয়া যাও। নানা সন্দেহ তুলিয়া ভাব আমি কি ঠিক করিতেছি?

এ সব ঘোরা ফেরা ছাড়। ছাড়িয়া যা ধরিয়াছ তাহাই বিশেষ ভাবে সাধিয়া যাও—মৌনী বাবা, সোঽহং বাবা আর—বহু বাবায় কাজ নাই। যাহা পাইয়াছ তাহাই জোর করিয়া ধর। বাধা ত পাইবেই। চিরদিন অর্থ ও কামের পশ্চাতে ছুটিয়াছ, তাই ছুটাছুটির অভ্যাসটা যায় নাই। এখন মনটাকে একটু বসাও। নিত্য তিন বেলা বস, আর কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া কোন কর্ম্মীর নিকটে একটি একটি মাত্র শাস্ত্র আলোচনা কর। ধর গীতা বা ভাগবত বা অধ্যাত্ম রামায়ণ বা দেবী ভাগবত। যা হোক একটি শাস্ত্র প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ কর বা শ্রবণ কর! সেই সময়ে দুই চারি জন বন্ধুবান্ধকেও শুনিতে ডাক। একবার পড়া হইয়া গেলে তখন না হয় কর্ম্মীর জন্য অর্থ ব্যয় আর না করিলে? নিজে বন্ধুবান্ধব লইয়া পাঠ কর বা বন্ধুবান্ধবদের কাহাকেও পাঠ করিতে বল আর সবাই শ্রবণ কর। কোন শাস্ত্র একবার পড়িয়া যদি ভাব একবার ত পড়িলাম আবার কি? তাহা হইলে তুমি শাস্ত্র হইতে ভস্মও পাও নাই।

শুন ঋষি বাক্য কি—

যস্তেকবার মালোক্য দৃষ্টমিত্যেব সন্ত্যজেৎ।
ইদং স নাম শাস্ত্রেভ্যো ভস্মাপ্যাপ্নোতি নাধমঃ॥

শাস্ত্র একবার দেখিয়াই দেখা হইয়াছে বলিয়া যে উহা ত্যাগ করে সেই অধম শাস্ত্রনিচয় হইতে ছাইও পায় না। যে শাস্ত্রই ধর যতদিন

পর্য্যন্ত একান্তে স্থির হইয়া বসিতে না পারিতেছ, তত দিন ধরিয়া শাস্ত্র আলোচনা কর। নিত্য কর্ম্ম ও নিত্য স্বাধ্যায় লইয়া থাক। ইহার উপরে কখন কখন যথার্থ শাস্ত্রপথাবলম্বী যিনি তার কাছে যাও—ভাল করিয়া সাধনা করিতে পারিবে। তখন মাতিতে পারিবে; আর দেখিবে শাস্ত্রও এইরূপ কথা বলিতেছেন—গাত্‌লেত একেবারে মেতে যাও, আর কেন এদিক ওদিক সেদিক চাও।"

২

এইরূপ একটা আয়োজন এখনও করিয়া লও; লইয়া একবার শেষের ভাবনাটি বেশ করিয়া বুঝিয়া লও। সর্ব্বদা আশা সবল রাখিতে পারিবে, নিজের উন্নতি বুঝিতে পারিবে। কখন জপ লইয়া থাকিতে পারিবে, কখন ধ্যান লইয়া থাকিতে পারিবে—কখন বিচার লইয়া থাকিতে পারিবে—কখন আপনার মনে পঠিত শাস্ত্রের ভাব উঠিতে দেখিবে। তখন বড় ভাল হইবে। শেষের দিনের ভয় আর থাকিবেনা। জীবনটাও সফল হইয়া যাইবে। তীর্থদর্শনের পরে পাণ্ডার হাতে 'সফল' লইয়া ধন্য হইয়া যাইবে।

৩

শেষের ভাবনা কি জান? যখন তখন নিত্যক্রিয়া ইত্যাদি করিয়া ঐ ভাবনাটিকে দৃঢ় করিতে হইবে—তাই না শেষের ভাবনাটি জানিতে হয়?

শেষের ভাবনাটি হইতেছে ধ্যান। ধ্যান হইতেছে দুই প্রকার। একটি ধ্যান হৃদয়ে করিতে হয়, আর একটি করিতে হয় সহস্রারে। দুই স্থানকে শাস্ত্র হৃদয় বলেন। হৃদয়ও হৃদয় বটে, আবার ভ্রূমধ্য ও হৃদয় বটে। যেমন নাসাগ্র বলিতে নাসার উপর ও নিম্ন দুই বুঝায় ইহাই সেইরূপ। ফলে যেখানে ভাবনা কর, ভাল করিয়া দেখিলে তাহাই হৃদয় হইয়া যায়। ভাবনাটা বাহিরে আরম্ভ করিলে

কখন কখন করা যায়, কিন্তু শেষে চক্ষু বুজিলে তাহাই ভিতরে হইয়া যায়।

হৃদয় হইতেছে ইষ্টদেবতার স্থান, আর সহস্রার হইতেছে গুরুস্থান। ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে স্মরণ করিতে হইবে—সর্ব্বদা সকল বাক্য সকল কার্য্য তাঁহাকে জানাইয়া করিতে হইবে। এই জন্য সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে কথা কওয়াটা পাকা ভাবে অভ্যাস করিয়া লইতে হইবে। আর কর্ম্ম অন্তে স্থির হইয়া বসিয়া তাঁর অপেক্ষা করিতে হইবে। অপেক্ষা করিয়া করিয়া দেখিতে হইবে সে আসিল কিনা—সে কাহাকেও আমার জন্য পাঠাইল কি না? বড় ভাল অভ্যাস ইহা। নিত্য মানস পূজাও করিবে, তার পরে তার সঙ্গে কথা কও আর তার জন্য অপেক্ষা কর। ব্যবহারিক কাজে যাইবার সময় তার কাছে বিদায় লইয়া যাও—দেখিবে সে তোমার হৃদয়ে হৃদয়েই তোমার সঙ্গে চলিল—তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা রহিল। সেই তোমায় বড় বেশী ভাল বাসে—ভালবাসে বলিয়া সে তোমায় এক দণ্ডও ছাড়ে না। আর সেই তোমায় সর্ব্বদা বলে "ওরে তোর হৃদয়ে আমি যেমন বসিয়াছি সেইরূপ সকলের হৃদয়েই দেখ্ না আমি আছি। আমি ছাড়া আর যে দেখার কোনকিছুই নাই! সবার মধ্যে আমাকেই দেখ্, আবার নিজের মধ্যেও আমাকে দেখ্। বাহিরের আকার যা দেখিস্, তা আমি মুখোশ পরিয়া সাজিয়া থাকি মাত্র—বাহিরের যে রাগ দ্বেষের কথা শুনিস্ তাহা মায়িক মাত্র। তুই এসব দেখার ভিতরে এসব শোনার ভিতরে আমার দিকে চাহিতেই অভ্যাস করিয়া ফেল্। মানুষ দেখিলে—নিজের হৃদয়ে যেমন আমাকে ভাবিস্—সেইরূপ সবার হৃদয়ে আমি বসিয়া আছি তাহা ভাবিস্; এইরূপ যেখানে দেহ দেখিবি তারই হৃদয়ে আমি বসিয়া আছি তাহা ভাবনা করিস্। হৃদয়ে মূর্ত্তিটি কিরূপে ভাবনা করিবি জানিস্—মহাবীর যেমন বুক চিরিয়া শ্রীলক্ষ্মণকে সীতারাম দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপে হৃদয়পদ্মে ইষ্টদেবদেবীকে দেখিতে হইবে। এ দেখা বিশ্বাসে—এ স্মরণ বিশ্বাসে। এই সঙ্গে দেবতার পীঠস্থানটীও

ভাবিয়া লইও। প্রাতঃসূর্য্যের মত শুভ্র জ্যোতিঃ হৃদয়পদ্মের উপরে—সেই জ্যোতির ভিতরে অতি গাঢ় নীল—তাহার ভিতরে ইষ্টদেবতা—সব কথা বলা গেল না—পঞ্চপাদুকার মধ্যে দুইটির কথা বলা হইল—ইহাতেই কার্য্য হইবে।

এই যে ইষ্টদেবতা ইহাঁকে স্মরিয়া যখন যে কার্য্য আসিবে তাহা করিতে অভ্যাস কর। মহাবীর যেমন সমুদ্র লঙ্ঘনের সময়, ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধের সময়, রাবণের সভায় বসিয়া রাবণকে শিক্ষা দিবার সময়, ইষ্টমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছিলেন সেইরূপে অভ্যাস করিয়া ফেলিতে হইবে। মন অসংবদ্ধ প্রলাপ বকিবার সময় এই হৃদয় দেবতাকে নালিশ করিতে হইবে। সংসারে স্ত্রী পুত্র ও কন্যার বাক্য শুনিবার সময়—অথবা বিবাদে গালিগালাজ শুনিবার সময়—অথবা লোকের মুখে নিন্দাস্তুতি শুনিবার সময় হৃদয়-দেবতার সহিত কথা কওয়াটা এমন অভ্যাস করিতে হইবে যে সে সময় যেন একটুও বিচলিত না হইতে হয়। দুঃসময়ে বেশ করিয়া তাঁর সঙ্গে কথা বলিবার অভ্যাস করিলে দুঃসময় সুসময় হইয়া যাইবে। এই হইল প্রথম ভূমিকা। ইহা ভক্তিমার্গের সাধনা। ইহার পরে জ্ঞানমার্গের সাধনা। হৃদয়ে ইষ্টধ্যানের পরে গুরুর ধ্যান সহস্রারে। এই ধ্যান হইতেছে "সত্যং পরং ধীমহি।" শ্রীগুরুর স্থানে গমন করিলে আর কোনই দ্বন্দ্বভাব থাকে না। "নিয়মিতাঘকোলাহলং" হইয়া যায়। সেখানে গেলে "ধাম্না স্বেন নিরস্ত কুহকং" হইয়া যায়, সেখানে গেলে শ্রীগুরু শিষ্যকে আর পৃথক অবস্থায় রাখেন না—শ্রীগুরু আপনার মতন শিষ্যকে ষড়োর্ম্মির পারে লইয়া যান—জন্মমৃত্যু দেহের, দেহ আমি নই, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাণের, প্রাণ আমি নই, শোক মোহ মনের, মন আমি নই। আমি পূর্ণ—আমি জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির উপরে তুরীয়, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, শ্রীগুরু শিষ্যকে এই বোধ দিয়া স্বরূপে বিশ্রাম লাভ করাইয়া দিয়া থাকেন।

হৃদয়ে ইষ্টদেবতার নিত্যস্মরণে তিনিই তখন শিষ্যকে গুরু স্থানে "প্রচোদয়াৎ" করেন।

ইষ্টদেবতার স্থান হইতে গুরুস্থানে যাওয়ার ভাবনাটিকে শেষ ভাবনা করিয়া ফেল—সর্ব্বদা যখন অবসর পাইবে এই ভাবনা কর—ভাবনা পাকা হইয়া গেলে ইষ্টই গুরু স্থানে লইয়া যাইতেছেন ইহাই সর্ব্বদা মনে থাকিবে শেষের দিনে যদি কর্ম্মবশে ভুল হয় তাহা হইলে ইষ্টদেবতাই বলিতেছেন "মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ" মরণে আমার স্মৃতি আমিই জাগাইয়া দিব—আমিই ইষ্টদেবতা, আমিই শ্রীগুরু, আর আমিই মন্ত্র—এই তিন এক করিয়া কখন মন্ত্র জপ কর, কখন ইষ্ট ধ্যান কর, কখন বা আমি দেহ নই, আমি মন নই, এই ভাবিয়া ভাবিয়া সেই অনন্তের এক অতি ক্ষুদ্র স্থানে মায়ার তরঙ্গকে অগ্রাহ্য করিয়া "সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ" সর্ব্বদা এই ভাবনা করিয়া তাহাতেই বিশ্রাম লাভ কর। মরণের সময় কি করিবে এ ভয় আর থাকিবে না। মহাবীর যেমন কর্ম্মখণ্ডে জ্ঞানাপেক্ষ হইয়াছিলেন আর মায়ের কাছে, শ্রীভগবানের মুখে জ্ঞানের কথা শুনিয়া শুনিয়া এই জীবনেই সব শেষ করিয়াছিলেন তোমার আমারও তাহাই হইয়া যাইবে।

লঘূপায়।

নাম কর আর প্রণাম কর ইহা সর্ব্বদা স্মরণের অতি সহজ উপায়। যাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ ভিন্ন ভীম ভবার্ণবে পাড়ী দেওয়া যাইবে না তিনি কোথায় নাই? তোমার মনে তিনি, তোমার বাক্যে তিনি, তোমার প্রাণে তিনি, তোমার হৃদয় কমলে তিনি, গুরু রূপে সহস্রারে তিনি, প্রণব রূপে কূটস্থে তিনি, ইষ্ট রূপে হৃদয় কমলে তিনি—তিনি কোথায় নাই? শাস্ত্র মুখে, সাধু মুখে, তাঁহার স্বরূপের কথা কতইত শোনা হইয়াছে। যত কিছু দেহ তাহাতে দেহীরূপে তিনিই আছেন। জগৎ যাহাই হউক কিন্তু জগৎরূপে সেই চৈতন্যই আকার ধরিয়াছেন।

তবেই ত হইল সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তিনি। চৈতন্যে লক্ষ্য কর আর মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভিতরে মন্ত্ররূপী তাঁহাকে প্রণাম কর, আর বাহিরে সকল প্রাণীকে সকল বস্তুকে চৈতন্যময় চৈতন্যময়ী ইষ্টদেব ইষ্টদেবী ভাবিয়া মনে মনে প্রণাম কর। জপের সঙ্গে এই প্রণামটি অভ্যাস করিয়া ফেল। কাহারও সহিত কথা কহিবার পূর্ব্বে, কোন কিছু দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে যেন প্রণাম করিতে পার ইহা অভ্যাস করিয়া ফেলি এস। নাম জপ ত কর। ইহাত ভিতরের চৈতন্যকে ইষ্টদেবদেবীর ছাঁচে ফেলিয়া দেখিতে দেখিতে জপ কর—ইহাঁকেই দেখিতেই দেখিতে ইহাঁকেই স্মরিতে স্মরিতে ইহাঁকেই প্রণাম করিতে করিতে নাম জপ কর বড় ভাল হইবে। ভিতরে প্রণাম অভ্যাস কর, করিয়া বাহিরে যাহা দেখ তাহাকেই চৈতন্যরূপী শ্রীভগবানের দেহ ভাবিয়া আর সেই দেহের ভিতরে শক্তি শক্তিমান আছেন ভাবনা করিয়া করিয়া নাম জপ আর প্রণাম কর! বিনা অভ্যাসে কোন কিছুই লাভ হইবে না স্থির জানিও। দশ হাজার জপ ভাল কিন্তু সর্ব্বত্র জপের সঙ্গে প্রণামের প্রয়োগ করিতে অভ্যাস করা বড় ভাল।

এই ব্রহ্মাণ্ড ত তাঁর মন্দির। এই দেহত তাঁরই মন্দির। মন্দিরে দেবতা আছেন—মন্দিরের বাহিরেও দেবতা আছেন। এমন কি তিনিই মন্দিররূপে দাঁড়াইয়া আছেন। এই ভাবে জগৎকে ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন কর। সকলকেই ঈশ্বর ভাবনা করিয়া জপে প্রণামে সেবা কর, মানসে পূজা কর—সেবাই যে অনুরাগের প্রাণ ইহা ভুলিওনা। নিত্য কর্ম্ম ত করিবেই নিত্য স্বাধ্যায় ও অভ্যাস কর। তাহাও তাঁহাকে শোনাইয়া কর।

এক কথায় পরোক্ষ জ্ঞানে তিনিই সব সাজিয়া আছেন. তাহা বেশ করিয়া বুঝিয়া সর্ব্বদা জপের সঙ্গে প্রণাম অভ্যাস কর। ইহা বড় সহজ উপায়। শ্রীভগবানও সহজ উপায়ের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন 'মাং নমস্কুরু'। শুধু এখানে ওখানে ছুটিলে কি হইবে? ভিতরে বাহিরে অন্ততঃ বিশ্বাসে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাকে স্মরিয়া নিত্য

তাঁহাকে লইয়া থাকিতে হইবে। এখন যেমন শ্রীভগবানকে ডাকিতে গিয়া বিষয় চিন্তা করিয়া ফেল সেইরূপ যখন সংসার করিতে গিয়া শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া ফেলিবে তখন বুঝিও ঠিক পথে চলিতেছ। নতুবা 'তোঁহে বিঁসরি মন তাহে সমর্পিনু' যদি নিত্য হয় তাহা হইলে বড় ফেরে পড়িবে। তাই বলি জপ আর প্রণাম নিত্য অভ্যাস করিয়া ফেল, হইবে। শুন দেখি নামের কথা কে গায় ওই—

"এ নাম করে কণ্ঠহার কণ্ঠেতে আমার
পরেচি কত আদরে।
আমি কত না যতনে, বুক ভরা ধনে
রাখিয়াছি বুকে ধরে॥
এ নাম শিরেতে ধরেছি প্রণাম করেছি
বার বার ভক্তি ভরে।
এ নাম রেখেছি শ্রবণে নয়নে নয়নে
কত না আদর করে॥
এখন যায় যাবে প্রাণ নাহি জানি আন
নাম কেবল নাম।
এবার নাম বুকে ধরে অনায়াসে ত'রে
যাব সে আনন্দধাম॥

অভ্যাসে—আহারে বিহারে স্বাধ্যায়ে তপস্যায় নিত্য অভ্যাসে তারই হইয়া যাও! কেন হইবে না? তার নাম যখন লইয়াছ তখন ভয় কেন করিবে? যাহা হয় হউক—যাহা আসে আসুক—বৃক্ষ যেন বারিধারা মাথাপাতি লয়—এইভাবে নাম জপিয়া নামীকে প্রণাম করিয়া চল কোন ভয় সে রাখিবে না। মরণের ভয় কেন করিবে?

যো যিন্‌বে স্মরণ লিয়া সো রাখে ওন্‌কো লাজ। উলট্‌ জলে মছ্‌লি চলে বহি যায় গজরাজ।" শরণ লও আর সে কি বলিতেছে শোন—স্মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ।

জগন্নাথ।

(১)

শান্তিময়, সুশীতল ও-পদ-কমল,
এসেছি দুয়ারে আজ ভিখারিণী সাজে ;
আমি দীন-কাঙ্গালিণী, অজ্ঞান, দুর্ব্বল,
ফিরায়ে দিও না নাথ ! বড় ব্যথা বাজে।

(২)

ভুলে, ভুলে, গতাগতি দেও শেষ করে,
তুমি না চাহিলে নাথ করুণা নয়নে
জন্ম, মৃত্যু ভবব্যাধি কে ঘুচাতে পারে ?
লয়ে শেষ আশা তাই এসেছি দুয়ারে।

(৩)

পবিত্র সুন্দর কত সে গৃহ তোমার
যেথা নাহি মর্ম্মঘাতী সংসারের জ্বালা,
জ্যোতিঘেরা, জ্যোতির্ম্ময় রূপ মনোহর
আপনি আপনি রহি সদা আত্মভোলা।

(৪)

স্নেহভরা, হাসিমাখা দুটী স্থির আঁখি
নিয়ত মঙ্গল লাগি আছে সাথে সাথে,
রয়েছ যতনে মরি সদা আগুলিয়া
বিসরি কেমনে দেব ! যাব অন্য পথে ?

(৫)

তব স্নেহ শান্তিকণা পরশ পাইয়া
তোমার(ই) আনন্দ স্মৃতি যবে জাগে প্রাণে,
অনন্ত অসীম তুমি তোমারে চাহিয়া
আমার ক্ষুদ্রত্ব ভুলি, যাই মিশাইয়া ।

(৬)

এ দুরন্ত অহং জ্বালা ঘুচায়ে এবার,
কর শান্ত চিরতরে তোমার সন্তানে
জগন্নাথ নাম তব জগতে প্রচার
আমি ত জগত মাঝে নহি জগবার ?

তোমার পূজা।

জীবন ধন্য করিতেই ত চাই। এতদিন বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিতেছি আমরা তোমারই। আমরা ইন্দ্রিয় স্থানীয়—অন্তরের ও বাহিরের ইন্দ্রিয় স্থানীয় আমরা। আমরা তোমারই পরিবার বর্গ। তুমি আমাদের প্রাণ। তুমি না থাকিলে আমরা মরিয়া যাই। আবার তুমি আসিলে আমরা জীবন পাই। প্রতিদিন দেখি তুমি আমাদের ছাড়িয়া কোথায় যেন যাও। তখন আমরা একেবারে মৃত হইয়া যাই। আবার তুমি যখন আসিয়া কি জানি কেমন করিয়া আমাদের স্পর্শ কর তখন আমরা বাঁচিয়া উঠি। তোমায় বাদ দিয়া আমরা স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্য কতই না বিবাদ করি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা বড়—আমার শক্তির কাছে কে দাঁড়াইতে পারে ইত্যাদি করিয়া আমরা বড়ই দুঃখে পড়ি। কতবার পড়িলাম এখন আর ঐ ভুল করিতে চাই না। এখন আমরা জীবন ধন্য করিতেই চাই।

আমাদের সকলের কার্য্য কিছু একরূপ নয়। আমরা কর্ম্ম করিতেই চাই সত্য। আমাদের সকলের সকল প্রকার কর্ম্মে যদি তোমার পূজা হয়, তবেই আমাদের জীবন ধন্য হয়।

যেমন চক্ষু কর্ণের দর্শনে শ্রবণে, হস্তপদাদির গ্রহণে গমনে, মনের সঙ্কল্পে বিকল্পে, বুদ্ধির বিচারে বিবেকে, যদি তোমার পূজা হয় তবে যেমন ইহারা ধন্য হয় সেইরূপ ব্রাহ্মণের যজনে যাজনে, অধ্যয়ন অধ্যাপনে দান প্রতিগ্রহে, যদি তোমার পূজা হয়, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধবিগ্রহে. দুষ্টের দমনে, শিষ্টের রক্ষণে, যদি তোমার পূজা হয়; বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্যে, ধনোপার্জ্জনে, ধনরক্ষণে, যদি তোমার পূজা হয়; শূদ্রের সর্ব্বপ্রকার সেবায় যদি তোমার পূজা হয়; তবে মনুষ্য জাতিও ধন্য হয়।

আমাদের নিত্য কর্ম্মে তোমার পূজা হওয়া চাই, নিত্য স্বাধ্যায়ে তোমার পূজা হওয়া চাই, সংসার পালনে তোমার পূজা হওয়া চাই,

আহারেবিহারে, আলাপে পরিচয়ে, এমন কি শয়নে স্বপনেও তোমার পূজা হওয়া চাই—এই যদি হয় তবেই জীবন ধন্য হয়। ইহা কি হইবে?

তোমাকে যদি সর্ব্বদা স্মরণে না রাখিতে পারিলাম তবে সকল কর্ম্মে তোমার পূজা হইবে কিরূপে? পূজার প্রাণ তবে স্মরণ। যেখানে স্মরণ হইল না—সেখানে পুষ্পপত্রে ফলে জলে তোমার পূজা কি হয়? স্মরণত চাইই—তারপরে তুমি যে প্রসন্ন তার অনুভব চাই। আমি যাহা তোমায় দিতেছি—গঙ্গাজলই দিই বা বিল্বদলই দিই বা বাক্যে স্তব স্তুতিই করি, বা স্বাধ্যায়ে তোমাকেই শুনাই, বা লেখায় তোমার গুণকীর্ত্তন করি, বা জপে তোমার নাম কীর্ত্তন করি, বা ক্রিয়ার পরাবস্থায় তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া স্থির হই, বা মানসে তোমার চরণ সেবা করি বা মানসে তোমার সেবা করি বা জীব সেবায় সেবা করিতেছি ভাবনা করি—এই সব কর্ম্মে তুমি আমার দত্ত সব বস্তু গ্রহণ করিতেছ, আমার সকল প্রার্থনা, সকল স্তবস্তুতি, গুণ কীর্ত্তন, নাম কীর্ত্তন, আমার পঠন পাঠন, আমার অধ্যয়ন, অধ্যাপন আমার যজন যাজন, আমার দান প্রতিগ্রহ সমস্তই তুমি গ্রহণ করিতেছ তুমি শুনিতেছ দেখিতেছ ইহা যতক্ষণ আমার অনুভব সীমায় না আইস ততক্ষণ আমার পূজা যে প্রকৃত হইল তাহা বুঝি কিরূপে?

স্মরণটি যেমন চাই প্রথমে, অনুভূতিটি তেমনই চাই সঙ্গে সঙ্গে বা শেষে— এই হইলে তবে ত হইবে?

স্মরণটি সকলেই করিতে পারে, কিন্তু এই অনুভবটি প্রথমে বিশ্বাসে হয়, শেষে হয় প্রত্যক্ষে।

বিশ্বাসে যখন হয় তখন আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হইবেই। চিত্ত, প্রসন্নতায় বুঝিতে পারি তুমি প্রসন্ন হইয়াছ কিন্তু এই চিত্তপ্রসন্নতা যখন সর্ব্বপ্রকার গ্লানিশূন্য প্রসন্নতা হয় তখনই বিশ্বাসে তোমার প্রসন্নতার বোধ একটা হয়। তাহার পরে প্রত্যক্ষে অনুভব হয় যে তুমি এসেছ, তুমি গ্রহণ করিতেছ, তুমি আমার সেবায় প্রসন্ন হইতেছ—আমিও ভরিত

অনুরাগে তোমার হইয়া রহিলাম। আহা! ইহা কি আমাদের হইবে? চক্ষু যাহা দেখে তাহাতেই কি তোমার রূপ দেখিবে? কর্ণ যাহা শুনে তাহাতেই কি তোমার নাম কীর্ত্তন শুনিবে? হইবে কি এই সব?

তুমি—তুমি! তোমায় সর্ব্বদা না স্মরিতে পারিলে তোমার পূজা ত হইবে না। তুমি কোথায় নাই? চৈতন্য কোথায় নাই? প্রতি জড়ের কোলে কোলে ত চৈতন্য আছেন। প্রতি জড় ত চৈতন্যের উপরেই ফুটিয়াছে—সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের ভাঙ্গা ভাসার মত তোমার বক্ষেই ত সবই উঠিতেছে, স্থিতিলাভ করিতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে। জনম মরণের খেলা ত তোমার উপরেই হইতেছে—সংসার চক্র ত তোমার উপরেই ঘুরিতেছে, সূর্য্য চন্দ্র ত তোমার এক দেশ ধরিয়া কিরণ দিতেছে। যাহা কিছু হইতেছে, যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, শুনা যাইতেছে—সকলেই ত তোমায় লইয়া প্রকাশিত হইতেছে—তুমি ভিন্ন ত আর কাহারও প্রকাশে কোন কিছুই প্রকাশিত হইতেছে না। জপ পূজা স্তব স্তুতি প্রার্থনা অপরাধ মার্জ্জনা—সবই তোমার উপর হইতেছে—আবার তুমি অরূপ হইয়াও রূপ ধরিয়া সকলের মধ্যেই রহিয়াছ। ইহা বিশ্বাস করিলাম—ইহা বিচারে ঠিক বুঝিলাম। কিন্তু আমি যে তোমার নিত্য স্মরণে থাকিব—এই নিত্য স্মরণ কোথা হইতে আরম্ভ করিব?

বাহিরেও তুমি, ভিতরেও তুমি। চৈতন্য আমার মধ্যেও আছেন, চৈতন্য বাহিরেও আছেন। আকাশ যেমন ঘটের মধ্যে ও ঘটের বাহিরে সেইরূপ।

সকল কর্ম্মে যে তোমার পূজা করিতে অভ্যাস করিব ইহা ভিতর হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। চৈতন্যকে ভিতরে ধরিয়া বাহিরে সকলের মধ্যে যে চৈতন্য আছেন তাহা দেখিতে অভ্যাস করিতে হইবে। ভিতরে হৃদয়ের রাজাকে বসাইতে হইবে। রাজাত আছেনই, তাঁহাকে দেখিতে হইবে। তাঁহাকে ভিতরে দেখার অভ্যাস যখন

পাকা হইয়া যাইবে তখন বাহিরে সব বস্তুতে তাঁহাকে স্মরণ করা সহজ হইবে। আর ভিতরে পাকা ভাবে ধরিতে অভ্যাস যিনি না করিয়াছেন তিনি বাহিরে ধরিতে গেলে পুনঃ পুনঃ চৈতন্য হারাইয়া ফেলিবেন। নৃত্য বাহিরে দেখিতেছি—সেখানে আমি সাক্ষী ও দ্রষ্টা। আমি দ্রষ্টা—আমি দেখিতেছি কিন্তু দেখিতে দেখিতে যখন নিজে নাচিতে আরম্ভ করিলাম তখন আমি আর সাক্ষী ভাবে থাকিতে পারিলাম না। আপনাকে আপনি ভুলিলাম—ভুলিয়া প্রকৃতির বশ হইয়া পড়িলাম। দুরত্যয়া প্রকৃতি দেখিয়া তোমাতে স্থির থাকা বড়ই দুরূহ। কিন্তু ভিতরে তোমায় ধরিয়া বাহিরে তোমার উপরে প্রকৃতির হাব ভাব কটাক্ষ দেখায় আত্ম বিস্মৃতির ভয় নাই—ফলে তখন হাব ভাব কটাক্ষে লক্ষ্যই পড়ে না। সেই জন্য হৃদয় কমলে তোমার মূর্ত্তি বসাইয়া ধারণাভ্যাসী হওয়াই ক্রমমুক্তির প্রধান সাধনা। ভিতরে তোমায় দেখিয়া বাহিরের তাহার প্রয়োগ ইহাতে ঐ সাধনাই পাকা হয়। ইহার পরেই পরা পূজায় স্থান। ইতি।

কোমলে কঠোরে।

সে দিন ত বলিলে আমার সকল অন্তরায়ের মূল আমার আপনার কর্ম্ম। আমি ত বুঝিয়াছিলাম যে আমার আপদের হেতু আমি। তোমার উপদেশ শিরে ধরিয়া সংসারে চলিতে যাইয়া ইতিমধ্যেই কিন্তু আমার মনে আবার একটু ধাঁধাঁ উঠিয়াছে। তোমার নিকট আসিলে তুমি চিরদিনই আমার সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়া থাক, তাই আজ আবার ধাঁধাঁয় পড়িয়া এই বিরলে তোমার শরণ লইতেছি। তুমিই মানবের একমাত্র সহায়, তুমিই আর্ত্তের ত্রাণকর্ত্তা,—তোমার চরণ ব্যতীত বিপদে আর কোথায় আশ্রয় চাহিব! তুমি আমার

ধাঁধাঁ ঘুচাইয়া দাও। প্রতিদানে আমি তোমাকে কি দিব? এ জগতের সকল দ্রব্যইত তোমার,—আমি তোমার, আমার সকলই যে তোমার। তবে আর তোমাকে আমি কি দিব? শুনিয়াছি, তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও এক বস্তুর কাঙ্গাল। আর সে বস্তু নাকি মানবের হৃদয়ে অবস্থিতি করে। আচ্ছা, যদি তাহাই হয়—যদি তুমি তাহারই কাঙ্গাল হও, আর যদি আমার তাহা থাকে, তাহা হইলে আমি তোমাকে তাহাই দিব। এখন লোভে লোভে আমার সমস্যাটির সমাধান করিয়া দাও দেখি।

আবার কি ধাঁধাঁয় পড়িয়াছ,—বল। দিবানিশি দশজন দশরকম কার্য্যের পরামর্শ করিতে আইসেন। তাঁহাদের জটিল বিষয় সমূহের নীরস আলোচনায় আমার মূল্যবান্ সময় বৃথা কাটিয়া যায়,—আমি তোমার সহিত আলাপ করিবার অবসর পাই না। আমার এখনকার ধাঁধাঁ এই।

বেশ ত। দশজন তোমার নিকট আইসেন তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? কখনও একাকী বিরলে বসিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিলে, আবার কখনও বা তাঁহাদের সহিত বসিয়া আমারই কথা আলাপ করিলে? আমার তাহাতে ক্ষতি কি? আমার খুব ক্ষতি। তোমাকে লইয়া আমার যে সুখ জগতের আর কাহাকেও লইয়া আমার সে সুখ হয় না। তোমার, মধুরোজ্জ্বল শ্রীমুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আমার প্রাণ যে সুখ পায়, তোমার চরণকমলে মনভৃঙ্গকে নিলীন করিয়া আমার যে পরম আনন্দ, কাহারও সহিত তোমার আলাপ করিয়াও সেই আনন্দের শতাংশের একাংশ আনন্দও আমার হয় না। আর আমি ত তোমার কথা কহিতে চাহি না। আমি চাহি তোমাকে হৃদয়ে ধরিতে, আমি চাই তোমার মাঝে আমাকে বিসর্জ্জন দিতে। তুমি বল কিনা লোক আসিলে আমার ক্ষতি কি? আমার শত ক্ষতি, আমার সহস্র ক্ষতি, আমার লক্ষ ক্ষতি, আমার কোটি ক্ষতি।

রাগ কর কেন? যাহা বলিবে শান্ত হইয়া বল না। রাগ করি কেন? তা' তুমি বুঝিবে কি প্রকারে? একবার যদি তুমি আমি হও, আর আমি তুমি হই, আর তুমি আমার প্রেমে পড়, আর শত চেষ্টাতেও আমাকে হৃদয়ে ধরিতে না পাও, আর তখন যদি তুমি আমার নিকট বেদনা জানাইতে আইস, আর আমি যদি তখন বলি দশজন তোমার নিকট আইসে তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? তাহা হইলে তখন বুঝিতে পারিবে, আমি রাগ করিতেছি কেন? এখন তুমি বুঝিবে না ;—আমার রাগ হয় কেন?

চির সুখীজন ভ্রমে কি কথন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?

আমার পাগলামি শুনিতেছ আর মৃদু মৃদু হাসিতেছ। আমার জ্বালা দেখিয়া তোমার হাসি আসিতেছে তোমার দশা যেন আমার মত হয়।

একেবারে অভিসম্পাত করিতে আরম্ভ করিলে! ঐ দেখ, আমি কাহাকে কি বলিলাম! তোমার চরণে ধরিতেছি, আমাকে ক্ষমা কর।

ক্ষমা ত চিরদিনই করিতেছি। এখন রাগ দ্বেষ ছাড়িয়া যাহা বলিতেছিলে তাহাই বল। বুঝিয়াছি আমায় লইয়া তোমার যত সুখ আর কাহাকেও পাইয়া তোমার তত সুখ নহে। ভাল। কিন্তু আমাকে লইয়া কি সারাদিন থাকিতে পার?

তোমার চরণ ধ্যান করিয়া, তোমার পবিত্র নাম জপ করিয়া, তোমার লীলা চিন্তা করিয়া, তোমার গুণ আপন মনে গাহিয়া, তোমার কাহিনী অধ্যয়ন করিয়া, প্রকৃতির সর্ব্বত্র তোমার মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া

আমি ত সারাদিন কাটাইয়া থাকি তবে আবার ঐ প্রশ্ন করিতেছ কেন ?

আচ্ছা, তা ঐ প্রশ্ন না হয় পরিত্যাগ করিলাম। এখন বল দেখি কাহারও সহিত আলাপ করিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না ?

হইবে না কেন ? হয়ই ত। যে সত্য সত্যই তোমাকে ভালবাসে, তাহার মুখে তোমার কথা শুনিবার জন্ম প্রাণ ত পাগল, তাহার চোখে মুখে তোমার প্রেমের আভা দেখিবার জন্য প্রাণ ত সদাই কাঁদে। কিন্তু আমার নিকট যাঁহারা আইসেন, তাঁহারা ত সে শ্রেণীর লোক নহেন। তাঁহাদের কেহ বিনা-আয়াসে তোমায় চাহেন, কেহ সময় কাটে না বলিয়া তোমার কথাবার্ত্তা লইয়া আড্ডা দিতে চাহেন। ইহাঁদের সঙ্গ আমার একেবারেই ভাল লাগে না। আবার কেহ ঘোর সংসারী, কি উপায়ে অর্থ করিবেন, কি উপায়ে মানযশ করিবেন, তাহারই পরামর্শ করিতে চাহেন। ইহাঁদিগের সহিত অধিকক্ষণ থাকিলেই আমার অসুখ হয়।

যদি ইহাঁদিগকে তোমার ভাল না লাগে, তবে ইহাঁদিগকে তুমি ত্যাগ করিলেই পার। ইহা আর সমস্যা কি ?

ত্যাগ করি কি প্রকারে ? তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইলে তাঁহারা আর আমাকে জ্বালাতন করিতে আসিবেন না এই মনে করিয়া কোন কার্য্য সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিলাম, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম মিটিয়া গেল। আবার দেখি দু'দিন পরে নূতন বিষয় লইয়া আসিয়া উপস্থিত। তাহার ব্যবস্থা করিলাম; চলিয়া গেলেন। ভাবিলাম, বার বার আর আসিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের লজ্জা নাই। দু'দিন পরে আবার আর একটি বিষয় লইয়া উপস্থিত। বিনয় সহকারে বহুবার নিবেদন করিয়াছি যে আমার শরীর ও মন সংসারের উপযোগী নহে। তাঁহারা যদি দয়া করিয়া আমাকে একটু ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে আমি পরম অনুগৃহীত হইব। উত্তরে পরমবিজ্ঞের ন্যায় মৃদু হাসিয়া আজ্ঞা করেন "আরে! কর, একটু কর, একেবারেই কিছু

করিবে না।" উত্তর শুনিয়া মনের মধ্যে যাহা হয় তাহা সম্বরণ করিলেই শক্তি বৃদ্ধি হয় এই জন্য তাহা আর প্রকাশ করিলাম না।

সমুচিত উত্তর দিলে পাছে অবিনয় হয় এই ভয়ে সমগ্র জীবন নীরবে এই জ্বালায় জলিতেছি। আর যাঁহারা আমার নিকট আইসেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আমারই ন্যায় ভক্ত। আমাদের হৃদয়ে বৈরাগ্য নাই, দেহসুখে মন পূর্ণ, অহঙ্কার ষোল আনা, অথচ আমাদের ধারণা আমরা প্রেমিক। শতদিন ত্যাগের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেও আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও বৈরাগ্য ফুটে না, এবং বৈরাগ্যের সাধনাও আমরা করি না। আমি চাহি বিরলে বসিয়া ভক্তগণের গরিমা ধ্যান করিয়া করিয়া আমার ভণ্ডামি নাশ করিতে। আমারই ন্যায় ভণ্ডের সহিত বসিয়া ভণ্ডামি করিতে আমার বিন্দু-মাত্রও ইচ্ছা নাই, তবুও তাঁহাদের সঙ্গ আমাকে করিতে হয়—আমার ধাঁধাঁ এই। আমার কোন্ কর্ম্মফলে আমার এই বিড়ম্বনা, প্রভু? আর কি উপায়েই বা আমি ইহার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, জননি?

তোমার এই বিড়ম্বনা তোমার নিজের ভুলে। যাঁহাদিগের সহবাসে তোমার আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়, তুমি তোমার হৃদয়ের কোমলতা-বশে তাহাদিগকে উচিত কথা বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পার না। কোম-লতা ভাল জিনিষ। কিন্তু কিছুরই অতি ভাল নহে। এই কোমলতারও অতি ভাল নহে। ঘোর কলিযুগ পড়িয়াছে। এই যুগে মানুষ স্বার্থান্ধ। কোমল ব্যক্তির উপর এই কালে নিত্যই অবিচার বর্ষিত হইতেছে। যাহারা সংসারের কীট তাহারা ধীরে ধীরে এই কোমল কুসুমে প্রবেশ করিতেছে, এবং আপন পুষ্টির জন্য নির্দ্দয়রূপে কুসুমের প্রাণ সংহার করিতেছে। কলির কুটিলতার ভয়ে ভীত হইয়া ঋষিগণ নৈমিষারণ্য আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন। কলির প্রভাব হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে হইলে স্থানবিশেষে তোমাকেও একটু কোমলতা কম করিতে হইবে। এতকাল কোমল থাকিয়া এত ভুগিলে, এখন ক্ষেত্র-

ভেদে একটু কঠোর হইয়া দেখ, কষ্ট কমিতে পারে। আর এই স্থান বিশেষে একটু কঠোর হইতে বেদনা বোধ কর কেন? শাস্ত্র ত তারস্বরে বলিতেছেন সাধককে কুসুম অপেক্ষাও কোমল এবং বজ্র অপেক্ষাও কঠোর হইতে হইবে। অবিচারিতচিত্তে শাস্ত্রবাক্য মান না, তাই এতদিন এই কষ্ট পাইতেছ। শাস্ত্রশাসন অবনত মস্তকে গ্রহণ কর, যাতনা দূর হইবে। তাই বলিতেছি, তাঁহার জন্য একটু কোমলে কঠোরে হও।

অধ্যয়ন।

১

নিত্য আনন্দে ভরিত থাকিবার জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞানানন্দের বস্তুটিকে অজ্ঞান বা অবিদ্যা হইতে পৃথক করিয়া লইতে হইবে। অসত্য হইতে সত্যকে পৃথক কর ইহাই প্রথম কথা। সত্য অসত্যের সঙ্গে মিশিয়া অসত্যের আকারে আকারিত হইয়া আছেন। এই সত্যের কিন্তু আকার নাই। সেইজন্য ব্রহ্মকে চিত্তপটে চিত্রিত যাহাতে করা যায় তাহার আচরণ কর। সেইটিতে একাগ্র হও হইলে আনন্দ আসিবে। ক্রমে নিরোধ অবস্থায় আসিতে পারিলে নিত্যানন্দে ভরিত হইয়া নিত্যানন্দ স্বরূপে স্থিতি লাভ ঘটিবে।

২

প্রথমেই তত্ত্ববিবেক, ভূতবিবেক, পঞ্চকোশবিবেক, দ্বৈতবিবেক ও মহাবাক্যবিবেক দ্বারা সত্য বস্তুটি অসত্য ব্রহ্মাণ্ড হইতে বাছিয়া লও। পরে চিত্রদীপ, তৃপ্তিদীপ, কুটস্থদীপ, ধ্যানদীপ দ্বারা সৎঘিনি তাঁহাকে চিত্তপটে রঞ্জিত কর। শেষে যোগানন্দ, আত্মানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, বিদ্যা

নন্দ, বিষয়ানন্দ দ্বারা ঠিক ঠিক আনন্দ যাহা তদ্বারা ভরিত হইয়া আনন্দে স্থিতি লাভ কর।

মহামোহকে দূর করিবার জন্য শ্রীগুরুকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জানিয়া তাঁহাকে প্রণাম কর। ভক্তির সহিত প্রণাম, সেবা, স্তুতি, বন্দনাদি করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হয়। এইটি মানস ব্যাপার। ইহারই জন্য শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার আবশ্যক। সাত্ত্বিক আহারে প্রাণ মন ও বাক্য বা কায় মন বাক্য জ্ঞানানন্দ লইয়া থাকিবার উপযোগী হয়। শুদ্ধ আহার ও শুদ্ধা ভক্তির সাহায্যে চিত্তে জ্ঞান সমুৎপন্ন করা যায়। চিত্তে জ্ঞান জন্মানই তত্ত্ববিবেকের কার্য্য।

৪

তত্ত্ববিবেকের জন্য তত্ত্ববিচার চাই। তত্ত্ববিচার কাহাকে বলে এখন লক্ষ্য কর। পরমাত্মাই অধিষ্ঠান চৈতন্য। তাঁহার উপরেই তাঁহার আত্মশক্তি মায়ারাণী বিচিত্র জগদিন্দ্রজাল তুলিয়াছেন। জনন, মরণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক মোহ চৈতন্যে নাই, জড়েও নাই, কিন্তু চিজ্জড়ের মিশ্রণে যে জীবত্ব তাহাতেই আছে। জড়ের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিলেই জীবই পরমাত্মা। জীবই যে পরমাত্মা ইহা প্রতিপন্ন করাই তত্ত্ববিচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিরূপে এই বিচার জন্মে তাহাই লক্ষ্য কর।

৺পুরীতে বংশীরব।

চক্রতীর্থের নিকটে কোন এক বাড়ীতে থাকি। কাল বুধবার ২৪শে বৈশাখ, ১৩২৬ গিয়াছে। কাল স্নান আহার বন্ধ ছিল। আজ সীতা-নবমী। আজও বন্ধ থাকিবে। ব্রতও ত করা হইল না। সকালেও মস্তকের স্থানবিশেষে টিপ্ টাপ্ করিতেছিল। কিন্তু প্রাতঃকৃত্য ত করিতেই হইবে। করিতে বসিলাম। প্রথমে মন কিছু গোলমাল

করিতেছিল। শেষে আর গোলযোগ তুলিল না। শান্ত হইয়া কাজ করিতে লাগিল।

বেশ স্থির হইয়াছে। অকস্মাৎ বংশীরব কাণে আসিল। মরি মরি কি সুন্দর লাগিল! এই স্থানটি বহু কাল পতিত ছিল। শুধু বালুকা রাশি চারিদিকে। আর শীতল বায়ু সমুদ্রের কি জানি কি বিষাদমাখা করুণধ্বনি লইয়া মানুষকে কোন্ জন্মের কত কি যেন নিরন্তর স্মরণ করাইয়া দিতেছে। চক্রতীর্থের দক্ষিণ দিকে এই সমুদ্র নিরবধি কি জানি কি বিলাপ করিতে করিতে কত যুগযুগান্তর যেন কারও অপেক্ষা করিতেছে। আর ইহার পশ্চিমে বহু দূরে জগবন্ধু মন্দিররূপে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি জানি কি চক্ষে যেন ক্রন্দনতরঙ্গমাখা সমুদ্র দর্শন করিতেছেন। আর উপরে সুন্দর নীল আকাশ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া কখন জগবন্ধু, কখন সমুদ্র দেখিতেছে—আর সময়ে সময়ে নীলাম্বুতে আপনার অঙ্গকান্তি মাখাইয়া কখন বা নীলাম্বুর ছায়া আপনার হৃদয়ে মাখিয়া কি জানি কি যেন জগৎবাসীকে দেখাইতেছে।

বলিতেছিলাম এই চক্রতীর্থের চতুঃপার্শ্ব বহুদিন শুধু নিম্নে বালুকা রাশি, আর উপরে নীল আকাশ ভিন্ন আর কিছুই দেখিত না—সমুদ্র গর্জ্জন ভিন্ন আর কিছুই শুনিত না। এখন এ তীর্থের উপরে এখানে সেখানে মানুষ অনেক বাসস্থান তুলিয়াছে। কি জানি মানুষ এই স্থানে আসিয়া সমুদ্র বায়ু আকাশ চক্রতীর্থ ইহাদের নির্জ্জন আলাপের কোন বিঘ্ন করিল কিনা? কি জানি এই স্থানের জনশূন্য নিশীথে "কে কাহারে কেন ডাকে" ইহার কোন বিঘ্ন এখন ঘটিতেছে কি না? কি জানি মানুষের মনগড়া নানা প্রকার ক্রিয়া কলাপ সমুদ্র, জগবন্ধু, আকাশ, বায়ু, চক্রতীর্থ কতদিন মানুষকে করিতে দিবে?

আমি প্রাতে শরীর মন একস্থানে বসাইয়া কি জানি কার যেন চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে করিতে সন্ধ্যার মন্ত্র জপিতেছিলাম। অকস্মাৎ সমুদ্রের মোটা আয়াওজের সঙ্গে এক অতি মধুর বংশীধ্বনি শুনা গেল। মরি মরি এমন প্রেমের ধ্বনি বুঝি কখন শুনি নাই

মুরলীধ্বনি যতদূর ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল ততদূর যেন অমৃতে ভরিয়া যাইতেছিল। এই বংশীনিনাদ বুঝি সেই "কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়" স্মরণ করিয়া দিতেছে। এই বুঝি সেই বংশী—যে বংশীরবে গোপাঙ্গনা উন্মাদিনী হইয়া ছুটিত, আর শ্যামলী ধবলী হাম্বারবে ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যাইত। আহা যখন নন্দের ভবনে "গর গর বাজে বাঁশী" হইত তখন সত্য সত্যই বুঝি "যার যৈছে মনোভাব সেহ তৈছে শুনে" হইত।

বাঁশী ত শুনিলাম, কিন্তু সেই কৃষ্ণবর্ণ শিশুর পানে ত ছুটিলাম না। কে যেন বাঁশী বাজাইয়া কোথায় লুকাইল। বাঁশীর রবে ভরিয়া গিয়া শেষের কথা ভুলিলাম। স্বামীর ঘর বাড়ী হীরা জহরত দেখিয়া দেখিয়া সোহাগিনী কি হইয়া গেল—সোহাগিনী স্বামীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ফিরিয়া আসিল "অভাগিনী স্বামী সঙ্গ না রচি।" আহা বড় বিষাদ রহিয়া গেল।

২

পূজা সাঙ্গ হইল। তখন স্বাধ্যায় চলিল। স্বাধ্যায়ে ঝঙ্কার দিল দুইটী কথা।

(১) ভূতং ভবিষ্যদভজন্ বর্ত্তমানমথাচরন্।

(২) তত্র দেষান্ দর্শয়িত্বা রামানন্দেনিয়োজয়॥

ভূত ভবিষ্যৎ আর ভজিওনা—বর্ত্তমানে আচরণ কর—ইহা প্রথম বাখ্যা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাজাগতিক যা শুন যা দেখ যা ভাব তাহাতে বহু দোষ; মনকে বিষয়ের এই দোষ দেখাইয়া ইহাকে রামানন্দে নিয়োগ কর! রামানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, শিবানন্দ, দুর্গানন্দ, সীতানন্দ, রাধানন্দ—এ সব একই কথা। শুধু নামে রূপে ইহাদের কিছু পার্থক্য আছে; গুণে লীলায় ইহারা প্রায় এক হইলেও স্বরূপে সর্ব্বদা এক। এই রমণীয়কে দেখিতে দেয় না ভূতভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা। শাস্ত্র তাই বলিতেছেন "তত্র দোষান্ দর্শয়িত্বা রামানন্দে নিয়োজয়।" নিত্য দোষ

দেখাও দেখি দেখিবে বিষয়ানন্দ—"ভব সব বিষসম লাগই" হইয়া যাইবে। তখনই রামানন্দে নিয়োজয় করিবার সময়।

কিরূপে নিয়োগ করিবে?

শ্রবণ কর। রামানন্দে বা কৃষ্ণানন্দে বা কাল্যানন্দে মনকে নিয়োগ করিতে হইলে মনকে বিষয় চিন্তা করিতে না দিয়া ঈশ্বর চিন্তা করাও। বিষয় চিন্তার দোষ কি তাহাত জান। সেই যে গীতা বলিতেছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎসঞ্জায়তে কাম্ কামাৎ ক্রোধোপজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বিষয় চিন্তা—বিষয়ধ্যানের শেষ ফল প্রণশ্যতি হওয়া। তাই প্রণশ্যতি পথে না যাইয়া অমৃতের পথে চল। অমৃতের পথে নাশ নাই, অমৃতের পথে চির নিত্যানন্দে স্থিতি। এই পথটিতে চলিতে হইলে "তত্র দোষান্ দর্শয়িত্বা" ঈশ্বরচিন্তায় মনকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

রামানন্দে বা কৃষ্ণানন্দে বা দুর্গানন্দে নিয়োগ কর—ইহাতে বুঝা যায় ঈশ্বর চিন্তা কর। ঈশ্বরচিন্তায় কি করিতে হইবে লক্ষ্য কর।

নাম-চিন্তায় ঈশ্বর চিন্তা হয়,
রূপ-চিন্তায় ঈশ্বর চিন্তা হয়,
গুণ-চিন্তায় ঈশ্বর চিন্তা হয়,
কর্ম্ম ও লীলাচিন্তায় ঈশ্বর চিন্তা হয়
আর স্বরূপচিন্তায় বড় সুন্দর ঈশ্বরচিন্তা হয়।

প্রথমে যাহা কিছু বিষয় চিন্তা মনে উঠিতেছে তাহার দোষ দেখাও, মন তখন বিষয়ে বিরক্ত হইবে। যখন বিরক্ত হইল, তখন কতক্ষণ নাম কর। কিন্তু নাম করিয়াই সব হইল ভাবিও না। বহিরঙ্গ সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করিতে পার, কিন্তু তার পরেই প্রসাদভক্ষণে মাতিয়া যাইও না।

নামকীর্ত্তনের পরেই একটু রূপচিন্তা কর। ভাবনা কর না—

প্রাতঃস্মরামি রঘুনাথমুখারবিন্দং
মন্দস্মিতং মধুর ভাষি বিশাল নেত্রং
কর্ণাবলম্বি চলকুণ্ডলশোভি গণ্ডং
কর্ণান্তদীর্ঘনয়নং নয়নাভিরামম্।

ভাবনা কি ভাল করিয়া করিয়াছ?—কর্ণান্তদীর্ঘনয়ন আর মন্দ হাস্য আর মধুর কথা— কখন কি ভাল করিয়া ভাবিয়াছ সেই পদারবিন্দ—আর যে পাদপদ্মে সেই মানুষী চারণচূর্ণ আছে—যে পদরজঃ পদ্মজ শঙ্করাদিভিঃ রঞ্জিত মানসৈঃ সদা বিমৃগ্যতে, যে পদরজের সন্ধান না পাইয়া তপ্তমনে ব্রহ্মশঙ্কর সর্ব্বদা ইহা অন্বেষণ করেন—যে পাদপঙ্কজের পরাগ গাত্রে মাখিয়া ভাগীরথী নিজে পবিত্র হইয়া "ভব বিরিঞ্চিমুখান্ পুণাতি" শিবব্রহ্মা প্রমুখ দেবতা এবং এই জগৎকে পবিত্র করেন, কখন কি ভাল করিয়া ভাবনা করিয়াছ সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কানি পদানি জগতীপতেঃ—সেই ধ্বজাঙ্কুশলাঞ্ছিত জগৎপতির পাদপদ্ম—ধূলায় চিহ্নিত যে পাদচিহ্ন দেখিয়া পাদসৌন্দর্য্য মোহিত হইয়া কামরূপিনী রাক্ষসীও দেখিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল—নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া একবার রূপ চিন্তা কর। ভাব দেখি—ভাবিয়া একবার বিচার করিয়া দেখ দেখি কি পাও—

গোবিন্দ খারবিন্দ নিরখি মন বিচারে
চন্দ্রকোটি ভানু কোটি কোটি মদন হারে—

ভাবিয়া দেখ না। এ কথা সত্য কি না। একবার ভাব না "নীল কাদম্বিনী মায়ের" ইত্যাদি—শুধুই গান গাহিয়া নিরস্ত হইও না—নামের পরে রূপচিন্তা কর। রূপচিন্তা করিয়াই থামিও না—ইহার পরে একবার গুণ চিন্তা কর। আহা এত দয়ার সাগর আর কে? পাছে তুমি আমি কুপথে চলি তাই সে আপনি আপনার গুণ গাহিয়াছে—সে আপনি তোমার আমার মত পতিতের জন্য বলিতেছে "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ

সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ”। সে আপনি তোমার আমার মত কত অপরাধে অপরাধী জনকে বলিতেছে “সুহৃদং সর্ব্বভুতানাম্”—বলনা এত দয়া আর কার? বলনা এমন কাঙ্গালের ঠাকুর আর কে? দীনের বন্ধু এমন আর কে? তার গুণ চিন্তা করিয়া একবার ভরিয়া যাও না?

গুণের পরে কর্ম্মচিন্তা বা লীলাচিন্তা। ইহা ত বলা যায় না। সত্য সত্য ত্রেতা দ্বাপরের লীলা চণ্ডী রামায়ণ ভাগবতে লেখা আছে। শুধু পড়িলেই ত সব হইল না—এ যে চিন্তা করিতে হয়—ভাবনা করিতে হয়। এই ভাবনায় যে ঈশ্বর চিন্তা হয়—এই ভাবনায় যে মৃত্যু সংসার সাগর পার হওয়া যায়—এই ত্রৈলোক্য পাবনী রাধা যে কলিহরা পরমা গতি—তাহা কি ভাল করিয়া ভাবিয়াছ? তার পর কলির লীলা—এই লীলা ভাবনা করিতে পারিবে যখন নাম রূপ গুণ লীলা চিন্তার পরে স্বরূপ চিন্তায় পৌছিবে। এই স্বরূপচিন্তা যে মাণ্ডুক্য শ্রুতি বড় আদর করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অঙ্গে মাখিয়া যে মায়া জগৎকে মোহন করেন, সেই মায়া যাহাকে দেখিয়া নিরস্ত হয়—তাহা স্বরূপ চিন্তার পরে তার নাম, তার গুণ, তার রূপ, তার লীলা, আরও যে কত মধুর লাগে তাহা যে না অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহাকে বুঝান যাইবে কিরূপে? আর স্বরূপে তাহাকে একটু বুঝিতে চেষ্টা করিয়া জীবে জীবে সে কত রঙ্গে খেলা করিতেছে সুন্দরে কুৎসিতে, কপটে সরলে, ভক্তে ভণ্ডে, অহঙ্কারীতে নিরহঙ্কারে, বিদ্বানে মূর্খে, সমুদ্রে সমুদ্র গর্জ্জনে, আকাশে বায়ুতে, বনভূমিতে, মন্দিরে পশুতে পাখীতে মূকে, পঙ্গুতে, পর্ব্বতে নদীতে, স্ত্রীতে স্বামীতে, পুত্রে কন্যায় সংসারে মরুভূমিতে—বল কোথায় সে লীলা করে না?

একবার কিছুদিন ধরিয়া ঈশ্বর চিন্তা কর—নিরন্তর কর—রসের সহিত কর—দেখিবে আর তুমি ঈশ্বর চিন্তা ছাড়িয়া সংসার করিতে পারিবে না। এখন যেমন ঈশ্বর চিন্তা করিতে বসিয়া বিষয় চিন্তা করিয়া উঠিয়া আইস—সন্ধ্যা করিতে বসিয়া সং করিয়া ধ্যা করিতে ভুলিয়া

আইস—সেইরূপ তখন দেখিবে সংসার করিতে গিয়া "সার করিবে "সং "করিতে ভুলিবে, সংসারের সব স্থানে তারেই দেখিবে তার খেলাই বুঝিবে—আর লোককে দেখাইবে বুঝাইবে সে কত সুন্দর সে কত প্রেমময় তার লীলা কত মধুর।

করণা ঈশ্বর চিন্তা—দেখ না তোমার ভিতরে সব ফুটিয়া উঠে কি না। তুমি হাসিতে হাসিতে মৃত্যু সংসার সাগর পার হইয়া যাও কি না? করিবে কি এই ঈশ্বর চিন্তা? কর—তখন যখন তখন বংশীরব শুনিয়া ধন্য হইয়া যাইবে। ২৫ শে বৈশাখ সীতানবমী চক্রতীর্থ। ১৩২৬।

সার জন উড্রফ মহোদয়ের "ভারত কি উন্নত"?

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমরা গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

"Mr. Wm. Archer" একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচক। তিনি ইংলণ্ডের সাধারণ সকলকে বুঝাইতেছেন ভারতবর্ষ কোন কালে উন্নত ছিল না। ভারত চিরদিন অসভ্য ছিল, এখনও তাহাই আছে। ইনি "India and the future" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। যত লোক যত প্রকারে ভারতের দোষ দেখাইয়াছেন বা দেখাইতে পারেন এই পুস্তকে তৎসমস্তই বলা হইয়াছে, আরও অনেক বেশী আছে। "It assails the fundamental principles of Indian civilization and every form of its culture religious, intellectual, artistic

and social" আর্চার মহাশয় বলিতেছেন "কি ধর্ম্ম, কি বিজ্ঞান, কি কলা বিদ্ধা, কি সামাজিক ব্যাপার সকল বিষয়েই ভারত অসভ্য।" বিলাতের "Times" পত্রিকাতে ইহার সমর্থন করা হইয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের জ্ঞান, ভারতের সামাজিক নিয়ম, ভারতের কলাবিদ্যা সম্বন্ধে ইয়ুরোপের বড় বড় পণ্ডিত—শোপেনহর, মিষ্টার কুজে, ম্যাক্সমূলর, কোলব্রুক, ডক্টার মরগ্যান, বারসেলেমি, সেণ্ট হিলেয়ার, জে এইচ টক্‌ওয়েল, ডক্‌টার ম্যাক্সিসন, ফ্রেডরিক শ্লীগেল, সার উইলিয়াম জোন্স মার্ডাণ্টষ্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোন প্রভৃতির যে মতামত তাহাতে দেখা যায় জ্ঞান সম্বন্ধে বা ধর্ম্মসম্বন্ধে হিন্দু জাতির নিকটে আজ জগতের সকল জাতিই ঋণী। Mr. Wm. Archer প্রভৃতি লেখকগণ ভারতের সুখ্যাতি যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে একেবারেই উড়াইয়া দিতে চান ও ইংলণ্ডের সকলকে বুঝাইতে চান যে ভারত সকল বিষয়েই চিরদিন হীন-অসভ্য। এই শ্রেণীর ভারত নিন্দুক জনগণ বলিতেছেন "India is barbarous, unprogressive, Superstitious, mediaeval ignorant, unspiritual and so forth," বিলাতের টাইমস্‌ পত্রিকা উপরের মত সমর্থন করিয়া বলিতেছেন "Indian culture does not provide anywhere any great moral or spiritual concept capable of uplifting a a nation." তঁহারা আরও বলেন "India's real distinction lies not in evolving but in killing, the germs of sane and virile spiritualtiy. The Indian people have always gravitated towards the lower rather than the higher element in religion." যাঁহারা ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুখ্যাতি করেন তাঁহাদিগকে ইঁহারা বলেন, Only a "few fanatics" would say that India "has evolved a noble progressive religion etc." যে উপনিষদ সম্বন্ধে বিখ্যাত দার্শনিক শোপেনহর এবং মাক্সমুলার এত সুখ্যাতি করেন "in the whole

world there is no study so beneficial and so elevating as the Upanishad. It has been the solace of my tear, it will be the solace of my death সেই উপনিষদ সম্বন্ধে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রোফোসার ডক্‌টর এ,ই, গফ বলেন যে the Upanishads are the work of a rude age, a deteriorated race and a barbarous unprogressive community" P 131. গফ সাহেব আরও বলেন ' there is little that is spiritual in all this". ইনি আরও বলেন "In treating of Indian Philosophy a writer has to deal with thoughts of a lower order thah the thoughts of the every day life of Europe'. Mr. Archer কত ভাবে যে হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দুর জ্ঞান শাস্ত্র, হিন্দুর দর্শন শাস্ত্র, এক কথায় হিন্দু জাতির যাহা কিছু আছে—তাহার নিন্দা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ যেন আমরা করিতে পারি না। সকল প্রকার গালিগালাজ দিয়াও যেন তাঁর তৃপ্তি নাই। ভগবান বাল্মীকি যুগে যুগে রামগুণগান করিয়াও অতৃপ্ত—লোকে তাই বলে "অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে" আর্চার মহাশয়ও কুৎসা করিয়া করিয়া অতৃপ্ত। "Hinduism is not a morally hopeful religion." "Its Philosophy denies all value to life, its metaphysic is enervating." Hinduism is anti-rational. 130.

Hinduism has not been cleansed for thirty centuries. 130.

Hinduism is a wholly unfiltered religion" 130.

It is the lowest in the scale of world religion" "India cannot claim fellowship on terms of equallty with the civilized nations of the earth." "Hinduism a weltering chaos of terror, darkness and uncertainty" "হিন্দুর ঈশ্বর হইতেছে a mixture of Bacchus ; Donjuan

Dick Tnrpin "Pot bellied Falsdaff of Hinduism Ganesh. Mr. Archer যত প্রকার কুৎসিৎ ভাষা পাইয়াছেন তাহা লইয়া লিখিতেছেন The monster gods of India are originally ogres, figures in which cowering savages embodied their conception of the destructive powers of nature". Kali is set in a ravening attitude like that of a barn-storming player of the good old days tearing passion to tatters". হিন্দু জাতির রামায়ণ ধরিয়া সাহেব বলিতেছেন "Ram is over-Saintly—a dehumanised character; Sita's heroism excessive to the verge of immorality"—মহাভারত সম্বন্ধে বলা হইতেছে "it is the more barbarous of the two".

এই গালাগালির আর অন্ত নাই। যদি আর্চার সাহেব বা গফ সাহেব বা দুই একজন পাদরী এই সব বলিতেন, তাহা হইলে এই সমস্ত প্রলাপ বাক্যকে অগ্রাহ্য করাই উচিত ছিল। কিন্তু এই সমস্ত লেখক এই সমস্ত কুৎসিৎ অসত্য প্রচার করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িতে চাহেন। সার জন উড্রফ এই সমস্ত লেখকের মতলব কি তাহা দেখাইতেছেন।

"If her (India's) face can be made ugly religiously, morally, intetecffually, and socially and in every other way, then the British people will not like the look of it". অর্থাৎ যাতে তাতে পার ভারতের মুখে চুণ কালী দাও দিয়া ইহাকে যতদূর পার কুৎসিৎ কর—দেখাও ধর্ম্ম ভয়ানক, ইহার নীতি নিন্দনীয়, এ দেশে জ্ঞানের কোন কিছু নাই, এ দেশের সামাজিক প্রশ্ন সমস্তই অসভ্য বর্ব্বর জাতির মত—সব দিক দিয়া যদি এই জাতিটাকে বর্ব্বর করিয়া আঁকিতে পার, তবেই দেখিবে ইংরাজ জাতি ভারতের মুখ দেখিতে পারিবে না।

শুধু যে বিলাতে এই সব মত চলিতেছে তাহা নহে there is a party amongst the Indian people themselves who favour in varying degree in the introduction of western civilization &c". ভারতবাসীর মধ্যে একদল জন্মিয়াছেন যাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতা অল্প অধিক পরিমাণে ভারতে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারাও ভারতের দেবদেবী মানিতে চান না, ইঁহারা ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক নিয়ম জাতিভেদ মানেন না, ইঁহারা ধর্ম্মের সহিত আহারের সম্পর্ক মানেন না, ইঁহারাও ভারতের সবর্ণবিবাহপ্রথা দূষণীয় ভাবিয়া অসবর্ণ বিবাহ চালাইতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন।

সার জন উড্রফ মহোদয় তাঁহার পুস্তকে ভারতের এই দুই বিবাদের প্রতীকার করিয়া ভারতের প্রকৃত ধর্ম্ম কি ভারতবাসীকে কি করিতে হইবে তাহাই দেখাইয়া দিতেছেন। ভারতবাসীর মধ্যে যাঁহারা ভারতের সৌন্দর্য্য দেখিতে পান না—যাঁহারা ভারতকে বিলাতের ছাঁচে গড়িতে চান সার জন তাঁহাদের বড় সুন্দর একটি নাম দিয়াছেন—তিনি বলিতেছেন many have become the mere mind-born Sons (মানসপুত্র) of the English.

"ভারতকি উন্নত" এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইতেছে যথার্থ সত্যাভিসন্ধিৎসুর উদ্দেশ্য যাহা তাহাই। যাঁহারা সত্যের আদর করেন, যাঁহারা যথার্থ জ্ঞানের মুখ দেখিতে প্রয়াসী তাঁহারা একদিকে সত্য বস্তুটি দেখাইবেন, অন্যদিকে অসত্য যাহা, মূর্খতা যাহা, অবিদ্যা যাহা, তাহার বিনাশেরও চেষ্টা করিবেন। ভারত কি উন্নত গ্রন্থের লক্ষ্য এই দুইটি আমরা তৃতীয় প্রবন্ধে ইহাই দেখাইব। ক্রমশঃ।

বকুলমালা।

উতলা-অনিলে হারাণ পরশ তার,
তেমনি উজলে, সে যে সাধ্য সাধনার।
আজো সে মধুর হাঁসে,
তেমনি স্মৃতিতে ভাসে;
বহির্বাসে থাকে ঢাকা বিসোরা কি যায়?
মরম-সখীর সনে
সে প্রতীক্ষা মনোবনে
বিজনে তটিনী তীরে বিটপীর ছায়।
অমল মধুর প্রীতি
সে যে গো স্বরগস্মৃতি
মনে মনে দিয়ে ছিনু হাতে তার তুলি,
সেই বকুলের মালা
সে কি কভু যায় ভোলা?
দিয়েছিল ক্রীড়াছলে পুনঃ বঁধু খুলি।
সিঞ্চিয়া নয়ন জলে
যতনে রেখেছি তুলে
আজো ভরা ঝরাফুলে গায় গন্ধ তার;
কুসুম শুকায়ে যায়,
মধু না ফুরায় তায়;
বসন্ত চলিয়া যায় স্মৃতি থাকে তার।
দেখিয়া মিটে না সাধ প্রিয় উপহার॥

হিন্দুর জাতিভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আর বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ বীর্য্যে জন্ম লাভের কথাত অতি রঞ্জিত বা কোনও রূপ আজগবী গল্প নহে। ইহা শাস্ত্রের কথা সুতরাং এই বিবরণ কিছুতেই উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ যিনি ব্রাহ্মণ বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন অপিচ ব্রহ্মতেজ যাঁহার মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই বিরাজমান অথচ যিনি পূর্ব্ব জীবন ও ইহ জীবনের উগ্র কঠোর তপস্যা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিয়ছেন তিনি যে ইহ জীবনে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? বরং ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করাইত অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়। সুতরাং তাঁহার এই ব্রাহ্মণত্ব যে সে ব্রাহ্মণত্ব নহে, প্রত্যুত অসাধারণ অলৌকিক ব্রাহ্মণত্ব, বিশ্বামিত্র অসাধারণ অলৌকিক ছিলেন বলিয়াই এক তিনি তাহা পারিয়াছেন। তবু বিশ্বামিত্র রাজর্ষি হইয়াছিলেন, এত সাধ্য সাধনায়ও ব্রহ্মর্ষি হইতে পারেন নাই, ইহাও কি বিশেষ ভাবিবার বিষয় নহে? যিনি জন্ম জন্মান্তরের উগ্রকঠোর তপস্যাদ্বারাও ব্রহ্মর্ষি হইতে পারিলেন না, তাঁহার কি ব্রাহ্মণ বীর্য্যে জন্ম না হইলে ব্রাহ্মণত্বলাভ কদাচ সম্ভবপর হইত? এই ঘটনায়ত স্পষ্টই সুচিত হয় যে, বিশ্বামিত্র কেবল তপস্যায় ব্রাহ্মণ হন নাই; প্রত্যুত ব্রাহ্মণবীর্য্যে জন্মলাভই তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব লাভের একমাত্র মুলীভূত কারণ; অথচ আবার ইহার সঙ্গে পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফল ত আছেই; সুতরাং ইহা যে মণিকাঞ্চন যোগ তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? অতএব বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া যাঁহারা জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়া থাকেন

তাঁহাদের সেই আপত্তির কোন মূল্যই নাই। তারপর জন্মগত ব্রাহ্মণ বা জন্মগত জাতিভেদই যদি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত না হইবে তাহা হইলে জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারাদ্বিজোচ্যতে। এমন কথাই বা শাস্ত্রে থাকিবে কেন? ভগবান্ মহাদেবই আদ্যাশক্তি পার্ব্বতীর নিকট বলিতেছেন জন্মই ব্রাহ্মণ সংজ্ঞার কারণ এবং সংস্কারই দ্বিজসংজ্ঞার কারণ। জন্মগত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসঙ্গত সমীচীন সিদ্ধান্ত না হইলে কি ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণোজয়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে, এমন কথা কি কখনও কিছুতেই বলিতে পারিতেন? তবে শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্, ইহাও অবশ্য ভগবান্ মনুরই বচন বটে; ইহা যে জন্মগত জাতিরই বিরুদ্ধ পরিচায়ক তাহাত কিছুতেই হইতে পারে না। ইদানীন্তন অনেকেই এই বচনের প্রকৃত অর্থ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মহা গোলই পাকাইতেছেন। নানা শাস্ত্রীয় বচনের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দ্বারা এই বচনের অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়া হিন্দুসমাজের আদর্শ ধর্ম্মপত্র বঙ্গবাসী লিখিয়াছেন—এই বচনের অর্থ এইরূপ যে শূদ্র এই জন্মেই ব্রাহ্মণ হইবে বা ব্রাহ্মণ এই জন্মেই শূদ্র হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণের অনুপযোগী হইবে যদি ভগবান্ মনুর এইমত হইত, তবে মহাভারতে ভগবান্ ব্যাসদেব কখন বলিতেন না অতি হীন শূদ্রও স্বীয় সৎকর্ম্ম প্রভাবে অনায়াসে বেদজ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিতে পারেন আবার ব্রাহ্মণ নীচবর্গের অন্নভক্ষণ প্রভৃতি অসৎকর্ম্ম প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে গুণশালী শূদ্র পরজন্মে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিবেন এবং গুণহীন ব্রাহ্মণ পরজন্মে শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন; কিন্তু ইহাতেই যে এই জন্মেই গুণহীন ব্রাহ্মণকে লোকে শূদ্রবৎ দেখিবে ইহা শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন না। যদি তাহাই হইত, তবে শ্রীভগবান্ কখনও বলিতেন না—অবিদ্বোবাসবিদ্বোবা ব্রাহ্মণো মামকীতনুঃ, অর্থাৎ মূর্খই হউন বা বিদ্বানই হউন ব্রাহ্মণ আমারই দেহ। রাজা

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পতিত জাতি ব্রাহ্মণেরও পদ ধৌত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহজন্মে জন্মই যে একমাত্র ব্রাহ্মণের কারণ তাহাত এই সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও ভগবদ্দৃষ্টান্ত দ্বারাই সুন্দর প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্ এই ভগবান্ মনুবচনের অর্থ এইরূপ নহে যে কর্ম্মানুসারে শূদ্র এই জন্মেই ব্রাহ্মণ হইবে বা ব্রাহ্মণ এই জন্মেই শূদ্র হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণের অনুপযোগী হইবে। এই সব শাস্ত্রীয় প্রমাণে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে কর্ম্মানুসারে ইহজন্মে কিছুতেই জাতির বা সম্মানের ব্যত্যয় হয় না, কর্ম্মানুসারে জাত্যন্তর প্রাপ্তি বা নীচ হওয়া যে কেবল জন্মান্তরের সাপেক্ষ এতাবতা তাহাই স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। এই বচনের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য না করিয়াই বাবুর দল মহাগোল পাকাইতেছেন।

পরম ভক্তিভাজন স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বাবু এম্ এ, বিএল মহাশয়ও তাঁহার হিন্দুত্ব পুস্তকে লিখিয়াছেন—যাঁহারা ইউরোপীয় সাম্যবাদের পক্ষপাতী তাঁহারা হয় ত এইখানে হিন্দুশাস্ত্রকারকে জিজ্ঞাসা করিবেন তবে কি শূদ্র কথনই এবং কিছুতেই বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না?

হিন্দু শাস্ত্রকার বোধ হয় এইকথার উত্তরে বলিবেন—পারিবে, কিন্তু এ জন্মে নয়। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এ জন্মে যেমন বর্ণবিশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এ জন্মে তেমনি আপন বর্ণধর্ম্ম পূজন করিয়া এবং ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া উন্নত স্বভাব লাভ করিলে পরজন্মে উচ্চতর অবস্থা অর্থাৎ উচ্চতর বর্ণপ্রাপ্ত হওয়া যাইবে। গৌতম বলিয়াছেন—বর্ণাশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেতকর্ম্মফলমনুভূয়ততঃশেষেণ বিশিষ্ট দেশ জাতি কুলরূপায়ুঃ শ্রুতবিত্তসুখ মেধামে জন্ম প্রতিপাদ্যান্তে। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বর্ণের ও সর্ব্বপ্রকার আশ্রমের লোক সকল সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মরণানন্তর স্বস্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া

অবশিষ্ঠ কর্ম্মফল অনুসারে বিশেষ বিশেষ জাতিকুলরূপায়ু শ্রুত বৃত্ত সুখ ও মেধালাভ করত জন্মগ্রহণ করে। অতএব হিন্দু শাস্ত্রমতে এ জন্মে যে উত্তম কর্ম্ম করে পরজন্মে সে উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয়। (হিন্দুত্ব পুস্তক দৃষ্টব্য)॥ ভক্তিভাজন পরম পণ্ডিত স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখাইতেছেন কর্ম্মানুসারে ইহজন্মে মানবের উচ্চনীচ প্রাপ্তি ঘটে না। ইহজন্মে যিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণই থাকিবেন, কিছুইতেই শূদ্র হইবেন না; আর ইহজন্মে যিনি শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনিও শূদ্রই থাকিবেন; তাহারও ইহজন্মে কিছুতেই ব্রাহ্মণ হইবার যো নাই। বাস্তবিক উচ্চনীচ বা জাত্যন্তর প্রাপ্তি যে পর জন্মেই ঘটিয়া থাকে শাস্ত্রের তাহাই মুখ্যাভিপ্রায়। অতএব শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণ শ্চৈতি শূদ্রতাম, এই বচনের দৃষ্টান্ত দিয়া জন্মগত ব্রাহ্মণ্য বা জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে আপত্তি করা আর কিছুতেই চলে না। আর এই জন্মগত জাতি ভেদের দৃষ্টান্ত আমাদের শাস্ত্রে আমরা বহুল আছে। নারায়ণের অবতার পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ রামচন্দ্রই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নহে কি? ভগবান্ রামচন্দ্র গুহক ভবনে গমন করিয়া জল পিপাসু হইলে লক্ষণ কর্ত্তৃক আনীত জল পান করিয়া নিশাযাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু গুহক চণ্ডালের স্পৃষ্ট জল যে কদাচ পান করেন নাই মূল রামায়ণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরিচায়ক। রামায়ণে স্পষ্টই আছে—

ততশ্চীরোবরাঙ্গঃ সন্ধ্যামন্বস্য পশ্চিমাম্।
জল মেবাদদে ভোকত্তুম্ লক্ষণে নাহৃতংস্বয়ম্॥

অর্থাৎ তদনন্তর চীর বল্কলধারী ভগবান্ রামচন্দ্র সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষণ কর্ত্তৃক অনীত জল পান করিলেন। আবার গুহক চণ্ডাল যখন রামচন্দ্রকে খাদ্য দিয়াছিলেন তখন তিনি তাহার কিছুই গ্রহণ করেন নাই। তিনি

বলিয়াছিলেন—

যত্ত্বিদং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রীত্যা সমুপকল্পিতম্।
সর্ব্বং তদনু জানামি নহি বর্ত্তে প্রতিগ্রহে ॥

(বাল্মীকি রামায়ণ)

অর্থাৎ তুমি আদন্দের সহিত আমকে দেওয়ার জন্য যে সকল খাদ্য আনিয়াছ আমি তাহা স্বীকার করিতেছি বটে, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। এই সকল ঘটনায় জন্মগত জাতি ভেদই স্বীকৃত হয়। বিশেষতঃ রামায়ণ যুগের ঘটনা পরন্তু সুপ্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ আর এই ত্রেতাযুগের কি কখন আদি অন্ত আছে ? অনাদি অনন্ত কাল হইতেইত এই সত্য দ্বাপর কলি পর্য্যন্ত ক্রমে এই সংসারে চলিয়া আসিতেছে সে হিসাবে জাতিভেদের প্রাচীনতা সমন্ধে সন্দেহ আসিতে পারে কি ? অথচ আবার এখনকার মত জাতি ভেদের দৃষ্টান্ত যখন রামায়ণে বহুলই পাওয়া যায়, আর যখন দেখা যায় রামচন্দ্র স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান হইয়াও জাতি ভেদ পালন পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় মর্য্যদা পদে পদে রক্ষা করিয়াছিলেন তখন শাস্ত্র জাতিভেদ জন্মগত না বলিয়া উপায় কি ? যদি জন্মগতই না হইবে তাহা হইলে যিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তিনি কি কখনও তাহার আচরণ করিয়া জনসমাজের কাছে দেখাইতে ? কিন্তু যাহাতে কোন সত্য নিহিত নাই অপিচ যাহা সঙ্কীর্ণতা মূলক এমন আচরণ নিত্য সত্য ভগবান তাঁহার কাছে আবার জাতি ভেদের প্রয়োজন কি ? ভগবানের নিকটেই সকলই সমান, ইতর বিশেষ কিছুই নাই তবে কেন তিনি সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিবেন ? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায় যে ভগবানের নিকট সব সমান হইলেও সাধারণ মানুষের মত তাহার কোন কর্ত্তব্য না থাকিলেও তবুও যেন তিনি কর্ম্ম করেন তাহা কেবল লোক শিক্ষার জন্য। সাধারণ জনে ভ্রান্তপথে চলিত হইয়া বিপথে গমন না করেন, কর্ত্তব্য বিমুখ না হন তাহারই জন্য শ্রীভগবানের জাতি ভেদের প্রয়োজন বা যত কিছু কর্ম্মের প্রয়োজন। আর সেই জন্যই শ্রীভগবান নিজ মুখে বলিয়া-

ছেন যদাযদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্ত দেবতরোজনঃ। সযৎ প্রমাণং কুরুতেলোক স্তদন্থ বর্ত্ততে॥ সুতরাং ইহা শ্রীভগবানের সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক নহে প্রত্যুত জনসাধারণের প্রতি তাঁহার অসীম দয়ারই পরিচায়ক বটে। যাহা দেখি শ্রীভগবানের কার্য্য ও আচরণ দ্বারা পষ্টই বুঝাইতেছে হিন্দুর জাতি ভেদ নিশ্চয়ই জন্ম মুলক, ইহা কিছুতেই কাল্পনিক বা মনুষ্যকৃত নহে। যদি কাল্পনিক বা মনুষ্য কৃতই হইত তাহা হইলে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চাতুর্ব্বর্ণংময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ এমন কথাত কখন কিছুতেই বলিতেন না। জাতিভেদ যে স্বকপোলকল্পিত নহে, পরন্তু এক মাত্র ভগবানেরই সৃষ্টি ভগবদ বাক্যইত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যাহা ভগবৎ সৃষ্ট নিত্য স্বাভাবিক তাহা কি কখনও কাল্পনিক বা মনুষ্যকৃত হইতে পারে? অবশ্য এই ভগবদ বচনে গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ কথাটী আছে বটে, কিন্তু ইহা যে জন্মগত জাতিরই বিরুদ্ধ পরিচায়ক এমন ত কিছুতেই হইতে পারে না। গুণকর্ম্ম লইয়া যে জাতি ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাত কেহ অস্বীকার করেন না। লোক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জাত ব্যক্তির জাতি ধর্ম্ম নির্দ্দেশের সহিত তাহাদের গুণকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াইত ভগবান জাতি ভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর সৃষ্টির আদিঅন্ত বা কালাকাল বলিয়া কখনও কিছু থাকিতে পারে কি? এই সৃষ্টি প্রবাহ অনন্ত কাল হইতেই এই সংসার সাগরে একাদিক্রমে চলিয়া আসিতেছে সুতরাং এই জাতিভেদেও যে সৃষ্টির বা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই অনাদি অনন্তকাল হইতে ঠিক একই ভাবে ইহসংসারে চলিয়া আসিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? জন্ম জন্মান্তর হইতেই এই জাতি স্রোত অবিরাম চলিতেছে এবং এইরূপই চলিতে থাকিবে; কেন না ইহাই ভগবৎ রাজ্যের প্রাকৃতিক নিয়ম; এই নিয়মের একতিলও ব্যতিক্রম হইবার যো নাই। (ক্রমশঃ)।

উৎসব।

—ঃ-*-ঃ—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৪শ বর্ষ। | সন ১৩২৬ সাল, আষাঢ়। | ৩য় সংখ্যা।

শ্রীগুরু।

গগন সদৃশ সে যে আছে সব ঠাঁই
কি ভাবিয়া মনে করি সেত কাছে নাই ?
আকাশ সতত দেখে সদা চেয়ে আছে
কে তারে ভুলিতে পারে ? কে এমন আছে ?

জীবন্ত আকাশ মত শ্রীগুরু আমার
সীমাশূন্য হয়ে ভাসে উপরে সবার।
সীমাশূন্য হয়ে ভাসে আমার উপরে
ঊর্দ্ধে অধে পার্শ্বে পৃষ্ঠে ভিতরে বাহিরে।

তবু তারে ভুলে যাই এ মায়া কাহার
বৃহতে ভুলয়ে ক্ষুদ্র একি চমৎকার ?
আপন অঙ্গুলে ঢেকে নয়নের তারা
সে নাই সে নাই বলি হই দিশেহারা !

কি লইয়া ভুলে থাকি হাহাকার করি
তাহার ভিতরে থেকে তাহারে বিসরি!
সুনীল অনন্তাকাশ সীমাশূন্য তুমি
শতবার নমস্কার করিলাম আমি।

সীমাশূন্য তবু দেখি আকার তোমার
জপিব তোমায় নাথ না ভুলিব আর।
যথা সতী নাহি গণে ননদিনী জ্বালা
স্বামীসঙ্গতরে যার পরাণ উতলা।

সেইরূপে চেয়ে চেয়ে আকাশের পানে
সেইরূপে কথা কয়ে জীবন্তের সনে।
ভুলে যাব সব জ্বালা তোমা হৃদে ধরে
এ তুচ্ছ সংসার বল কি করিতে পারে?

তোমার হৃদয়ে ধরা কিযে সুখ তায়
সেই জানে যে ধরেছে আপন হিয়ায়।
হৃদয় অনন্ত হয় অনন্ত ধরিয়া
সব শান্ত সব জ্বালা যায় জুড়াইয়া।

জড়ের মতন থাকে অসাড় সে জন
তোমার পরশ সুখে ডুবে যায় মন।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখে
সাধের বিরাম নাই যা দেখে তা দেখে।

চাপিয়া এ নীলনভ হৃদে একবার
দেখ দেখি কোথা থাকে সংসার তোমার
আর এক কথা বলি দেখহ ভাবিয়া
বুঝিয়া আপন ভ্রান্তি দেহত ছাড়িয়া?

ভ্রমর কমলে যবে করে মধুপান
চন্দ্রমা চকোরে যবে দেয় সুধা দান।

ভ্রমর সে সুখ বল বুঝিবে কেমনে
চকোরিণী সে আনন্দ জানিবে কেমনে।

যে আনন্দ কমলের যে সুখ চাঁদের
ভক্তে হৃদে ধ'রে সুখ যথা ঈশ্বরের।
সুখ, ভগবৎ স্বার্থ জানিও নিশ্চয়
আনন্দের বৃদ্ধিহেতু সৃষ্টিখেলা হয়।

এস এস হৃদে ধরি করি নমস্কার
তোমাতে তুমিই প্রভু করহ বিহার।

সবই-তুমি।

কোথাও যাইতে হইলে লোকে সঙ্গী খুঁজিয়া থাকে। কিন্তু যাইতে হইবে ত বহুদূর রাস্তাও ত জানা নাই সঙ্গে যাইবারও ত কেহ নাই। রাস্তায় বড় ভয়ও আছে। সেই দূর দূরান্তরের সাথি কে? কে আমার সঙ্গে যাইবে?

যাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম সে কি আমার সঙ্গে যাইবে? কি ভাল বাসিয়াছিলাম? চেতন না জড়? দেহ না অন্তর্যামী? কাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতাম? কি পাইবার জন্য ব্যাকুল হই? মৃত্যুর পরে সে কি আমায় সেই ভয়সঙ্কুল দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে?

আমি কারে নিত্য স্মরণ করি? তার কি প্রাণ আছে না সে জড়? যারে স্মরণ করি সে কি জীবন্ত জাগ্রত, না সে পটের ছবি, না সে ধাতু পাষাণের সাজান মূর্ত্তি, না সে ফটোগ্রাফ? আমাকে তুমি স্মরণ কর এই

আমি চাই। তুমি যদি আমায় স্মরণ কর তবে আমার মৃত্যু থাকে না। তুমি বড় প্রেমিক। তোমাকে যে ভালবাসে তাহাকে তুমি কখন ভুলিতে চাওনা, তোমার স্বভাবে তাহাকে ভুলিতে দেয় না। কোথায় সে প্রেমিক যাহাকে ভালবাসিলে সে আমায় কখন ভুলিবে না?

সেই প্রেমিককে যদি ভালবাসিতাম? তারে ভালবাসিয়া যদি আমি মরি? সে ত মৃত্যু নয় সেই অমরত্ব। তারে ভালবাসিলে সে কখন ভুলে না। আমার দেহ যদি ছুটিয়া যায় তবু তার জগৎ যেন আমার জন্য শোক করে। তারে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়া তার বায়ু বুঝি আমার জন্য হা হুতাশ করে, তার পুষ্প বুঝি আমার জন্য নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করে, তার সমুদ্র, তার আকাশ, তার তারা, তার সূর্য্য, তার চন্দ্র সকলেই আমার জন্য শোক করে। এরা যত দিন থাকিবে তত দিন এরা আমায় স্মরণ রাখে।

কিন্তু এখন যদি মৃত্যু হয় তবে? "রামপ্রসাদ মোলো কান্না গেলো অন্ন খেলাম অনায়াসে।" হরি হরি তোমায় না ভালবাসিলে আমার স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ হইয়া যাইবে। স্বার্থের জন্য যাহারা আমায় ভালবাসিত তাহাদের স্বার্থতৃপ্তির অভাবে আমারও অভাব হইবে। কামের ভালবাসা কামের চরিতার্থতে যায়, প্রেমে ভালবাসা যায় না— অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া থাকে। প্রেমিককে ভালবাসিলে অনন্ত অনন্ত কাল জীবন-প্রবাহ আনন্দ সাগরে মিশিয়া থাকে।

তাই বলি কোথায় সেই প্রেমিক? কে সেই প্রেমিক? কোথায় সে থাকে?

শুনি দৃশ্য জগতের সকলি তার মূর্ত্তি। তবু সে কোন্ চিহ্নিত মূর্ত্তিতে আমায় ভালবাসে। আমার গুরু, আমার ইষ্টমূর্ত্তি, আমার মন্ত্রমূর্ত্তি ভিতরে বাহিরে সেই চিহ্নিত মূর্ত্তিতেই সে আমায় ভালবাসে। কে সে? তুমি। তুমি আমাতে কি ভাবে আছ?

এই আমায় বুঝাইয়া দাও দেখি, তাহা হইলে আমি বুঝিব "তুমি ভিন্ন আমি কি?"

যখন নির্জ্জনে তোমায় খুঁজি, যখন তুমি যে নিত্যকর্ম্ম করিতে বলিয়া দিয়াছ তাহা করিয়া একান্তে চুপ করিয়া বসিয়া থাকি—তুমি আসিবে বলিয়া, তখন মনের ব্যাপারে কত কি দেখি। এই মানসিক ব্যাপার দেখিতে দেখিতে "তুমি ভিন্ন আমি কি" ইহার উত্তর যেন পাই।

চুপ করিয়া একান্তে বসিয়া থাকিলে দেখি মনের মধ্যে দুই প্রকারের চিন্তা হয়। (১) সংসার-চিন্তা (২) ঈশ্বর চিন্তা। সংসারাচন্তা বা বিষয়চিন্তা আপনি আইসে—ইহাদিগকে ডাকিতে হয় না, সাধিতে হয় না ইহারা আপনি আসে—আসিয়া আমার জন্য বহু কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। আবার এই সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইলে কোন্ কোন্ উপায় করিতে হইবে, আবার সেই উপায় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কত কৌশল করিবে তাহাও মনের মধ্যে লক্ষিত হয়। মূল বিষয়-চিন্তা বা সংসার-চিন্তা বিনা আয়াসেই আইসে ইহাতে কোন চেষ্টা আবশ্যক করে না—ইহার শাখা প্রশাখা জন্য চেষ্টা আবশ্যক হয় বটে। শাস্ত্র বলেন সংসারচেষ্টার নাম উন্মত্ত-চেষ্টা।

সংসারচিন্তা মনে যেমন বিনা আয়াসে আইসে ঈশ্বরচিন্তা কিন্তু সেরূপে আইসে না। ঈশ্বরচিন্তার জন্য পুরুষার্থ চাই। ঈশ্বর-চিন্তা যখন এখনকার সংসার-চিন্তার মত বিনা আয়াসে আসিবে তখন আমার স্থান ধর্ম্মজগতে।

কিন্তু বুঝিতে যাইতেছি তুমি আমাতে কি ভাবে আছ। আচ্ছা—যখন সংসারচিন্তার প্রকোপে মস্তিষ্ক গরম হয়, যখন সংসারচিন্তায় ক্লেশ পাইয়া বলি আর পারি না, তখন ভাবি সংসার ত আমার সঙ্গে নাই—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জ্বালা যন্ত্রণা কাহাকেও ত চক্ষে দেখিতেছি না তবে শোক করি কেন? উত্তর পাই সংসারটা চিন্তা লইয়া। চিন্তাটা মনেই হয়। বিষয়চিন্তাকুল মনই সংসার। "চিত্তমেব হি সংসারো রাগাদি-ক্লেশদুষিতম্।" চিত্ত বা মনই সংসার। কষ্ট মনই পায়। ভাল, মনই না হয় কষ্ট পাইল ইহাতে আমার কি? আমি কি মন? দেখি মনই অগ্রে চিন্তা করে, তাহার পরে কথা কয় তাহার পরে

কর্ম্ম করায়। "যৎ মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি তৎকর্ম্মণা করোতীতি শ্রুতিঃ"।

বুঝিতে চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারি—আমি মন না হইলেও, আমার মন তাহার সহিত আমাকে এক করিয়া রাখিয়াছে। মন যাহা করে তাহাই আমার কার্য্য বলিয়া আমি মানিয়া লই। মন কষ্ট পায়, আমি বলি আমি কষ্ট পাইতেছি।

আমি মন হইতে পৃথক হইতে চেষ্টা করি—আমি বলি—আমিত মন নহি। আশ্চর্য্য—যখন বুঝিয়া বলি আমিত মন নহি—তখন কি এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আমার মধ্যে ঘটে; আমি দেখি আমার আর কোন ক্লেশ নাই, কোন চিন্তা নাই, আমি মন নহি তবে আমি কি? কিসের যেন আভাস পাই; ক্ষণকালের জন্য "অভিমান" মনের উপরে না রাখিয়া যেন আর কাহারও উপরে রক্ষিত হয়, তাই ক্ষণিকের জন্য বড় শান্তি আইসে। শাস্ত্র যে অভিমান বা অহংকে তিন প্রকার বলিয়াছেন, যে অভিমান বা অহং দেহের উপর স্থাপিত, তাহাই আমাদের সমস্ত শোকতাপের মূল; কিন্তু "আমিই এই নিখিল বিশ্ব" অথবা "আমিই এই নিখিল বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র" এই দুই ভাবে যখন অহং স্থাপিত হয় তখন আর আমাদের কোন শোক থাকে না, আমি সীমাশূন্য আকাশের মত এই ভাবে আপনাকে ভাবনা করিতে পারিলে এই দেহটা যে অপরের কৌতুক উৎপাদনের জন্য নৃত্যকারী কাষ্ঠপুত্তলিকা তাহা বোধ হইয়া যায়।

বলিতেছিলাম "আমি মন নহি" বুঝিয়া বলিলে যতই ক্ষণিক হউক না কেন একটা শান্ত অবস্থা আইসে। এ অবস্থাতে আমি যেন কোন এক স্থানে গিয়াছি কোন অবলম্বন নাই—শাস্ত্রে যাহাকে নিরোধ অবস্থা বলে ইহা যেন তাহারই আভাস। কাহার উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া নাই—কিছুই অবলম্বন নাই—সম্মুখে পশ্চাতে উর্দ্ধে অধে সীমাশূন্য আমি—কিন্তু মনে হয় বুঝি পড়িয়া যাইতেছি—পরম শান্ত সীমাশূন্য এই পরম পদে উৎকৃষ্ট সাধক ভিন্ন কেহই থাকিতে পারে না। এই স্থানে থাকিতে না পারিয়া কোন এক অবলম্বন যেন প্রার্থনা করি।

এই সময়ে আরও সূক্ষ্ম ব্যাপার সংঘটিত হয়। "আমি মন নহি" "তবে অমি কি" যখন বিচার করি তখন অন্য এক অবস্থা প্রত্যক্ষ করি। দেখি আমি মনের দ্রষ্টা। দ্রষ্টা হইয়াই আপনাকে আপনি দেখিতে ইচ্ছা করে। পরিপূর্ণ কোন কিছুর সহিত যেন আমি এক হইতে চাই। কিন্তু অবলম্বনশূন্য হইয়া থাকিতে পারি না বলিয়া সেই পরিপূর্ণ পরম শান্ত পদের যাহা প্রিয়নাম শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করি। নামের সঙ্গে রূপ। প্রথম রূপই তেজ। সেই পরম ব্রহ্মের উপাসনীয় তেজ—তাঁহার শক্তি ধ্যান করি। ইহাই সীমাশূন্য। এই অনন্ত বস্তুতেও যখন থাকিতে না পারি তখন তিনি কৃপা করিয়া যে তেজোময়, যে অমৃতময় মূর্ত্তি উদয় করিয়া দেন তাহাই আমার অবলম্বন হয়।

মনের দ্রষ্টা আমি এই অনুভব হইলে উপরের বস্তুসমূহের সহিত একত্ব স্থাপন হইয়া যায়।

এখানেও বিচার আবশ্যক। "আমি" মনের দ্রষ্টা। আর "তুমি? "তুমি" সকলের দ্রষ্টা—ভিতরে বাহিরে যাহা আছে সকলের দ্রষ্টা তুমি। কিন্তু দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের কি সম্বন্ধ? দ্রষ্টা চেতন, দৃশ্য মাত্র জড়। আমি যখন মনের দ্রষ্টা হই তখন মন জড়, আমি চেতন। তুমিও চেতন আমিও চেতন। চেতনই সীমাশূন্য পরম শান্ত। আমি দ্রষ্টা ভাবে পৌঁছিলেই সীমাশূন্য বস্তু হইয়া যাই। আর তুমি? এক্ষেত্রে দ্রষ্টা আর দুই থাকে না—জীব ঐ ভূমিকা প্রাপ্ত হইয়া আপন স্বরূপ দেখিতে দেখিতে তাহার সহিত যে সে এক তাহাই দেখে—স্পষ্ট বুঝিতে পারে "আমি" কি—"তুমি" কি। এই কথা আর একবার বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যখন প্রশ্ন করি আমার "আমি" কে? উত্তর পাই 'তুমি"। তুমি—পরম শান্ত—পরিপূর্ণ সীমাশূন্য—কি জানি কি—ভাল করিয়া তোমায় ধরিয়া থাকিতে পারি না। যাঁহারা এই পরমশান্ত, সীমাশূন্য, সর্ব্বসংসারচিন্তাশূন্য, পরম আনন্দপদে স্থির থাকিতে পারেন তাঁহারাই দেখিতে পান তুমি কি? তুমি সচ্চিদানন্দ, তুমিই নিত্যজ্ঞান আনন্দময়, শান্ত পরমপদ। আর এই পরম পদের

আভাস পাইয়াও সাধনা অভাবে যিনি এখানে স্থির থাকিতে পারেন না তিনি সেই দেবতার পবিত্র সীমাশূন্য পরম তেজের দিকে দৃষ্টি করেন— তেজের ধ্যান করেন, শক্তির ধ্যান করেন। এখান হইতে নামরূপ। তেজের ধ্যানও যাঁহার দুঃসাধ্য হয় তিনি তেজোময় বা তেজোময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করেন। ইহাও যাঁহারা পারেন না তাঁহারা ধ্যানমার্গের উপাসনা ছাড়িয়া কর্ম্ম-মার্গে উপাসনা করেন। ইহারা বিশ্বাসে ভর করিয়া তোমার প্রীতির জন্য কর্ম্ম করেন। তোমাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাইতে হইলে তোমাকে বুঝিতে হয় যাহাকে না জানি তাহাকে ভক্তি করা যায় না। বিশ্বাসে যতটুকু জানা হয়। ভক্তি ও ততটুকু হয়। কিন্তু ঠিক ঠিক যখন জানা যায় তখন ঠিক ঠিক ভক্তি জন্মে। বিশ্বাস-জনিত ভক্তি দ্বারা সাধনা করিতে করিতে যখন তোমার কৃপা লাভ হয়, তোমার কৃপা লাভ করিয়া যখন তোমার জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের পর যে ভক্তি তাহার নাম পরাভক্তি বা অভেদ ভক্তি। সে ভক্তিতে তোমায় আমায় ভেদ নাই। যেমন নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তি যদি পূজা করিতে আইসে সে পূজার অবসান যেমন আলিঙ্গনে, সেইরূপ পরা ভক্তির পূজা সাঙ্গ হয় একত্ব স্থাপনে। তথাপি সাধক দাস অভিমান রাখিতে ভালবাসে। এই পরাভক্তির পরে পরম জ্ঞান। তত্ত্বের সহিত তোমায় জানা ইহাই জীবন্মুক্তি।

তুমি আমার মধ্যে দ্রষ্টা ভাবে আছ। আমি যখন আমার মধ্যে দ্রষ্টা ভাবে থাকি, আমার মনে যখন যাহা উঠে তাহার দ্রষ্টা ভাবে থাকি তখন আমি কে? তুমি। ভিতরেও তুমি বাহিরেও তুমি।

তুমি না হইলে আমার এক ক্ষণও চলে না। তুমি বল তুমি ভিন্ন আমি কি? আমি ভিন্ন তুমি কি? তুমি বেদমুখে কত কথা বলিয়াছ— সব কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি না কিন্তু চেষ্টা করি। তোমার কথা বুঝিতে আমার বড় সুখ হয়।

জগত সুখের জন্য ব্যাকুল। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, ন্যায় অন্যায় লোকে যাহা কিছু করে সমস্তই সুখের জন্য। আমি কল্পনায় ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া দেখিলাম, বুঝিলাম তুমি ভিন্ন আমার সুখ নাই। তোমায়

পূর্ণভাবে না জানিতে পারিলে আমার শান্তি নাই। তুমি ভিন্ন আমি কোথাও স্থির থাকিতে পারি না। সংস্কারবশে চিত্ত বিষয়ে গিয়া পড়ে, কিন্তু আবার তাড়া খাইয়া ফিরিয়া আইসে। এরূপ হয় কেন? আমার বড় দুঃখ হয়। চিত্তের এ চঞ্চলতা আমার সয় না।

ঐ দেখ কি বলিতেছিলাম—তোমার কথা শুনিতে আমি বড় ভালবাসি। ইহা তুমিই জান, আর কেহ জানে না। তুমি যখন বিষয়-দোষ বর্ণন কর যখন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বাহু তুলিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে বল—

ভোগা মেঘবিতানস্থবিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলাঃ।
আয়ুরপ্যগ্নিসন্তপ্ত লোহস্থ জলবিন্দুবৎ॥

পৃথিবীর ভোগ বা স্বর্গের ভোগও মেঘ সমূহ মধ্যে বিদ্যুল্লেখার গতির মত চঞ্চল আর আয়ু, অগ্নিতপ্ত রক্তবর্ণ লৌহখণ্ডে জলবিন্দুবৎ—আবার যখন বল—

"নারিস্তনভব নাভিনিবেশং
মিথ্যা মায়া মোহাবেশং"

তখন আমার বেশ লাগে। আমি সব ভুলিয়া তোমার মুখের পানে চাহিয়া থাকি। গুরু বশিষ্ঠের বাক্য শুনিতে শুনিতে রাম যেমন সব ভুলিয়া যাইতেন, সব ভুলিয়া মুখপানে তাকাইয়া থাকিতেন "বশিষ্ঠস্যাননে রামঃ ক্ষণং দৃষ্টি নিবেশয়" আমার ইহা মনে পড়ে। ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদ্মমধ্যে উপবেশন করিলে যেমন ভ্রমরের সুখ, আবার পদ্মের মধুপান করে বলিয়া, পদ্মেরও যেন তদপেক্ষা অধিক সুখ। আমার মনে হয় মানুষের চিত্তভ্রমরকে তোমাতে বসাইতে পারিলে তোমার না জানি কত সুখ হয়। তাই তুমি শাস্ত্রমুখে সাধুমুখে কত কথা কহিয়া সকলকে তোমাকে আকর্ষণ কর।

আমি তোমার কথা লইয়া থাকি বলিয়া লোকে আমায় বোকা বলে,

লোকে আমায় অকর্ম্মণ্য বলে। কিন্তু তুমি কি বোকা, তুমি কি অকর্ম্মণ্য, যে তোমায় ভজিয়া আমি বোকা হইব, তোমায় ভজিয়া আমি অকর্ম্মণ্য হইব? কাজেই লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না—সেও তোমার জোরে।

"তুমি ভিন্ন আমি কি" মোটামুটি এই কথা বুঝাই। তুমি যদি না থাক তবে আমার কি হয় এই স্থূল অর্থ। "যদি তুমি না থাক" একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আত্মা নাই আমি আছি, আত্মারাম নাই আমি আছি এ কথা বালকেও ধারণা করিতে পারে না। তুমি পরিপূর্ণ তুমি সত্য কেমন করিয়া কল্পনা করিব "তুমি যদি না থাক"? চক্ষে না দেখিলেই যে বস্তুটি নাই কে বলিল? বীজ মধ্যে বৃক্ষ থাকে চক্ষে দেখি না তাই বলিয়া বীজ মধ্যে কি বৃক্ষ নাই? যদি না থাকে তবে আসে কোথা হইতে? জলে লবণ মিশ্রিত করিলাম, চক্ষে দেখি না কিন্তু লবন কি নাই? এই পৃথিবীর কত স্থানে কত বস্তু আছে যাহা চক্ষে দেখি নাই; কিন্তু নাই ত বলি না। অন্যে যাহা দেখিয়াছে তাহাও আছে, বলিয়া মানিয়া লই। যদি সকলে বলিত কেহ তোমায় দেখে নাই—তবু বলিতাম তুমি আছ। আমি যে মনে মনে তোমার সত্ত্বা অনুভব করি প্রমাণ করিতে পারি না সত্য, আরণ তুমি অপ্রমেয় তুমি নিজ বোধরূপ। তবে তুমি "যদি" না থাক—এ "যদি" টুকু আমি কিছুতেই মানিতে পারি না। যে পারে সে পারুক আমি তার কি করিব তুমি তাকে পারাইয়া দিও।

'তুমি ভিন্ন আমি কি' ইহার আর এক অর্থ হইতে পারে। তুমি ছাড়া হইলে আমি কি? তুমি কি সত্যই আমাকে ছাড়িয়া থাক? কখন কি ছাড়িয়া থাকিয়াছ? কখনই থাক না। আচ্ছা যখন মানুষ মরে তখন কে কাহাকে ছাড়ে? তুমি দেহটা ছাড়। দেহটা জড়—তুমি চেতন। চেতন জড়কে ছাড়ে। কিন্তু আমি কি? চেতন না জড়? কেহত বলে না আমি জড়। কেহ বোঝেও না আমি জড়। আমিও চেতন। আর তুমিও চেতন। তবে তুমি আমায় ছাড়িয়া থাকিয়াছ

কোথায় ? যখন তুমি আমাকে তোমার সহিত এক করিয়া রাখ, তখন আমি তোমার মত আনন্দ, তোমার মত জ্ঞান, তোমার মত নিত্য। আমি তোমার সহিত এক হইয়া মিশিয়া থাকিলে আমি "নাই" হইল ? তা নয়। তুমি কত আদর জান—আমাকে যখন অভিন্ন করিয়া রাখ তখন আমি যে কি আনন্দে থাকি তা বলিতে পারি না। তুমি ত কখন আমায় ছাড়িয়া নাই।

আর এক কথা তুমি যে আমার সহিত অভিন্ন তাত বুঝিতে পারি না। তুমি দ্রষ্টা—আমিও দ্রষ্টা বুঝি। কিন্তু তুমি দ্রষ্টা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের, আর আমি দ্রষ্টা আমার মনের। আমার মন যে সীমাশূন্য তাহাত বুঝি না—আমিও যে কোন একটা সীমাশূন্য বস্তুর দ্রষ্টা তাহাত বুঝি না। তুমিও যে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞাতা তাওত বুঝি না। বিশ্বাস করিলাম তুমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান কিন্তু দেখি যে আমি অল্পজ্ঞ অল্প শক্তিমান। আমি যে অল্পজ্ঞ এবং অল্প শক্তিমান ইহা আমি অনুভব করিতে পারি। আমি সর্ব্বশক্তিমান আমি সর্ব্বজ্ঞ ইহা যেমন অনুভব করিতে পারি না সেইরূপ তুমিও যে সর্ব্বজ্ঞ তুমিও যে সর্ব্ব-শক্তিমাম ইহা অনুভব করিতে পারি না। অনুভব করিবার কি কোন উপায় আছে ?

আছে বৈকি। তুমিও দ্রষ্টা আমিও দ্রষ্টা। তুমিও চেতন আমিও চেতন। আবার তোমাকে আমি কখন ছাড়িয়া নাই। এক বিন্দু যখন সিন্ধুতে পড়ে তখন বিন্দুটি কোথায় যায় ? এক কণা অগ্নি যখন অগ্নিরাশিতে পড়ে তখন সেই কণাকে কি খুঁজিয়া পাওয়া যায় ? একটি রশ্মি যখন অনন্ত রশ্মির সহিত মিলিত হয় যখন কি এক আর অনন্ত এইরূপ পার্থক্য থাকে ? তুমি পূর্ণ তুমি সর্ব্বদাই দেখিতেছ তুমি ভিন্ন কিছুই নাই। তুমি জানিতেছ "আমি" ও সেই পরিপূর্ণ "তুমি।" কিন্তু "আমি" কি এক কুহকে যেন ভাবিতেছি আমি অল্পজ্ঞ, আমি ক্ষুদ্র, আমি অল্পশক্তিবিশিষ্ট। আমার এই ভ্রম ঘুচাইবার জন্য তুমি ব্যবস্থা করিয়াছ—তুমি বলিয়াছ সাধনা করিতে। সাধনা করিতে

হইবে (১) আমি তোমার (২) তুমি আমার (৩) আমি ও তুমিও এক।

এই সাধনাটা ভাল করিয়া বলিবে?

শুন। ভক্তি কর সমস্ত বুঝিবে। আমি যাহা বলিতেছি তাহাত ধারণা করিতে পারিয়াছ?

যাহা ধারণা করিয়াছি তাহা একবার বলি—তুমি সৎ, তুমি দ্রষ্টা তুমি চৈতন্য। আমিও চেতন। সতের সঙ্গে যখন আমি থাকি তখন সৎই হইয়া যাই। সৎস্বভাব পাইয়া দেখি যে তুমি এক দণ্ডও আমায় ছাড়িয়া থাক না। ওতপ্রোত ভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আছ। তুমি সর্ব্বদা আমাকে সঙ্গে করিয়াই আছ। তবু আমি মনে করি কখন তুমি দেখা দাও কখন দাও না। যখন দেখা না দাও—সঙ্গে আছ তবু মনে হয় দেখা পাইনা—যখন তোমার বিরহে আমি ব্যাথা পাই, তখন বিরহে বিরহে তোমার সাধনা হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়া তোমার সাধনা করিতে হয়।

"আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"
"হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে"

ইন্দ্রিয় দ্বারা সেবা করিতে লোকে বলে। ইন্দ্রিয় অর্থে শক্তি। কর্ম্ম করিবার যে সমস্ত শক্তি আছে তন্মধ্যে যে শক্তি দ্বারা হস্ত পদ এবং বাক্য কর্ম্ম করে সেই শক্তি গুলিই, প্রধান।

তীর্থ পর্য্যটনে হস্ত পদ বাক্যের কার্য্য অনেক হইয়াছে। কত স্তবস্তুতি, কত পূজার দ্রব্য সম্ভার, কত আহারাদি সেবা। এই সমস্ত কার্য্যই যে শক্তি তাহা নহে। শক্তির বিকাশের নাম কার্য্য। এখন আমি স্থির হইয়া বসিয়া আছি এখন সে সমস্ত কার্য্য নাই। কিন্তু যে শক্তির বিকাশে ঐ সমস্ত কার্য্য হইয়াছিল সে শক্তি এখনও আছে। আমি যখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকি তখন যে শক্তি দ্বারা মন হস্তকে তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে নিযুক্ত করে, যে শক্তি দ্বারা মন চরণকে তোমাকে প্রদক্ষিণ করিতে বলে, তোমার

সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বলে, তোমার পাদোদক গ্রহণ করিতে বলে, তোমার প্রসাদ ভক্ষণ করিতে বলে, যে শক্তি দ্বারা তোমার সঙ্গে কত কথা কয়—সেই সমস্ত শক্তি হস্ত, পদ ও বাক্য দ্বারা কর্ম্মরূপে পরিণত হয়। যখন আমি তোমার বিরহে জ্বলি পুড়ি তখন হস্ত পদাদিতে শক্তি থাকে না। থাকে বাক্য। তুমি আমার হৃদয় গুহায় শয়ন করিয়া আছ, তুমি আমার অন্তর্যামী, তুমি আমার অন্তরে রহিয়াছ তোমার সহিত কথা কহার যে কত সুখ তাহা আমি জানিয়াছি। যে সে সুখ জানিয়াছে সে তোমার সঙ্গে এক দণ্ডও কথা না কহিয়া কি থাকিতে পারে? তোমায় ছাড়িয়া অপর লোকের সহিত কথা কহিতে সে ত রাজী হয় না। অভ্যাসবশতঃ অপর ব্যক্তি বা বস্তুসম্বন্ধে কথা কহা ত ব্যভিচার। কিন্তু কথা কহা মানুষের বড় প্রিয় হয়, যদি বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলিকে বন্ধ করিলেও মন ভিতরে বিষয় কথা কয়, যদি হস্তপদাদি রোধ করিলেও এই ভিতরের কথা বন্ধ না হয়, যদি ধ্যানে চিত্তকে একাগ্র না করা পর্য্যন্ত কথা বন্ধ না করা যায় তবে অত কঠিন করিয়া কথা রোধ করাও ত উচিত নহে। কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছে—ভাল ভুমিত হৃদয়ে—তোমার সঙ্গে কথা কহিতে কেহ নিবারণ করে না। তোমার সহিত কথা কহার কত সুখ। এই ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার সেবায় কত আনন্দ। ইহারই নাম ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষী-কেশের সেবা।

যাহারা বড় ব্যভিচারী তাহারাও কিছু দিন যদি অভ্যাস করে তোমার কথা ভিন্ন অন্য কথা কহা অভ্যাস অথবা তুমি ভিন অন্যের সহিত কথা কহা অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে। তাহারা অভ্যাসবলে মনকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করুক মন কাহার সহিত বা কাহার সম্বন্ধে কথা কহিতেছে? পুনঃ পুনঃ এইরূপ অভ্যাসে তোমার সঙ্গে ভিতরে কথা চলিবে। যাহা পড়ি এ যেন তোমায় শুনাইবার জন্য, যাহা লিখি এ যেন তোমারই কথা আমি নকল করি মাত্র। অথবা তোমার কথা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য বাহিরে আবৃত্তি করি। কারণ, তোমার কথা

একটিও আমি ভুলিতে পারি না—তোমার প্রত্যেক বাক্য আমার হৃদয় স্পর্শ করে, তোমার প্রত্যেক বাক্যেই যেন তোমার হৃদয় মাখান থাকে, তোমার প্রতি বাক্যই যেন মূর্ত্তিমান। আমি তোমারই কথা তোমায় শুনাইয়া বড় সুখ পাই। আমি যখন নির্জ্জনে বসিয়া তোমার কথা পাঠ করি, পাঠ করিতে করিতে শূন্য মনে শূন্যপানে চাহিয়া দেখি তুমি শুনিতেছ কি না? শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে না পারিলে বড় কাতর হইরা বলি "গুরো! বুঝাইয়া দাও"। আমার বুদ্ধি নির্ম্মল করিয়া দাও। তুমিই ত বুদ্ধিরূপিনী "সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে" তুমি জান সব তুমি দেখ সব তথাপি তোমায় সব বলিতে, সব দেখাইতে ইচ্ছা করে। সর্ব্বদা যখন তোমার সঙ্গে কথা চলে তখন কত সুখ অনুভব করি। অপর লোকে আমার সঙ্গে কথা কয় আমি দেখি তুমি কত প্রকারের সাজ পরিয়া ঐ সমস্ত লোক সাজিয়া একটু মুখসের মুখ হইতে কত কি বাহির করিতেছ। আমি কিন্তু আমার প্রাণের কথা ঐ সমস্ত মুখসের ভিতরে যে স্থির তুমি রহিয়াছ সেই ভিতরকার তোমার সহিতই কহিতেছি। কাজেই মুখস কি বলে সব সময়ে লক্ষ্য করিতে পারি না, তাহা সকল সময়ে শুনিতেও পাই না। অথবা এক কর্ণ দিয়া কথা প্রবেশ করে কর্ণান্তর দিয়া বাহির হয়। আবার দেখ আমি কত কথা যেন শুনাইতেছি—শুনাইতে শুনাইতে চুপ করিয়া যাই—দেখি একটা বৃক্ষ সাজিয়া তুমি রহিয়াছ, নিস্পন্দকায়ে বড় স্থির হইয়া আমার অন্তরের অন্তস্তলে যে কথা হইতেছে তুমি তাহা শুনিতেছ। সাগর-সঙ্গমে নদী যেরূপ কুল কুল শব্দে বেগে ধাবিত হয় কিন্তু মিশিতে পারিলে আর শব্দ থাকে না; আর সাগর গম্ভীর হইয়া নদীর ঐ ভাষাহীন ভাব অনন্ত হৃদয়ে লুকাইয়া রাখে। আমারও তাহাই হয়। সত্য কথা, যখন আত্মদর্শন লাভ হয়, তখন আর কথা থাকে না, যত দেখি ততই দেখি, কি দেখি তাও জানি না। কত সুন্দর তুমি— দর্শনে কথা থাকে না। ইহাকেই ধ্যান বলে। যখন 'দেখা না পাই

তখনই কথা কই। কথা কহিতে কহিতে কখন তোমায় দেখা দিতে হয়। তুমি চন্দ্র হইয়া শোন; আকাশ হইয়া দেখ। যা দেখি তাই তুমি মনে হয়। আমার প্রার্থনা তুমি যে শুনিতেছ আমি যাহা চিন্তা করি—আর কি করিব তুমি ভিন্ন অন্য চিন্তা করিতে ইচ্ছা যায় না—যখন হঠাৎ অন্য চিন্তা হয় তখন বড়ই ধিক্কার আইসে, তোমা ভিন্ন অন্য চিন্তা করাই ব্যভিচার। আমি যাহা মনে মনে করি সমস্ত তুমি জানিতেছ, শুনিতেছ, দেখিতেছ এইটি যখন অনুভব করি তখন চিত্ত বড়ই প্রসন্ন হয়। তবুও তোমায় দেখিতে পাই না—কোথায় লুকাইয়া তুমি রহিয়াছ? শুনি তুমি বাহিরের বস্তু নও, অন্তরের অথবা তোমার সম্বন্ধে অন্তর বাহির নাই, সবই তুমি সাজিয়া আছ, অন্তর বাহির কোথায়? তথাপি ভিতরেই তোমাকে ধরিতে হয়। চিত্ত অন্তর্মুখী হইলে অল্পে অল্পে তোমাতে চিত্ত একাগ্র হইতে চায়, পরে বড় আগ্রহে চিত্ত অন্তর্দ্দেবের অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রবণ মননাদি দ্বারা দর্শন লাভ করে। ইহা জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার অনুশীলন। ভক্তি যোগে সাধনা দ্বারা আমি তোমার অতিক্রম করিয়া তুমি আমার হইলেই সে তুমি আমি সমান করিয়া লয়।

ভক্তের ভালবাসা।

কি সুধাময়, কি অমৃতময় জীবন ভক্ত জনের! মনে হয় এত সুখ বুঝি আর কোন জীবনে নাই—মনে হয় এত আনন্দ বুঝি আর কোন জীবনে হইতে পারে না। কোথাও বিরোধ নাই—ইষ্ট অনিষ্ট, শত্রু মিত্র, তিরস্কার পুরস্কার সমান হইয়া গিয়াছে। কোথাও উদ্বেগ নাই—সম্পদে বিপদে, রাজদ্বারে শ্মশানে, লাভে অলাভে একই ভাব, একই আনন্দ। সর্ব্বদাই সুখ।

এত সুখ, এত আনন্দ কিসে হয়? কাকে দেখিয়া এই আনন্দ সমভাবে থাকে?

ভক্তের সুখ ভাল বাসিয়া। বেশ করিয়া দেখ বুঝিবে ভালবাসাই সুখ।

বলিতে পার ভালত একদিন সকলেই বসিয়াছিল বা বাসিতেছে বা বাসিবে। সুখ ত থাকিল না। ভক্তের সুখ না চিরদিনই থাকে? ভক্তের ভালবাসা কি রকম যাহাতে চিরদিন এই সুখ থাকে?

ভক্তের ভালবাসা কোন কিছুর জন্য নহে। তোমার আমার ভালবাসা কোন কিছুর জন্য—তোমার আমার ভালবাসা প্রতিদান চায়, তোমার আমার ভালবাসার হেতু আছে। ভক্তের ভালবাসার হেতু নাই, ইহা অহেতুকী। কোন কিছু চাই না, কোন কিছুর আশা রাখিনা, শুধুই ভালবাসি—এই ভালবাসা ভক্তের।

কিরূপে এই ভালবাসা হয়? ঠিক বলা যায় না কিরূপে হয়। তথাপি যদি বলিতে বল তবে বলি—যারেই কেন ভালবাসনা—যদি সর্ব্বত্র সে আছে এইটি বিশ্বাস করিতে পার তবেই ভক্তের ভালবাসা পাও।

এই ভালবাসার বস্তুটি শ্রীভগবান্। কোথায় তিনি নাই? আকাশে সমুদ্রে, পর্ব্বতে নদীতে, বৃক্ষে লতায়, ফলে পুষ্পে, প্রস্তরে পাষাণে, পক্ষীতে পশুতে, মানবে দেবতায় কোথায় সে নাই? যারে অন্তরে ভাবনা করি, তারে বাহিরে সকল বস্তুর মধ্যেও যদি ভাবনা করি তবে ভক্তের ভালবাসায় পৌঁছান যায়।

যেমন করিয়াই ভালবাসা উৎপন্ন হউক না কেন, যদি তাহা কোন কিছুর জন্য না হয়, তবে সে ভালবাসা আর যায় না। কোন কিছুর জন্য হইলে তাহা কলঙ্কিত হইয়া চটিয়া যায়। তথাপি ভালবাসা এত ভাল যে কোন কিছুটা না চাওয়া যখন আবার হয়, তখন আবার পবিত্রতা ধারণ করে। আবার ভালবাসা আসে—আর চিরদিন থাকে। ইহার জন্য, তাহার জন্য শ্রীভগবান্‌কে ভালবাস, সে ভালবাসা থাকিবে না

না। শুধু শুধু ভালবাস—আর কোন কিছু ভালবাসার নাই বলিয়া ভালবাস—দেখিবে তুমি ভক্তের ভালবাসায় পৌঁছিয়াছ।

যে ভালবাসায় কোন কিছু চাওয়া আছে তাহা প্রবৃত্তিমার্গের ভালবাসা। এ ভালবাসা কলঙ্কিত। ইহা কাম। ইহা প্রেম নহে। প্রবৃত্তিমার্গের হইলেও এটা ভালবাসা বটে। ইহা হইতে খণ্ড ভাবটা যদি ছুটাইতে পার তবে ভালবাসাই যে ভগবান্ তাহা বুঝিতে পারিবে।

খণ্ড ভাবটা কি না শুধু একটি স্থানে এই ভালবাসাটি আবদ্ধ এইটি মনে করা। ভালবাসাটি ভগবান্—আর ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন এইটুকু মানিয়া লও। এইটি সত্য কথা। আত্মা রসময়, আত্মা আনন্দময়—সেখানে চৈতন্য সেইখানে নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যই জগতে সর্ব্বত্র। বস্তুতঃ তিনিই অন্য যা কিছু দেখ, তাহা যাহাই হউক না কেন। শ্রীভগবান্ সকলের মধ্যে, সকলের মূলে, তাঁহার উপরেই অন্য সমস্ত খেলা করে। তুমি যদি এইটী মনে রাখিতে পার আমার ভগবান্ কোথায় নাই—তিনি শত্রুতে মিত্রে,—তবে বল আর কি তোমার শত্রু মিত্র থাকে? যে তিরস্কার করিতেছে তার মধ্যেও তিনি, যে পুরস্কার করে তার মধ্যেও তিনি। এই ভগবান্‌কে নিজে হৃদয়ে রাখিয়া ভালবাস, অন্যের হৃদয়েও তিনি আছেন ভাবনা করিয়া ভালবাস; জীবন মধুময়, অমৃতময় হইয়া যাইবে, কোথাও বিরোধ আর থাকিবে না।

শুদ্ধ চিত্ত ভালাবাসার স্থান। অশুদ্ধ চিত্তে ভালবাসা থাকে না। চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ভালবাসা হইতে সঙ্কীর্ণতা দূর হয় না।

চিত্তশুদ্ধি কার নাম? যে চিত্ত এইটি ভাল, এইটি মন্দ দেখে না, এইটি ইষ্ট এইটি অনিষ্ট বোঝে না, এইটি লাভ এই অলাভ গণেনা তাহাই শুদ্ধ। যে চিত্তে অনুরাগ ও দ্বেষ নাই তাহাই শুদ্ধচিত্ত। সকলের মধ্যেই আমার শ্রীভগবান্ আছেন ইহা দেখিলে আর রাগ দ্বেষ কাহার উপর করিবে? বালকে বৃদ্ধে, পুরুষে প্রকৃতিতে, শত্রুতে মিত্রে, সুন্দরে কুৎসিতে—সর্ব্বত্র যে সেই কোথায় দাঁড়াইয়া রাগ দ্বেষ

করিব? সর্ব্বত্র সে আছে ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারিলে তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি জন্য সহজ উপায় কর্ম্ম করা।

কর্ম্ম করিয়া কখন সুখ পাইয়াছ? যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার জন্য কর্ম্ম করায় বড় সুখ। শুধু কর্ম্ম করা কেন তাহার জন্য কষ্ট করাতেও সুখ আছে।

কর্ম্ম করায় বড় ক্লেশ সবাই বলে। ভালবাসিয়া কর্ম্ম করে না তাই ক্লেশ হয়। নতুবা কর্ম্মও সুখের।

এই সুখের জন্য দুই প্রকার উপায় আছে। শ্রীভগবানের নাম-রূপ হৃদয়ে রাখ—তাহা জপ কর ধ্যান কর—এইটি মানসিক কার্য্য। কিন্তু বাহিরে যদি তাহার জন্য সেবারূপ কর্ম্ম না কর তবে শুধু মনের কর্ম্ম করিতে তুমি সমর্থ হইবে না। অভ্যাস মত নাম জপ করিবে বা মূর্ত্তি ধ্যান করিবে, কিন্তু তোমার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিবে না। শুধু বৈদিক কর্ম্মে হইবে না, লৌকিক কর্ম্মে দ্বারা তোমার চিত্তকে প্রশস্ত করিতে হইবে—লোক সঙ্গে ভগবান্ আছেন স্মরণ করিয়া লোকসেবা করিতে হইবে, তবে তোমার ভালবাসার বস্তুটি যে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন এই অনুভবে তুমি আসিতে পারিবে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। গরীব দুঃখীকে খেতে দেওয়া—এটা আমাদের দেশে খুব প্রচলিত, বিশেষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে। কিন্তু বড় মানুষ লোকে মনে করে আহা! গরীব মানুষ উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায় না, তাদের আহার দিলে তারা বড় সন্তুষ্ট হইবে। যদি এই ভাবিয়া আহার দাও তাতে তোমার বেশী কি হইল? গরীবকে এক দিন আহার দিয়া তুমি তার কোন্ দুঃখ দূর করিলে? কিন্তু যদি ভাব আমার ভগবান্ ইহাদের মধ্যেও আছেন, গরীব বড় মানুষ সবার ভিতরেই তিনি, আমি এই ভাবে আজ ভগবান্‌কে সেবা করিতেছি তবেই তোমার হৃদয় প্রসারিত হয়। নতুবা তুমি গরীবের উপর দয়া করিতেছ এই অহং বোধে তোমার অনিষ্টই হয়, গরীবেরও বিশেষ উপকার তোমার দ্বারা হয় না।

ভক্ত হইয়া নিজের হৃদয়ে জপ ধ্যানে ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে সচেষ্ট হও, আবার সর্ব্বলোকের জন্য কর্ম্ম করিয়া সর্ব্বহৃদয়স্থ ভগবান্‌কে সেবা কর তুমি কর্ম্মেও সুখ পাইবে, ধ্যান জপেও রস পাইবে। আর কর্ম্মটি বাদ দাও তোমার জপ ধ্যান তোমার চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারিবে না—তুমি রস পাইবে না বলিয়া প্রকৃত জপ ধ্যান রাখিতেও পারিবে না।

স্বামী বা গুরু যদি তোমার ভালবাসার বস্তু হয়, আর যদি তুমি জীবনকে আনন্দময় করিতে চাও, তবে জপ ও ধ্যান দ্বারা স্বামী গুরু বা ইষ্ট দেবতাকে ভিতরে স্পর্শ করিতে যত্ন কর, বাহিরে কখন স্পর্শ করিও না, বাহিরে শুধু সেবা করিয়া যাও, তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত কর, রন্ধন কর, সকল কার্য্য কর। স্বামী, গুরু বা মন্ত্র তিনই এক, তিনই শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্‌ই সর্ব্ব জীবে সর্ব্ব বস্তুতে আছেন ভাবিয়া সর্ব্ব জীবের জন্য কার্য্য কর। পরে তোমার কর্ম্মও থাকিবে না। ভিতরে সর্ব্বদা সঙ্গ করিয়া তুমি ধারণা ধ্যান সমাধিতে স্থিতি লাভ করিবে। তোমার জীবন মধুময় হইয়া যাইবে। ভিতরে ব্রহ্মচর্য্য আসিবে, তখন শ্রীভগবান্ বাহিরে যাহা করান তাহাই আনন্দ!

চিত্তশুদ্ধি হইয়া গেলে যখন সর্ব্বজীবে সে আছে অনুভবে আসিবে, যখন নিজের হৃদয়ে তাহাকে দেখিবে, তখন তুমি কি হইবে একবার ভাব দেখি? এই হইলে তোমার ভালবাসা পূর্ণ হইবে।

যে ভালবাসিয়াছে কতসুখ তার! যারে ভালবাসি তারে সাজাইয়া সুখ, তার জন্য সাজিয়া সুখ। তারে খাওয়াইয়া সুখ, তার জন্য খাটিয়া সুখ। তারে দেখিয়া সুখ, তারে দেখাইয়া সুখ, তারে সেবা করায় সুখ; তার সেবা লওয়ায় সুখ। তার জন্য কাঁদিয়া সুখ, তারে কাঁদাইয়া সুখ—দুঃখ আর থাকে না, সবই সুখ হইয়া যায়।

লোকে বলে যে ভালবাসা পায় তার সুখ নাই, যে ভালবাসে সেই সুখ পায় কথাটি ভুল। ভগবানকে ভালবাসিয়া ভক্তের সুখ যত ভক্তের ভাল

বাসা পাইয়া ভগবানের সুখ তদপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক। সাধুর মুখ হইতে ভগবানের কথা শুনিয়া সাধকের যত সুখ, সাধুর সুখ তদপেক্ষা অনেক বেশী—যদি জড়বস্তুর সুখ জানিতে মানুষ সক্ষম বলা যায়, তবে বলিতে পারা যায় মধু পান করিয়া ভ্রমরের যত সুখ মধু দান করিয়া পুষ্পের সুখ তদপেক্ষা কোটী গুণে অধিক।

হিন্দুর জাতিভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কাজেই জাতিভেদ যে জন্মজন্মান্তর হইতেই অবাধে নিরন্তর চলিয়া আসিতেছে তাহাতে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইদানীং ভগবদ্ বচনস্থিত গুণকর্ম্মবিভাগশঃ কথাটি দেখিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন ভগবান্ গুণকর্ম্ম বিভাগ অনুসারেইত জাতিভেদের পুষ্টি করিয়াছেন। ইহজন্মে যে যেমন উচ্চ করিবে সে সেইরূপ উচ্চ গতি হইবে আবার যে যেমন নীচকর্ম্ম করিবে সে সেইরূপ নীচ জাতিতে পরিণত হইবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্তই ভ্রমাত্মক ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তাহা পরমারাধ্য পরম পূজনীয় পণ্ডিত বর অতি সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। সকল শাস্ত্রের সামঞ্জস্য দ্বারা প্রকৃত অর্থ নিরূপণে তিনিই যে একমাত্র অদ্বিতীয় এমন কথা বলিলে বোধ হয় না। সেই অশেষীয়মান্ পরম পূজ্যপাদে অতি বিচক্ষণ পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয়ই নানা শাস্ত্রীয় বচনের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দ্বারা দেখাইয়াছেন— মহাভারতের অন্তর্গত গীতাতে যে চাতুর্ব্বর্ণং ময়াস্হষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ আছে তাহার ব্যাখ্যা মহাভারতের সৌপ্তিক পর্ব্বে স্পষ্ট হইয়াছে।

প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্টাক্রর্ম্মতাসু বিধায় চ।
বর্গে বর্গে সমাধস্ত হেকৈকংগুণভাগগুণম্॥

প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের কর্ম্ম বিধান করিলেন এবং বর্ণে বর্ণে একৈকগুণ সমর্পণ করিলেন। তাহা হইলে গুণকর্ম্ম বিভাগ অনুসারে তিনি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু গুণকর্ম্ম বিভাগ সহকারে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন অথার্থ চতুর্ব্বর্ণ ও তাহাদিগের গুণকর্ম্ম তাঁহারই সৃষ্ট (পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয়ের অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত)॥ তাহা হইলে দেখা গেল গুণকর্ম্মবিভাগশঃ কথাটী কিছুতেই জন্মগত জাতির বিশুদ্ধ পরিচায়ক নহে, উহা জন্মগত জাতিরই উজ্জ্বল পরিচায়ক বটে। তবে মহাভারতে যে শূদ্রেতুযৎ ভবেৎ লক্ষণ দ্বিজেতচ্চ ন বিদ্যতে। নবে শূদ্রো ভবেচ্ছুদ্রোব্রোহ্মাণো নচ ব্রাহ্মনঃ এমন বচন দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অর্থ এইরূপ নহে যে, এই লক্ষণ যদি শূদ্রে থাকে তাহা হইলে তিনি শূদ্র নহেন, আর এই লক্ষণ যদি ব্রাহ্মণে না থাকে তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। ইহার প্রকৃত মীমাংসা পরমারাধ্য পরমপুজনীয় তর্করত্ন মহাশয়ই সুন্দর করিয়াছেন। তিনি নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণের সামঞ্জস্য দ্বারা এই মীমাংসা করিয়াছেন যে এই লক্ষণ যদি শূদ্রে থাকে তাহা হইলে তিনি শূদ্র নহেন, এই লক্ষণ যদি ব্রাহ্মণে না থাকে তিনি ব্রাহ্মণ নহেন—এই উক্তির মধ্যেই দুই প্রকার শূদ্র ও দুই প্রকার ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণ যদি শূদ্রে থাকে এ স্থানে শূদ্র অর্থে জাতি শূদ্র। এই লক্ষণ যদি ব্রাহ্মণে না থাকে এ স্থলে ব্রাহ্মণ অর্থে জাতি ব্রাহ্মণ। তিনি শূদ্র নহেন, এ স্থলে চরিত্রে শূদ্র নহেন এইরূপ অর্থ বুঝিতে হয়, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন এ স্থলেও চরিত্রে ব্রাহ্মণ নহেন—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হয়; কেন না একই বস্তু বিরুদ্ধ ভাবে উপবিষ্ট হইতে পারে না।

(পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ, তর্করত্ন মহাশয়ের
অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত।)

তবেই ইহার অর্থ এই দাঁড়াইল যে, যদি জন্ম শূদ্রে সত্যাদি সদ্গুণ থাকে তাহা হইলে তিনি চরিত্র শূদ্র নহেন, কিন্তু জাতিতে শূদ্রই বটেন।

আর যদি জন্ম ব্রাহ্মনে সত্যাদি সদ্‌গুণ না থাকে তাহা হইলে তিনি চরিত্রে ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু জাতিতে ব্রাহ্মণই বটেন। এইরূপ অর্থইত সুসঙ্গত ও ত্যজ্জীব সমাচীন। অধুনা বাবুর দল মনঃকল্পিত ভ্রান্ত অর্থ দ্বারা কেবলই খিচুড়ি পাকাইতেছেন মাত্র; এখনও যার মনে যা খুসী তিনি তাই লিখিয়া শাস্ত্র বিপ্লব ঘটাইতেছেন। ইহা কি সমাজের পক্ষে উন্নতির পরিচয় না অধঃপতনের লক্ষণ?

কিন্তু যিনি যাহাই বলুন না কেন ভারতের জাতিবর্ণ ভারতের ব্রাহ্মণ সেই অনাদি অনন্তকালেরই, অধুনাতন কালের কিছুতেই নহে। ভারতের জাতিবর্ণ ভারতের ব্রাহ্মণ যে কত যুগযুগান্তর হইতে এই সনাতন হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার কি আর সীমা আছে? প্রত্যুত অনাদি অনন্তকাল হইতেই ব্রাহ্মণ এই সনাতন ভারতে অবস্থান করিতেছেন। এই ব্রাহ্মণ যে কত কালের তাহা কেহ গণনায় স্থির করিতে পারেন কি? এই ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ মহিমা কি এক কথায় বলিয়া শেষ করা যায়? তারপর আরও একটী কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। রামচন্দ্র স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ হইয়াও কেবল শাস্ত্রের আদেশে নিত্যকর্ত্তব্য বোধেই সায়ংসন্ধ্যারও জাতি বিচার প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কার্য্য পালন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাও তাঁহার সনাতন শাস্ত্রের প্রতি অগাধ ভক্তি বিশ্বাসের এবং সুন্দর প্রমাণ পরিচয়। তিনিও যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতই পদে পদে শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন ইহাও তাহার এক বিশিষ্ট ও বলবৎ প্রমাণ। এমন কি যিনি গুহক চণ্ডালের ভক্তিপূত প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রী পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিয়া তৎসমস্তই ফিরাইয়া দিয়া অবাধে ও অম্লান বদনে বলিলেন—যদ্বিদং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রীত্যা সমুপকল্পিতম্। সর্ব্বংতদনুছানামি নহিবর্ত্তে প্রতিগ্রহে॥ সুতরাং ইহার চেয়ে আদর্শধর্ম্মপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কিছু আছে বা হইতে পারে কি? আমাদের আধুনিক বাবুরা এ বিষয় কি বলেন? ইদানীন্তন বাবুদের অনেকেইত আমাদের ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে এবং ভগবান্

রামচন্দ্রকে ব্রাহ্মোর দলে ফেলিয়া জগাখিচুড়ি পাকাইতে চাহেন; তাঁহাদের গরজ বড় বেশী কি না! তাহা না হইলে যে তাঁহাদিগের ছত্রিশ জাতের সঙ্গে একত্র হইয়া এক সানকিতে খাওয়া লওয়া চলিয়া উঠে না। কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বদাই রাখা উচিত যে হিন্দুর জাতি বর্ণ যতকিছু সমস্তই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিজ্ঞান সম্মত; তানা হইলে সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্ কথাটী কি প্রাচীন ঋষিগণ শাস্ত্রে উল্লেখ করিতেন? ইহাত ভগবান্ কপিল দেবেরই উক্তি। যিনি সাংখ্যদর্শনে নানা বিচার বিশ্লেষণ ও অপূর্ব্ব গবেষণাদ্বারা স্থির করিলেন ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু তিনি প্রমাণে অসিদ্ধ; যিনি স্বীয় প্রমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে একান্ত নারাজ, তাঁহার ঈশ্বর গবেষণা প্রসূত সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্ কথাটী কি কখনও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া পারে? যিনি নিজ প্রমাণের দ্বারা কোথাও ঈশ্বর খুঁজিয়া পাইলেন না, তিনিই কি না আবার প্রমাণের দ্বারা স্থির করিলেন, জাতিভেদই সৃষ্টির কারণ এবং একাকারই ধ্বংসের কারণ; সুতরাং ইহাও কি বিশেষ ভাবিবার কথা নহে? বাস্তবিকই জাতি, বর্ণ, যে চির সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত ও বিজ্ঞানসম্মত তাহা আর কিছুতেই অস্বীকার করিবার যো নাই। (ক্রমশঃ)

পুরী সাগর তট।

পুরী প্রবাস হইতে

সংসারে কারু সঙ্গে কারু মিল নাই অথচ অনেকের সঙ্গে অনেকের মিল আছে, তা না হলে আমরা মিলিলাম কি প্রকারে! কতকগুলি লোক কেমন মিলিয়া মিশিয়া থাকে—কোন্ কর্ম্মফলে, কোন ঘটনা-স্রোতে ফেলিয়া কে তাহাদিগকে মিলায়। এত

মেলা মেশার মাঝেও কেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—বুঝি, যখন সব মিলিয়া এক হইয়া যায়, যখন সব স্বাধীন চিন্তার লোপ হয় তখন সৃষ্টিলোপ হয়; নতুবা, সৃষ্টি লোপ সম্ভবে না। কৈলাশ-খণ্ডে হরপার্ব্বতীর মিলনে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল—শিবের শবত্ব ঘুচাইবার জন্য প্রকৃতির সেই তাণ্ডব নৃত্যে ব্রাহ্মাণ্ড বিকম্পিত হইয়াছিল; বৃন্দাবনে সৃষ্টি-লীলার চরম পরিণতি—পুরুষ প্রকৃতির সহিত মিলনাভিলাষে আত্মহারা—উথলিল প্রেমসিন্ধু—যমুনায় উজান বহিল দুকুল ভাসিয়া জগত প্লাবিত করিল; পুরীক্ষেত্রে ইহার শেষ অঙ্ক। এখানে প্রকৃতি পুরুষের বামে স্থান পান নাই—তিনি এখন সৃষ্টিসংহার অভিলাষী—এখানে পুরুষ সকল হৃদয় এক করিয়া গাঁথিবার চেষ্টা করিতেছেন, সমুদ্রের বে ভূমিতে ছোট বড়, উচ্চ নীচ সকলকে একত্র করিয়া সাম্যে সংস্থিত করিতেছেন। সমুদ্রের বিশালতা দেখিয়া কে না নিজের ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করে, এখানে আসিয়া কার মন মহতো মহিয়ানকে খোঁজে; কেনা ইহার গম্ভীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়—সমুদ্র দেখিয়া মুগ্ধকবী গাহিয়াছিলেন—

> দূরাদয়শ্চক্রে নিভস্যতন্বী তমালতালী-বনরাজিনীলা।
> আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

এ সৌন্দর্য্যের কাছে সব সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়, সব ঐশ্বর্য্য ধুলায় লুণ্ঠিত হয়। যাহার গড়া প্রকৃতি এত সুন্দর সে না জানি কত সুন্দর! মন অনন্ত বিস্তৃত বালুকাস্তুপের মধ্য হইতে প্রত্যেক বালুকা-কণা তুলিয়া তুলিয়া সেই সৌন্দর্য্যাধরকে খুঁজিতে থাকে।

এখানে না হইলে পুরুষোত্তমের পুরী কোথায় নির্ম্মিত হইবে? এমন না হইলে কে তাঁকে পুরুষোত্তম বলিত?

এ হেন পুরুষের পুরীতে সস্ত্রীক প্রবেশ করিয়াছিলাম—দুজনে মিলিয়া এক হইবার আসায় একত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সমভাবাপন্ন, হইবার আসায় একত্র হইয়াছিলাম, মনে হইতে লাগিল যে, এখানে বুঝি সব এক হইয়া যায় তাই প্রিয়জনকে সঙ্গে লইয়াছিলাম। কিন্তু এক হওয়া হইল কৈ?

নিয়তির বশে আবার আমাকে ফিরিতে হইল। স্পর্শ মণির স্পর্শে সব সোণা হইয়া যায় কিন্তু সে বুঝি বাহ্যিক স্পর্শে নহে, যুগ যুগান্তরের সাধনা চাই, অন্তরে অন্তরে মেলা চাই, মনের লয় বিক্ষেপ ঘোচান চাই, মন নাশ করা চাই। এই মন সেই বিশালতার কল্পনা করিতে পারে না, সান্ত মন লইয়া অন্তরের অধিকারে প্রবেশ করা যায় না। মনকে বিশালতা বুঝাইবার জন্য তিনি সমুদ্রকে বিশাল করিয়াছেন, আকাশকে বিশাল করিয়াছেন। অফুরন্ত জল রাশিকে অনন্ত বিস্তৃত আকাশের সহিত মিশাইয়া এক করিয়াছেন। সূর্য্য সমুদ্র হইতে উঠিয়া সমুদ্রেই ডুবিতেছেন। চন্দ্র সূর্য্য একই আকাশে, একই সময়ে থাকিয়া নীল জলোর্ম্মিমালা লইয়া খেলা করিতেছেন। এমন মেশামিশি দেখিয়া কার না অনন্তে মিশিতে ইচ্ছা হয়—ইচ্ছা হয় বটে সাহসে কুলায় কৈ? তট-ভূমিতে তরঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া ভয় হয়, হইবারই কথা। কিন্তু তরঙ্গ তট দেশেই, দূরে সব স্থির, ধীর, শান্ত—উপরে যাহা কিছু দেখ ভিতরে আরও স্থির ও গম্ভীর। এই স্থির গম্ভীর নিসঙ্গ স্থানে অন্তরের সহিত ঐকান্তিক মিলন হয়। আমি কি সে মিলনের অধিকারী? মন সতত বাহিরে ছুটিতেছে, রূপের জন্য ছুটিতেছে, রসের জন্য ছুটিতেছে, গন্ধের জন্য ছুটিতেছে, শব্দের জন্য ছুটিতেছে—বাহিরের প্রবাহে পড়িয়া সে অহর্নিশ ভাসিয়া চলিয়াছে—চঞ্চল প্রবাহে সে সতত চঞ্চল, ভিতরে যে কি আছে তাহার দেখিবার অবসর নাই, সে দিকে তাহার লক্ষ্য নাই—এই মন লইয়া কি শান্ত স্থানে পৌছন যায়, ইহাকে

লইয়া কি অনন্তে মিশিয়া যাওয়া যায়? কখন না—মনের ছুটা-ছুটি থামাইতে হইবে, মনকে শান্ত করিতে হইবে তবে শান্তি পাওয়া যাইবে।

পুরীক্ষেত্র অপূর্ব্ব, পুরী অপূর্ব্ব, এখানে না হলে কোথায় পুরুষোত্তম সাক্ষাৎ সম্ভবে! পুরী প্রবেশ কালে হৃদয় ভাবে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। প্রবেশ দ্বার হইতে দেখি সেই নিভৃত গুহাগর্ভে পুরুষোত্তম। গুহাগর্ভে তাঁহার স্থান, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই—রোদ, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত, সংসারের কলরব হইতে দূরে নিভৃতে নির্জ্জন প্রদেশে ভিন্ন কোথায় তাঁহার অব-স্থান হইবে?—হৃদয়ের অন্তস্তলেই তিনি বাস করেন। অন্ধকারে চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টিকে অভ্যস্থ করিতে হইবে, সৌৎসুকে চাহিয়া থাকিতে হইবে, অনন্যমনে অনন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে হইবে তবে দর্শন মিলিবে। তোমাকে দেখা দিবার জন্য তাঁহার বিরাট তনু ক্ষুদ্র করিয়াছেন, তোমারই জন্য তিনি পুরী প্রবেশ করিয়াছেন, তোমরাই গড়া সিংহাসনে বসিয়াছেন নতুবা তুমি তোমার ক্ষুদ্র প্রদীপের ক্ষীণালোকে কতটুকু দেখিতে পাইতে! তথাপি দেখ ক্ষুদ্র হইয়াও কত বিশালায়তন। গোলাকার তাঁহার দুই চক্ষু চন্দ্র সূর্য্যের মত কত বড়। আশে, পাশে, পশ্চাতে চাহিও না—রোগ শোক, সুখ দুঃখ যাহা কিছু সঙ্গে আছে সব লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হও গুহাতলে উপনীত হও, চরণপ্রান্তে যাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা কর—চরণস্পর্শে তুমিও বিশাল হইয়া যাইবে—তোমার ক্ষুদ্রত্ব লোপ হইবে, তোমার ব্যক্তিগত হৃদয় বিকার অন্ত-র্হিত হইবে।

ক্ষণেকের তরে আত্মহারা হইলাম, জগত ভুলিলাম, আপনাকে ভুলিলাম—সে যেন এক কল্পনাতীত অবস্থা—কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য—আবার আমি আমার হইলাম। চাহিয়া দেখি সকলই যেন নিয়তির বশ—নিয়তি যে বিধির বিধান, ঈশ্বরের নিয়ম—

যতদিন •স্পষ্ট জগতের মধ্যে থাকিব ততদিন নিয়তি আমার নিত্যসহচর, যতদিন কল্পনা ভাবনা থাকিবে ততদিন নিয়তি থাকিবে। সর্ব্ববিধ ভাবনার পরিসমাপ্তিও নিয়তি। কিন্তু নিয়ন্তাকে না জানিলে নিয়তির এ পরিণতি বুঝি হয় না। নিয়তির বশ আমি, স্রোতের কুটা আমি, ছোট আমি, আমার বড় কথা ভাবিবার সাহস হইল না—সংসারে আপনাকে কত ক্ষুদ্র মনে করিলাম, কত অকেজো মনে করিলাম। সংসারে আমি যতই অকেজো হই না কেন, কাজেরও আমার অবকাশ নাই। আমার কোন্‌টা কাজ, কোন্‌টা অকাজ ভাবিবার সময় নাই এইজন্য সব কাজে আমি আছি এবং মনে করি আমি না হলে কোন কাজ চলিবে না। এই অহঙ্কার আমাকে নিয়ত কর্ম্ম করাচ্চে, কর্ম্মের চাপে আমাকে পিষে ফেল্‌ছে—একবার একটু নিশ্বাস ফেল্‌তে দেয় না, একবারও মুক্তবাতাসে আস্‌তে দেয় না—প্রকৃতির বিশ্রান্তকোলে স্থান পাইলে, পাছে আমি কর্ম্মের গুরুতর পীড়নটা অনুভব করিয়া ফেলি যাহা এর পূর্ব্বে ভাব্‌তে সময় পাইনে, পাছে বলি আমি কর্ম্মের বশে চল্‌বো না, কর্ম্মকে আমার বশে চালাবো। এই অহঙ্কারই আমার আমি—যত কেন ক্ষুদ্র আমি হইনা আমি একেবারে অকেজো হইতেই পারি না। আমার কাজ কি?—এই কাজের বিষয়ে আমাকে সাবধান হইতে হইবে। কেবল কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়া—কেবল প্রারব্ধ ভোগ করা—অতিরিক্ত কিছু করবো না—কর্ত্তা সেজে কাজ বাড়াবো না—শান্তিত চাই। যিনি আমার পথপ্রদর্শক তিনি বারাম্বার বলেন একজনের আদেশমত কার্য্য কর্‌ছি—একজনকে প্রসন্ন করিব বলিয়া কাজ কর্‌ছি এই ভাবতে পার্‌লে একটু বিশ্রাম পাওয়া যায়। সত্যকথা—কিন্তু তাঁর প্রসন্নতা লাভের জন্য আমি ব্যস্ত হবো তাঁকে ভালবাস্‌লে তবে নতুবা আমার ব্যস্ততা কিসের,—ব্যস্ততা আস্‌বে কেন?

এ ভালবাসা আমি শিখেছি কি? আমি আমার জন্য, আমার তৃপ্তির জন্য অনেক বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসি—যে ভালবাসা আমাকে ছাড়াইয়া যায় সে ভালবাসা আমার কৈ? আপ্ত বন্ধু তোমরা, আমার সুহৃদ তোমরা, তোমাদিগকে সেই সর্ব্বভূতের সুহৃদের সঙ্গে এক করে ফেল্‌তে পার্‌লে তবে না হয়। এই পুরীধামে এসে আকাশ পাতাল গ্রহ নক্ষত্র বালুকণার সহিত মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্চে তাই এত কথা লিখিলাম। জানিনা কি লিখিলাম, মনের কথার যে ভাষা নাই। যিনি বলিতে পারেন তিনিই বলিতে পারিবেন এই সুভক্ষেত্রে, সুভমুহূর্ত্তে ক্ষণকালের জন্য আমার হৃদয় স্পন্দন ছন্দমত হইয়াছে কি না? হইলেও ইহার স্থায়ীত্ব কোথায়? বা হয় কিসে? ঐ শুন কাতর কণ্ঠের আক্ষেপ—"জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই, যাই যাই কোথা কুল কি নাই!"—প্রবাসীর পত্র।

সমাজ সংস্কারকগণের প্রতি কয়েকটী কথা।

ইদানীং সমাজ সংস্কারকের দল ভারত ব্যাপিয়া পঙ্গপালের মত ছাইয়া উঠিল, ইহা কিন্তু হিন্দুর পক্ষে বড় আশঙ্কা ও আতঙ্কের কথা! সংস্কার শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কি সংস্কারকগণ তাহা আদৌ বুঝেন না। সংস্কার শব্দের প্রকৃত অর্থ পবিত্রীকরণ বা বিশুদ্ধকরণ। অর্থাৎ সমাজের মলিনতা দূর করিয়া সমাজের বৈশিষ্ট রক্ষা পূর্ব্বক প্রাচীন সমাজকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আনয়ন করার নামই সমাজ সংস্কার; কিন্তু সংস্কারকগণ যে ভাবে সংস্কার সাধনে উদ্যত হইয়াছেন তাহাত সংস্কার নহে, সংহারেরই নামান্তর। এইরূপ ভাবে সংস্কার কার্য্য ক্রমাগত চলিতে থাকিলে অচিরেই যে ভারতের হিন্দুসূর্য্য এই ভারত গগণ হইতে চিরতরে অস্তগত হইবে তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? সমাজ সংস্কার সোজা কথা নহে, সংস্কার সাধনটী বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া খুব সাবধানতার সহিত করিতে হয়, নতুবা হঠকারিতায় সমস্তই পণ্ড হইয়া পড়ে। আর এই ভারতে সমাজ সংস্কারত একবার হয় নাই বহুবারই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা যে হঠকারিতার সহিত কখনও হয় নাই পরন্তু বিশেষ সাবধানতারই সহিত হইয়াছে সনাতন শাস্ত্রইত তাহার একমাত্র উজ্জ্বল নিদর্শন। যখনই সমাজে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব এবং ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখন একমাত্র ভগবানই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সমাজের মলিনতা দূর করিয়া প্রাচীন সমাজের প্রাচীন ধর্ম্মকেই রক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু সমাজের বিশিষ্টতা ও গৌরব নষ্ট পূর্ব্বক

নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপনও শ্রীভগবানের আদৌ অভিপ্রেত নহে। আর যখন দেখা যাইতেছে শ্রীভগবানই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা পূর্ব্বক সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া থাকেন, তখন আর আমাদের মত সাধারণ মানবের সমাজসংস্কার করিতে যাওয়াত নিতান্তই ধৃষ্টতা ও বাতুলতার বিষয়। সুতরাং সমাজসংস্কার করা মুখের কথা বা যে সে কাজ নয়; তেমন অসাধারণ যদি কেহ জন্মগ্রহণ করেন তিনিই পারেন, আর কেহ নহেন। আর হিন্দুর শাস্ত্র ও হিন্দুর আচারের পরিবর্ত্তন করিয়া সমাজসংস্কার ত কোন দিনও হয় নাই এবং হবেও না; কারণ, হিন্দুর শাস্ত্র ও হিন্দুর আচার যে নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়, চির শাশ্বত সনাতন। ইহারই প্রমাণ স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ সুলেখক ভক্তিভাজন স্বর্গীয় ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল মহাশয়ই একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতেছেন—এখনকার দিনে স্বধর্ম্ম যেন কিছু ম্রিয়মাণ মত বোধ হইতেছে; এ ভাব থাকিবে না, অচিরে স্বধর্ম্ম আবার জীবন্তভাবেই প্রবিদৃশ্যমান হইবে। পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্ন—যাবতীয় জীবন্ত পদার্থেরই কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও জরা মরণ আছে, কেবল সনাতন ধর্ম্মেরই কি সেরূপ পরিণাম হইবে না? পুরাতন বলিয়াই কি মরিবে না? না, শীঘ্র মরিবে?

এই প্রশ্ন ভাবিবার বিষয় বটে। অনেকদিন ভাবিয়াছি ও ভাবিতেছি। প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল পিতৃদেব ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন; তার পর শত্রুমিত্র অনেকেই ঐকথা তুলিয়াছেন, আমিও আপন মনে ঐ কথা তোলাপাড়া করিয়াছি, তাহারই ফল লিপিবদ্ধ করিতেছি। সকল গাছইত বুড়া হইয়া মরিয়া যায়, কিন্তু বটবৃক্ষ ত মরে না। বটগাছ যৌবনে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই জটা ফেলিতে থাকে। জটাগুলি সমস্তই অভিনব মুল। দেখিবে, প্রাচীন মুল জীর্ণ হইয়া, কীট দষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চারিদিকে অন্য চারিটী মুল, এমন দৃঢ়ভাবে মাটিতে বসিয়াছে, যে তাহাতে বৃক্ষরাজ,

"গট হয়ে বসে যেন গাছের পাহাড়।" ভীষণ ভূকম্পে টলে, কিন্তু চলে না, প্রলয়কারী ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জন দশটা আশে পাশের শাখা ভাঙ্গিয়া নিজনামের গৌরব রক্ষা করেন, কিন্তু মূলগাছ অনড় অটল। আজকাল অনেক শিক্ষিত লোকেই পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী,—মনে করেন, ধর্ম্মে সমাজে, শিক্ষায় দীক্ষায় আচারে সকল বিষয়েই নিয়ত পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। সংসারের গতিই যেন কেবল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতেছে; পরিবর্ত্তন দ্বারাই সংসারের সকল পদার্থেরই যেন পরিস্ফুটন হইতেছে। এটি তাহাদের বিশ্বাস, কিন্তু—এটি একটি বিষম ভ্রমাত্মিক ধারণা। (সনাতনী হইতে উদ্ধৃত)।

তবে এ কথা ঠিক যে, সময় সময় প্রাচীন ঋষিগণ সমাজের অবস্থা বুঝিয়া সমাজের মঙ্গলের জন্য আবশ্যকমত সামাজিক বিষয়ের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেন বটে, কিন্তু তাহা তত সমাজের বিশিষ্টতা ও গৌরব বর্দ্ধিত ছাড়া কিছুমাত্রও কমিত না বা নষ্টও হইত না, কিন্তু এ কালে কি আর তেমন হবার যো আছে? এ যে বিষম কলিকাল, ঘোর কলিকাল!, এখনত বাবুদের অধিকাংশই স্বেচ্ছাচারী, এ যে বাবু প্রাধান্যেরই কাল! তাই বলিতেছি যে আচারনিষ্ঠ অপরিবর্ত্তনীয় চির শাশ্বত সনাতন; তাহার পরিবর্ত্তনের অধিকারী একমাত্র ঋষিগণই; আর কেহ নহেন। বাস্তবিক ঋষিগণ ছাড়া সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে এমন সাধ্য আর কাহারও নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এখনকার বাবু সংস্কারকগণ কি এক এক জন সেকালের ঋষি? পরন্তু এখনকার সংস্কারক বাবুর দলত কেবলই স্বেচ্ছাচারী ও অসংযমী; আবার তাহারাই কিনা সংস্কারের নামে সংহার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদেরই সনাতন আদর্শরীতি নিচয় একেবারে উঠাইয়া দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আস্পর্দ্ধারই কথা বটে! কেবল আস্পর্দ্ধা কেন ধৃষ্টতারও একশেষ! কিন্তু ভারতের জাতি, ভারতের বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, ভারতে বাল্যবিবাহ আর আবহমান প্রচলিত হিন্দুর যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির কোনটীই যে মিথ্যা

বা যদৃচ্ছা কল্পনা সম্ভূত নহে, পরন্তু উহার সমস্তই যে চিরসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিজ্ঞানসম্মত হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থইত তাহার একমাত্র প্রবৃষ্ট প্রমাণ পরিচয়। বাস্তবিক চিরসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াইত যুগ যুগান্তরের শাস্ত্রাদিতেও এইসবের উজ্জ্বল নিদর্শন এখনও যেমন আছে তেমনই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সত্যের লেশমাত্রও না থাকিত তাহা হইলে সহস্র সহস্র বৎসরের বিজাতীয় অত্যাচারের প্রবল স্রোতে এইসব সনাতন আদর্শ ভাসিয়া যাইত না কি? যখন দেখিতে পাইতেছি যুগ যুগান্তরের যে হিন্দুসমাজ এখনও সেই হিন্দুসমাজই আছে, তখনও যে অন্নবিচার জাতিবিচার দৃষ্ট হইত এখনও তাহাই দেখা যায়, এমন কি তখনকার বিধবার চির পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যের চিরোজ্জ্বল নিদর্শন পর্য্যন্ত এখন ও বর্ত্তমান, সুতরাং তখন আর এই সকল সনাতন পবিত্র আদর্শ নিচয় সংস্কারগণের অসার ফুৎকারের চোটে কিছুতেই উড়িবার নহে। সংস্কারকগণ যেন ইহা ভবিয়াই সংস্কার সাধনে উদ্যত হন, নতুবা তাঁহাদের এই বড় সাধের উদ্যম সখাদ সলিলে ডুবিয়া থাকিবে মাত্র।

শ্রীআনন্দবিহারী সেনগুপ্ত।

উৎসব।

—ঃ-*-ঃ—

স্বাত্মরামায় নমঃ।
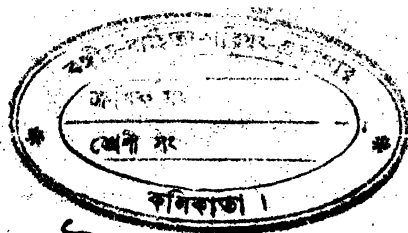
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৪শ বর্ষ। } সন ১৩২৬ সাল, শ্রাবণ। { ৪র্থ সংখ্যা।

প্রার্থনা

[১]

প্রণমি চরণে মাগো! জগত-জননি!
দীন জ্ঞানে পদতলে রেখো মা তারিণি!
নাহি পূজা উপচার,
প্রেম-ভক্তি পারাবার,
নাহি ধ্যান নাহি জ্ঞান, অজ্ঞান-নাশিনি!
সংসার প্রমত্ত ঘোর, দিবস যামিনী।

[২]

ত্রিতাপে দহিছে সদা ত্রিতাপ-নাশিনি!
কামনা ছুটিছে যেন উন্মত্তা করিনী।
বাসনার দৃঢ় ডোরে,
বাঁধিছে প্রবল মোরে,

কেমনে ছিঁড়ি এ ডোর কামনা-নাশিনি!
বিনা ওই পদ-ছায়া শান্তি প্রদায়িনি!

[৩]

মায়া, মোহ সদা ধায় নিষাদ যেমতি,
দুরন্ত কালের মত ভীত মৃগ প্রতি;
পরায়ে কর্ম্মের ফাঁশ,
বাড়ায়ে কামনা রাশ,
সদা দুঃখ-ময় স্রোতে ভাসায় নিয়তি,
কর্ম্ম-পাশ ছিন্ন করি নাহিক শকতি।

[৪]

মায়া মোহ কর দুর ওমা মায়াবিনি!
তোমারি নিয়তি-চক্র বুঝেছি জননি!
তোমারি জগতে তুমি,
বেষ্টিয়াছ ব্যোম-ভূমি,
তোমারি জগত লীলা লীলা-প্রকাশিনি!
ক্ষুদ্র নর বুঝিব কি এ লীলা ভবানি!

[৫]

ভব তারারূপে মাগো জগতে প্রকাশ,
লক্ষ-হীন সদা তাই পরাণ নিরাশ;
নিরাশ জলদ জালে,
ঘেরিয়াছে অন্তঃস্থলে,
ফুটহ নয়নে মাগো, করি তমো-নাশ,
হৃদয় জলদ জাল হউক বিনাশ।

[৬]

রোগ-শোক-আধি ব্যাধি রাক্ষসের মত,
মানব পশ্চাতে সবে নিয়ত ধাবিত,

সদা ছিদ্র অন্বেষণ,
নাশিতে জীবন ধন,
পুত্র কন্যা দারা তরে সদা প্রাণ ভীত;
কালরূপী রাক্ষসেরে কে করে তাড়িত?

[৭)

মানবের শক্তি কি মা বিনা কালী ভবে?
বিনা ওই করালিনী আর কে রক্ষিবে?
মহাকাল যারে হেরি,
ভীত পদতলে পড়ি,
লয়েছি আশ্রয় তাই ও চরণে শিবে!
তারিতে নাহিক কেহ ভীম ভবার্ণবে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

একাকী নরমতে।

দুই আর পাও কোথায়? একা—আর কেউ নাই। তাই কি? আপনাকে আপনি দেখিতেও কি পার না? আপনাকে আপনি দেখিলে। "নিজ শক্তিমুমাং পশ্যন্।" আপনার মধ্যে আপনার শক্তি। তখন "মহেশ ইব নৃত্যসি"—তখন নিজ শক্তি উমাকে দেখিয়া নট-রাজের কি আনন্দ, কি নৃত্য! তাই হইতেছিল একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয় মৈচ্ছত্। একাকী রমণ হয় না তাই সে দ্বিতীয় ইচ্ছা করে। কিন্তু দ্বিতীয় আর পায় কোথায়? আপনাকে আপনি দেখিলেই দ্বিতীয়। আপনিই এক আপনিই দ্বিতীয়। আপনিই শক্তিমান্ আপনিই শক্তি। অথচ উভয়ে এক।

শক্তি শক্তিমানকে লইয়া কত খেলাই করেন। শক্তি বলেন শিব কিছুই করেন না। আমিই সব করি। শ্রীসীতা বলেন রাম কিছুই করেন না আমিই সব করি আর "আরোপয়ন্তি রামেঽস্মিন্ নির্ব্বিকারেঽখিলাত্মনি। আমার কার্য্য লোকে রামে আরোপ করিয়া বলে রামই সব করেন। কিন্তু সত্য কথা কি?

মাং বিদ্ধি মূল প্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্ত কারিণীম্।
তস্য সন্নিধি মাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা॥
তৎ সান্নিধ্যান্ময়া সৃষ্টং অস্মিন্নারোপ্যতেঽবুধৈঃ॥

আমিই সব করি কিন্তু সে কাছে থাকা চাই। সে কাছে থাকিলে আমার আর নিদ্রা তন্দ্রা থাকে না আমি সর্ব্বদা কত খেলা খিলি—কত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করি। আমি যে মূল প্রকৃতি। করি আমিই সব কিন্তু অবুধ জন বলে সেই করে।

আচ্ছা প্রকৃতি যখন খেলা করেন তখন পুরুষ কি করেন? পুরুষ দেখেন শুধু, দেখেন সে কত সুন্দর! তার খেলা কত সুন্দর! এই যে

বর্ষে বর্ষে নব বর্ষ—দেখনা একবার পুরুষ হইয়া দেখনা—প্রকৃতি কত বিচিত্র রঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ করিতেছে—কত সাজে সাজিতেছে—প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে তার খেলার সাঙ্গ কোথায়? আর তোমার দেখার শেষই বা কোথায়? আর এই বা কি দেখা? দেখিয়া দেখিয়া কি দেখার শেষ হয় না—দেখা কি পুরাতন হয় না? সকল লোকের মধ্যে গোপনে দেখ আর নির্জ্জনে সাক্ষাতে দেখ। সে ঘুমায় তুমি দেখ—আহা সে কত সুন্দর! অনিমিষ নয়নে এত কি দেখ! কি সৌন্দর্য্য সেথা পাও?

শুধুই কি দেখ আর কিছুই কর না? আপনাকে আপনি দেখ আপনি আপনার শক্তিকে দেখ—শান্ত ভাবে দেখ আশান্ত করিয়া দেখ—সকল রকমে দেখ। একটু জ্বলুক একটু পুড়ুক একটু ছাই রাই হউক এত কি তোমার আছে? আছে বৈকি? একটু ঝগড়া বিবাদও তোমার ভাল। বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া একটু ছাড়া ছাড়িতে জ্বালা পোড়া এও ভাল। আর সাধ্য সাধনার চাই। যখন প্রকৃতি বড় গম্ভীর হইয়া মান করিয়া শুইয়া থাকে—অভিমানে যখন শ্বাসটি পর্য্যন্ত বড় গরম হইয়া যায়, যখন মানুষ বড় গুমট অনুভব করে আরপরে তোমার মান ভাঙ্গানও আছে। তুমি মান ভাঙ্গাইতে যাও। কালাম্ভোধর কান্তি তোমার। সুন্দর হাত দুখানি লইয়া ধীরে ধীরে তার অঙ্গ স্পর্শ করিতে যখন যাও তখন সে হাত ঝিনকুটি দিয়া যখন জোরে তোমার হাত সরাইয়া দেয় তখন কাল মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ কেমন সুন্দর ছড়াইয়া পড়ে। পড়েনা কি—সবাইত ইহা দেখি—সে হাতের বালা তাড় চূড়ীতে যে কত হীরা জহরত পান্না চুন্নী—আহা কালমেঘে তাদের বিদ্যুৎ কেমন ঝলক দেয়।

কিন্তু মান আর কতক্ষণ থাকিবে? তোমার শুষ্ক মুখ দেখিলে সে কি আর থাকিতে পারে? তখন রুদ্ধ শ্বাস প্রবল বেগে বয়—মানুষ দেখে প্রকৃতির গম্ভীরতার পরেই বাতাস বয়। তারপরেই মানের কান্না। তখন মেঘের গুড় গুড় শব্দ পরেই কান্নার বারিপাত। এসব কি তোমাদের খেলা?

কিন্তু তোমার আদর আমার বড় ভাল লাগে। প্রকৃতির সেবা পুরুষের প্রতি ইহা ত ভালই। কিন্তু তোমার আদর প্রকৃতির প্রতি এইটি আমার বড় ভাল লাগে। সেই যে যখন তুমি বল।

গুরুস্তং সর্ব্ব শাস্ত্রানাং অহমেহ প্রকাশকঃ। সেই যে কত আদর করিয়া, কেমন কেমন হইয়া বল—তুমিই সর্ব্ব শাস্ত্রের গুরুগো আমি মাত্র প্রকাশক—সেই যে বল

কথং ত্বং জননী ভূত্বা বধূস্তব মম দেহিনাম্।
উক্ত্বা চোক্ত্বা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোঽহং নগোত্মজে॥

রাজাধিরাজ তনয়া—তুমি জননী হইয়া সবার ঘরে বধূ হইয়া কেমন করিয়া থাক এই কথা বলিয়া বলিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া আমি ভিক্ষুক হইয়া গিয়াছি। রাজাধিরাজ তুমি তোমার এই ভিখারী সাজ বড় ভাল লাগে। দ্বারে দ্বারে আজ কারে দেখিয়া কারে পাইয়া ভিক্ষুক সাজিয়া বেড়াও? আর দীনের দীন হইয়া কি লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে বিলাইতে যাও? তোমার অন্ন জুটে না কেমন? তাই ভিক্ষুক সাজিয়া সদার কাছে হাত পাত! আর এ হাত পাতাও কেমন গো? এমন হাত পাতিতে শিখিলে কোথায়? কেউ কিছু দেয় কেউ দেয় না তাড়াইয়া দেয় কপটতাকরে—আদরে তিরস্কারে তোমার একই ভাব। আহা এ তুমি কেমন ভিক্ষুক।

এই খেলা তোমার—এ আমার বড় ভাল লাগে। আর ভাল লাগে তোমার উপাসনা। তুমি যখন তোমার প্রকৃতির উপাসনা কর শন্ন আপো ধম্বন্যা—শুদ্ধস্তু মৈনসঃ—স্তান উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে—উষতীরিব মত্তর—এই যে তোমার প্রার্থনা এই যে তোমার স্তব স্তুতি—এই সব রঙ্গ তোমার—এ আমার বড় ভাল লাগে। কি বা বলিব কোনটিই বা ভাল না লাগে? উপাসনা সাঙ্গে যখন নিজের বক্ষের উপর তুলিয়া নাচাও—নাচিতে নাচিতে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে—তোমার দিকে ভিতরে চাহিতে চাহিতে—আমার মনোভিরাম পুরুষের বক্ষে আমি একি করি বলিতে বলিতে জিহ্বা

বর্দ্ধিত করিয়া ঐ খেলার বেশে রুধির মাখা অঙ্গে ঐ অসি মুণ্ড ধরা হাতে ঐ বরাভয় দেওয়া হাতে যখন শাম্ভরী মুদ্রার ভিতরে তোমাতে ভরিয়া থাকিয়াও বাহিরে যেন কোন দিকে চাহিয়া থাকে আর তুমি অনিমিষ লোচনে সেই অপূর্ব্ব রূপ রাশি দেখিয়া দেখিয়া কেমন হইয়া যেন পড়িয়া থাক—আহা! এ আমার বড় ভাল লাগে। খেলাই সব, আবার খেলিতে খেলিতে স্থির হওয়া—এই জন্যই জগদাড়াম্বর। নব বর্ষে এই দৃশ্যে সবাই ভরিয়া যাউক ইহাই প্রার্থনা।

জ্ঞানের কথা ও সাধনা।

১

জীবচৈতন্য বা সম্বিৎ ব্রহ্মাকারা ও জগদাকারা দুইই হয়। ব্রহ্মাকারা করিতে যত্ন চাই, জগদাকাকারা অযত্নলভ্য। যত্নলভ্য যাহা তাহার বল অযত্নলভ্য যাহা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। বিশেষ জগৎ মিথ্যা ওব্রহ্ম সত্য বলিয়া ব্রহ্মকারা সম্বিদের কাছে জগদাকারা সম্বিত অতিতুচ্ছ। সম্বিদকে ব্রহ্মকারা করিতে একদিকে যত্ন কর অন্যদিকে বিচার দ্বারা জগৎ ভ্রান্তি দূর কর ইহাথ জ্ঞান লাভের উপায়। ইহাতেই সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হথবে।

২

সম্বিৎকে ব্রহ্মাকারা করিতে হইলে নিরন্তর কি অভ্যাস করিতে হইবে তাহা প্রথম দিনে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় দিনে সম্বিদকে কারা হইতে না দেওয়ার জগদাকথা বলা হইতেছে।

৩

বহুদিন ধরিয়া বিচার করিতে হইবে এই যে জগৎ দেখিতেছি, এই যে দেহ দেখিতেছি এটা কি? এটা ছিল কোথায়? দেহটা বীজাকারে অহঙ্কার বিমূঢ় আত্মাতে সংস্কার রূপে ছিল। জগৎটাও বীজাকারে মায়াশবলিত ব্রহ্মে সংস্কারাকারে ছিল। জগৎটা ব্রহ্মেও নাই মায়াতে থাকিয়াও নাই কেননা শুধু মায়া যাহা তাহা আছে কি নাই বলার উপায় নাই। চলনটা চম্বুকেও নাই। চুম্বক ও লৌহ সন্নিধি প্রাপ্ত হইলে চলনটার স্ফুরণ হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম মায়াশবলিত হইলে জগতের স্ফুরণ হয়। মায়াশবলিত ব্রহ্ম হইতে চিত্ত জন্মে। চিত্ত হইতে কল্পনা বা চলন উঠে সেই কল্পনা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে স্থূল আকার ধারণ করে।

৪

জগৎটা তবে কি? চিত্ত স্পন্দন কল্পনা। বহুকাল ধরিয়া বিচার করিতে হইবে এটা চিত্ত স্পন্দন কল্পনা। কিন্তু চিত্তটাত ভিতরে থাকে তার চিত্তস্পন্দন কল্পনাও ভিতরের বস্তু। বিশ্বটা দর্পন দৃশ্যমান নগরীর মত নিজের ভিতরেই আছে। অল্প মায়াতে স্বপ্নদৃশ্য বস্তু বাহিরে দেখার মত ভিতরের চিত্তটাকে বাহিরে দেখা যায় মাত্র।

৫

সমকালে সত্যে অনুরাগ কর আর অসত্যে বিরাগ কর। সত্য ব্রহ্মই অসত্য জগৎ রূপে তোমার ভ্রমজ্ঞানে ভাসিতেছেন।

৬

ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত হইতেছে রজ্জুকে সর্প ভাবে দেখা। মায়া মণ্ডিত চিৎ বা জীব চৈতন্য বা সম্বিদের ভিতরেই ভ্রান্তি নিহিত। চিন্মাত্র যিনি তাঁহাতে ভ্রান্তি নাই। ভ্রান্তি আছে মায়ামণ্ডিত চিত্তের ভিতরে।

৭

চিৎ যিনি তিনি সর্ব্বদা অসঙ্গ। চিৎ এর ভিতরে চিৎ হইতে ভিন্ন অন্য কিছুই থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের ভিতরে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই থাকিতে পারে না। আকার বিশিষ্ট মহাসলিলে আকার বিশিষ্ট তরঙ্গমালা থাকে কিন্তু নিরবয়ব পরব্রহ্মে সাবয়ব সৃষ্টি থাকিতেই পারে না। কাজেই জগৎ যাহা তাহা মায়িক প্রতিভাস মাত্র; কাজেই জগৎ ভ্রান্তি যাহা তাহা বিনা কারণেই উঠিতেছে।

৮

মায়ামণ্ডিত চিত্তের স্বভাব হইতেছে প্রস্ফুরণ বা কচন। জ্ঞান স্বরূপ যিনি তাঁহাতে কোন প্রকার স্ফুরণ নাই বা কম্পন নাই। যে জ্ঞানের কথা আমরা কহিয়া থাকি তাহার স্বভাব হইতেছে স্ফুরণ। স্বভাবে যাহা হয় তাহার আবার কারণ কি থাকিবে?

প্রাণের সাড়া।

আজ অষ্টাহ তোমার ক্ষেত্রে কাটিল। প্রাণের কোন সাড়া নাই। অথচ মুখে বলা আছে 'সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকা চাই। সর্ব্বদা—একবার আধবার নয়। এ কেমন ভালবাসা—যাতে সর্ব্বদা প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না।

তোমায় লইয়া ছিলাম না তবে কি লইয়া ছিলাম? আর কিছুই লইয়াছিলাম না সত্য কিন্তু তেমন করিয়া তোমায় লইয়া ছিলাম না, যাহাতে প্রাণের সাড়া পাই।

আজ রবিবার। এই রবিবার সন্ধ্যার সময় তোমার ক্ষেত্রে আসিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। আজ এখন রবিবার সকাল ৮টা।

আজ বেশী বসি নাই। শীঘ্র শীঘ্র উঠিলাম। ইহার মধ্যেই কিন্তু সাড়া পাইলাম। বড় সুন্দর কথা। যদি কেহ এই কথা সদা মনে রাখিয়া জীবন চালায় তবে তার বুঝি সবই সিদ্ধ হয়।

লোকে জ্বলে পুড়ে ছাই রাই হয় মন লইয়া, আর দেহ লইয়া। দেহটা সূক্ষ্মের স্থূল আকার মাত্র। এই দুইটি এমন বস্তু যে শত জ্বালায় জ্বালায় পুড়ায় তবু কিন্তু ইহাদিগকে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। সংসার উহাদিগকে লইয়াই। মিথ্যা আরোপে সংসার উঠে ইহাও কিন্তু ন স্বয়ং বিনিবর্ত্ততে অর্থাৎ আপনা হইতে সংসারটা মিটিয়া যায় না।

জ্বলি পুড়ি মন লইয়া কিন্তু মনকে যদি চিনি তবে দেখি এ আমার বড় সুহৃদ্। মাণিক মাজা ঘসা ভিন্ন উজ্জ্বল হয় না। সকল মাণিকেই একটা দীপ্তি থাকে তাহা কিন্তু লুকান। মাজিলে ঘসিলে তবে ইহার ছটা বাহির হয়।

মনের ছটা বাহির করিবার জন্যই সাধনা।

জড় মাণিক একস্থানে পড়িয়া থাকে কিন্তু মন মাণিক সর্ব্বস্থানে ছুটে। সর্ব্বস্থানে ছুটিয়া কত কি দেখে, কত কি লালসা বাড়ায়, কত কি করে আর তাই লইয়া হা হা হি হি হু হু করে।

মন ছুটুক বা একস্থানে পড়িয়া পড়িয়া জাওর কাটুক মন যে একটা বড় বস্তু, এইটি সর্ব্বদা মনকে যদি কেহ স্মরণ করাইয়া দিতে পারে সেই কিন্তু ইহাকে ঘসিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল করিয়া কৌস্তভ মণির মত ইহাকে তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিতে পারে।

বুঝিলে ইহা কিরূপে হয়? মনের উপরে মন্ত্র জপ করিয়া দাও। মনই ভিতরে—মনই বাহিরে।

এই যে সমুদ্র—ইহাত দেখ। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিতে যদি পারিতে তবে বুঝিতে এই কিন্তু সেই—যারে তুমি খোঁজ। যারে জগত খোঁজে এইরূপ যত কিছু তোমার চক্ষে পড়ে ভাল করিয়া যদি দেখিতে পার দেখিবে ইহারা যত কিছুই কিন্তু নহে ইহারা কিন্তু

যাঁরে খোঁজ সেই। সেই জগৎরূপে সাজিয়া আছে। ভিতরে মন সাজিয়া সে, আর বাহিরে জগৎ সাজিয়া সে।

এইটুকু সর্ব্বদা দেখিতে পারিলেইত সব হইল। এই দেখার জন্যই মন্ত্র জপ। যাহা দেখ যাহা শোন তাহার উপরেই মন্ত্র জপিয়া যাও। মনের উপর যখন মন্ত্র জপ তখন বল তুমিইত সে—তুমিই কিন্তু দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষ ছাইয়া আছ। তুমিই কিন্তু সেই সৃষ্টিকর্ত্তার অতি উৎকৃষ্ট তেজ—আহা এই তেজই আমার ধ্যানের বস্তু—ইহার ধ্যানে আমি তোমাতে পৌঁছি।

মন দেখিয়া দেখিয়া, সমুদ্র দেখিয়া দেখিয়া, আকাশ দেখিয়া দেখিয়া মানুষ পশু ফুল ফল—সব দেখিয়া মন্ত্র জপনা—তোমার সব হয় কি না দেখ। সাড়াত এই। আর এক রকমে এই কথাই বলা হউক।

তুমি আমি কি করিব শ্রুতি এক কথায় তাহা দেখাইতেছেন।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিৎ ধনম্॥

ভুক্তি মুক্তি উভয়ই থাকিল যদি জগতে গতিশীল যা কিছু আছে তাহা ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ফেলিতে পার। ঈশা ঈশ্বরেন বাস্যং আচ্ছাদয়িতব্যং। ঈশ্বর দিয়া যাহা আচ্ছাদন কর তাহাই কিন্তু ত্যাগ হইল। ত্যাগের পরে যে ভোগ তাহাই ভুক্তি মুক্তির যোগ। তখন কাহারও ধন আর গ্রহণ করা গেলনা।

এই যে এত বড় উপদেশ শ্রুতি করিলেন তাহাতে করণীয় ব্যাপারটি কি, এইটি হইতেছে ঈশ্বরের দ্বারা জগতের সকল বস্তুকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলা।

কিরূপে করিব ?

এই প্রণালীই হইতেছে মন্ত্রজপ।

কোন্ মন্ত্র ?

যাহা হইতে শ্রেষ্ট মন্ত্র আর নাই, যে মন্ত্র সকলকেই জপিতে হয় ? যে মন্ত্রে ব্রাহ্মণ শূদ্র সবারই অধিকার !

গায়ত্রী মন্ত্র কি ?

হাঁ। স্ত্রী শূদ্রের গায়ত্রী ব্রাহ্মণের গায়ত্রী কি একই বস্তু ?

বিদ্মহে ধীমহি প্রচোদয়াৎ—ইহাই একটু স্ফুটরূপে একটু ব্যাপক ভাবে ব্রাহ্মণের গায়ত্রীতেও আছে। বিদ্মাহ ধীমহি প্রচোদয়াৎ ব্রাহ্মণ শূদ্র উভয়কেই জপিতে হয়। তান্ত্রিক সন্ধ্যা ব্রাহ্মণকেও করিতে হয়।

বিদ্মহে ধীমহী প্রচোদয়াৎ—ইহা মূর্ত্তি অবলম্বনে—মূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া—তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে প্রয়োগ করিতে হয় আর বৈদিক সন্ধ্যাতে ধ্যানের বস্তুটি ঠিক করিয়া লইয়া সেই বস্তুটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে হয় তুমিই অ উ ম, তুমিই দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষ ছাইয়া আছ, তুমিই সেই জগৎ প্রসবিতার উৎকৃষ্ট তেজ, তোমাকে আমরা ধ্যান করি—কেন না তুমি ভিন্ন আর কেহই ক্রম অনুসারে আমাদিগকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পথে লইয়া যাইতে পারে না।

এই না গায়ত্রীর অর্থ? গায়ত্রীর অর্থই শ্রীভগবানকে দেখাইয়া দিতেছে। শ্রীভগবানের সকল মূর্ত্তিই বরণীয় ভর্গের মূর্ত্তি। বরণীয় ভর্গ ভিন্ন অরূপকে রূপ দিতে আর কেহই পারে না। জগতের সকল বস্তুতে এই গায়ত্রী মন্ত্র জপ কর। সাগরের উপরে জপিয়া দাও দেখিবে সাগর আর সাগর নাই হইয়াছেন ঈশ্বর। মনের উপরে জপিয়া দাও দেখিবে মন আর মন নাই, হইয়াছেন ঈশ্বর। শ্রুতির ঈশাবাস্য শুনিয়া বুঝিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপে ঈশ্বর ভাবনার কার্য্যটিই সাধনা। বুঝিলে কেমন সুন্দর উপায়—জপ করাও হইল ভাবনা করাও হইল। অথবা ভাবনা করিতে করিতে জপ সর্ব্বদা লইয়া থাকা গেল। সর্ব্বদা জপ এখন কত সহজ। কর না বড় ভাল হইবে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলেই হইবে না—ধর্ম্মের প্রয়োগ সর্ব্বত্র চাই—সর্ব্বদা চাই। ইতি

২১ বৈশাখ। ১৩২৬। ৺পুরী। চক্রতীর্থ।

হিন্দুজাতি—বাঁচিবে কি মরিবে ?

হিন্দুজাতি কি মরিয়াছে না এখনও জীবিত আছে ? যদি জীবিত থাকে তবে কি ভাবে জীবিত আছে ? এই জাতি কি নিজের নিজত্ব ছাড়িয়া অন্যের মত হইয়া চলিতে রাজী হইয়াছে অথবা নিজের নিজত্ব বজায় রাখিয়া অন্যকে উন্নত করিতে বাসনা রাখিতেছে ?

হিন্দুজাতি এখনও মরে নাই। তবে ইহার উপর আক্রমণ বড় বেশী। ইহা হইয়াই থাকে। কথায় বলে বড় গাছেই ঝড় বেশী লাগে। চিরদিনই ইহার উপর ঝড় বেশী লাগিয়াছে। সত্যে অসুর, ত্রেতায় রাবণ, দ্বাপরে কংস, আর কলিতে ? দাশরথী কিছু দেখিয়াই যেন বলিয়া গিয়াছেন—

* * *

তখন কংস নামে একটি অসুর আছিল দ্বাপরে।
এখন বাঙ্গালা দেশটা কর্‌লে অংশ যুটেছে দশ হাজার কংস।
অন্যদেশ সব ঐক্য করিলে লক্ষ হতে পারে॥

চিরদিনই হিন্দুজাতির ব্রাহ্মণের উপর উপদ্রব বেশী হইয়াছিল তবু কিন্তু ব্রাহ্মণ মরে নাই। আর শাস্ত্রে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ কখন মরিবে না।

এখন, যে ব্রাহ্মণ মরিতে বসিয়াছে একথাত অস্বীকার করা যায় না।

আজ সমস্ত জগৎ একদিকে আর ভারতের মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ অন্যদিকে। সমস্ত জগৎ বলিতেছে আচার ছাড়, খাদ্যাখাদ্য বিচার ছাড়, শুচি অশুচি ছাড়, জাতিভেদ ছাড়, প্রতিমা পূজা ছাড়, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ছাড়াও রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া ছাড় ; হও আমাদের মত ; আমরা তোমাদিগকে আমাদের বলিয়াই স্বীকার করিব, আমরা তোমাদিগকে আমাদের মতন করিয়া লইব, তোমাদিগকে বহু অধিকার পাইবার উপযুক্ত দেখিলে সেই সব অধিকার দিব।

ভারতের মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ এক্ষেত্রে করিবে কি? নিজের নিজত্ব ছাড়িয়া সকলের সঙ্গে কি এক হইয়া যাইবে? না যিনি ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়াছেন, ব্রাহ্মণের শরীরে ব্রাহ্মণত্ব শক্তি জাগাইবার যন্ত্র দিয়া যিনি ইহাদিগকে গঠন করিয়াছেন তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য বীরের মত এই জীবন তুচ্ছ করিয়া জগৎ ছাড়িবে—কোন্ পথটি ইহাদের শ্রেয়ঃ?

আজ জগতের প্রায় লোক—আরও আশ্চর্য্য ভারতের বহুলোক আরও প্রহেলিকা—ব্রাহ্মণ বংশেরও কতলোক ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করে। ঘৃণা করিলে কি হইবে ব্রাহ্মণকে এখনও শ্রেষ্ট বলে। যদি না বলিত তবে অন্য জাতি আজ ব্রাহ্মণ বলাইতে এত ব্যগ্র কেন?

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠত্বই ইহার নিজত্ব। এই নিজত্ব লইয়া গোল বাধিয়াছে। হয় তোমাদের নিজত্ব রক্ষা কর, নয় নিজত্ব ছাড়িয়া আচার ভ্রষ্ট, খাদ্য ভ্রষ্ট, বিবাহ ভ্রষ্ট, জাতি ভ্রষ্ট সকলের সঙ্গে এক হও।

নিজত্ব কে কবে ছাড়িয়াছে? ব্রাহ্মণ তাঁহার নিজত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণ আজিও বাঁচিয়া আছে, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছিল বলিয়া সে আজিও শ্রেষ্ঠ হইয়া আছে এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে।

বলিবে কেন, কি সে নয়?

ব্রাহ্মণ আচারে শ্রেষ্ঠ, বিচারে শ্রেষ্ঠ, ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ, বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ—ত্যাগে—উদাহরণ খুঁজিবে—বশিষ্ট বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান স্মরণ কর।

কোন্ শিক্ষার বলে তাঁহাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইয়াছিল? সে কালের শিক্ষা এক রকম ছিল, এখন অন্য রকম হইয়াছে। সে কালের শিক্ষার এবং এ কালের কলেজী শিক্ষার প্রভেদ আছে—প্রভেদ কি তাহা দেখ—

কলেজে যে শিক্ষা পায় সে শিক্ষা কোন কাজেরই নহে। উহা না এক

মুখী না সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা। উহা আমাদের কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষা দেয় না; সুতরাং উহা একমুখী শিক্ষার স্থান অধিকার করিতে পারে না। আবার যাহাতে শারীরিক শিক্ষার নাম নাই, যাহাতে হৃদয় বৃত্তির উন্নতি হয় উহাতে তাহার কিছুই নাই, যাহাতে ইচ্ছা শক্তি ও কর্ম্ম কুশলতা বৃদ্ধি হয়, তাহাও উহাতে নাই, ফলকথা যাহাতে শরীরের ধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম পালনে অনুরাগ জন্মে এমন কিছুই নাই তাহাকে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা বলি কি প্রকারে? উহাতে আছে কেবল কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা—তাহাও উচ্চতর বৃত্তির নহে। এই কলেজী শিক্ষার চাপে পড়িয়া হিন্দুসমাজ আজ বিব্রত, এবং শির খুঁটি ব্রাহ্মণ আজ তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে পারিতেছে না। লেখাপড়ার যে উদ্দেশ্য—মনোবৃত্তি সমূহের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি—তাহা কলেজী শিক্ষায় হয় কি? যে চিন্তাশক্তি দ্বারা সমাজের উপকার হইবে তাহা হয় না, চিন্তা করিবার শক্তি হয় না অথচ জ্ঞান আমি বড় বুঝি, ইহার অনেক দোষ, আজ কালকার শিক্ষার এই দোষগুলি সমুদয়ই ঘটিয়াছে। যদি বা কাহারও চিন্তাশক্তি জন্মে তাহাও শূন্যের উপর। চিন্তা করি abstract লইয়া। যদি এরূপ হইত তবে ফল এই প্রকার হইত, যাহা আছে তাহার উপর নহে।

লেখা পড়ার দায়ে আমরা পিতামাতা স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন। সংসারে থাকিলে, সমাজে থাকিলে, যে মনোবৃত্তি পুষ্ট হয়, যে ভাব, ভালবাসা, ভক্তি, স্নেহ মমতা জন্মে তাহা জন্মিবার অবসর হয় না। সংসারে সমাজে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় এখানে তাহা হয় না।

পুরাকালের শিক্ষার দুইটি উদাহরণ গৌরবের সহিত উল্লেখ করা যায়—একটি গ্রীসের, আর একটি ভারতবর্ষের। একটি ব্রাহ্মণদিগের, আর একটি এথিনীয়নদিগের। একটিতে ব্রাহ্মণ হইত আর একটিতে সিটিযেন হইত। একটির ফল সংস্কৃত চর্চ্চা, শাস্ত্র চর্চ্চা,

ভারতে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বিস্তার, আর একটির ফল গ্রীক কলা বিদ্যা, গ্রীক সাহিত্য, গ্রীক চিন্তাশীলতার পরিচয় ও প্রভুত্ব।

ব্রাহ্মণগণের শিক্ষার মৌলিকত্ব কোথায় জান? এই প্রকার কলেজী শিক্ষার ব্রাহ্মণ তৈয়ারি হয় না। তাঁহাদিগকে গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। হয় ১৮, না হয় ২৭, না হয় ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা গুরুকুলে বাস করিতেন এবং তথায় যাবতীয় শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিতেন—বেদ, বেদান্ত, সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, চিকিৎসা সমস্তই শিখিতেন। গুরু তাঁহাদিগকে শিখাইতেন—গুরু শিষ্যে পিতা পুত্র সম্বন্ধ। এক জন ভালবাসিয়া শিখাইবার জন্য যত্ন করিত আর এক জন ভক্তি করিয়া শিখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইত। শিক্ষা উত্তম হইত—সম্পূর্ণ হইত।

শিষ্য গুরুর গৃহস্থালিতে যোগ দিত, তাঁহার সংসারে সংসার করিতে শিখিত, লোকের সহিত ব্যবহার শিখিত, শারীরিক পরিশ্রমের মর্য্যাদা বুঝিত। কেমন করিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়, বিচার করিতে হয়, বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে হয়, ব্যবস্থা দিতে হয় এই ৩৬ বৎসরকাল মধ্যে সব শিখিত। গুরু তাঁহাদিগকে সমাজে যাইতে শিখাইতেন, গুরু যেখানে যাইতেন শিষ্য তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

শিক্ষা Theoretical ও Practical দুই রকমই হইত। গুরুকুল হইতে বাহির হইয়া একটি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, সমাজে মূর্ত্তিমান শক্তিস্বরূপ অবতীর্ণ হইলেন। বড় বড় রাজারা তাঁহার সন্ধান লইতে লাগিলেন, যিনি তাঁহাকে আপন রাজ্যে স্থাপন করিতে পারিলেন, তিনি মনে করিলেন আমার রাজ্য ধন্য হইল—কারণ অগ্নির মত ইহাঁর তেজঃ, ইহাঁর বিদ্যা সর্ব্বব্যাপিনী, ইহাঁর শক্তি অনন্ত।

আমরা ব্রাহ্মণের শিক্ষা, দীক্ষার কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি কারণ এইরূপ এক একটি ব্রাহ্মণকে লইয়া এক একটি সমাজ গঠিত হইত। এইরূপ একটি ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিত। ব্রাহ্মণই সমাজের নিয়ন্তা, সমাজের পথ

প্রদর্শক। সে শক্তি ব্রাহ্মণের ছিল, সে শক্তি তাঁহারা অর্জ্জন করিতেন। ব্রাহ্মণগণের শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা। আমরা বলিতে পারি তাঁহারা কলাবিদ্যা চিত্রলেখন, ভাস্কর্য্য, নৃত্যগীতাদি অধিকারীভেদে শিক্ষা-দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তথাপি শেষ অধিকারীর জন্য অধ্যাত্মবিদ্যাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

গ্রীকগণ অধ্যাত্মবিদ্যার তাদৃশ অনুরাগী ছিলেন না কিন্তু তাঁহারা সুন্দর শরীর গঠনে সিদ্ধহস্ত, লিপি চাতুর্য্যে, ভাস্কর্য্যে, নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যায়, চিন্তাশীলতায়, সমাজের অন্যান্য সকল বিষয়েই তাঁহারা অগ্রণী ছিলেন। সমাজের উপযোগী মানুষ তৈয়ারি করিতে গ্রীকগণ সাতিশয় পটু ছিলেন। আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়া তাঁহারা মানুষের সামাজিক বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তুলিতেন—বাস্তবিক গ্রীকদিগের মত এমন সহজে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা আর কোন আধুনিক জাতীর কখন হয় নাই।

ব্রাহ্মণগণের শিক্ষা ধর্ম্ম প্রধান, গ্রীকদিগের শিক্ষা সৌন্দর্য্যও প্রধান এবং সামাজিকতায় পর্য্যবসিত। আমাদের কলেজী শিক্ষা কিন্তু এ দুয়ের কোনটির মত নহে। কলেজী শিক্ষায় আমরা না হই ধর্ম্মপ্রাণ না শিখি সামাজিকতা।

আমরা আদর্শটি হারাইতে বসিয়াছি; তাই হিন্দু তাহার নিজত্ব বজায় রাখিতে পারিতেছে না এবং ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে।

আদর্শ খুঁজিতে বাহিরে ছুটিলে হিন্দু মরিবে—কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। হিন্দুর আদর্শ ভারতের কাননে, প্রান্তরে—পর্ব্বতকন্দরে, সরিৎসরোবরে, গগনে, পবনে লুকাইয়া আছে—আদর্শ খুঁজিতে তাহাকে বাহিরে যাইতে হইবে না। হিন্দু যদি আজ ঘরের দিকে ফিরিয়া চায় তবে সে বাঁচিয়া যায়—তাহার নিজত্ব বজায় থাকে।

কি জন্য হয় না ?

১

বিশ্রান্তি হয় না কেন ?

ভ্রম ভাঙ্গাইবার জন্য দৃঢ় সাধনা নাই বলিয়া।

ভ্রমটা কি ? ভাঙ্গাইবার সাধনাই বা কি ?

যে বস্তু যাহা তাহাকে তথা ভাবে না জানাই ভ্রম। ইহাই প্রথম প্রকারের ভ্রম। দ্বিতীয় প্রকারের ভ্রম হইতেছে তথাভাবকে অন্যথা ভাবে দেখা। রজ্জুকে রজ্জু ভাবে না জানা প্রথম প্রকারের ভ্রম। দ্বিতীয় প্রকারের ভ্রম হইতেছে রজ্জুকে সর্পরূপে দেখা। না জানার জন্যই অন্যভাবে দেখা হয়।

ব্রহ্মকে ব্রহ্মরূপে না জানা প্রথম প্রকারের ভ্রম। দ্বিতীয় প্রকারের ভ্রম হইতেছে ব্রহ্মকে ব্রহ্মরূপে না দেখিয়া জগৎরূপে দেখা—আত্মাকে দেহরূপে দেখা ইত্যাদি।

কোন্ সাধনায় ভ্রম যাইবে ?

আত্মার আত্মভাবের কথা শ্রবণ করিয়া একদিকে পুনঃ পুনঃ তাহাই ভাবনা কর অন্যদিকে আত্মাকে আত্মভাবে না দেখিয়া দেহভাবে যে দেখিতেছ, জগৎ ভাবে যে দেখিতেছ তাহা যে সম্পূর্ণ ভ্রম সমকালে তাহারও বিচার কর; করিলে মিথ্যা যাহা তাহা দূর হইবে—সত্য ভাবেই তখন স্থিতি লাভ করিবে।

প্রথম সাধনা অভ্যাস দ্বিতীয় সাধনা বৈরাগ্য। সমকালে দুই সাধনা কর, হইবে।

২

সর্প ভ্রান্তি কিরূপে উঠে বুঝিয়া দেখ—তবে জগৎ ভ্রান্তি কিরূপে জন্মিল বুঝিবে। জগৎকে যাহা দেখিতেছ তাহা দেখিয়াই ভাবিতেছ এই ইহার তথা রূপ। জগৎকে যেভাবে দেখিতেছ তাহা অজ্ঞানেই

দেখিতেছ। অন্য একটি বস্তুকে সেই বস্তুটি না জানার দরুণ জগৎরূপে দেখা যাইতেছে।

৩

রজ্জু রজ্জুই আছে। অন্ধকারে আমরা দেখিতেছি একটা সর্প। বাহিরের বস্তু কেহই দেখে না। আমরা আমাদের চিত্তকেই দেখি। তদাকারে কারিত হওয়াই চিত্তের ধর্ম্ম। চিত্ত যখন যাহার উপরে পড়ে তখনই সেই আকারে আকারিত হয়।

মন্ত্র-ধ্যানে রূপ।

আজি এবিজন বাসে এসেছি মিলন আশে
চরণে মিশিব বলে সেজেছি নূতন সাজে।
অধরে অপূর্ব্ব হাঁসি নয়নে করুণা রাশি
কোটি রবি সমপ্রভা হেরিনু হৃদয় রাজে।
মালা গাছি দিতে গলে ভাসিনু নয়ন জলে
অরূপের রূপলীলা আজি গো আমারি তরে।
সেদিন আসিবে কবে আমারে বুঝায়ে দেবে
দুটি ভেঙ্গে এক হব, যাবগো মিলন পারে।

ভ

কর্ম্ম করায় কে? করেই বা কে?

কর্ম্ম করিতে বসিবার সময় স্মরণ হইল তুমি বা কে আমিই বা কে? কর্ম্ম করায় বা কে করে বা কে? মন একটু বিচার করা দেখি! আমার এই বিষ্ঠা কৃমিযুক্ত রক্ত মাংস মেদ পরিপূর্ণ পঞ্চ-ভূতময় দেহ ইহাই কি সব? অথবা এই সদা চঞ্চল মন এইটী কি আমি? না এই দেহ বা মন আমি কিরূপে হইব—এ দেহটার ত সদাই পরিবর্ত্তন হইতেছে—বাল্য কৈশোর যৌবন ইত্যাদি কত পরিবর্ত্তনই হইল। আবার দেখ মৃত্যুর পরে এ দেহের কি থাকে? এই মৃত দেহটাকে শ্মশানে লইয়া গিয়া অগ্নিসংযোগে পোড়ায় শেষ পরি-নাম কতকটা ভস্মমাত্র। তবে ইহার অস্তিত্ব কোথায় যাহা পূর্ব্বে ছিলনা আবার পরেও থাকিবে না—চৈতন্যবিহীন হইলে আর এই দেহ যে আমি তাহা থাকে না, যেথাকার দেহ সেথায়ই পড়িয়া থাকে কিন্তু আমি তখন কোথায়?

> নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবোবিদ্যতে সতঃ।
> উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শভিঃ॥

নাশ উৎপত্তি যুক্ত সদা পরিবর্ত্তনশীল বস্তু কি কখন আমি হয়? ইহাকে আমি ভাবা সম্পূর্ণ ভ্রম, মিথ্যা কল্পনা মাত্র, আর কিছুই নাই—চির সুন্দর পরিপূর্ণ শান্ত পুরুষ ইহাতে চলন উঠিয়াই মায়াময় এই বিশ্বসংসার।

একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝিবে এই দেহ মন সংসার যাহাকিছু সমস্তই মিথ্যা. সূক্ষ্ম বা স্থুল-সঙ্কল্পের আকার যাহা তাহাই ত মন, অস্তিত্ব-বিহীন সঙ্কল্পাকার বায়ুকে আমি তবে কেমন করিয়া আমি বলি, কাজে কাজেই দেহ মন মিথ্যা বলায় কোন আপত্তি থাকে না। একটু ভাল করিয়া বিচার করিলে ইহা পূর্ণরূপে অনুভব করা যায়, এই দেহ এবং মন হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বোধ করা যায়। আমি চিরদিন আছি এবং চিরদিন থাকিব যাহা আজ আছে কাল নাই তাহাকে

আমি ত বলিতেই পারি না। এই বালক দেহটা বৃদ্ধ হইল সঙ্গে সঙ্গে আকৃতিরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল কিন্তু আমির পরিবর্ত্তন কি কোনদিন হইয়াছে? বালককে জিজ্ঞাসা কর কে? সেও বলিবে আমি, আবার বৃদ্ধকে বল সেও বলিবে আমি? এ আমির পরিবর্ত্তন কোন দিন নাই। এ আমি চির নূতন, কিন্তু এমন সুন্দর চির নূতন আমিটী কে তাহা কি একবার অনুসন্ধান আবশ্যক নয়? এস দেখি—দেখি আমার মধ্যে কে আমি সাজিয়া এই রঙ্গ করিতেছে? দেহ মন বাদ দিয়াও আমাদের ভিতর আর একটি সুন্দর বস্তু পাই সেটি আমাদের স্ব স্বরূপ? আমাদের চৈতন্য, এই চৈতন্যের শক্তিই আমাদের শক্তি, ইহাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা শক্তিমান, ইহা লইয়াই কর্ত্তা সাজিয়া ক্রিয়া করি।

এই চৈতন্য জড়িত হইয়াই আমরা শক্তিমান নচেৎ জড়ভিন্ন আর কিছুই নয়। চৈতন্যেরই কোনদিন ক্ষয় অপচয় নাই ইনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বশক্তিময়—অনাদি চৈতন্যের খণ্ড হয় না। একটী আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে, চৈতন্য কিন্তু এই আকাশকেও ব্যাপিয়া আছেন। আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকিয়াও যেমন কোন কিছুর সহিত মিশ্রিত হয় না তদ্রূপ চৈতন্য সমস্ত পদার্থের মধ্যে মিশ্রিত হইয়াও সমস্ত বস্তু হইতে বিভিন্ন, আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম—প্রতি বস্তুর স্বরূপটীই এই চৈতন্য। চৈতন্য একটী আছে, আবরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়; নামরূপ দিয়া বহু দেখি, নচেৎ এক ভিন্ন দুই নাই, ঘটাকাশই মহাকাশ স্বরূপ অনুসন্ধানে বুঝা যায়। এক পদার্থ ছাড়া আর কোন কিছুই নাই—একটী বস্তুই আছে তাহা ছাড়া আর যাহা কিছু সে সমস্তই মিথ্যা, মায়িক রজ্জুতে সর্প দেখার মত ভ্রম।

আমার স্বরূপ যেটি সেইটী আমি। চৈতন্যের উপরই এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়াছে অথচ এই চৈতন্য সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইনি নিষ্ক্রিয় সঙ্গ বর্জ্জিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একাকিই পরিপূর্ণ কারণ ইনি ছাড়া আর কোন কিছুই নাই। যখন আপনি আপনি থাকেন তখন

স্থির শান্ত, কোন চলনই থাকে না দুই নাই আপনাতে আপনি পূর্ণ। একা একা ত খেলা হয় না তাই সেই সীমাশূন্য পরিপূর্ণ শান্ত চলন রহিত যিনি তিনি তাহাতে একটু ঝলক উঠান ; সেই জন্য বলা হয় তিনি আপনাতে যেন অজ্ঞান কল্পনা করেন।

এই স্পন্দন দ্বারা সেই পূর্ণ বস্তুকে খণ্ড মত বোধ হয়, এ খণ্ড সম্পূর্ণ মিথ্যা, এটা ভাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এক থাকিয়া আর সাজা খেলিবার জন্য। অতি নির্ম্মল অতি সূক্ষ্ম যে বস্তু তাহাকে কি খণ্ড করা যায় ? পূর্ণ পুরুষে মায়া ভাসে, মায়া যাহা তাহাত মিথ্যা, যাহা নাই তাহাকে আছে মত দেখা ইহাই মায়া, এই মায়াতেই দ্বিতীয় মত বোধ হয় ; খেলা এই ত্রিগুণময়ী মায়া লইয়া, তাই ইহা একেবারে মিথ্যা, মিথ্যা লইয়াই খেলা। তিনটী রেখা মুছিয়া ফেল, একই আছে। আবার দাগ টান দেখিবে এই আমি তুমি জগৎ সংসার হাসি কান্না সুখ দুঃখ আসা যাওয়া, এইটী তাহার খেলা। আপনাতে আপনি মায়া তুলিয়া খণ্ড ভাণ করিয়া দুই সাজিল, আবার অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড সাজিল, হইল বিশ্বরূপ, পুনঃ প্রতি পদার্থের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া বহু হইল। জড় লইয়া খেলা হইবে না তাই জড়কে চৈতন্যদীপ্ত করিয়া জীবে জীবে চৈতন্য রূপে জীবন দান করিল। অহং বহুস্যাম, একাই সব সাজিল। কিন্তু আবার আপনিই আপনাতে পূর্ণ রহিল। আপনাকে লইয়াই আপনার খেলা। কিছুই নাই একমাত্র সেই আছে আর কিছুই নাই, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, মায়া যাহা তাহা একেবারেই মিথ্যা। আত্মমায়ায় আত্মারাম পূর্ণ চৈতন্য যিনি তিনি খেলিতেছেন মাত্র।

তাই বলিতেছেন আমার মধ্যে তোমার সন্ধান কর ? তাহার পর আমার মধ্যে তোমাকে হারাইয়া ফেল। খণ্ড চৈতন্যই অখণ্ড মহা চৈতন্য, ইহাই আমার মধ্যে তোমার অনুসন্ধান। আমাকে খুঁজিয়া পাইলেই তোমাকে পাও, তখন আর আমি থাকে না আমি তুমি হইয়া যায়। আমি কে ? তাহা এখন এক প্রকার বুঝিতে পারা গেল,

আমার স্বরূপই আমি এবং এই স্বরূপটীই সকলকার স্বরূপ, কারণ চেতন যাহা তাহা চেতনই, আত্মার কখন খণ্ড হয় না। এক আত্মা ভিন্ন যখন কোন কিছুই নাই আর যাহা কিছু তাহাত কল্পনা মাত্র। অজ্ঞান নাশ হইলেই জগত দর্শন স্বপ্নবৎ হয় আমার মন্ত্রের স্বরূপই আমার ইষ্ট গুরু এবং ইষ্ট এক নাম ও নামী অভেদ, কাজেই আমার গুরুই যে আমার ইষ্ট তাহা স্বরূপে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এক ভিন্ন দুই নাই। মন্ত্রগুরু এবং ইষ্ট এক। ইহা স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়াই জ্ঞানী ব্যাস বশিষ্ঠ ইত্যাদি মহাপুরুষগণ বুঝাইয়াছেন। একই বহু সাজিয়া খেলা করিতেছে তাই কর্ম্ম করেও সে, কাজ করায়ও সে। অখণ্ড যিনি তিনি মায়া সাহায্যে খণ্ড হইয়া যেন আপনাকে বিস্মৃত হয়েন ইহাই স্ব স্বরূপ বিস্মৃতি। আপনাকে ভুলিয়া গুণের বশীভূত হইয়া জন্ম মৃত্যুরূপ খেলা আরম্ভ হয়, যত যত প্রকৃতিতে অভিমান হইতে লাগিল ততই আপনার শক্তি হারাইতে লাগিল, যখন স্বয়মন্য ইবোল্লসন্ আমি আর আর একজন এই উল্লাস তখন আমি কম্বল ঢাকিয়া ভল্লুক সাজিলাম আমি আমিই আছি অথচ আর কিছু হইয়াছি। তাহার পর অহং বহু-স্যাম, আমি বহু হইলাম। প্রশব্দে সত্ত্ব গুণ, কৃ শব্দে রজঃ গুণ তি শব্দে তম গুণ; গুণের মধ্যে গিয়া স্বরূপটী ভূলিয়া রাজার ছেলের খেলার ছলে চামার সাজিয়া আমিই চামার বলিয়া মনে করা, অদ্ভুত এই প্রহেলিকা। যিনি ত্রিগুণের হাত অতিক্রম করিতে পারেন তাঁহাকে আর এই দুঃখময় জন্ম জরা মৃত্যু সঙ্কুল সংসারে আসিয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যিনি এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করিতে পারেন তিনিই গুণাতীত। তিনিই সেই বিশ্ব বিমোহিনী দুরত্যয়া মায়া অতিক্রম করিয়া আপনার স্বরূপে থাকিয়া স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করিয়া পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করেন, তাঁহার আর আসা যাওয়া দেখা শুনা হাসি কান্না করা কর্ম্মা কোন কিছুই থাকে না, আপনাতেই আপনি পূর্ণ। এ অবস্থা লাভ করা কি সহজ কথা? শ্রীভগবানের নিজমুখের বাণী, দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া, আবার তখনই বলিয়াছে মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।

এই মায়া দুরত্যয়া বটে কিন্তু যে আমার শরণাপন্ন হয় সে অনায়াসে এই মায়া অতিক্রম করিয়া মৃত্যু সংসার সাগর পার হইয়া যায়। চেতন ভিন্ন জড়ের কখন উপাসনা হইতে পারে না, উপাসনা হয় একমাত্র চেতনেরই। চেতনই যেন খণ্ড হইয়া রজস্তমঃ যুক্ত মন সাজিয়া, সেই মনের সঙ্গে খেলা করেন, কিন্তু ক্রমে গুণের বশীভূত হইয়া পড়েন তাই খেলা দেখিতে দেখিতে খেলিতে থাকেন। আপনার স্বরূপ হারা হইয়া আপনি ক্ষুদ্র অজ্ঞানী সাজিয়া মায়ার হাতে ক্রীড়ার পুতুল হইয়া হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া বেড়ান। গুণের বশীভূত হইয়া দেহের অভিমান করিয়া দেহকে আমি সাজাইয়া দেহের যত যত কল্পনা তাহাকে আমার সুখ দুঃখ ভাবিয়া অনন্ত কাল ধরিয়া ক্রমাগত যাতনা ভোগ করা হয়। ত্রিগুণকে বশীভূত করিতে পারিলে, আপনার স্বরূপটীতে অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলে আর এই ষড়োর্ম্মিযুক্ত জরা মৃত্যু ক্ষুৎপিপাসা শোকমোহময় হইয়া নিয়ত প্রাণের জ্বালা ভোগ করিতে হয় না।

আত্মার সুখ দুঃখ কখনও নাই, ভয় মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা বন্ধন এ সমস্ত তাঁহাতে নাই, এ সমস্তই প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতিতে আমি অভিমান করা হয়, তাই হয় স্বরূপ বিস্মৃতি, আপনি যাহা তাহা ভুলিয়াছি আপন ভাবে আপনি থাকিতে পারিনা তাই এই ভ্রমের খেলা।

আমি কে এইটী সকল সময় সকল অবস্থায় স্মরণ রাখিয়া তাহার পর যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যায়। বৃদ্ধ জানেন আমি অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ, কিন্তু আবার বালক সাজিয়া বালকের সহিত সচ্ছন্দে ঘোড়া ঘোড়া কানামাছী ভোঁ চোর চোর ইত্যাদি খেলা খেলেন। প্রকৃতি বশে না গিয়া সদাসর্ব্বদা আপনারস্বরূপ স্মরণ রাখা ইহারই নাম আপনাতে আপনি থাকা। স্ব স্বরূপটী স্মরণ রাখিয়া তুমিই সব জানিয়া হাতে পায়ে কর্ম্ম করিয়া যাওয়া। এই ভাবে চলিতে পারিলে কর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সঞ্চিত কর্ম্ম জনিত দুঃখভোগ করিতে হয় না। তাহাকে স্মরণ করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া আবার আপনার

স্বরূপে স্থির থাকিতে পারে। সকল কর্ম্ম সকল ভাবনায় তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার কর্ম্ম তাঁহাতেই অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আমিই আমার স্বরূপ এইটী ক্রমাগত অভ্যাস না করিলে ইহা কখনও অনুভবে আসিবে না। বিচারে আমিই আমার স্বরূপ তাহা বেশ বোঝা যায় কিন্তু ইহা যতদিন না অনুভবে আসিবে ততদিন সাধনা দ্বারা ইহা অভ্যাস করা চাই। বিচার করিয়া করিয়া সেইটী অনুভব করিবার জন্যই সাধনা চলিতে থাকুক "আমিই সেই" এইটী সমস্ত সময় স্মরণ করিবার কথা। নিরাকার সাকার আত্মা অবতার সেই সব স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার রূপ গুণ চিন্তার সহিত তাঁহারই উপাসনা। অখণ্ডই খণ্ড; ঘটাকাশই মহাকাশ। এই ভাবে চিন্তায় ক্রমে দেহে অভিমান নষ্ট হইয়া যাইবে তখন দেহের সুখ দুঃখ সংসারের হাসিকান্না সমস্তই মিথ্যা কল্পনা বোধ করিতে পারিবে। সদাসর্ব্বদা একমাত্র ইষ্ট চিন্তায় পূর্ণ হইয়া নাম স্মরণ করিতে করিতে সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ ভয়ভাবনা সমস্তই তাঁহার ইচ্ছা-জনিত জানিয়া কোন কিছুতে বিচলিত না হইয়া আমি যন্ত্র সে যন্ত্রী ভাবিয়া তাহার মুখ চাহিয়া সকল সহ্য করা যাইতে পারে। সময় হইলে সে আমার হইবে। প্রথম সাধনা আমি তোমার, তাহার পর তুমি আমার, শেষে তুমিই আমি। ক্রম অনুসারে সাধনা করিয়া এইসব অবস্থা অনুভব করিলে তবে ঠিক ঠিক ভাবে আমি সেই হইয়া সকল সময় তাঁহাকে লইয়া থাকিতে পারা যায়। সাধনা ব্যতিরেকে কখনই তাঁহাকে পাওয়া যায় না—মনকে বৈরাগ্য-যুক্ত করিয়া সমস্তই নশ্বর জানিয়া নিরন্তর ব্যাকুলিত চিত্তে তাঁহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা। কি জানি সে কখন আসিয়া ফিরিয়া যাইবে আমি যদি তাহা না জানিতে পারি, তাই পততি পতত্রের অবস্থায় থাকা চাই—এযে প্রিয়তমের আগমন প্রতীক্ষা।

তুমি আমি একের সাধনা

সকল সাধনার শেষ হইতেছে তুমি আমি একে। নদী সমুদ্রে মিশিয়া যখন সমুদ্র হইয়া যায় তখনই নদীর স্বরূপ বিশ্রান্তি ঘটে।

ইহাই কি প্রার্থনীয়? আমার আমিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া সুখ কি? তদপেক্ষা আমি তোমার দাস রহিলাম—তোমার দাসী রহিলাম—নিরন্তর তোমার সেবা করিতেছি নিরন্তর তোমায় দেখিতেছি নিরন্তর তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছি নিরন্তর তোমার কথা শুনিতেছি নিরন্তর তোমায় সাজাইতেছি তোমায় আদর করিতেছি তোমার আদর পাইতেছি ইহাতেই ত সুখ বেশী। এই সুখ বিসর্জ্জন দিয়া আমি হারাইয়া কি সুখ? এই জন্যই ত বলি "বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং"—বলি বরং বৃন্দাবনে শৃগাল হইয়া থাকিব তাও ভাল তথাপি কিন্তু আমিত্ব ছাড়িব না। কেন না তুমি ত বৃন্দাবনে ব্রজসুন্দরিগণের সঙ্গে খেলা কর তাহাত শৃগাল হইলেও কখন চক্ষে পড়িবে তখন ত আমি ধন্য হইয়া যাইব কিন্তু আমি তোমাতে লয় হইয়া পাইব কি? এখানে প্রাপ্তি ত কিছুই নাই।

তোমাকে যখন পাই তখন আমার কত সুখ!

আহা—গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারে।
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি কোটি মদন হারে।

কি সুন্দর তোমার মুখ মণ্ডল। দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যাই। সুন্দর মুখ পদ্ম দেখিয়া মনে হয় বুঝি কোটি চন্দ্র কোটী সূর্য্য কোটি কাম ইহার কাছে লাগে না। এই সুখের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ ত আর নাই। আমি যদি না থাকে তবে এই সুখ ভোগ করিবে কে? নদী সমুদ্রে লয় হইয়া গেল নদীর ত আর কিছুই থাকিল না—ইহাতে নদীর প্রাপ্তি কি রহিল? নদী পাইল কি? লয় হওয়ার সুখ আর কি রহিল?

আহা! বেশ কথা বলিলে। বেশ তুমি। কিন্তু দেখ বেদে সর্ব্বত্র বলা হইয়াছে আমি সেই ইহাই উৎকৃষ্ট সাধনা। "শিবোভূত্বা শিবং যজেৎ" ঋষিগণ এই জন্যই বলেন। "হরি হ'য়ে বলচ হরি" এই কথাও আজ কালকার দিনে শুনা যায়। "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই" ইহাও বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন।

তুমি বলিতেছ কৃষ্ণ সেবার সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বেদ প্রমুখ শাস্ত্র—এবং বেদ সর্ব্বস্ব ঋষি সাধু সজ্জন বলিতেছেন কৃষ্ণ হওয়ার সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই ত তোমার আমার সঙ্গে শাস্ত্রের বিরোধ।" "চিনি হওয়া ভাল নয় চিনি খেতে ভালবাসি" ভক্ত রাম প্রসাদের এই উক্তিটি বেদ বিরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে।

এই বিরোধের মীমাংসা কোথায়? কৃষ্ণ সেবা জনিত সুখ সর্ব্বোৎকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ হইয়া যাওয়ার সুখ সর্ব্বোৎকৃষ্ট—এই দুইটাই সত্য হইবে কিরূপে? অতএব হয় বল "কৃষ্ণসেবা" সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ দেয় আর কৃষ্ণ হইয়া যাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ দিতে পারে না; না হয় বল কৃষ্ণ হইয়া যাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ দেয়—কৃষ্ণসেবায় ততসুখ পাওয়া যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট সুখ এই দুই এর একটিতেই আছে। দুইটিই শ্রেষ্ট নহে।

বিবাদ কিন্তু তুমি গড়িয়াছ। বিবাদ ভাঙ্গিতেও তুমি পার। বুদ্ধিকে একটু শাস্ত্র শ্রদ্ধার দিকে নিযুক্ত করিলেই সব শীতল হইয়া যাইবে।

দেখনা কিরূপে ইহা হয়। নদী ক্ষুদ্র বস্তু আর সাগর বৃহৎ বস্তু। নদী সাগরে গিয়া লয় হইল। তোমার দুঃখ হইতেছে "আমিই যদি লয় হইয়া গেলাম" তবে আমার থাকিল কি?

নদী সাগরে লয় হইল—কিন্তু নদী গেল কোথায়? তুমি বলিবে নদীর কিছুই থাকিল না—বেদ বলিলেন নদী সাগর রূপে স্থিতি লাভ করিল। নদীটিই আপনার ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া মহান সাগরত্ব লাভ করিল। নদীর প্রাপ্তি হইল মহান সাগরত্ব। সাগরকে ত বড় বল। নদী যদি এইরূপে বড় হইয়া যায় তবে বড় হওয়াতেই ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ পাওয়া

গেল। নদী লয় হইয়া লোপ ত পাইল না যে তোমার এত দুঃখ হইবে—নদীই যে পূর্ণ হইয়া সাগর হইয়া গেল।

দৃষ্টান্তটি কৃষ্ণসেবা আর কৃষ্ণ হওয়ার সঙ্গে মিলাইয়া লও।

জীবের সুখ যত কৃষ্ণের সুখ তদপেক্ষা বেশী না কম? কৃষ্ণের প্রেম অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি, কৃষ্ণের শক্তি এক কথায় কৃষ্ণের মাধুর্য্য কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু কি আছে? জীব যখন কৃষ্ণে লয় হইয়া যায় তখন কি তার সব লুপ্ত হইল, না, জীবই কৃষ্ণরূপ পাইল! কৃষ্ণ যাহা করেন জীব তাহাই করিতে তখন পারিল—জীব তখন রহিল না কৃষ্ণই রহিলেন। জীব যদি কৃষ্ণরূপে থাকিলেন তবে জীবের লয় হওয়াটা কি?

কৃষ্ণ কখন মরেন না জীব কৃষ্ণ হইয়া মৃত্যু অতিক্রম করিল। কৃষ্ণের কোন অভাব নাই জীব কৃষ্ণ হইয়া সব অভাবের হাত হইতে এড়াইল। ইহাই না জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি? জরা মরণ হইতে চিরতরে এড়াইয়া যাওয়া ইহাই না সবাই চায়? কৃষ্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা কি হয়? এক মাত্র কৃষ্ণই ত অমর। শ্রুতি না এই কথাই বলেন? বলেন না কি?

"ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। তোমাকে জানাই অতিমৃত্যু-মৃত্যু অতিক্রম করা। এতদ্ভিন্ন মৃত্যু-সংসার সাগর হইতে মুক্ত হওয়ার আর দ্বিতীয় পথ নাই। তুমি "মুক্তি তার দাসী" বলিয়া মুক্তিকে ছোট করিলে কি হইবে বল? তোমার এই বচন যে বেদ বিরুদ্ধ হইয়া যায়? ছাড় তোমার অজ্ঞান। শ্রুতি মান্য করিতে শিক্ষা করি এস—আমাদের ইহাতে ভালই হইবে।

দেখিতেছ না শ্রুতি বলিতেছেন "তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা"। কেমন করিয়া ইহা হয় জান?

তোমাকে জানিলে তুমিই হইয়া যাওয়া হয়। হয় না কি? শ্রুতি কি বলেন?

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান। কৃষ্ণকে যিনি জানেন তিনি কৃষ্ণই হইয়া যান। তবেত হইল কৃষ্ণ হওয়ার বেশী সুখ—কৃষ্ণ ভজায় তত সুখ হইতে পারে না।

কৃষ্ণ ভজায় যে সুখ তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া কার্য্য কর, শেষে আমিই কৃষ্ণ ইহা অনুভব কর, অনুভব করিয়া কৃষ্ণ রূপে স্থিতি লাভ কর তোমার পরমানন্দ প্রাপ্তি হইল।

যে কোন শাস্ত্র দেখ—দেখিবে কৃষ্ণ হইয়া যাইবার উপদেশই সর্ব্বত্র পাইবে। সম্মুখে ব্রহ্মপুরাণ। বঙ্গবাসী সম্পাদিত। ২৮৬ পৃঃ। "কৃত্বৈবং কবচং পশ্চাদাত্মানং চিন্তয়েত্ততঃ। অহং নারায়ণোদেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। তোমার ভাগবতেই পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উপদেশ "অহং ব্রহ্ম" ভাবনা কর। সত্যের অপলাপ করিয়া কি ধর্ম্ম প্রচার হয়? যদিই বা হয় তবে সে ধর্ম্ম কয়দিন চলে?

(২)

এখন কিরূপ সাধনা দ্বারা—পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটিবে তাহাই আলোচনা করি এস। কৃষ্ণ বল, রাম বল, দুর্গা বল, কালী বল সবই পরমানন্দের নাম মাত্র। অখণ্ড চৈতন্যই পরমানন্দ। খণ্ড চৈতন্যকে অখণ্ড চৈতন্যে লইয়া যাওয়াই জীবের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

অজ্ঞানে তুমি আমি যেন খণ্ড হইয়া আছি অজ্ঞানটি ছাড় দেখিবে তুমি আমি অখণ্ডই আছ—আছি। অজ্ঞানটি নাশ করাই উদ্দেশ্য। ঘটের ভিতরে যে আকাশ তাহাকে অজ্ঞানে খণ্ড ভাবিতেছ—খণ্ড কল্পনা করিয়াছ কিন্তু দশখানা অস্ত্র দিতেছি একখণ্ড আকাশ কাটিয়া আন দেখি? তা পারনা। কেন পার না? আকাশের খণ্ড হয় না। আকাশের খণ্ড যখন হয় না তখন আকাশ অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম যে চৈতন্য তাহার খণ্ড কি হয়? হয় না! কেবল কল্পনায় ভাবিতেছ চৈতন্য খণ্ড হইয়াছেন। এই কল্পনাটি ছাড়—তোমার পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে।

৩

প্রাপ্তিটি কিরূপে হইবে এখন তাহাই দেখি এস।

গুরু ও শাস্ত্র মত নিত্যক্রিয়াগুলি কর। গুরু বাক্য ও শাস্ত্র বাক্য যদি মিলাইতে না পার তোমার কিছুতেই হইবে না। গুরু বাক্যকে যদি বেদ বিরুদ্ধ মনে কর তবে তোমার গতি নাই—গুরু ও বেদ অভিন্ন। বেদই গুরুরূপে উপদেশ করেন। যেখানে ইহা হয় না সেই খানেই দলাদলি সম্প্রদায়। তাই বড় সাবধান হইয়া কুলগুরু কুলমন্ত্র কুল দেবতা আশ্রয় করিতে হয়—এই তিনই যে এক তাহা বেশ করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। কু মন্ত্র ত্যাগে যে ব্যভিচার হয় সেই ব্যভিচারে লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে।

নিত্যকর্ম্ম দ্বারা আত্ম চৈতন্যটি বেশ করিয়া ধর। যখন গায়ত্রী মন্ত্র জপ কর তখন প্রতি জপে অর্থ ভাবনাতে লক্ষ্য কর, তুমি যাহাকে আমি আমি করিতেছ তিনিই কিন্তু প্রণব তিনিই কিন্তু দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষ ছাইয়া আছেন—তোমার সেই খণ্ড মত চৈতন্যই সেই অখণ্ড চৈতন্যের সেই সবিতার সেই ক্রীড়াশীল দীপ্তিশীল দেবতার বরণীয় ভর্গ—বরণীয় তেজ। ইহার ধ্যান কর করিলেই দেখিবে মা যেমন সন্তানকে পিতার নিকটে পৌঁছিয়া দেন সেইরূপে বিদ্যাতত্ত্ব স্বরূপিণী শুদ্ধা মায়া তোমার আত্মতত্ত্বকে—তোমার খণ্ডমত চৈতন্যকে সেই শিবতত্ত্বে সেই অখণ্ড চৈতন্যে এক করিয়া দিতেছেন। ইহাই "অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর"। ইহাই অভেদে ভজন।

একান্তে সাধনায় ত ইহাই অভ্যাস করিবে। আবার বাহিরে এই সাধনার প্রয়োগ সর্ব্বত্র করিতে হইবে। কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে জান?

আমার দেহের ভিতরে যে চৈতন্য আছেন সেইরূপ চৈতন্য প্রতি দেহেই বিরাজ করিতেছেন। প্রতি কর্ম্মে ভিতরে বাহিরে এই চৈতন্যকে লক্ষ্য কর নিজের মধ্যে ইহার সেবা কর সকলের মধ্যে ইঁহার সেবা কর,

ইনিই সর্ব্বত্র বিলাস করিতেছেন, সর্ব্বদা ইহা স্মরণ কর। এইরূপে প্রতি ভাবনায় প্রতিবাক্যে ইহার সেবা কর। পুস্তক যে পড় ইহাকেই শুনাইতেছ ভাবিয়া পড়। আমার এই চৈতন্যই তুমি। ইনিই যুগে যুগে অবতার হইয়া লীলা করেন—কৃষ্ণের লীলা চিন্তায় রামের লীলা ভাবনায়, শক্তির লীলা চিন্তায় এই চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া ভাবনা কর—এই চৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া স্তব স্তুতি স্বাধ্যায় নাম জপ, রূপ ভাবনা এক কথায় এই চৈতন্যকে সম্মুখে রাখিয়া সেই অখণ্ডের যশঃকীর্ত্তন করিতে থাক—"তখন তেরে সহজ মিলে রঘু রাই" তোমার কৃষ্ণ সহজেই মিলিবেন, আর "তেরে ঘসর মসর মিটি যাই" তোমার ঘসর মসর দলাদলি মিটিয়া যাইবে। তাই বলি শালগ্রাম দিয়া আর লঙ্কা বাটিও না। চৈতন্যকে কপটতায়, জিহ্বার লোভে রিপুর কাম ক্রোধে, সয়তানের অশাস্ত্রীর স্বাধীন বা ব্যভিচারী চিন্তায় লাগাইও না। চৈতন্যকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মত কর্ম্মে লাগাও, চৈতন্যকে ঈশ্বর ভাবনায় লাগাও, সর্ব্বদা লাগাইয়া দেখ নিষ্কাম ভাবে সংসারও চলিয়া যাইবে। তুমি সাধনা দ্বারা সেই এক হইয়া যাও তাহা হইলে তুমি তাই হইয়া সকল লইয়া খেলা করিতে পার, আর আপনি আপনি ভাবে স্থিতি লাভও করিতে পার; অথবা সর্ব্বদা আপনি আপনি ভাবে স্বরূপ বিশ্রান্তিতে থাকিয়াও মায়া লইয়া জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্তিতে কে যায় আসে তাহা দেখিতেও পার। ইহাই জীবন্মুক্তি—ইহাই হরি হইয়া হরি ভজা ইহাই শিবোভূত্বা শিবাং যজেৎ ইত্যাদি। কৃষ্ণ হইয়া যাওয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ আর নাই, প্রয়োগের অভ্যাস সর্ব্বদা কর—ইহা সাধনা-রহস্য।

ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩২৬। পুরী, চক্রতীর্থ।

উৎসব সৎসঙ্গ

যুগধর্ম্ম প্রভাবে ভগবৎ কথা প্রসঙ্গ হিন্দু সমাজে একরূপ বিরল হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন স্থানে এইরূপ সদনুষ্ঠানের কথা শ্রুতি-গোচর হইলেও ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুযায়ী মুক্তিমার্গের পথ ও পাথেয় সম্বন্ধে যে আলোচনা আদৌ হয় না ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কেননা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীন মত এবং প্রভাব বিস্তারের জন্য সকলেই ব্যতিব্যস্ত। যিনি যতই উচ্চাধিকারী হউন না কেন, ভগবান্ ব্যাস ও বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগের মতের সহিত যদি কেহ স্বীয় মত মিলাইতে না পারেন, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার মত ভ্রমাত্মক। এই ভ্রান্ত মতের পোষকতা করিয়া তিনি নিজেরও সর্ব্বনাশ করিতেছেন এবং আপাতরম্য বচন চাতুরীতে অপরেরও সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। মহা সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের একমাত্র মুখপত্র উৎসব পত্রিকায় জীবের নিশ্রেয়স ও অভ্যুদয়—ভোগ এবং অপবর্গ—এক কথায় বলিতে গেলে, ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্তির কৌশল বিগত ত্রয়োদশ বর্ষ কাল প্রচারিত হইতেছে। উৎসব পত্রিকা নিয়মিত রূপে পাঠ করিলে মৃত প্রায় প্রাণে নবীন আশা ও উদ্যম জাগে সত্য এবং ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য মন্য কোন গ্রন্থ পাঠের আ'শ্যাক হয় না ইহাও ধ্রুব সত্য কিন্তু শাস্ত্র বলেন অধ্যাত্ম বিদ্যা সদ্‌গুরু বক্ত্রগম্য। তাই পূজ্যপাদ উৎসব পত্রিকার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক মহোদয় প্রমুখাৎ ভগবৎ প্রসঙ্গ শ্রবণ ককিতে করিতে প্রাণের ভিতর যেন কি এক অব্যক্ত ভাবের স্ফুরণ হয়। এ বিষয় অধিক বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন কেননা বিনা মূল্যে যাহাদের এই কাঞ্চন লাভের সৌভাগ্য আছে তাহারাই ইহা সম্যক্ রূপে অবগত আছেন।

এই অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করিতে অভিলাষী হইয়া উৎসব সেবক

মণ্ডলী প্রতি শনিবার অপরাহ্নে সমবেত হইয়া থাকেন। অভিলাষ পূর্ণ হওয়া—শ্রীভগবানের কৃপা সাপেক্ষ।

প্রত্যেক হিন্দুসন্তানকেই এই সদনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য সাদরে আহ্বান করা হইতেছে। এই সৎসঙ্গের স্থান সম্প্রতি উৎসব কার্য্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ নিকটবর্ত্তী অন্য একটী স্থান নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এবং অন্যান্য অনেক ব্যয় নির্ব্বাহের প্রয়োজন। উৎসব সৎসঙ্গের কর্ম্মক্ষেত্র আপাততঃ স্বল্প পরিসর হইলেও উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং ব্যাপক। সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া উৎসব সেবকমণ্ডলী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃতসঙ্কল্প; ফলাফল তাঁহার শ্রীহস্তে। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

উৎসব সৎসঙ্গে সাধারণের লাভ উৎসবের মত হিন্দু পত্রিকার ও সৎসঙ্গের প্রয়োজন বিদেশাগত বিরুদ্ধ ভাব প্রবাহে পড়িয়া হিন্দু সমাজ আজ ছিন্ন ভিন্ন বিধ্বস্ত হইতেছে। সৎসঙ্গের সংশ্রবে আসিয়া উৎসব সৎগ্রন্থ পাঠ করা যদি দুই একটি গৃহস্থও স্বধর্ম্মে মতি স্থির রাখিতে পারেন এবং তাঁহাদের আচার ব্যবহার, উপাসনা পদ্ধতি দেখিয়া যদি একে একে আরও দশজন আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই দুর্দ্দিনে হিন্দু সমাজের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে।

উৎসবের ও উৎসব সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য কাজের মানুষ তৈয়ারি করা, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দেওয়া, তরলমতি বালক ও যুবক দিগকে পথ দেখাইয়া দেওয়া। কে বল স্রোতের কুটির মত ভাসিয়া বেড়াইতে চায়?

যাহা বলা হইল তাহা সত্য, চিরকালই সত্য—যাঁহারা সত্যে আস্থাবান্, তাঁহারা এই সদনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন এরূপ আশা দুরাশা নহে যাহা একের দ্বারা সম্ভব হইবে না, দশজনের দ্বারা তাহা অনায়াসে সাধিত হইবার সম্ভাবনা। সাহায্য লব্ধ অর্থের ব্যবহার—সাহায্য লব্ধ অর্থ হইতে উৎসব সৎসঙ্গের সাপ্তাহিক অধিবেশনের ব্যয় নির্ব্বাহ

করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইবে—তাহা হইতে উৎসব সদগ্রন্থ প্রচারকল্পে সাহায্য করা হইবে।

আর্থিক সমাবেশ আশাপ্রদ হইলে সহরে বা সহরের উপকণ্ঠে কোন স্থানে একটি আশ্রম স্থাপনের চেষ্টা করা হইবে। বাঙ্‌লার বাহিরে শত শত আশ্রম আছে, কিন্তু সংসার ছাড়িয়া, সংসারের কার্য্য ছাড়িয়া ঐ সকল আশ্রমে যাইবার মত সুদীর্ঘ অবসর কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? কিন্তু নিকটে একটি আশ্রম পাইলে অনেকেই সামান্য অবসরেও সেইখানে আসিয়া একটু জুড়াইতে পারেন। নিরন্তর বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে মন অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়। অবসর মত শান্ত স্থানে, সৎসঙ্গে আসিয়া মিলিত হইতে পারিলে মনের অবসাদ কাটিয়া যায়, প্রাণে সজীবতা হইতে আসে, সদালোচনায় মানুষের বিচার বুদ্ধি বিকাশের সুবিধা পায়। এখানে আসিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা সুকৌশলে সংসার পালন শিক্ষা করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্ম বিদ্যালাভের সুযোগ ঘটে। তাই এইরূপ একটি শান্ত নির্ম্মল স্থানের প্রয়োজন কল্পনা। যাঁহারা এরূপ প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন তাঁহারা এই সদনুষ্ঠানের প্রতি যত্নবান্ হইবেন ইহা স্থির নিশ্চয়। আসুন সকলে মিলিয়া মিশিয়া এক যোগে এইরূপ একটা সদনুষ্ঠানের আয়োজন করি। সমবেত সত্য সদনুষ্ঠান কখন ব্যর্থ হয় না, কারণ তাহার মূলে মহাশক্তি বিদ্যমান।

কালস্রোতে আমরা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহাতে মনে হয় আত্মরক্ষা করিতে হইলে সংসারকে হিন্দুর সংসারের মত বজায় রাখিতে হইবে। সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে পুরাতন ভিত্তির উপর দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইতে হইবে। হিন্দুর সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পল্লীবাস ছাড়িয়া কিম্ভুত কিমাকার অবস্থায় সহরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সেই সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে সেই জন্য প্রয়োজন—সহরের মধ্যে বা সহরতলীতে একটী সৎসঙ্গ মিলন ক্ষেত্র। ভাবিয়া দেখ, মনে মনে বিচার করিয়া দেখ তুমি এইরূপ একটা অভাব বোধ করিতেছ কি

না—না ভাবিয়া উত্তর দিও না, না বিচার করিয়া কথা কহিও না। চিন্তা করিয়া দেখ তোমার আত্ম-রক্ষার জন্য তোমার এখন কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য ঠিক হইলে কল্পনা দৃঢ় হইলে তোমাকে জেদ করিয়া আর কিছুই বলিতে হইবে না—তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই সদনুষ্ঠানে যোগ দিবে, এই সদনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করিবে। যাহা ভাবনায় দৃঢ় হইয়া যাইবে, তাহা কাজে হইতে কতক্ষণ লাগে!

সৎসঙ্গ অধিক কিছু আশা করেন না—যাঁহার যাহা শক্তি সেই মত সাহায্য করুন। এইরূপ অনুষ্ঠানে সাহায্য করিলে তাঁহারাও ধন্য হইবেন এবং লোক মণ্ডলীও ধন্য হইলেন বলিয়া বোধ করিবেন।

আমরা অনুরোধে কাহাকেও কোন কাজ করিতে বলিব না।

প্রথম কথা—প্রয়োজনানুভব,

২য়—কর্ত্তব্য নির্ণয়

৩য়—যাহা মঙ্গলময়ের ইচ্ছা তাহাই হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সৎসঙ্গ সম্পাদক
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভজন করি কার?

"মাতা রামো মৎপিতা রামচন্দ্রঃ স্বামী রামো মৎসখো রামচন্দ্র। সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালুর্নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে॥"

আমার ভজনার বস্তু কোনটী? ভজনা করি কার? রামই আমার প্রিয়, ভজনা করি রামের। কিন্তু এই রাম কে? আমি রামের অথবা রামই আমার সব কিরূপে? রাম ত একটী নাম, নাম রূপত মিথ্যা নামের সহিত যদি নামী না থাকেত আমার উপাসনার বস্তুটী মিথ্যা বা জড় হইয়া যায়; মিথ্যা বস্তু কখন

উপাসনীয় হইতে পারে না। অতএব বিচার করিয়া দেখা উচিত এই রাম কে? রাম যিনি তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্ব বস্তুতে থাকেন কি না। রাম ইন্দ্রিয় গোচর বস্তু অথবা ইন্দ্রিয়াতীত! শ্রুতি বলেন—"নাল্পে সুখমস্তি" যাহা অল্প যাহা কিছু ইন্দ্রিয় গোচর অল্পকাল স্থায়ী তাহা কখন আমার স্থায়ী সুখ বা নির্ম্মল আনন্দ দিতে পারে না। যাহা ভূমালয়, তাহা আমার আস্থার বস্তু হইতে পারে না। আত্মারামই রাম "চৈতন্যং মমবল্লভম্ আমার হৃদয়বল্লভ চৈতন্য ছাড়া আর কি। কিন্তু এই চৈতন্য যখন বাহিরে রূপ-ধারণ করিয়া আগমন করেন তখন কত সুন্দর হয়। চৈতন্য আপন স্বরূপে থাকিয়াও বাহিরে আসিয়া রূপ-ধারণ করিতে পারেন, শক্তি তাঁহার আছে। চৈতন্য অখণ্ড সর্ব্বশক্তিমান। অতএব রূপ-ধারণ করিলেও তাঁহার স্ব স্ব রূপের বিনাশ হয় না। চৈতন্য সদা শান্ত নির্ম্মল একরূপ অব্যয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পুরুষ। "রামং বিদ্ধি পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ মদ্বয়ম্। সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত সত্তা মাত্র অগোচরম্। আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্। সর্ব্ব-ব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্।" রামকে সচ্চিদানন্দ অব্যয় এবং সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত সত্তামাত্র বাক্য মনের অগোচর বলা হইতেছে। যাহা বাক্য মনের অগোচর নির্ম্মল সত্তাস্বরূপ তাহা আমার উপাসনার বস্তু কিরূপে হইবে? চৈতন্য যখন আপনি, আপনি স্ব স্ব রূপে অবস্থান করেন তখন তাঁহার উপাসনা কিরূপে হইবে? উপাসনা হয় বরণীয় ভর্গের। বরণীয় ভর্গই উপাসকের আরোধণীয় বস্তু। বরণীয় ভর্গের নামই রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতি যাহার যাহা। অবলম্বনের জন্যই নাম ওরূপ। রাম যিনি তিনিই সগুণ নির্গুণ আত্মা অবতার সমকালে। অতএব ইন্দ্রিয় গোচর যাহা কিছু সব তিনি বা তাঁহার রূপ, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, অথবা ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্ব বস্তুর সাক্ষী নির্ম্মল পরমাত্মা একমাত্র তিনিই আছেন আর যাহা কিছু সব তাঁহারই রূপ,

তিনি ভিন্ন কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই। আত্মা বলিতে কোন বস্তু বুঝায় ? সর্ব্ব বস্তুর প্রকাশক অন্তরের অন্তর নির্ম্মল জ্ঞান স্বরূপ, দ্রষ্টা, সাক্ষী, হৃদয়ের রাজারূপে যিনি আমার অন্তরে অবস্থিত এই আত্মাকে আমার ভিতরের জিনিষ বলিয়া বুঝি। আত্মাই আমি। কিন্তু অহং উপাধি যোগে আমি আমাকে ক্ষুদ্র এই চৌদ্দপোয়া দেহের সহিত মাখাইয়া ফেলিয়া নিতান্ত 'ছোট' মলিন করিয়া ফেলিয়াছি, আত্মারামই আমার সর্ব্বস্ব, আমি আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নই একথা ভুলিয়া দেহ ও মনে অহংতা ও মমতা মাখাইয়া আমি দেহ মন সাজিয়া আপনাকে তাঁহা হইতে ভিন্ন ভাবিয়া লইয়াছি। ইহাই অজ্ঞান। অজ্ঞানেই অভাব ক্লেশ জ্বালা থাকিবেই। এই অজ্ঞান ভ্রম ভাঙ্গাইবার জন্যই উপাসনা। আত্মারামই উপাস্য, উপাসনার বস্তু আর কেহই নয়। বিন্দু সিন্ধুরই মধ্যে এই অবিদ্যা বাঁধ, নহিলে পূর্ণের অভাব কোথাও নাই। বিন্দু সিন্ধুর সঙ্গে মিশিয়া সিন্ধু হইতেই চায়। মিলন ভিন্ন সুখ কোথায় ! আমার পূর্ণত্বই তুমি, আমি তোমারই অংশ, মহৎ ক্ষুদ্রকে ছাড়িয়া এক নিমিষও নাই তথাপি কি ভ্রম ! ক্ষুদ্র আপন ক্ষুদ্রত্ব ভুলিলেই মহৎ সিন্ধুবক্ষে আপনাকে অভেদ দেখিবে।' জীব তরাইতে ক্ষুদ্রকে মহতে পরিণত করিবার জন্যই অবতারের আগমন হয়। অবতারেরই নাম রূপ লইয়া সাধনা গুরুমন্ত্র ইষ্ট এক আপনাকে আপনার উপাস্যরূপে দেখাই সাধনা। "মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু মন্মথে শ্রীজগন্নাথ" তুমি জগতের গুরু জগতের নাথ তাহাতে কি যদি তোমাকে আমার না বলিতে পারিলাম তাই "মম সর্ব্বস্ব" না বলা হইলে আমার বলিতে না পারিলে তৃপ্তি নাই। প্রথমে আমি তোমার তুমি আমার শেষ তুমিই আমি।

হিন্দুর জাতিভেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তারপর আর এক কথা; এ ভারতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিত একবার হয় নাই। কত সত্য কত ত্রেতা কত দ্বাপর কত কলি এই ভারতের উপর দিয়া চলিয়া গেল তাহার কি ইয়ত্তা আছে? এক কথায় অনাদি অনন্তকাল হইতেই এই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই ভারতের উপর দিয়া চলিতেছে এবং এইরূপই চলিতে থাকিবে। সে হিসাবে জাতি ভেদের প্রচলন সম্বন্ধে সন্দেহ আসিতে পারে কি? জাতি ভেদ যে কোন্ অনাদি অনন্ত যুগের তাহাত কল্পনায় ও ধারণা করা যায় না। আর যখন এই যুগ চতুষ্টয়ের বিপর্য্যয়ে ও জাতিবর্ণের কিছুই ব্যত্যয় হয় নাই, ঠিক একরূপই আছে তখন এই হিন্দুর জাতিভেদ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরের ন্যায় হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেই। জাতি ভেদের বন্ধনে হিন্দুর অকল্যাণকর নহে প্রত্যুত উহা অশেষ শ্রেয়স্কর। যেমন সহসা সর্পদষ্ট ব্যক্তির পায়ের বন্ধন খুলিয়া দিলে তাহার মরণ অনিবার্য্য ও ধ্রুব সত্য; তেমনি এই ভারতের জাতি ভেদের বন্ধন খুলিলে সকলেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। পরম ভগবদ্ভক্ত মহা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম্ এ মহাশয় সনাতন তন্ত্র শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া একথার সার্থকতা দেখাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন আমরা তন্ত্র হইতেও দেখাইতেছি—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যবস্থা রহিত করা কোথাও নাই। তিনি দেখাইতেছেন কুলার্ণব তন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে মহাদেব বলিতেছেন,—

স্ব স্ব বর্ণাশ্রমাচার লঙ্ঘনাৎ দুষ্পরিগ্রহাৎ।
পরস্ত্রীধনলোভাচ্চ নৃণামায়ুঃ ক্ষয়ো ভবেৎ॥

আপন আপন বর্ণাশ্রমের আচার লঙ্ঘন করিয়া, অসৎজন হইতে দান গ্রহণ করিয়া, পরস্ত্রী ও পরধনে লুব্ধ হইয়া মানুষ আয়ু ক্ষয় করে। (উৎসব হইতে উদ্ধৃত)॥ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যভিচার অর্থাৎ জাতিভেদ পালন না করাই যে আয়ুক্ষয়ের একমাত্র কারণ এখানেও তাহাই দেখা যাইতেছে। আর স্বয়ং মহাদেবই যখন একথা বলিতেছেন তখন আর কথা কি ? পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয় আরও দেখাইতেছেন বর্ণাশ্রম মত কর্ম্মদ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করাই ভক্তির কার্য্য, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। 'বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মদ্বারা ভক্তি জন্মে। ভক্তি হইলেই জ্ঞানের উদয় হয় এবং জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ ঘটে। তিনি আরও দেখাইতেছেন—জাতিভেদ হিন্দুধর্ম্মের মেরুদণ্ড। জাতি ভেদ ঈশ্বর কৃত। ইহা না হইলে পবিত্র চরিত্র ও সতীত্ব সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার বিষয় হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় অনেকে জাতি ভেদের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না। আবার কেহ কেহ জাতি ভেদ ভাল বলিলেও বলেন যাহা তাহা আহার করায় জাতি ভেদের কোন ক্ষতি হয় না। এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। এই সিদ্ধান্তে শাস্ত্রকে এবং ঋষি দিগকে নিজের কদর্য্য স্বভাবের মতন করিয়া গড়া হইয়া যায়।' (উৎসব হইতে উদ্ধৃত)॥ বাস্তবিক জাতি ভেদের উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না। জাতি ভেদের এইরূপ অশেষ উপকারিতা হিন্দু শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক কথায় জাতি গৌরব মহিমা জগতে অতুলনীয়। জাতি ভেদই হিন্দুর যথা সর্ব্বস্ব ; জাতি ভেদ না থাকিলে হিন্দুর হিন্দুত্বই থাকিতে পারে না। আর হিন্দুর জাতি ভেদ যে কত সুন্দর সাম্য মূলক আমাদের সামাজিকের ঘটনাই তাহার একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আমাদের সনাতন হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বটেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি লক্ষপতি তিনিও যেমন একজন, আবার যিনি নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান, দিনান্তর একসন্ধ্যাও খাওয়া জুটিয়া উঠে না তিনিও তেমনি একজন। লক্ষপতি ব্রাহ্মণ যেমন সোনা মণিরত্ন খচিত

পরম রমণীয় হর্ম্ম্যতলে বাস করিয়াও পূর্ণকুটীর বাসী নিতান্ত দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরেও অকাতরে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে কন্যাদান করিয়া থাকেন এবং আবার এই লক্ষপতি ব্রাহ্মণই যেমন সেইরূপ কুটীরবাসী নিতান্ত দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে কিঞ্চিতমাত্রও কুণ্ঠিত হন না, পাশ্চত্য সমাজের ধন কুবেরগণ বা বিদ্বদগণ কি কদাচ সেইরূপ করিতে পারেন? হিন্দুর জাতিভেদে ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকল ব্রাহ্মণই সমান। এখানে কাহারও সম্মানের তারতম্য বা ইতর বিশেষ নাই; সকলেই সমান। ইহাইত হিন্দুর জাতিভেদের প্রধান বিশেষত্ব; এই বিশেষত্ব আছে বলিয়াইত আজ হিন্দুর এত গৌরব এত আদর এত সম্মান এত যশ। হিন্দুর জাতিভেদের তুলনা আছে কি? হিন্দুর জাতিভেদ যে পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় তাহাত ইদানীং পাশ্চাত্য সমাজের বিজ্ঞজনেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বাবু সমাজের বাবু লোকেরা যে ইহা স্বীকার করেন না ইহাই দুঃখের বিষয়। উপসংহারে এ সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা উল্লেখ না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না। অশেষ ভক্তি ভাজন সুপ্রসিদ্ধ সুলেখক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় লিখিয়াছেন—হিন্দু বিশ্বাস করে জন্মান্তরের কর্ম্মফলে আজ যে ব্যক্তি নিম্নশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কালে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব এমন কি ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। কিন্তু খৃষ্টানের বিশ্বাস এই যে, তাহারা ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই অনন্ত নরকের ক্রীতদাস। এই উভয় দলের মধ্যে কাহারা মনুষ্যজাতিকে বেশী ঘৃণা করিল? হিন্দুর জাতিভেদ সামাজিক আচার লইয়া, কিন্তু খৃষ্টানের জাতিভেদ আত্মাকে লইয়া। তাহাদের মতে কতকগুলি আত্মাই এক ঘরে হইয়াছে!

(ক্রমশঃ)

উৎসব।

—:-*-:—

স্বাত্মরামায় নমঃ।
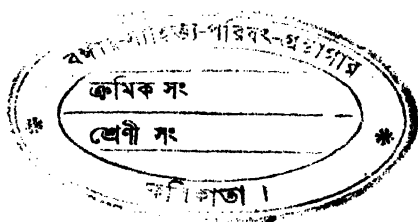
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৪শ বর্ষ। } সন ১৩২৬ সাল, ভাদ্র। { ৫ম সংখ্যা।

লঘুপায়ে ভজা।

তোমার অভয়, চরণ পাইতে,
এ মোর বাসনা মনে।
শয়নে স্বপনে, কিবা জাগরণে,
না ভুলিব এক ক্ষণে॥

প্রভু! এমন দিন কি হবে।
কেমনে হইবে, কে বলিয়া দিবে,
সদা শ্রীচরণ হৃদে রবে॥

[আমি] বিফলে জীবন, কতবা গোয়ানু,
আর বা ক'দিন আছে।
[এখন] শ্রীচরণ পাব, সর্ব্বদা স্মরিব,
থাকিব তোমার কাছে॥

[আজি] এ মধু যামিনী, চাঁদের জোছনা,
সাগর বেলায় খেলে।
[আমি] একেলা বসিয়া, তোমা শুনাইয়া,
কত বলি বিয়াকুলে॥

এ হেন সময়ে, পরাণ ভরিয়ে,
কে যেন কি বলে গেল।
[আমি] পরাণ পাইনু, পরাণ নাথের,
সাড়া হিয়া পরশিল॥

জাগিয়া শুনিনু, সাগর হাসিয়া,
তারি কথা শুনাইছে।
নীলাম্বু বেড়িয়া, সফেন লহরী,
তারি রূপ দেখাইছে॥

অলসে জোছনা, বেলায় শুইয়া,
তারে দেখে দেখে কয়।
লঘুপায়ে ভজ, লীলারসে মজ,
এই ত উচিত হয়॥

অপুনরাবৃত্তির লঘূপায়।

জনন মরণের দুঃখ যিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন— দেবোপম পিতা মাতা, প্রাণের অধিক পুত্র কন্যা, সর্ব্বকালের সুহৃৎ স্ত্রী বন্ধু বান্ধব, কল্পপাদপতুল্য নারায়ণরূপী স্বামী—ইহাঁদের মৃত্যু যাতনা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কি সেইরূপ জন্ম আকাঙ্ক্ষা করেন। সেখানে মৃত্যুযাতনা পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে হয়? যে দেশে গেলে আর জন্মিতে মরিতে হয় না, যে দেশে আর বিরহ বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইতে হয় না, যে রাজ্যে গেলে ভালবাসার বস্তু আর হারাইতে হয় না, যে স্থানে জরা নাই আধি নাই ব্যাধি নাই, যেখানে অনুরাগ আর কখন সরিয়া যায় না—এমন কি কেহ আছে যে সেই দেশে যাইতে চায় না? যে দেশে ভালবাসা কখন পুরাতন হয় না, যে দেশে অনন্ত অনন্ত কাল ধরিয়া ভালবাসা যায়—যে দেশে নরনারী নিত্য নূতন থাকে, যে দেশে চিরদিন মানুষ নবীন কিশোর অবস্থায় থাকে, যে দেশের স্ত্রীপুরুষ প্রেমের মূর্ত্তি—কে না সেই দেশে চিরদিন থাকিতে চায়? যে অবস্থা লাভ করিলে এই নিরবচ্ছিন্ন সুখের দেশ হইতে আর কখন বিতাড়িত হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে আর কখন জরা মরণের দেশে, আধি ব্যাধির দেশে আর ফিরিতে হয় না— সেই দেশ হইতে—সেই অমরত্ব হইতে এই মর জগতে না আসাই অপুনরাবৃত্তি।

অন্য কোন দেশে এই অপুনরাবৃত্তির কথা এত বিশেষরূপে আছে কিনা জানিনা আমাদের দেশে আমাদের জাতিতে ইহাই কিন্তু ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। শ্রীগীতাতে শ্রী ভগবান্ বলিতেছেন—

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে॥" ৭।২৯

যাহারা জরামরণ হইতে অব্যাহতি লাভ জন্য আমার আশ্রয় লইয়া সাধনা করেন ইত্যাদি। শ্রীভগবানের আশ্রয়ে আসিয়া সাধনা

করিলে জরামরণের দায় এড়ান যায়, ইহাই আমাদের জাতির প্রতি শ্রীভগবানের আজ্ঞা। শ্রীভগবানের আজ্ঞামত সাধন ভজন যাহারা না করে তাহাদের পুনরাবৃত্তি হইবেই। কিন্তু সাধন ভজন করিয়া তাঁহাকে পাইলে আর এই জরামরণের সংসারে ফিরিতে হয় না।

শ্রীগীতা বলিতেছেন—

আ ব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জ্জুন।
মামুপেত্যতু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮।১৬

ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোক হইতে জীবগণের পুনরাবৃত্তি হয় কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনরাবৃত্তি নাই।

"যংপ্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" ৮।২১

যাহা পাইয়া জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই আমার পরমধাম-পরম পদ-পরম গতি। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।

শ্রীগীতা এমন জ্ঞানের কথা বলিতেছেন যে জ্ঞানের সাধনা করিলে শ্রীভগবানের স্বরূপের সহিত সাধকের অভিন্নতা লাভ হয় "ইদংজ্ঞান-মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" আর "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ" ১৪।২। জগতের পুনঃসৃষ্টিতে আর ইহাদের জন্ম হয় না এবং জগতের লয়েও ইহাদের নাশ হয় না।

অনন্ত সাধকের জন্য অনন্ত সাধনার পথ খোলা আছে। অধিকার ভেদে নিত্যকর্ম্ম সকলকেই করিতে হইবে। "মরেতি জপ সর্ব্বদা" এই সর্ব্বদার কার্য্যও করিতে হইবে—কিন্তু আরও সহজ উপায় আছে। যতই হীন অবস্থায় মানুষ আসুক না কেন, মানুষ সৎসঙ্গ দ্বারা বড় সহজে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে।

সতের সঙ্গকেই সৎসঙ্গ বলে। অধিকার অনুসারে এই সৎসঙ্গ বহুরূপে হইতে পারে। সৎশাস্ত্রেও সৎসঙ্গ হয়।

জীবন্তভাবে যাহারা সজ্জন সঙ্গ পায় না, তাহাদের জন্যও শাস্ত্র

লঘূপায় দেখাইয়াছেন। যাঁহারা কোনপ্রকার বিদ্যা শিখিয়াছেন, যাঁহারা স্বাধ্যায় কিছু কিছু করিয়া থাকেন বা করিতে পারেন তাঁহারা নিপুণভাবে এই লঘূপায় অবলম্বন করিলে এই অপুনরাবৃত্তির পথে চলিতে পারিবেন—ইহাই শাস্ত্রের আশ্বাসবাণী।

আজকাল গীতাপাঠ কিছু কিছু চলিতেছে। কিন্তু যিনি শ্রীগীতার অর্থ মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়া গীতার ভাবগুলি নিজের চিত্তে বহাইতে পারেন তাঁহার সহজেই হয়।

এই সাধনার কথা বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধ। এই কার্য্যে সময় লাগিবে কিন্তু কিছু দিন সময় দিয়া অভ্যাস করিলে সহজেই লয় বিক্ষেপের দায় হইতে এড়াইয়া ঈশ্বর ভাবনা লইয়া সর্ব্বদা থাকিতে পারা যাইবে। শ্রীভগবানের কথার ভাব যিনি চিত্তে বহাইতে অভ্যাস করেন অসম্বন্ধ প্রলাপ বা সংসার ভাবনা আর তাঁহার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। এইরূপ সাধক সংসার করিতে গিয়াও সংসারের স্থানে ভগবান দেখিয়া দেখিয়া ধন্য হইয়া যান শ্রীগীতা যে শ্রীভগবানের হৃদয় শ্রীভগবানের হৃদয় হৃদয়ে ধরিলে অপুনরাবৃত্তিত হইবেই।

আমরা গীতার প্রথম হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের কতকদূর পর্য্যন্ত এই গীতা স্বাধ্যায়ের কথা বলিতেছি।

হস্তিনাপুরের রাজবাটীর কোন এক নিভৃত কক্ষে সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের কথোপকথন হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে উপনীত কুরুপাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধটা কিরূপে আরম্ভ হইল তাহাই বল। সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন—

কুরুক্ষেত্রের বিস্তৃত সমরাঙ্গণে যুদ্ধার্থ দুই দল সাজিয়া আসিয়াছে। মধ্যে যুদ্ধের স্থান। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্য দেখিয়া দ্রোণগুরুর নিকটে দ্রুতপদে চলিয়াছেন। রাজ আভরণ ঝলমল করিতেছে শিরতাজ দ্রুত গমনে বড়ই হেলিতেছে দুলিতেছে। গুরু দ্রোণের নিকটে গিয়া রাজা সুন্দরবাহু তুলিয়া সেনাপতিকে পাণ্ডবপক্ষের বীর পুরুষদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন। শেষে আপনার পক্ষের বীরপুরুষদিগকেও

দেখাইতেছেন আর বলিতেছেন আপনারা সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করুন। দ্রোণ কিন্তু কোন কথাই কহিলেন না। ভীষ্ম আত্মজন, দূর হইতে দুর্য্যোধনের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া দুর্য্যোধনকে উৎসাহিত করিবার জন্য শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন কৌরবদিগের মধ্যে সকল সেনাপতি শঙ্খনিনাদ করিলেন আর চারিদিকে বহু রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল।

ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদন করিলেন। ক্রমে পাণ্ডব পক্ষে চারিদিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের হৃদয়বিদারক রণবাদ্য বাজিতে লাগিল।

রণকেশরী ধনঞ্জয় গাণ্ডীব সজ্জিত করিয়া অস্ত্রপ্রয়োগ করিবেন— সহসা তাহার মনে অন্য কথা জাগিল। তিনি হৃষীকেশকে বলিতে লাগিলেন—অচ্যুত উভয় সেনার মধ্যস্থানে রথ লইয়া চল—আমি একবার দেখি দুর্য্যোধনের পক্ষে কে কে সমবেত হইয়াছে, কাহার সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে।

কেশব তাহাই করিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণ দেখিয়া অর্জ্জুনের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। স্বজন বন্ধুবান্ধব দেখিয়া তাঁহার অঙ্গ সকল অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, মুখ শুষ্ক হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল—রোমাঞ্চ হইল, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, তাঁহার মন ঘুর্ণিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন তখন যুদ্ধ করিবেন না নিশ্চয় করিলেন। এই যুদ্ধে অনিষ্ট কিরূপ হইবে তাহাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন শোক সংবিগ্ন মানসে সশর চাপ ত্যাগ করিয়া রথোপরি বসিয়া রহিলেন।

প্রথম অধ্যায়টি পড়িয়া পুস্তক বন্ধ কর, করিয়া ভাবনা করিতে থাক। ভাবনাটি হয় হৃদয়ে। হৃদয়মধ্যে কুরুক্ষেত্রের ব্যাপারটি দেখিতে থাক। তোমার হৃদয়ে অর্জ্জুন, তোমার হৃদয়ে সজল জলদ শ্যাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাঁড়াইয়াছেন। অর্জ্জুন শোকসংবিগ্ন মানসে অশ্রুপূর্ণ

লোচনে বসিয়া আছেন আর শ্রীভগবান তাঁহার একান্ত শরণাগত ভক্তের শোকাপনোদনের জন্য কথা কহিতেছেন—তোমার হৃদয়ে যেন এই চিত্র সর্ব্বদা থাকে। এই চিত্র দেখিতে দেখিতে শ্রবণ কর শ্রীকৃষ্ণ পার্থের ক্লীবভাব দূর করিবার জন্য কি বলিতেছেন। পার্থ—সারথি বলিতেছেন যুদ্ধকালে সখা তোমার এই অনার্য্য ভাব কোথা হইতে আসিল ?

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ২।৩

সখা! ক্লীব ভাব ত্যাগ কর। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি, কাতর ভাব তোমার সাজে না। তুচ্ছ হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া উঠ, যুদ্ধ কর।

অর্জ্জুন তখন আরও কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুজনকে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত দেখিতে ইচ্ছা করে ইহাদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করিব কিরূপে? ভিক্ষাজীবনই আমার ভাল। আমি যুদ্ধ করিব না।

শ্রীভগবান তখন শ্রীঅর্জ্জুনকে জাগ্রত করিবার জন্য উপদেশ করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোক হইতে যে প্রবাহ চলিল তাহাই ভাল করিয়া চিত্তক্ষেত্রে বহাইতে অভ্যাস কর।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলিতে, হয় ভগবান শঙ্করাচার্য্য এখান হইতেই শ্রীগীতার ব্যাখ্যায় হাত দিয়াছেন। তাঁহাকে অল্প সময়ের মধ্যে বহু কার্য্য করিতে হইয়াছিল বলিয়া অতি প্রয়োজনীয় যাহা তাহারই তিনি ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য ইহা বলা ঠিক নহে যে শ্রীগীতার প্রথম অধ্যায় হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীগীতার অঙ্গ নহে। যাঁহারা বলেন ভগবান শঙ্কর দশখানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন বলিয়া ঐ দশখানিই উপনিষদ অন্য ৯৮ খানি উপনিষদ পদ বাচ্য নহে—শ্রীশঙ্কর শ্রীযোগবাশিষ্টের ভাষ্য করেন নাই, শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণের ভাষ্য করেন নাই শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য

করেন নাই, অন্যান্য পুরাণের ভাষ্য করেন নাই অতএব এইগুলি শাস্ত্র নহে—এ যুক্তি যাঁহাদের তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা কে যে করে তাহা বলা যায় না। যদি অনেকেই এই অসার যুক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন তবে বলিব তাঁহারা সকলেই নষ্টবুদ্ধি।

সদাচার সম্পন্ন যে সকল সাধক লঘূপায়ে মুক্তিপথে চলিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য শ্রীভগবানের যুক্তিগুলি পরে পরে যথাক্রমে চিত্তে প্রবাহিত করিতে হইবে। বেশী যাঁহারা না পারেন তাঁহারা প্রতিদিন প্রথম অধ্যায়ের চিত্রগুলি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া প্রত্যহ নূতন পাঠের জন্য একটি বা দুইটি শ্লোক বুঝিয়া পড়িবেন। দ্বিতীয় দিনে নূতন শ্লোক একটি কিন্তু পুরাতন সবগুলি মনের মধ্যে প্রবাহিত করা চাই। এইভাবে শ্রীগীতার ভাব যদি হৃদয়ে ভাসিতে থাকে তবে গীতা মাহাত্ম্যের সকল কথাই যে সত্য তাহা এই জীবনেই উপলব্ধি করা যায়। এইভাবে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা যাঁহার অভ্যস্ত হয় তাঁহার যে আর পুনরাবৃত্তি হইবে না ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এখন আমরা ৪।৫টি শ্লোকের ভাব উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

অর্জ্জুন লোক সংহার ভয়ে যখন নিতান্ত মুহ্যমান তখন শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন অর্জ্জুন তুমি অশোচ্য বিষয়ে শোক করিতেছ অথচ পণ্ডিতের মত কথা কহিতেছ। শোক মোহ ত মনের ধর্ম্ম। তুমি মন নও তুমি আত্মা চৈতন্য স্বরূপ। ইহারা মরিবে বলিয়া ত তোমার শোক? কিন্তু তুমি ত এইমাত্র বলিলে "পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ" পিতৃ পিতামহগণ যদি নাই থাকেন তবে পিণ্ডোদক দেওয়া হয় কাহাকে? তবে ত কেহই লোপ পায় না এ কথাও তুমি বলিতেছ। তবে সত্য সত্যই পণ্ডিত হও। পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিতের জন্য শোক করেন না। দেখ, অর্জ্জুন আমি যে পূর্ব্বে ছিলাম না তাহা নহে তুমিও যে ছিলে না তাহা নহে এই রাজারাও যে ছিলেন না তাহাও নহে। ভবিষ্যতেও

আমরা আবার আসিব। তবে শোক কর কার জন্য? মরাটা ত দেহান্তর প্রাপ্তি মাত্র। যেমন কৌমার যৌবন জরা সেইরূপই-দেহান্তর প্রাপ্তি। ধীর ব্যক্তি কি জন্য দেহান্তর প্রাপ্তিতে শোক করিবে বল? যদি বল কৌমার যৌবন জরা এই সকল অবস্থার পরিবর্ত্তনে ত কোন ক্লেশ নাই কিন্তু দেহান্তর কালে ত অতি ভীষণ যাতনা হয়। সত্য কথা ক্লেশ হয় কিন্তু জ্ঞানী যিনি তিনি ত আপনাকে চৈতন্যরূপে দেখেন তাঁহার দেহ পরিবর্ত্তনে কোন শোক হইতে পারে না। যাহারা অজ্ঞানী তাহারা আপনাকে চৈতন্যরূপে ভাবেনা বলিয়াই না দেহের ক্লেশে নিজে ক্লেশ পায়? কিন্তু তুমি বিচার করিয়া দেখ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগেই শোক তাপ হয়, শীত উষ্ণ অনুভব হয়। ইহা কিন্তু আগমাপায়ী—যায় আসে একভাবে থাকে না। এজন্য শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ সকলেরই সহ্য করা উচিত। যদি বল প্রতীকার না করিয়া সহ্য করিতে বল কেন? বলি এইজন্য—সুখ দুঃখ সহ্য করিয়া যদি সমভাবে থাকিতে পার, যদি সুখ বা দুঃখ তোমায় ব্যথা দিতে না পারে, তবে তুমি অমর হইয়া যাইবে। কেন সহ্য করা যাইবে না বল? এই যে দেহটা, এটা কিন্তু অসৎ বস্তু আর চৈতন্যস্বরূপ যে তুমি তুমি সৎবস্তু। অসতের বিদ্যমানতা নাই আর সৎ বস্তুর কখন অভাবও হয় না। তত্ত্বদর্শী হও বুঝিবে যে যে দেহ পূর্ব্বেও ছিল না পরেও থাকে না সেই দেহ যাহা বর্ত্তমানে দেখ তাহা বাস্তবিক নাই। রজ্জুতে সর্পটা আদিতে ছিল না অন্তে রজ্জুর জ্ঞান হইলেও সর্প নাই মধ্যে যে সর্প ভাসিতেছে দেখ, তাহা কিন্তু রজ্জু সম্বন্ধে তোমার যে জ্ঞানের অভাব হয় সেই জন্য। বাস্তবিক কিন্তু বর্ত্তমানেও সর্প নাই। দেহটাও বর্ত্তমানেও নাই। তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসতের তত্ত্ব এইরূপে নিশ্চয় করেন। দেহটা ত বাস্তবিকই নাই। শোক করিবে কাহার জন্য তাহাই বল? আর দেখ দেহটা যেমন কোন কালেই নাই, সেই জন্য ইহাতে শোক করিবার কিছুই নাই সেইরূপ আত্মা যিনি তিনি ত সমস্তই ব্যাপিয়া

আছেন অতি ব্যাপক বলিয়া তিনি অবিনাশী। যিনি অবিনাশী বলিয়া ক্ষয়োদয় শূন্য অব্যয়, তাঁহাকে বিনাশ কে করিতে পারে বল? দেখ অর্জ্জুন তত্ত্বদর্শিগণ বলেন দেহের ভিতরে বাহিরে যে আত্মা থাকেন—যিনি দেহী তিনি অবিনাশী অপরিচ্ছিন্ন তাঁহারই এই সমস্ত দেহ—এগুলি অন্তবন্ত—বিনাশ ধর্ম্মশীল। তবে তুমি অজ্ঞানী হইয়া শোক করিবে কাহার জন্য? তুমি দেহ মরিবে, এই ভয় ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৮ শ্লোক পর্য্যন্ত বলা হইল। বলিতেছি প্রথম দিনে প্রথম অধ্যায় হইতে এই ১৮ শ্লোক পর্য্যন্ত পাঠ কর। করিয়া পুস্তক বন্ধ করিয়া এই পর্য্যন্ত পরে পরে ভাবনা কর। আর বিশেষরূপে ভাবনা কর, শ্রীভগবান্ তোমার বক্ষে দাঁড়াইয়া তোমারই হৃদয়ের অপর পার্শ্বে অবস্থিত অর্জ্জুনকে এই উপদেশ করিতেছেন। শ্রীভগবানের বাক্যগুলি তোমার চিত্তে প্রবাহিত হউক। প্রথম দিনের সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া ১৮ শ্লোক পর্য্যন্ত মনে মনে পুস্তক না দেখিয়া বেশ করিয়া ভাবনা করিয়া লও। দ্বিতীয় দিনে স্বাধ্যায় কালে প্রথমে ১৯ শ্লোকটির অর্থ ধারণা কর; করিয়া আবার প্রথম হইতে ১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত ভাবনা কর। যদি দেখ কোথাও ভুল হইতেছে তবে আবার পুস্তক দেখিয়া ঠিক করিয়া লও। এই ভাবে যদি গীতা স্বাধ্যায় কর, যদি অষ্টাদশ অধ্যায় এই ভাবে তোমার চিত্তে প্রবাহিত হয়, তবে এই জীবনেই তোমার সমস্ত হইয়া যাইবে আর তোমার পুনরাবৃত্তি হইবে না। আবার বলি শ্রীগীতা শ্রীভগবানের হৃদয় "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ।" শ্রীভগবানের হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া যে নিরন্তর থাকে, তারে সংসার আর কি করিতে পারে—যমেই বা তার কি করিবে?

গীতা কঠিন পুস্তক। রামায়ণ সহজ। রামলীলা বড় মধুর। যদি রামায়ণের এক একটি অধ্যায় এই ভাবে ভাবনা কর, তবে বড় সুখ পাইবে এবং লঘুপায়ে অপুনরাবৃত্তি পথে চলিবে, এবং দেখিবে সর্ব্বদা

রাম রাম করিতে পারিতেছ, সর্ব্বদা রামলীলা লইয়া থাকিতেছ। তখন তোমার আর কি অগতি হইতে পারে? আহা যে ভাবিতে পারে অহল্যা পাষাণী হইয়া তাহার হৃদয়ের এক প্রান্তে পড়িয়া আছে, আর ভগবান্ বিশ্বামিত্র শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের হাতে ধরিয়া পাষাণীর বক্ষে চরণ স্থাপন করিতে বলিতেছেন—অহল্যা তোমারই হৃদয়ে যুগযুগান্তর ধরিয়া রাম রাম করিতেছিল, শ্রীভগবানের চরণ স্পর্শে তোমার হৃদয়ে থাকিয়াই মানুষী হইতেছে, আর তোমারই হৃদয়ে দাঁড়াইয়া তোমার হৃদয়স্থিত শ্রীভগবানের স্তুতি করিতেছে তুমি ভাবনা করিতে করিতে ইহা উপভোগ করিতেছ আর কি হইয়া যাইতেছ। এই ভাবে যদি সমস্ত রামায়ণ তুমি স্বাধ্যায় করিতে পার, তবে তোমার হইবেনা ত কি রামু শ্যামুর হইবে? এই ভাবে সাধনা কর, পুনরাবৃত্তি আর হইবেই না। গীতা বল রামায়ণ বল বা চণ্ডী বল এই সকল শাস্ত্র-ভাবনাতে হৃদয়ে যে প্রবাহ উঠিবে তাহাতে তুমি বুঝিবে তুমি দেহ নও কাজেই দেহের ধর্ম্ম জন্ম মরণ তোমার নাই, তুমি প্রাণ নও কাজেই প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা পিপাসা তোমার নাই; তুমি মন নও, মনের ধর্ম্ম শোক মোহ তোমাতে নাই। জনন মরণ ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহ এই ষড়ূর্ম্মি যে অজ্ঞান প্রসূত—সম্পূর্ণ মিথ্যা—যতদিন পর্য্যন্ত ইহা তুমি নিশ্চয় ধারণা করিতে না পারিতেছ; যতদিন পর্য্যন্ত জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহকে মিথ্যা জানিয়া ইহাদের সংস্কার পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে না পারিতেছ, তত দিন পর্য্যন্ত তোমার পুনরাবৃত্তি থাকিবেই। জীব এই ষড়ূর্ম্মির সংস্কার বিচার দ্বারা নষ্ট করিয়া যায় না বলিয়াই জীবকে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিতে হয়। তাই বলিতেছি তপঃস্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান সাহায্যে এই জীবনেই ষড়ূর্ম্মির মিথ্যা সংস্কার মুছিয়া ফেল, দেখিবে শোক মোহে কাতর হইবেনা ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা থাকিবে না, মরিবার ভয়, গর্ভবাসের ভয় আদৌ থাকিবেনা। তুমি তখন অনন্ত কাল ধরিয়া তোমার প্রিয় সঙ্গে নিত্যানন্দে স্থিতি লাভ করিবে। যদি রুচি যায় কর—অমর হও। না কর তবে পুনঃ পুনঃ মর। আর কি?

তুমি কে?

(১)

চিদাকাশ বাসী তুমি অনাদি নির্গুণ।
বাক্য যেথা কুণ্ঠা পায়, মন প্রতিহত হয়,
অবাঙ্ মনসগোচর তুমি সনাতন।
কি আছে আমার বল করিব বর্ণন॥

(২)

বিধি বিষ্ণু মহাদেব সদা করিছে বন্দনা।
দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব যার দিতে নারে সীমা॥
আগম নিগম তন্ত্র যার কাছে অকিঞ্চন।
কি আছে আমার বল করিব বর্ণন॥

(৩)

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যে যিনি অনন্ত অপার।
অসীম জ্ঞানের সিন্ধু প্রেম পারাবার॥
বিশ্বজগৎ সৃষ্টি যাঁর ক্রীড়ার ছলন।
কি আছে আমার বল করিব বর্ণন॥

(৪)

গুণহীন লোকে বলে তবু এত গুণবান্?
অনন্ত শক্তির খেলা একি শুধুই ছলন?
সগুণে নির্গুণ তুমি অপূর্ব্ব কল্পন।
কোন্ গুণে গুণী আমি তোমা করিব বর্ণন?

(৫)

অপূর্ব্ব ! মোহন ! তব মায়ার ছলন ।
একে দুই—দুয়ে এক অসীম মিলন ॥
আধা নর নারী হয়ে গড় ভাঙ্গ বিচিত্র ভুবন ।
কি আছে আমার করি তোমা প্রকটন ?

(৬)

কভু নর কভু নারী ভুবন মোহন ।
কভু শ্যাম কভু শ্যামা ভাঙ্গন গড়ন ॥
কভু অসি কভু বাঁশী বিচিত্র মিলন ।
কেমনে বর্ণিব তোমা অবর্ণ বর্ণন ॥

(৭)

কভু জটাজুট লট্ট পট্ট বাঘছাল ।
কভু ধনুর্ব্বাণ কভু শোভে বনমাল ॥
কভু চক্রপাণি কভু উন্মুক্ত কৃপাণ
ভবভয় ভীত দেব তুচ্ছ মম বাক্য প্রবচন ॥

(৮)

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ! করুণা সাগর !
ভক্ত সাধ পুরাইতে হও অবতার ।
সেবা ছলে প্রকাশহ আপন মহিমা ।
অজ্ঞ দাস কি বর্ণিবে তোমার করুণা ॥

শ্রীআ

পূজার সাহস কেন হয়?

হরি হর ব্রহ্মা যাঁহার নিকট জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া থাকেন, বশিষ্ঠ বাল্মীকি ব্যাসাদি ঋষি যাঁহার চরণ ভিন্ন অন্যদিকে তাকাইতে পারেন না, শ্রীহনুমান ধ্রুব প্রহ্লাদাদি ভক্ত দূরে থাকিয়া যাঁরে ঘন ঘন প্রণিপাত করেন,সেই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর যিনি,একমাত্র অধিশ্বরী যিনি তাঁর কাছে তুমি যাও কিরূপে? রাজরাজেশ্বর যিনি তাঁরে—তোমার মত মানুষ—তুমি বলিয়া সম্বোধন করে কিরূপে? দেবতা ঋষি জ্ঞানী ভক্ত যোগী যে সভা অলঙ্কৃত করেন, সে সভায় তুমি বসিবে কিরূপে? এই জগদধিপতিকে তুমি, বল কিরূপে সে তোমার বড় আপনার জন? সে আমার আপনা হইতেও আপনার, সে আমার হৃদয় বল্লভ, সে আমার সখা, সে আমার দয়িত আমার ঈপ্সিততম সে আমার সকল সাধের সমষ্টি; তুমি কে যে তুমি তারে পূজা করিতে ছুটিয়া যাও? তুমি কে যে তুমি তারে বল আমি তোমায় পূজা করিতে আসিলাম? সে তোমায় আদর করিয়া যে বলে পূজা করিতে আসিয়াছ পূজা কর, এ সাহস তোমার হয় কিরূপে?

বলিতে পার শুধু ঐশ্বর্য্যশালী সে নহে সে যে সকল মাধুর্য্যেরও রাজা। সে যে আপনিই বলিয়াছে সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং—সে যে সকল ঐশ্বর্য্যের রাজা হইয়াও সবার সব হইয়া থাকে তাইত কাঙ্গালের হরিও সে হয়, তাইত পাপী তাপীর সখাও সে হয়, পতিতের পাবন সে হয়, আর্ত্তের ত্রাণ কর্ত্তা সে হয়। গম্ভীর মানুষের কাছে যাইতে ভয় হয়, জ্ঞানী ভক্ত যোগী পরিবেষ্টিত তার কাছে যাইতে পারি না শ্রীহনুমান্ ভীষ্মাদি চিরব্রহ্মচারী মধ্যগত তার কাছে যাইতে ভয় হয় সত্য, কিন্তু সে যে দীনহীনের কাছেও আসে, হাসিয়া কথা কয়, বড় আশ্বাসের কথা ও তাদের কাছে কয়, তাই কি তুমি তার কাছে

নির্ভয়? কথাটা তাই বটে তবু তারে একটু বুঝিতে হয়—তার স্বভাব একটু দেখিতে হয়—সে যে সত্য সত্য বড় আপনার জন তাহা একটু শাস্ত্র মুখে জানিতে হয় তবেই তারে নির্ভয়ে ভজা যায়। শত অপরাধ করিয়াও মানুষ আবার তারে ভজিয়া ভাল হইয়া যায়।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা তুমি, ত্রিজগতের সংহার কর্ত্তা তুমি, দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ং তুমি, কালানল চর্ব্বণকারীও তুমি—কিন্তু বড় সৌম্য মূর্ত্তিও তুমি—ভয়ানাং ভয়াং ভীষণং ভীষণানাং তুমি হইয়াও মধুর মূর্ত্তিরসৌ রঘুনন্দন তুমি—তাই আবার সমকালে। নির্গুণ সগুণ আত্মা অবতার তুমি সমকালে। অবতারের কাছে যাইতেও ভয় হয় কারণ উগ্রতপস্যা যাঁহারা করেন তাঁহারা অবতারের চরণ সেবার অধিকারী—কিন্তু সাধন সম্পত্তি যাহাদের নাই তারা তোমায় কি বলিয়া ডাকিবে? তারা তোমার কাছে কি করিয়া যাইবে? তারা কি তোমার কাছে তবে যাবেনা? পাপী তাপী কি তোমায় দয়াময় বলিয়া ডাকিবেনা, প্রাণেশ্বর বলিয়া আপনাকে তোমার চরণে লুটাইয়া দিবেনা? না না তাকি হয়? তুমি যে সর্ব্ব জীব হৃদয়ে আত্মারূপে বিরাজ কর—তোমাকে লইয়াই যে জীব নিরন্তর চলা ফেরা করে—তুমি যে জীবের সকল কার্য্যে আছ, তুমি যে তার সঙ্গে বালক হইয়া খেলা কর, সখা হইয়া আদর কর, তোমায় ছাড়িয়া যে জীব কোন কিছু করিতে পারে না। সবাই যখন তারে ঘৃণা করে তখনও যে তুমি তারে ত্যাগ করনা তখনও যে তুমি হাসিয়া হাসিয়া তার সব ক্ষমা করিয়া তার অপরাধের ফোঁড়া অস্ত্র করিয়া তারে নির্ম্মল করিয়া আপনার বক্ষে টানিয়া লও, শত পরিচিত মূর্ত্তিতে তারে আদর কর, তার প্রার্থনা শ্রবণ কর, তারে অভয় দাও, তারে আশ্বাস দাও। তোমার কাছে জীব যে বড় নির্ভয়। আত্মার কাছে কাহারও ত ভয় থাকেনা। যাক্ আর এসব বলিব না। বলিব—প্রত্যহ বলিব আমি তোমার পূজা করিতে আসিয়াছি। পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ নৈবেদ্য—সব দিয়া পূজা করিব।

মানসে তোমার পূজা বড় সুন্দর। পূজা করিয়া করিয়া তুমি হইয়া যাওয়া আরও সুন্দর। তুমি হইয়া গিয়া তোমার সন্ধ্যা আহ্নিক করা বড় সুন্দর—আর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, তোমার স্বরূপ ধরিয়া তাতে মিশাইয়া যাওয়া।

বুঝিলে পূজার সাহস কেন হয়? সেই সাহস দেয় বলিয়াইত সাহস। যে তাহার আজ্ঞা পালনে যত্ন করে তারেই সে সাহস দেয়। সে আপনিই তার ভরসা বাড়াইয়া দেয়। যে নিজের ইচ্ছা মত না চলিয়া তার পথে চলিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে, তার ইচ্ছা শাস্ত্র মুখে জানিয়া তার ইচ্ছাকেই নিজের সম্পত্তি করে, নিজের কাম ক্রোধ লোভ জনিত ইচ্ছা অনাস্থা করিয়া তার ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছার মিলন রূপ সংযম অভ্যাস যে করে—যে তার জন্য নিজের সব ত্যাগ করিয়া প্রথমে "আমি তোমার" সাধনা করে সে শেষে তারই হয়। "আমি তোমার" যে সাধিয়াছে সেই তারে বলিতে পারে "তুমি আমার" সত্য সত্যই সে তখন বহুভাবে বুঝাইয়া দেয় "আমি তোমার" আছি ভয় নাই। মৃত্যু সংসার সাগর দেখিয়া ভয় কি? অহং তেষাং সমুর্দ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ইহা তাহারই কথা। নিজের অহং ছাড়িয়া তার অহংকে নিজের অহং কর দেখিবে সেই তুমি সাজিয়া চিরদিন রহিয়াছে।

[শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ-প্রণেতা কর্ত্তৃক লিখিত]

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং ॥

নমোগণেশায় ॥

শ্রী ১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ ॥

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ ॥

বর্ণাশ্রমবিবেক।

প্রথম ভাগ।

বর্ণবিবেক।

বর্ণাশ্রমতত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন উঠিবার উদ্দীপক কারণ।

জিজ্ঞাসু। বর্ণ ও আশ্রম তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু শুনিবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইয়াছে।

বক্তা। বর্ণ ও আশ্রমতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কিছু শুনিবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, তাহার উদ্দীপক কারণ কি?

জিজ্ঞাসু। বেদ ও বেদমূলক স্মৃতি—পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ হইতে লব্ধ প্রকাশ ধর্ম্মের স্বরূপ জানিতে যাইলে বর্ণ ও আশ্রমতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়োজন বোধ না হইয়া থাকিতে পারেনা, কারণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই বেদশাস্ত্রবোধিত অসাধারণ বা বিশিষ্ট ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম তত্ত্বসম্বন্ধে কিছু শুনিবার বিশেষ প্রয়োজন হইবার উদ্দীপক কারণ হইতেছে, ইদানীং শিক্ষিত হিন্দুসমাজের সাধারণতঃ দৃঢ় প্রত্যয় হইতেছে বর্ণ ভেদই হিন্দুদিগের অবনতির মূল কারণ, বর্ণভেদের মূলোৎপাটন করিতে না

পারিলে দুর্গত হিন্দুজাতির উন্নতির কোনই আশা নাই। বর্ণব্যবস্থিতি সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে চিরদিন আছে, চিরদিন থাকিবে, প্রকৃতিভেদে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম, সংসারে কোন বিষয়েই সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত হয় না, হইতে পারে না। উন্নতি-প্রার্থী আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুবংশধরগণ বর্ণভেদের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিতেছেন, বর্ণব্যবস্থিতি যে অহিতকরী তৎপ্রতি-পাদনার্থ যে সকল যুক্তি শর নিক্ষেপ করিতেছেন, আমার বিশ্বাস, সেই সকল কথা বহুদিন হইতেই লোকে শুনিয়া আসিতেছেন, সেই সকল যুক্তিশর ইদানীং বিশেষতঃ তীক্ষ্ণীকৃত হইলেও সামান্যতঃ নূতন নহে। অষ্টোত্তরশত উপনিষদের মধ্যে বজ্রসূচিক নামে একখানি উপনিষৎ আছে; এই বজ্রসূচিক উপনিষদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদের তত্ত্ব কি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদের সাধারণতঃ পরিচিত রূপ যে, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়ানুরূপ নহে, ইহা যে যুক্তিসিদ্ধ হয়না, বজ্রসূচিক উপনিষৎ তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তই যেন উদিত হইয়াছিলেন। আমি বজ্রসূচিক উপনিষৎ যখন প্রথমে দেখিয়াছিলাম, তখন আমার ইহা ঠিক উপনিষৎ কিনা, এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু অষ্টোত্তরশত উপনিষদের মধ্যে বজ্রসূচিক উপনিষদের নাম আছে, দেখিয়া আমি এ সম্বন্ধে কোনরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। বজ্রসূচিক উপনিষৎ যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদের প্রতিষ্ঠার্থ প্রচলিত যুক্তি সমূহের খণ্ডনের জন্য কোন বৌদ্ধ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত বজ্রসূচী নামক একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি, * বজ্রসূচী যে বৌদ্ধগ্রন্থ আমার এখন তাহা বিশ্বাস হইয়াছে।

---

* The Wujra Soochi or Refutation of the Arguments upon which the Brahmanical Institution of Caste is founded by a learned Budhist Ashwa Ghosha.

বক্তা। বজ্রসূচী নামক গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি, এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, পরে তাহা বলিব, তুমি যাহা বলিতেছিলে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু। উইল্‌কিন্‌সন (L. Wilkinson, Political Agent at Bhopal) উক্ত বজ্রসূচী নামক গ্রন্থের ভূমিকাতে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় সমাজের (Indian Socity) সংস্কার ও উৎকর্ষ বিধানার্থ যাঁহারা উৎসুক, বর্ণব্যবস্থিতিকে তাঁহারা সর্ব্বোপরি অনিষ্ট (Evil) বলিয়া খেদ প্রকাশ করেন ("There is no evil in Indian Society, which has been so much deplored by those anxious to promote the enlightenment of the people as the institution of caste"—)। বর্ণব্যবস্থিতির বিপক্ষ যে বহুকাল হইতেই আছেন, এতদ্বারা তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। বেদ ও বেদাশ্রিত শাস্ত্রসমূহ হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজন এবং উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি, কিন্তু প্রাচীন ও নবীন বিপক্ষ দলের প্রতিকূল যুক্তিজাল সর্ব্বথা খণ্ডন করিতে পারিনা বলিয়া বর্ণ ব্যবস্থিতি সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন উদিত হয়, স্বয়ং কোন প্রশ্নেরই সমাধান করিতে সমর্থ হইনা। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে অহিতকর, ইহার মূলোৎপাটন করিতে না পারিলে, হিন্দুজাতির উন্নতির যে কোন আশা নাই, অধুনা শিক্ষিত হিন্দুসমাজের মধ্যে বহুব্যক্তির তাহাই দৃঢ় ধারণা হইয়াছে।

বক্তা। বর্ণভেদের মূলোৎপাটন করিবার নিমিত্ত আর বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবেনা। কালে জগৎ সৃষ্ট হয়, কালে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যখন যাহা ঘটিবার কাল উপস্থিত হয়, তখন তাহা আপনা হইতেই ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, এ যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ একবর্ণীভূত হইবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে, শাস্ত্রের ভবিষ্যৎবাণী অভ্রান্ত। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূল যুগপ্রভাবে শিথিল হইয়াছে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিলোপের কাল সমাগত।

জিজ্ঞাসু—এ যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, অতএব বর্ণ ও আশ্রম তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন কথা শুনিবার ইচ্ছা করা উচিত নহে কি ?

বক্তা—আমি তাহা মনে করিনা, যাঁহাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি আছে, বেদের উপদেশে যাঁহাদের অদ্যাপি আস্থা আছে, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স হেতু ধর্ম্মের স্বরূপ বেদ ভিন্ন অন্যতঃ অবগত হওয়া যায়না, বেদ হইতেই ধর্ম্মের প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে যজ্ঞার্থ বেদকেই আশ্রয় করিবে ("নান্যতো জ্ঞায়তে ধর্ম্মো বেদাদেবৈষ নির্ব্বভৌ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যজ্ঞার্থে বেদমাশ্রয়েৎ।") ভগবান্ ব্যাসদেবের এই কথা সারগর্ভ, যাঁহারা স্ব স্ব প্রকৃতির প্রেরণায় এখনও এইরূপ বিশ্বাসবান্, চাতুর্ব্বর্ণ্য, ভূরাদিলোকত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয় বেদ হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করে, অধিক কি, যাহা যাহা হইয়াছে, যাহা যাহা বর্ত্তমান, এবং যাহা যাহা হইবে তৎসমস্তই একমাত্র বাগাত্মা বেদ হইতে অবগত হওয়া যায়, মনুসংহিতার অতীব গম্ভীরার্থক পরমহিতকর এই উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বেদমূলক, ইহা অমূলক বা মনুষ্যকল্পিত নহে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে মনুষ্যের চরম উন্নতি বা পরম কল্যাণ সাধিত হইতে পারেনা। জড়বিজ্ঞানের এবং শিল্প-কলার প্রকৃষ্ট উন্নতি মনুষ্যকে কখন পূর্ণভাবে সুখী করিতে পারিবে না, সনাতন বেদোপদিষ্ট, বস্তুতঃ পরমহিতকর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুরোপ আমেরিকাদির ন্যায় কেবল জড়বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার উপাসনা করিলে কদাচ ইষ্টসিদ্ধি হইবে না, যাঁহারা এবম্প্রকার প্রতিভা বিশিষ্ট, তাঁহাদের বর্ণাশ্রমতত্ত্ব বিষয়ক জিজ্ঞাসা উদিত হইবেই।

জিজ্ঞাসু—আমাকে তাহা হইলে কৃপাপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে যথা প্রয়োজন কিছু উপদেশ দিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

প্রথমে বর্ণতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শুনিবার ইচ্ছা হইবার কারণ।

বক্তা—বর্ণাশ্রমতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যাহা যাহা বলিব তদ্দ্বারা তোমার যে বিশেষ লাভ হইবে, আমার তাহা বিশ্বাস হয় না, কারণ বর্ণাশ্রমতত্ত্ব দুরবগাহ, যথাশাস্ত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ইহার স্বরূপ দর্শন হইতে পারে না, যে চক্ষু দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের তত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়, সে চক্ষুর উন্মীলন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠানাপেক্ষ। বর্ণ-তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শুনিবার ইচ্ছা হইবার কারণ প্রথমে শুনিবে, না আশ্রমতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ প্রথমে শুনিবে ?

জিজ্ঞাসু—প্রথমে বর্ণতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণের অভিলাষ হইতেছে।

বক্তা—অগ্রে আশ্রমতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণের ইচ্ছা না হইবার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু—বর্ণতত্ত্ব যত বিবাদাস্পদ, যত দুর্ব্বিজ্ঞেয়, আশ্রমতত্ত্ব, আমার ধারণা, অত বিবাদাস্পদ ও দুর্ব্বিজ্ঞেয় নহে। বর্ণব্যবস্থিতির উপরি আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুসমাজের যত বিদ্বেষ লক্ষিত হয়, আশ্রম বিভাগের প্রতি তত বিদ্বেষ লক্ষিত হয় না। বর্ণব্যবস্থার মূলে কুটারাঘাত করিবার নিমিত্ত শিক্ষিত হিন্দুসমাজ বিশেষতঃ ব্যগ্র হইয়াছেন, আমি এই জন্য প্রথমে বর্ণতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

বক্তা—ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম বিভাগের প্রতি ইহাঁদের বর্ণব্যবস্থিতির ন্যায় বিদ্বেষ না হইবার কারণ কি ? ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় সম্বন্ধে ইদানীন্তন শিক্ষিত হিন্দুসমাজের কি মত ?

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের প্রতি শিক্ষিত হিন্দুসমাজের মত।

জিজ্ঞাসু—ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় সম্বন্ধে যে ইহাদের আপত্তি নাই, তাহা নহে, তবে বর্ণব্যবস্থিতির ন্যায় আশ্রমবিভাগের অনিষ্টকারিতা শিক্ষিত হিন্দুসমাজের অদ্যাপী অনুভূত হয় নাই। গৃহস্থ আশ্রম সম্বন্ধে (শাস্ত্রোক্ত আচারাদি বাদ দিলে) কোনরূপ আপত্তি হইতেই পারে না। কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত (modified) ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের উপকারিতা অধুনা কেহ কেহ উপলব্ধি করিতেছেন। তবে বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি ইহাঁদের অনুরাগ নাই, বরং দ্বেষই আছে। সমিদাহরণ, ভৈক্ষচর্য্যা গুরুশুশ্রূষা ইত্যাদি অসভ্যোচিত অপকৃষ্ট অনুষ্ঠানকে ইহারা নিষ্প্রয়োজন অসভ্যোচিত ও মানহর মনে করেন, সমিদাহরণাদি না করিয়াও, ব্রহ্মচর্য্য পালন হইতে পারে, ইঁহাদের ইহা বিশ্বাস। পূর্ব্বে বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত যাহা যাহা আচরণীয় তাহাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া বুঝা হইত, এখন ব্রহ্মচর্য্য বলিতে তাহা বুঝা হয়না। বানপ্রস্থ আশ্রম সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ, এখন বানপ্রস্থ আশ্রমের উপযোগী স্থান ও নাই, বনী হইবার প্রবৃত্তিও এখন অল্প ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। নূতন কালীন রূপান্তরিত সন্ন্যাস আশ্রম সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত হিন্দু দিগের, অনুমান হয়, বিশেষ আপত্তি থাকিবার কারণ নাই, যে যে বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে, সেই সেই বিষয়কে ইঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট আশ্রমধর্ম্ম এখন অনেকেই পালন করেন না, যাঁহার যাহা ইচ্ছা, যাঁহার যাহা ভাল লাগে (শাস্ত্রদৃষ্টিতে আশ্রমধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও) এক্ষণে অবাধে তাহা তাঁহারা করিতে পারেন। ধর্ম্মজগতে অধুনা নির্ভয়ে, যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, ধর্ম্মরাজ্য এখন অনেকতঃ প্রজা প্রয়োজনতন্ত্র। এখন কাহাকেও আর

কাহারও শাসন মানিতে হয় না, কাহাকেও কাহার বশে থাকিতে হয় না, ধর্ম্মরাজ্যে এক্ষণে সকলেই স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিতে পারেন। ইদানীং যে কেহ যে কোন আশ্রমধর্ম্ম নিজ প্রয়োজন ও বাসনানুসারে পালন করিতে সমর্থ। এখনকার ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী বিনা বাধায়, যখন ইচ্ছা গৃহস্থের ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারগ, এখন কেহ কাহাকেও বাধা দেন না, অধুনা কাহারও কাহাকে বাধা দিবার সামর্থ্যও নাই। অতএব আশ্রম বিভাগের উপরি আধুনিক অপরিচ্ছিন্ন সাম্যভাবের দর্শনেচ্ছু অপেক্ষাকৃত উন্নতম্মন্য হিন্দু সমাজের বিশেষতঃ দ্বেষ বুদ্ধির আবির্ভাবের প্রয়োজন হয় নাই। বাধা দিলেই বাধা পাইতে হয়, যে কাহাকেও বাধা দেয় না, সে কাহারও নিকট হইতে বাধা পায়না। যে কোন বর্ণ এখন সন্ন্যাসী হইতে পারেন, কাহাকেও কোন নিয়মের অধীন থাকিতে হয় না, বোধ হয় এই নিমিত্ত আশ্রম বিভাগের প্রতি ইহাঁদের তাদৃশ বিদ্বেষ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

বর্ণব্যবস্থিতিই হিন্দুজাতির অবনতির কারণ, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যুক্তি।

বক্তা—বর্ণব্যবস্থিতি হিন্দুজাতির অবনতির মূল কারণ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যুক্তি কি ?

জিজ্ঞাসু—উন্নতম্মন্য শিক্ষিত হিন্দুসমাজের মধ্যে যাঁহারা বর্ণ-ব্যবস্থিতির মূলোৎপাটনের প্রয়োজন বুঝিয়াছেন, বর্ণব্যবস্থার উচ্ছেদ করিতে না পারিলে, হিন্দু জাতির উন্নতির কোন আশা নাই, যাঁহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অহিতকারিতা

প্রতিপাদনার্থ তাঁহারা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, আপনাকে তাহা শুনাইব কি ?

বক্তা—ইচ্ছা হইলে, শুনাইতে পার।

জিজ্ঞাসু—আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস, বর্ণব্যবস্থিতি পৃথিবীর মধ্যে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতির নাই। বর্ণভেদ যদি প্রাকৃতিক হইত, তাহা হইলে ইহা অন্য জাতিতেও থাকিত। পৃথিবী-মধ্যে বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ হতভাগ্য হিন্দুজাতি ভিন্ন অন্য সকল জাতিই অল্প-বিস্তর স্বাধীনতা সুখ ভোগ করিতেছেন। সভ্যতার উচ্চ সোপান পদ্ধতিতে অবস্থিত, ক্রমোন্নতির শান্তিপ্রদ, সুখজনক প্রসন্নবদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সদা মুদান্বিত য়ুরোপাদি দেশবাসী দিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অহিতকারিতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয়। ইহাঁরা বলেন, যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহাদের সুখময়ী অবস্থার দিকে নয়ন প্রেরণ কর; আর পরাধীন পরমুখাপেক্ষী—বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ দুর্গত হিন্দুজাতির ম্লানমুখের দিকে তাকাও, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কিরূপ অকল্যাণকর, তাহা হইলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, এই সর্ব্ব অনর্থের নিদান বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলোৎপাটনে যত্নশীল হওয়া উচিত কি না।

বক্তা—হিন্দুজাতির যে ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যে সকল জাতির বর্ণব্যবস্থিতি নাই, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয় নাই, তাঁহারা যে, অল্প-বিস্তর স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করিতেছেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আচ্ছা বর্ণব্যবস্থিতি থাকাতে হিন্দুজাতির যে অধঃপতন হইতেছে, তাহার কারণ সম্বন্ধে যথোক্ত শিক্ষিত হিন্দুসমাজ কি বলেন ?

(ক্রমশঃ)

স্বপ্ন না কল্পনা।

———৹৺৹———

সখি!

বসিয়া বসিয়া নিশি শেষ প্রায়,
নিরাশ নয়ন জলে।
অবসাদে দেহ পড়িল ঢলিয়া,
পদ উপাধান তলে॥

সে বলে আসিব তাই গো সজনি,
উৎকণ্ঠা স্ফুটিত দৃষ্টি।
আজন্ম সঞ্চিত শুষ্ক কণ্ঠ সই,
চাতকি পরাণ বৃষ্টি॥

সেকি রে শুনে না কাতর আহ্বান,
ব্যাকুল প্রাণের দান।
(তার) সান্ত্বনা উচ্ছ্বাসে হয় জাগরিত,
নিস্তেজ নীরব প্রাণ॥

আমি ভালবাসি সমগ্র পরাণে,
শুনিতে তাহার কথা!
নিদাঘ অনলে যেন হিম ছায়া,
মরিয়া বাঁচেগো লতা॥

ক্ষুদ্র তটিনীর অদম্য উদ্যম,
সাগর পানেগো ধায়।
মহান জলধি উপেখি কটাক্ষে,
দলে কি চরণে তায়॥

উচ্চ গিরি শৃঙ্গে সূর্য্য রশ্মি ঢালে
কতনা আদর করে।
তা'বলে কি সই তাঁর কৃপা কণা
পশেনা দরিদ্র ঘরে ?

সই অতীত আশার কুহেলিকা মাঝে
বাসনার অন্তরালে।
কি শুভ মুহূর্ত্ত আসিল সজনি
দেখিনু বিরাম কালে॥

তন্দ্রা কি জাগ্রত স্বপ্ন কি সুষুপ্তি
বুঝিতে নারিনু সখি।
উছলিত প্রাণ কি এক প্রভায়
সবিস্ময়ে চেয়ে দেখি॥

সেই দেব দেহ পূর্ণ মহিমায়
সুনীল সরোজ নেত্র।
ব্রহ্ম তেজ দীপ্ত ঝলসিছে কণ্ঠে
মনোহর যজ্ঞসূত্র॥

ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব আগম
মূর্ত্তিমান দেখি অঙ্গে
ত্রিমূর্ত্তি গায়ত্রী আসিছে বাহিরে
কত ভক্ত তার সঙ্গে॥

কিবা অব্যক্ত মধুর বচনে অভয়
প্রফুল্লবিজ্ঞান মূর্ত্তি।
জলদে জড়িত বিদ্যুল্লতা যেন
হৃদয়ে স্ফুরিত ভক্তি॥

কিবা স্নিগ্ধ ধারা সুকণ্ঠে কবিত্ব
জীবশিক্ষা ভরা গান।
সত্য ও ত্রেতায় দ্বাপরে কলিতে
ছাড়িয়া একটি তান॥

চাহি ঊর্দ্ধ নেত্রে ইঙ্গিতে সজনি
দেখায় আপন স্থান।
বলি ধীরে ধীরে অনুষ্ঠান প্রথা
হইল গো অন্তর্দ্ধান॥

বাহ্যজ্ঞান শূন্য অনুভব লয়
দেখিতে দেখিতে হায়
না ফেলিতে সই আঁখির পলক
লুকাল গগন গায়॥

সে যে এসেছিল সাধ ভরা প্রাণে
লইতে আমার পূজা
দেখি ভুলে আছি তাই ফিরে গেল
(সই) কত না পাইল সাজা?

শ্রীভরত।

মঙ্গলাচরণ।

(১)

মনোঽভিরামং নয়নাভিরামং বচোঽভিরামং শ্রবণাভিরামং।
সদাভিরামং সততাভিরামং বন্দে সদা দাশরথিঞ্চ রামম্॥

(২)

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুর মানুষ তির্য্যগাদীন্।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত
স্তত্তো বিভেত্যখিল মোহকরী চ মায়া॥

(৩)

যৎ পাদপঙ্কজরজঃ শ্রুতিভির্বিমৃগ্যং
যন্নাভিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ
যন্নাম সাররসিকো ভগবান্ পুরারি।
স্তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি॥

(৪)

নমস্তুভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে॥

শ্রীশ্রীদুর্গা—

শরণং।

শ্রীভরতের অবতরণিকা।

বিচিত্র-ঘটনা শ্রীভরতের জীবনে ঘটে নাই, কিন্তু যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতেই জীবন ধন্য করিবার উপাদান রহিয়াছে। বিবাহের পরে মাতুলালয়ে গমন, উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে মাতুলালয় হইতে আগমন, মাতার নিকটে পিতার মৃত্যু সংবাদ ও রাম বনবাস বৃত্তান্ত শ্রবণ, কৌশল্যা জননীর নিকট নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ, চিত্রকূটে রাম-মিলনের পূর্ব্বে বশিষ্ট দেব কর্ত্তৃক পরীক্ষা, চিত্রকূটপথে গুহক ভগবান ভরদ্বাজ ও লক্ষ্মণের সন্দেহ অপনয়ন, চিত্রকূটে রাম-মিলন, পাদুকার অধীনে থাকিয়া নিষ্কামভাবে রাজ্যপালন, বনবাসান্তে শ্রীহনুমান মুখে রামাগমন শ্রবণ এবং শ্রীরামকে রাজ্যপ্রত্যর্পণ ইহাই শ্রীভরতের জীবনের ঘটনা।

এমন করুণরস-পূর্ণ জীবন ত আর কাহারও দেখা যায় না। যাঁহার কোন অপরাধ নাই, তিনি যদি কোন বিচিত্র অবস্থায় সকলের নিকট অপরাধী বলিয়া প্রতীত হন, তবে বুঝি তাঁহাকে সকলেরই নিকট কাঁদিতে হয়। ভরতকে জীবনের বহুদিন ধরিয়া কাঁদিতেই হইয়াছিল। নির্ম্মল ভরত মাতৃ অপরাধে অপরাধী। ভরতের দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করে না এমন মানুষ বুঝি নাই!

শ্রীরামায়ণের ভরত-চরিত্র অতি সুন্দর। এই ভরত-চরিত্রের অনুকরণ করিতে পারিলে শ্রীভগবানে কিরূপে আত্ম-নিবেদন করিতে হয়, সকল ভাবনা বাক্য কর্ম্ম তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এবং তুমিই আমার হৃদয়ের রাজা আমি তোমার দাস জানিয়া এই দুর্ব্বার মৃত্যু সংসার সাগরে শ্রীভগবানের অভয়চরণ-তরণী লাভ করিয়া অনায়াসে

সংসার পার হইতে পারা যায়। ভরত-চরিত্র অনুকরণে কর্ম্মের কৌশলরূপ যে যোগ তাহা শিক্ষা করিয়া সাধক বা সাধিকা সকল সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া চির অমরত্ব লাভ করিতে পারে।

ভরত ত বৈরাগ্যের মূর্ত্তি। এ বৈরাগ্যের মূলে ছিল রামানুরাগ। যিনি রামকে ভালবাসিয়াছেন জগতে এমন কি আছে যাঁহা তাঁহাকে রাম ভুলাইতে পারে? প্রেম ত নিজে ভোগ করিতে কিছুই চায় না; নিজে ভোগ করার সুখ ত প্রেমিকের কাছে অতি ঘৃণ্য। প্রিয়কে যে সব দিতে চায় সে কি প্রিয়ের জন্য সংগৃহীত কোন কিছু প্রিয়কে বঞ্চিত করিয়া ভোগ করিতে পারে? ভরত যে প্রেমের মূর্ত্তি। তাই ভরত অযোধ্যার রামের রাজসিংহাসন অধিকার করিতে পারিলেন না। তাই ভরত রামের আজ্ঞায় রামের পাদুকাকে রত্নসিংহাসনে বসাইয়া রামবোধে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন—রাম-বোধে রামের পাদুকার সহিত কথা কহিয়া ছিলেন—ভরতের প্রেমে পাদুকা জীবন্ত হইয়াছিল।

"কামার্ত্তা হি প্রকৃতি কৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।" অনুরাগের চক্ষে চেতন অচেতনের ভেদ লক্ষিত হয় না। কালিদাসের যক্ষ অচেতন মেঘকে দূত করিয়া প্রিয়ার নিকট পাঠাইয়াছিল। আর দময়ন্তী অস্ফুট চেতন হংসকে দূত করিয়া নলের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আর ভরত? রাম পাদুকার উপরে শ্রীরাম, পদ রক্ষা করিয়া সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য পালন করিতেছেন দেখিতে পাইতেন, তাই তিনি পাদুকার সহিত কথা কহিতেন। নিষ্কাম কর্ম্মের এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথায়? স্বামীর পাদুকার পূজা এখনও এ জাতির মধ্যে দেখা যায়—ইহা বুঝি শ্রীভরতের পাদুকা পূজার অনুকরণ? হইতেও পারে।

শ্রীভগবানকে লাভ করিবার সহজ সাধনা শ্রীভরতে আছে। পুস্তক লেখা বা পুস্তক পড়ায় যদি শ্রীভগবানকে ভাবনা না করায়, তবে সে ক্ষণিক চিত্ত বিনোদনে বড় একটা কিছু হয় না। ভগবৎ

ভাবনাইত ভবরোগের একমাত্র ঔষধ। শুধু শ্রবণে কি হইবে যদি শ্রবণের পর মনন না করা যায়? কোটি কল্প-শাস্ত্র শুনিলেও কিছু হইবে না যদি শ্রুত-বিষয় ভাবনা না করা যায়। ভাবনাই সাধনার প্রাণ। ভাবনাই নষ্টবুদ্ধি জনগণের সংসারসাগর পার হইবার লঘূপায়। ভরত লিখিয়া ভরত ভাবিয়া ভরতের মত হইয়া রাম রাম করিবার জন্যইত এই আয়োজন? ভরত চতুর্দ্দশবর্ষ সাধনা করিয়াছিলেন, আর শ্রীভগবান ঠিক চতুর্দ্দশবর্ষের শেষে শ্রীভরতের প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিয়া ছিলেন। আর তোমার আমার জীবনব্যাপী সাধনার শেষেও কি রাম আসিয়া তাঁহার এই দেহরাজ্য গ্রহণ করিয়া হৃদয় সিংহাসনে চরণ স্থাপন করিয়া একবার উপবেশন করিবেন না? অথবা এ ভাবনা সাধকের কেন আসিবে? সাধক এই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লঘূপায় ধরিয়া শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালনরূপ স্বাধ্যায় চেষ্টা করুন ইহাই ত প্রার্থনা। ইতি—

প্রথম চিত্র।

ভরত এখনও যুধাজিৎ নগরে। ভরতের মাতুল বিবাহের কিছু দিন পরেই ভরতকে লইয়া গিয়াছেন। মাণ্ডবীও বুঝি ভরতের সঙ্গে গিয়াছিলেন এ সংবাদ কিন্তু ভগবান বাল্মীকি কোথাও দেন নাই। দিবার অবসর তাঁহার ছিল না। আমরা শুধু শ্রীভরত লইয়াই ভাবনা করি তাই মাণ্ডবীকেও তাঁহার সঙ্গে দেখি।

শ্রীভরতের বয়ঃক্রম এখন ২৭ বৎসর। বিবাহের পরে দ্বাদশ বৎসর কাটিয়া গেল।

আজ চৈত্র মাস। "চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিত কাননঃ" এই ত রাম অভিষেকের সময়। ফলে ফুলে প্রকৃতি সাজিয়া রাম অভিষেক দেখিতে আসিল, বিহগকুল সপ্তমে তান তুলিয়া মধুরকণ্ঠে রামগুণ গাহিতে লাগিল, ফুলকুল রামচরণে স্থান পাইবে বলিয়া

সুবাসে দিক আমোদিত করিয়া রামানন্দে ভরিয়া আনন্দে ফুটিয়া উঠিল, রামগুণ-কীর্ত্তনে অযোধ্যাবাসীরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভুলিল, সীতার সহিত কখন রাম রাজাসনে উপবিষ্ট হইবেন, কখন্ সেই ভুবনমোহন বিদ্যুল্লতাজড়িত নব-জলধর রামকে আমাদের রাজা হইয়াছেন দেখিব, পুনঃপুনঃ এই কথা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া অযোধ্যাবাসীরা অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে ভাসিতে লাগিল। অযোধ্যায় রামাভিষেকের মহা ধুম পড়িয়া গেল। (ক্রমশঃ)

হিন্দুর জাতিভেদ।

(শেষানুবৃত্তি)

অনন্তকালেও তাহাদের আর মনুষ্য সমাজে উঠিবার সম্ভাবনা নাই। ইহারাই হিন্দুর জাতিভেদ প্রথাকে মিলনের পরিপন্থী মনে করে।

আসল কথা গরজ বড় বালাই। এ দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও মুসলমান বৌদ্ধ এক সঙ্গে আহার করে না বলিয়া কি তাঁহারা মিলিয়া মিশিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করে না? বঙ্গবাসী হইতে উদ্ধৃত॥ বাস্তবিক্ যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক না কেন হিন্দুর জাতিভেদের তুলনা নাই। হিন্দুর জাতিভেদের মত এমন সুন্দর সাম্য-মূলক জাতিভেদ জগতে আছে কি? অতএব যাঁহারা বলেন হিন্দুর জাতিভেদ কুসংস্কার-মূলক এবং কাল্পনিক বা মনুষ্যকৃত তাঁহারা নিশ্চিতই ভ্রান্ত। হিন্দুর জাতিভেদ কিছুতেই কাল্পনিক বা মনুষ্যকৃত নহে; অনাদি অনন্তকাল হইতেই জন্মগত। যিনি এই হিন্দুর জাতিভেদের ধ্বংসসাধনে উদ্যত হইবেন তাহার পতন অনিবার্য্য ও ধ্রুব সত্য। ইতি—

শ্রীআনন্দবিহারী সেনগুপ্ত,
ভোলা, বরিশাল।

উৎসব।

—ঃ-*-ঃ—

স্বাত্মরামায় নমঃ।
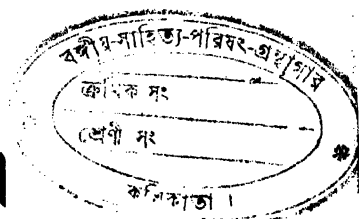
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৪শ বর্ষ। | সন ১৩২৬ সাল, আশ্বিন ও কার্ত্তিক। | ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

ভক্ত ও ভগবান।

ছাড়িয়া যাইতে পারি না তবুও ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তখন ভক্ত কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন ঃ—

স্নেহো মে পরমো রাজংস্ত্বয়ি তিষ্ঠতু নিত্যদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা বীর ভাবো নান্যত্র গচ্ছতু॥
যাবদ্রাম কথা বীর চরিষ্যতি মহীতলে।
তাবৎ শরীরে বৎস্যন্তি প্রাণা মম ন সংশয়ঃ॥
যচ্চৈতচ্চরিতং দিব্যং কথা তে রঘুনন্দন।
তন্মমাপ্সরসো রাম শ্রাবয়েয়ুর্নরর্ষভ॥
তৎশ্রুত্বাহং ততো বীর তব চর্য্যামৃতং প্রভো।
উৎকণ্ঠাং তাং হরিষ্যামি মেঘলেখামিবানিলঃ॥

হে রাজন্! আপনার প্রতি যেন আমার অবিচল স্নেহ সর্ব্বদা থাকে। সর্ব্বকালে যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকে আমার ভাব যেন আর কোথাও না যায়। বীর! যতদিন রাম-কথা এই ধরাতলে থাকিবে, ততদিন আমার শরীরে প্রাণ থাকিবে সন্দেহ নাই। হে রঘুনন্দন রাম! হে নরর্ষভ! তোমার এই দিব্য চরিত্র কথা অপ্সরোগণ আমাকে শুনাইবে। ইহা শুনিয়া শুনিয়া হে বীর! হে প্রভো! বায়ু যেমন মেঘখণ্ড অপসারিত করে সেইরূপ আমিও আপনার অদর্শন জনিত উৎকণ্ঠা দূর করিব।

সত্যই ত! অদর্শন জনিত উৎকণ্ঠা দূর করিবার উপায়ই হইতেছে তোমার চরিত্র কথা শ্রবণ করা—করিয়া তোমার যশোগান করা তোমার নাম কীর্ত্তন করা। বিরহে যথা তথা অটন বা ভ্রমণ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ।

(২)

শ্রীভগবান্ তখন এই ভক্তকে আলিঙ্গন করিলেন; করিয়া বলিতে লাগিলেন—

মহাবীর তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে সংশয় নাই। যতদিন আমার কথা লোক সমাজে প্রচলিত থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তোমার কীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিবে এবং তুমিও শরীর ধারণ করিয়া থাকিবে। আর লোকাহি যাবৎ স্থাস্যন্তি তাবাৎ স্থাস্যন্তি মে কথাঃ—আর যতদিন এই সকল লোক থাকিবে ততদিন আমার কথাও থাকিবে। কত ভাগ্য ভক্তজনের! শ্রীভগবান আরও বলিতে লাগিলেন—

একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে।
শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম ঋণিনো বয়ম্॥
মদঙ্গে জীর্ণতাং যাতু যত্ত্বয়োপকৃতং কপে।
নরঃ প্রত্যুপকারাণামাপৎস্বায়াতি পাত্রতাম্॥

কপিবর! তোমার একটি একটি উপকারের জন্য প্রাণ দিতে হয়। কত উপকার তুমি করিয়াছ! একটি উপকার শোধ দিতে হইলে প্রাণ দিতে হয় কাজেই অন্য উপকারের জন্য আমরা ঋণী রহিলাম। হে কপে! তুমি যে সমস্ত উপকার করিয়াছ তাহা আমার শরীরে জীর্ণ হইয়া যাউক; যেহেতু বিপৎকাল আসিলে মানুষ প্রত্যুপকারের পাত্র হয়।

অহোভাগ্য! সেই ভক্তের—শ্রীভগবান্ যাঁর নিকটে ঋণী থাকেন।

ততোহস্যহারং চন্দ্রাভং মুচ্য কণ্ঠাৎ স রাঘবঃ।
বৈদূর্য্যতরলং কণ্ঠে ববন্ধ চ হনূমতঃ।
তেনোরসি নিবন্ধেন হারেণ মহতা কপিঃ।
ররাজ হেমশৈলেন্দ্রশ্চন্দ্রেণাক্রান্তমস্তকঃ॥

শ্রীভগবান্ তখন নিজ কণ্ঠ হইতে বৈদূর্য্যতরল চন্দ্রাভ হার উন্মোচন করিয়া শ্রীহনূমানের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন আর কাঞ্চন পর্ব্বত সুমেরু চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত হইয়া যেমন শোভা পায় শ্রীমৎ হনূমান সেই হার বক্ষে ধারণ করিয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।

আমরা এই ভক্তকে কোটি কোটি প্রণাম করি। এমন সৌভাগ্য আর কার?

আগমনী।

ওই এল আগমনী আনন্দ মুখর ধ্বনি,
তারা-হারা পাবে কি সে আঁখির সে হারামণি ?
আসিবে সে কতক্ষণে অপেক্ষিয়া পথ চাহি,
স্মরিয়ে যে গেছে কাল যায়নিগো বৃথা বাহি।
ভরিত ও দিঠি' হেরে মাখি নব অনুরাগ,
বলিদে সেমুখ স্মরি বৃথা বাসনার ছাগ।
বরষা গিয়েছে চলি এনেছে শারদ রাতি,
তারি হাসি প্রসন্নতা পুলক-কৌমুদী ভাতি।
পীযূষ পূরিত বক্ষে কত না ভরসা দানি ;
লুটায় ক্ষেতের বুকে স্নেহের অঞ্চল খানি।
নিরমল নদীজল সোহাগেতে ঢল ঢল,
গুঞ্জরিত মধুব্রত সৌরভ কমলদল।
ব্যক্ত আজি ফলে ফুলে মায়ের সোহাগ হাসি
ছেয়ে গেছে তরুমূলে শেয়ালি ফুলের রাশি।
বাসিত মধুর বায়ে আগমন চিহ্ন ভাসে,
পথ চেয়ে আছে ধরা চরণ পরশ আশে।
আজি নাই ধনী দীন নাই বাছা, মাতৃহীন ;
সবাই মায়ের শিশু রাজা প্রজা সম দান।
আয়রে মায়ের হয়ে জুড়াবি স্নেহের ছায়ে ;
উৎসব ভরা প্রাণে উৎসব যে তারে চেয়ে॥

পূজার ভাবনা।

সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদিতে যদি ভাবনা না থাকে তবে কি হয়—কবে হয় তাহা বলা যায় না। লবণ হীন ব্যঞ্জন আর ভাবনা হীন পূজা প্রায় একই রকমের।

কতবার ত পূজা দেখিলাম অঞ্জলি দিলাম কত পূজা করিতেও দেখিলাম কিন্তু কি হইল? ধর্ম্মভাব যতক্ষণ ততক্ষণ। ইহাতে ত মরণমূর্চ্ছাকালে কোন উপায় লাগিতে পারে না; ইহাতে ত সেই নিদান কালে—যখন অনুগ্রাহক দেবতারাও ত্যাগ করিবেন—চক্ষু থাকিয়াও দেখিবে না, কর্ণ থাকিয়াও শুনিবে না, মুখ থাকিয়াও বলিবে না—সেই নিদান কালে কি হইবে তাহার ভরসা কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রতিদিনের কার্য্যে যদি ভাবনা থাকে—যদি ভাবনাটি—ঈশ্বর ভাবনাটি বেশ করিয়া অভ্যস্ত হইয়া যায় তবে প্রাণ ত বড় শীতল হয়। সেই জন্য এই মহাপূজার দিনে একটু ভাবনার কথা আলোচনা করি। তোমার কাছে প্রার্থনা করি তুমি একটু উপায় করিয়া দাও।

শাস্ত্র বলেন "দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ" দেবতার সঙ্গে পরিচয় নাই বল পূজা হয় কিরূপে? পরিচয় কিরূপে হইবে?

শ্রুতিই আমাদের সকল জ্ঞানের আধার। শ্রুতি এই বিষয়ে কি উপদেশ করেন তাহারই অনুসন্ধান করা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। বেদ পাঠত ব্রাহ্মণের স্বাধ্যায়, ইহাও ত নিত্য কর্ম্ম।

বেদ পাঠ কিন্তু সকলের হইতে পারে না। যাঁহারা বেদকে বা বেদের দেবতাকে নিজের মধ্যে মিলাইয়া লইতে পারেন না অর্থাৎ

যাঁহারা অধ্যাত্ম বিদ্যা স্ফূরণ করাইবার চেষ্টা করেন না তাঁহারা বেদের কিছুই বুঝিবেন না। মনু ভগবান বলিয়াছেন—

নহ্যনধ্যাত্মবিদ্ বেদান্ জ্ঞাতুং শক্নোতি তত্ত্বতঃ।
নহ্যনধ্যাত্মবিদ্ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশ্নুতে॥

অধ্যাত্মজ্ঞান যাঁহার নাই তিনি বেদের মর্ম্ম জানিতে সমর্থ হন না। কোন অনাধ্যাত্মবেত্তা বিচারের ফল যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা পান না। অধ্যাত্ম বিদ্যা না জানিয়া যদি কেহ বেদ ব্যাখ্যা করেন তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণের যোগ্য নহে। আচার্য্য গৌড়পাদ বৈতথ্য প্রকরণের ৩০ শ্লোকে ইহা বলিয়াছেন; আচার্য্য শঙ্কর ঐ শ্লোকের ভাষ্য করিতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত মনুস্মৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই দুর্গাপূজার দিনে দেখি এস বেদ কি ভাবে মহাদেবীকে ভাবনা করিতে বলিতেছেন। প্রথমেই বলিতেছেন—

শ্রীদেব্যুপনিষদ্বিদ্যা বেদ্যাহপার স্মৃখাহকৃতি।

ত্রৈপদং ব্রহ্মচৈতন্যং রামচন্দ্রপদং ভজে॥ ইহার পরেই ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শান্তিঃ॥ শান্তিপাঠ মন্ত্রের পরেই দেবতাগণ দেবীর নিকটে গিয়া বলিতেছেন—

হরিঃ ওঁ সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ। কাহসি ত্বং মহাদেবি? সমস্ত দেবতা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— মহাদেবি তুমি কে?

দুর্গাপূজা ত মহাপূজা। এক সঙ্গে বৎসরের প্রায় সব পূজাই এক-পূজায় হইয়া থাকে। মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী মহাকালী গণপতি কার্ত্তিক ইত্যাদির পূজা বৎসর ধরিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হইতে থাকে। দুর্গা পূজার পরে কোজগর পূর্ণিমাতে লক্ষ্মীপূজা। পরে অমাবস্যায় কালীপূজা, পরে কার্ত্তিক গণপতি—মহাসরস্বতী আবার বাসন্তি ইত্যাদি।

এত পূজা ত এখনও দেখি কিন্তু দেবীর ভাবনা যেমন ভাবে শ্রুতি বলিতেছেন তেমন ভাবে হয় কি? কৈ কখনও দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি কি মহাদেবি! তুমি কে? যদি কখন

জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকি তবে না হয় এইবার হইতেই আরম্ভ করি। আমাদের মধ্যে দেবতাগণ কে এবং মহাদেবী কে ইহা মিলাইয়া লইবার ভার পূজকের উপরেই রহিল।

মা তুমি কে? ইহার উত্তরে দেবী বলিতেছেন—

সাঽব্রবীদহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ শূন্যং চাশূন্যং চ। অহমানন্দা নানন্দাঃ। বিজ্ঞানাঽবিজ্ঞানেঽহম্। ব্রহ্মাঽব্রহ্মণী বেদিতব্যে। ইত্যাহাঽথর্বণী শ্রুতিঃ। মহাদেবী আবার বলিতেছেন অহংপঞ্চভূতান্যপঞ্চভূতানি। অহমখিলং জগৎ। বেদোঽহমবেদোঽহম্। বিদ্যাঽহমবিদ্যাঽহম্। অজাঽহমনজাহম্। অধশ্চোর্দ্ধং চ তির্য্যক্‌চাহম্। অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি ইত্যাদি। সকল কথার ব্যাখ্যার স্থান আমাদের নাই। একটি একটী কথাই আলোচনা করা যাউক।

আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী। মা বলিতেছেন আমি স্বরূপে ব্রহ্মই। কি বুঝিলাম ইহাতে?

যাঁহাকে দেবীমূর্ত্তিতে উপাসনা করিতে যাইতেছি তিনি স্বরূপে ব্রহ্ম—তিনি চৈতন্য। চৈতন্যই দেবীর মূর্ত্তি ধরিয়াছেন। মূর্ত্তিটি গৌণ আর চৈতন্যই মুখ্য। চৈতন্য আপনি আপনি। ইনি নিরাকার। ইহাঁর পূজা সাকারেই হয়। সাকার অবলম্বন করিয়া নিরাকার চৈতন্য ভাবনা করিতে হয়। তাই তন্ত্রও শ্রুতি অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন "সাকারেণ বিনা দেবি নিরাকারং ন পশ্যতি। সাকার না ধরিয়া নিরাকারে স্থিতি লাভ হইবে না। কৃষ্ণ বল, রাধা বল, শিব বল, কালী বল, রাম বল, সীতা বল, এই সমস্ত মূর্ত্তিই ব্রহ্ম চৈতন্যের। মূর্ত্তি ধরিয়াই ব্রহ্মচৈতন্য ভাবনায় ব্রহ্মচৈতন্যে স্থিতি লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্ম চৈতন্যই সেই পরম পদ। যত দেবতা সবাই এই পরম পদেই অবস্থিত। "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ" ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্র ইহা।

এখন দেখ ভাবনা কিরূপ করিতে হইবে। মহাদেবী বলিতেছেন—

আমিই পরমপদ, পরমব্যোম্, মহাবিষ্ণু, পরমাত্মা, মহাদেবী। আমি যখন আপনি আপনি থাকি তখন অখণ্ড চৈতন্য। সর্ব্বদা অখণ্ড থাকিয়াও খণ্ড মত হইয়াই আমি জগৎ ভাঙ্গি গড়ি। আমার চারি পাদের তিন পাদ সর্ব্বদা চলনরহিত কম্পনরহিত অবস্থায় থাকে। অবিদ্যাপাদের এক অতি ক্ষুদ্র স্থানে আমার আত্মামায়া যেন ভাসে। তখন তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমিই সগুণব্রহ্ম হই। যখন জগৎ ভাসে তখন আমি বিশ্বরূপে থাকি। আবার ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে আত্মারূপে থাকি। আবার জগতের বিপ্লবকালে মূর্ত্তি ধারণ করি। সমকালে আমি নির্গুণ সগুণ আত্মাও অবতার। এই কথা আমরা পূর্ব্বে এই পত্রিকায় বহুবার বহু ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

এই মহাপূজার দিনে এই মহামায়ী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতীকে দেখিতে দেখিতে ভাবনা কর না—মা তোমরা তিনেই এক। জগৎ যখন না থাকে তখন মা তুমি কিরূপে থাক, আবার জগৎ যখন উঠে তখন সমষ্টি জগতে তুমি কিরূপে থাক, প্রতি ব্যেষ্টিতেই বা কিরূপে থাক আবার অবতার হইয়া জগতে কত ভাবে কত লীলা কর! আহা! এ ভাবনায় যে ব্যক্তি ভরিত হৃদয় হয় তাহাকে কি আর অন্য কিছু বলিতে হয়? মায়ের এই মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে সে কোন্ রাজ্যে যে চলিয়া যায় তাহা কে বলিবে? নামরূপ গুণ লীলা ধরিয়া স্বরূপ চিন্তা যে কত সুন্দর তাহা যে না করিয়াছে সে বুঝিবে কিরূপে? এই প্রকারের ভাবুক জন সর্ব্বত্রই যে মাকে দেখে তাঁহা কি আর বলিয়া দিতে হয়? মা যে বলিতেছেন শূন্যও আমি অশূন্যও আমি; আনন্দ ও আমি নানন্দও আমি; বিজ্ঞানও আমি অবিজ্ঞানও আমি; ব্রহ্মও আমি অব্রহ্মও আমি; পঞ্চভূতও আমি অপঞ্চভূতও আমি। এই অখিল জগৎ আমিই। বিদ্যা অবিদ্যা, অজা অনজা, অধ, উর্দ্ধ তির্য্যগ্ সবই আমি। আহা! জগতের সব দেখিয়া যে আমাকেই দেখে আর বলে "নেহ নানাস্তিকিঞ্চন" সব আমার মা। মা ভিন্ন আর নানা বস্তু বলিয়া কিছু নাই। কুমারী মূর্ত্তি মাই ধরেন, যুবতী মূর্ত্তি ধরিয়া মাই

আহার দেন, বৃদ্ধা মূর্ত্তি মায়েরই—আহা! স্থাবর জঙ্গমের কোলে কোলে যে হৃদয় বিহারিণী মাকে ভাবনা করিতে পারে, জগতের সকল বস্তু, জগতের সুরূপ কুরূপ, হিংসা দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা নীচতা, উদারতা মহত্ব—জগতের সকল ভাবে সকল বস্তুতে যে মাকে স্মরণ করিতে পারে, সে যে সর্ব্বদাই এক অতি রমণীয় জগতে রমণীয় দর্শনকে লইয়া থাকে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

দেবীর নিকট হইতে "কাহংসি ত্বং মহাদেবি" ইহার উত্তর শুনিয়া দেবতাগণ কি অপূর্ব্ব দেখিতেছেন। সাকারে নিরাকার ভাসিয়া উঠিতেছে। সত্যই দেখিতেছেন একাদশ রুদ্র অষ্টবসু দ্বাদশ আদিত্য বিশ্বদেব রূপে বিচরণ বার এক তুমিই। মিত্রাবরুণকে অগ্নিকে অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে ধরিয়া আছ তুমিই। সকলকে—অনন্ত কোটি জগতকে ধরিয়া আছ তুমিই। যাগ যজ্ঞ দ্বারা লোকে দেবতাদের তৃপ্তি সাধন করে সেই যজ্ঞ ফলরূপ ধনাদি দান কর তুমিই। তুমিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী, তুমিই উপাসকদেবগণের ধনদায়িনী, ইষ্ট ফলদাত্রী, তুমিই সর্ব্বদা সর্ব্ব-দর্শিনী, উপাসক দেবগণের মধ্যে আছ তুমিই; সর্ব্ব দেহে সর্ব্বরূপে বিরাজ কর তুমিই, নিখিল পদার্থের সত্তা তুমিই, জীবন ও তুমিই; এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী দেবগণ যেখানে থাকিয়া যাহা কিছু করেন তাহা তোমার আরাধনাতেই পর্য্যবসিত হয়।

তুমি সকলের ভোজন শক্তি রূপিণী, দর্শন শক্তি রূপিণী, জীবন শক্তি রূপিণী, শ্রবণশক্তিরূপিণী। তোমা দ্বারাই সকলে ভোজন করিয়া থাকে দর্শন করিয়া থাকে, জীবিত থাকে, শ্রবণাদি সমস্ত কার্য্য করে। যাহারা তোমার তত্ত্ব জানে না তোমার তত্ত্ব জানিয়া ও তোমার ভাবনা করে না তাহারা সংসারে জন্ম মৃত্যু রূপ ক্লেশের দ্বারা পীড়িত হয়।

জীব! এই উপদেশ তুমি শ্রবণ কর আর সর্ব্বদা স্মরণ রাখ।

দেবতা ও মানুষের উপাস্য যে ব্রহ্ম তাহাও তুমি স্বয়ং। তুমি

যাহাকে ইচ্ছাকর তাহাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর, তাহাকে সৃষ্টি কর্ত্তা কর ঋষি কর—ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের দ্রষ্টা কর—সুন্দর প্রজ্ঞাশালী কর।

রুদ্র যে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন তাহা তোমারই কর্ম্ম। তুমিই তাহাকে নিহত করার নিমিত্ত আপন শক্তি দ্বারা রুদ্রের ধনু বিস্তৃত করিয়াছিলে। তোমার উপাসক গণের রক্ষার জন্য তুমিই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাক এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর বাহিরে ভিতরে তুমিই ওতপ্রোত ভাবে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছ।

তুমিই ভূলোকের উপর স্বর্গ লোককে প্রসব করিয়াছ। পরমাত্মাতে যে সর্ব্বব্যাপিনী ধীবৃত্তি আছে তন্মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্ম চৈতন্যই তোমার আবির্ভাবের কারণ। সেই হেতু তুমি চৈতন্যরূপে এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছ।

তুমি স্বতন্ত্র-ঈশ্বর। তোমার কোন কার্য্য করিতে অন্যের সহায়তার অপেক্ষা নাই। তুমি নিজেই এই ত্রিভুবন সৃজন করিয়া ইহার অন্তরে বাহিরে বায়ুর ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিতেছ এবং পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকেই তুমি নিজ মহিমায় অধিষ্ঠিতা আছ কিন্তু তুমি স্বয়ং নির্লিপ্তা তোমাতে কোনরূপ অবিদ্যা মালিন্য নাই।

দেবীর কথা দেবতাগণ ত বলিলেন—তুমি এই ভাবে এই মহাদেবীকে ভাবনা করনা। আর দেবতাগণের মত একটু স্তব করনা—আর প্রণাম কর না। মনে মনে স্তবের সঙ্গে প্রণামটি সর্ব্বদার কার্য্য করিয়া ফেল না।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥
তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্ম ফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরাং নাসয়তে তমঃ॥
দেবীং বাচ মজনয়ন্ত দেবাস্তাং, বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সানো মন্দ্রেষমূর্জ্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপসুষ্টুতৈ তু॥

কালরাত্রীং ব্রহ্মস্তুতাং বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরম্।
সরস্বতীমদিতিং দক্ষ দুহিতরং নমামঃ পাবনাং শিবাম্॥
মহালক্ষ্মীশ্চ বিদ্মহে সর্ব্বসিদ্ধিশ্চ ধীমহি তন্নোদেবীঃ প্রচোদয়াৎ॥

দেবতাগণ বুঝিলেন মাকে বুঝাইলেন। বলিলেন
এষা শ্রীমহাবিদ্যা। য এবং বেদ স শোকং তরতি।

আবার বলিলেন
তামহং প্রণৌমি নিত্যম্॥ আবার ধ্যান করিতেছেন।
হৃদ্পুণ্ডরীক মধ্যস্থাং প্রাতঃ সূর্য্যসমপ্রভাম্।
পাশাঙ্কুশধরাং সৌম্যাং বরদাঽভয়হস্তকাম্॥
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্তকামদুঘাং ভজে।

এস এস আমরাও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি আর বলি—

নমামি ত্বামহং দেবীং মহাভয়বিনাশিনীম্।
মহাদুর্গপ্রশমনীং মহাকারুণ্যরূপিণীম্॥
মন্ত্রাণাং মাতৃকা দেবী শব্দানাং জ্ঞানরূপিণী॥
জ্ঞানানাং চিন্ময়াঽতীতা শূন্যানাং শূন্যসাক্ষিণী॥
যস্যাঃ পরতরং নাঽস্তি সৈষা দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা॥
দুর্গাৎ সন্ত্রায়তে যস্মাৎ দেবী দুর্গেতি কথ্যতে।
প্রপদ্যে শরণং দেবীং দুন্দুর্গে দুরিতং হর॥
তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীং দুরাচারবিঘাতিনীম্।
নমামি ভবভীতোঽহং সংসারাঽর্ণবতারিণীম্॥

মায়ের ভাবনা এইরূপে করিয়া স্তবস্তুতি কর। ভাবনা করিতে করিতে প্রণাম কর। আর সর্ব্বদার সম্বল ইষ্ট নামটি অবলম্বন কর। সর্ব্বদা ভিতরে প্রণাম করিতে করিতে ইষ্ট মন্ত্র জপ কর আর বাহিরেও সকল বস্তুতে সেই আছে স্মরিয়া মনে মনে তারে প্রণাম কর। তবেই ভিতরে বাহিরে সর্ব্বদা তারেই লইয়া থাকিতে পারিবে। সর্ব্বদা তার ভাবনা ভাবিয়া তার ভাবে ভরিত, হইয়া থাকিতে পারিবে।

বলিতেছ, "সর্ব্বদার জন্য একটি জিনিষ থাক্। সেটি নাম। নামই নামী, নামই গুরু, নামই ব্রহ্ম, নামই ইষ্ট। তাই নাম লইয়া সর্ব্বদা থাকায় বড় সুখ। সুখে দুঃখে, ভয়ে ভাবনায়, আনন্দে নিরানন্দে, হর্ষে বিষাদে, রোগে দৈন্যে, ধর্ম্মে বাক্যে, সর্ব্ব কালে নামই সঙ্গীরূপে থাকুক। সকল যাতনা, সকল বিঘ্ন, সকল ভয়, দূর কর নাম জপিয়া। প্রাণে প্রাণে ভরিয়া তখন তারই আস্বাদ সুখে ভরিয়া যাইবে। এই নামের সাধনা বড় সুলভ। নামের সাধনাই প্রথম সাধনা—শেষ সাধনাও বটে। গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম সীতারাম শেষেও বটে। নাম নাম নামই সব। মরেতি জপ সর্ব্বদা। দুর্গা দুর্গা শিব শিব সর্ব্বদা স্মরণের বস্তু বটে। আবার বলি নামই তোমার আমার সব হউক। নাম বুকে ধরে এই সংসার সাগর অনায়াসে পার হওয়া যাইবে। শাস্ত্রও তাই বলেন—

যন্নাম স্মৃতিমাত্রতোঽপরিমিতং
সংসার বারাংনিধিং
তীর্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোঽপি পরমং
বিষ্ণোঃ পদং শ্বাশ্বতম্।
তন্নৈবাদ্ভুত কারণং ত্রিজগতাং
নাথস্য দাসোঽস্ম্যহং
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্
নারায়ণো মে গতিঃ॥

আজ একবার চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করি এস। এই শির ঐ চরণে চির লুণ্ঠিত থাকুক ইতি।

আবাহন।

এস মা আনন্দময়ি ভবভীতি হরা।
সর্ব্ব হৃদি নিবাসিনী ত্রিপুর সুন্দরী।
প্রণব পিঞ্জরে শুকী তুমি গো মা তারা
আগম কানন মাঝে তুমি মা ময়ূরী।

নির্লিপ্তা নির্গুণা নিত্যা শুদ্ধা সনাতনী
রাজগুহ্য ব্রহ্মবিদ্যা হর মনোরমা।
স্মৃতি-শ্রুতি তুমি কামধেনু স্বরূপিণী ;
জ্ঞপ্তিরূপা নিত্যানন্দা এস রামরমা।

দেব তৃপ্তি বিধায়িনী অনাদি নিধনা
বর্ণ পদ বাক্য অর্থ রূপে বর্ত্তমান।
অনন্ত অব্যক্তা উমা বিশাল লোচনা
কম্বুকণ্ঠী সর্ব্বভূতে কর অধিষ্ঠান।

সংসার সন্তাপহরা তুমি সুধানদী
তুমি মা সেবক জনে জিহ্বাগ্র-বাসিনী।
মন বুদ্ধি পর-পারে তুমি নিরবধি
এস মা চিন্ময়ি চিৎশক্তি স্বরূপিণি।

এস মা এ পূজা যজ্ঞে তব দ্যোতমান
দ্যুলোক হইতে আজি ধর্ম্মার্থ দায়িনি
শম দম ভক্তি মুক্তি কর মা প্রদান
রোগ শোক তাপ হরা ঐশ্বর্য্য রূপিণী।

শরতে প্রকৃতি

প্রকৃতির পরিবর্ত্তন কি বিনা প্রয়োজনে হয়? স্থাবর জঙ্গমের কোন কার্য্যই যখন নিষ্কারণে হয়না তখন ঋতুপরিবর্ত্তনেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। ভক্ত, জ্ঞানী, বিজ্ঞানবিৎ, নাস্তিক, সকলেই কিন্তু আপন আপন প্রতিভাবলে এক এক প্রকার কারণ উল্লেখ করেন আমরাও আমাদের মতন করিয়া করি।

আমরা বলি ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতি পুরুষের পূজার জন্যই বিচিত্র ভাবে আয়োজন করেন। প্রকৃতি পূজা করেন বলিয়াই যাঁহারা প্রকৃতির সেবক তাঁহার প্রকৃতির অনুকরণেই পূজা করেন। যাঁহারা পূজা দেখিতে পান না তাঁহারা পূজা করেন না। যাঁহারা পূজা করিতে জানেন না তাঁহারাও কিন্তু এই শরৎকালে কাহারও যেন একটা সুখময় স্পর্শ অনুভব করিতে পারেন—যদি একটু করিয়া নির্জ্জনে থাকেন। ভাবুকে বলেন এই কালে চক্ষু যেন কাহারও রূপ দেখে, কর্ণ যেন কাহারও কথা শুনে।

"প্রকৃতি করেন পুরুষের পূজা আর পুরুষ করেন প্রকৃতির আদর। এই আদর এই পূজা কত সুন্দর। এই খেলাই প্রকৃতি—পুরুষের মিলন খেলা। প্রকৃতি পুরুষকে ভুলাইবার জন্য দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে নূতন নূতন সাজে সাজে। কখন সুন্দর ফুল ফুটাইয়া, কত সুন্দর করিয়া শিশিরবিন্দুর মালা গাঁথিয়া প্রকৃতি খেলা করে, কখন আকাশে নানা রকমের রংমাখা সুন্দর কাপড় পরিয়া দেখা দিয়া যায়, বিজলী খেলায় আপন রূপের ঝলকে আপনি আপনার চক্ষু ঝলসিয়া দিয়া যায়। প্রতি ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতি নূতন ভাবে নূতন সাজে সাজিয়া আসে।

বর্ষার অশ্রুভরা চক্ষু, শরতের আনন্দময়ী মূর্ত্তি, আবার শীতের কুয়াসার আঁধারে কি যেন কি লুকাইয়া ঢাকিয়া রাখিতে চায়। আপনাকে লুকাইয়া রাখাই যে তাঁর সাধ। কিন্তু আবার সাজের পরিবর্ত্তনে প্রাণের উচ্ছ্বাস যখন ফুটিয়া উঠে তখন কেমন করিয়া ঢাকিবে? শত চেষ্টাতেও ত ঢাকা যায়না। প্রাণের উচ্ছ্বাস চ'খে মুখে ফুটিয়া ছড়াইয়া পড়ে। তাই গাছে গাছে ফুল ফুটে, ফুলেফুলে ভ্রমর ঝঙ্কার করে, ডালে ডালে কোকিল কুহু কুহু করিয়া তাহারই বাঞ্ছিত, তাহারই ঈপ্সিততমের আগমন প্রতীক্ষা করে—বুঝি ডাক শুনিয়া সাড়া পাইলেই ছুটিয়া আসিবে। আপন ভাবে আপনি ভরিয়া, যেন সকল সৌন্দর্য্যের পসরা খুলিয়া, সব ভুলিয়া, সব ঢালিয়া, তাহারই চরণে অঞ্জলি দেয়। আপন ভালবাসা জগতে মাখাইয়া জগৎ ভরিত করিয়া দিতে চায়। আপনা ভুলিয়া—তাহাকে ভুলিয়া তারে ভুলাইতে চায়। এ ভালবাসায়, এ আদরে দুই এক হইয়া যায় তাই সব পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বসন্তের শোভায় মিলনের পূর্ণতা। এ জগৎ তখন মিলন আনন্দে ভরিয়া উঠে। সুন্দরকে হৃদয়ে পাইয়া সবাই সুন্দর হইয়া যায়। আপন সাজে তারে সাজাইয়া তাহাকে যেন ভুলাইয়া ভরিয়া দেয়। আর পুরুষ তখন কতখানি প্রাণ লইয়া তার প্রকৃতিকে ক্রোড়ে লইয়া কত আদর করেন। এ আদরে এ আনন্দে চৈতন্যও যেন চৈতন্যহারা। প্রতিক্ষণে প্রেমের খেলা। পুরুষ আপনাকে আপনার প্রকৃতিতে মিশাইয়া আদর করেন—বলেন ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্। ইত্যাদি।

বলিতেছিলাম শরৎ আসিল। এখন আর বর্ষার সেই সজল জলদমালা আকাশ ছাইয়া নাই—এখন সেই স্তনিত বৈদ্যুৎগর্ভ জল পূরিত মেঘমালা—সুবর্ণ পৃষ্ঠাস্তরণ ভূষিত গজযুথের মত শব্দ করিতে করিতে আকাশ পথে ছুটিতেছে না। আকাশ কার্ত্তিক হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত এই নয় মাস ধরিয়া সূর্য্য কিরণ জাল দ্বারা সমুদ্র সকলের রস পান করিয়া যে গর্ভ ধারণ করিয়াছিল বর্ষাকালে সেই গর্ভ হইতে

লোকের জীবন স্বরূপ সলিল ধারা প্রসব করিয়া সূতিকাগার হইতে বাহিরে আসিয়াছেন।

গগন মণ্ডল এখন মেঘ মুক্ত, দিবাভাগে সুন্দর সুনীল আকাশে জল শূন্য অতি শুভ্র পর্ব্বতাকার মেঘমালা, রাত্রিতে পাণ্ডুর বর্ণ আকাশে বিমল চন্দ্রমণ্ডল আর জ্যোৎস্নানুলিপ্তা শারদীয়া রজনী—আহা! এই কাল কি মনোহর! সহরে নগরে কি করিয়া মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিবে? সৌন্দর্য্য দেখিতে যদি হয় তবে এক বার আদি কবির চক্ষু লইয়া শৈল শিখরে শ্রীভগবানের চরণ তলে উপবিষ্ট হইয়া সেই গতবিদ্যুৎ বলাহকম্ আর সারসারাব সংঘুষ্টং—সেই বিদ্যুৎবক-শ্রেণী শূন্য, শব্দায়মান্ সারস শ্রেণী সেবিত, নির্ম্মল আকাশমণ্ডলের শারদীয় সৌন্দর্য্য—একবার সত্য সত্য দেখিয়া আসিতে হয়। দেখ দেখি শ্রীভগবানের মুখার-বিন্দ বিগলিত এই শারদ সৌন্দর্য্য কত মধুর। শ্রীভগবান বলিতে-ছেন দেখ লক্ষণ! বর্ষার বারি বর্ষণে ধরা আজ পরিতৃপ্ত হইয়া শস্য সকল উৎপাদন করতঃ কত সুন্দর সাজিয়াছে। দীর্ঘ গম্ভীর শব্দকারী মেঘ সকল তরু ও শৈল সমূহের উপরে বারি বর্ষণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে; নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ গতিবিহীন মেঘমালা দশদিক শ্যামীকৃত করিয়া মদশূন্য মাতঙ্গগণের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে।

বর্ষাকালের মহাবেগবান্ বায়ু এখন সঞ্চরণ হইতে বিরত হইয়াছে। মেঘ, হস্তী, ময়ূর, প্রস্রবণ ইহাদের ধ্বনি এখন প্রশান্ত। গিরিনভ আজ চন্দ্ররশ্মি দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া কেমন শোভা ধারণ করিয়াছে। সূর্য্য-রশ্মি প্রতিবোধিত পদ্মসমূহের শোভা একবার চাহিয়া দেখ। মহা-নদীর পুলিন প্রদেশে চক্রবাক মিথুনের সহিত হংসসকল ক্রীড়া করিতেছে। মেঘমুক্ত আকাশ মণ্ডল দর্শনে ময়ূর সকল বর্হাভরণ ত্যাগ করিয়া যেন কাহারও ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। এক্ষণে নদী, মেঘ, প্রস্রবণ, জল, অতি প্রবৃদ্ধ বায়ু, ময়ূর ও উৎসবহীন ভেক সকলের

ধ্বনি আর শুনিতে পাওয়া যায় না। বিবিধ বর্ণ তীক্ষ্ণ বিষধর সর্প সকল নবজলধরের সমাগম কালে বহুদিন উপবাস এবং আহারাভাবে মৃত প্রায় হইয়া গর্ত্তের মধ্যে থাকিয়া এক্ষণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহার অন্বেষণে গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিতেছে। নিশা জ্যোৎস্না বসনে দেহ আবৃত করিয়া যেন শুভ্র বসন দ্বারা আবৃত কায়া নারীর মত প্রকাশ পাইতেছে।

আবার দেখ সুচারু সারসশ্রেণী পক্কব্রীহি শস্য ভোজন করতঃ সানন্দে বায়ু সঞ্চালিত গ্রথিত কুসুম মালার ন্যায় দ্রুত বেগে নভোমণ্ডল অতিক্রম করিতেছে। প্রসুপ্ত হংসগণে পরিব্যাপ্ত কুমুদ শোভিত মহাহ্রদস্থ বারি নিশাকালে মেঘ নির্ম্মুক্ত পূর্ণচন্দ্র সমন্বিত নক্ষত্র সমাকীর্ণ আকাশ মণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে।

জলং প্রসন্নং কুসুম প্রহাসং
ক্রৌঞ্চস্বনং শালিবনং বিপক্কম্।
মৃদুশ্চ বায়ু র্বিমলশ্চ চন্দ্রঃ
শংসন্তি বর্ষব্যপনীত কালম্॥

জল নির্ম্মল, কুসুম প্রস্ফুটিত, ক্রৌঞ্চরব প্রাদুর্ভূত, শালিধান্য বিপক্ক, বায়ু মন্দগামী, চন্দ্রমণ্ডল সুবিমল হওয়ায় বর্ষণ বিহীন শরদাগমন প্রকাশ করিতেছে।

লোকং সুবৃষ্ট্যা পরিতোষয়িত্বা
নদীস্তটাকানি চপূরয়িত্বা।
নিষ্পন্ন শস্যাং বসুধাঞ্চ কৃত্বা
ত্যক্ত্বা নভস্তোয় ধরাঃ প্রনষ্টা॥

মেঘ সকল বৃষ্টিদ্বারা লোকদিগকে সন্তুষ্ট, নদী তড়াগ পরিপূর্ণ এবং ধরিত্রীকে শস্যশালিনী করিয়া এক্ষণে আকাশ মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সায়ংকালে আকাশের গায়ে কত বর্ণের মেঘ খেলা করিতেছে যেন কাহারও সঙ্গে ছটা মাখিয়া ইহারা রূপ দেখাইতেছে। এইত মায়ের আগমনের সময়।

নামে রূপ।

(১)

স্থির শান্ত অচঞ্চল চৈতন্য সাগরে,
মায়ার তরঙ্গে উঠে দুর্গা নাম ভাসি ;
সাক্ষীরূপে হেরিনু সে আপন অন্তরে,
নামের ঝঙ্কারে রূপ উঠিল প্রকাশি।

(২)

নামের সে উর্ম্মিমালা নাচিয়া নাচিয়া,
চিৎ সাগরের বুকে খেলিছে সদাই—
শব্দরূপে নাদ তাহে উঠিছে ধ্বনিয়া,
দেখিতে দেখিতে শেষে আমাকে হারাই।

(৩)

আমি বা কে—কোথা আমি—কোথা ভেসে যাই
আমার আমিত্ব কোথা পাই না খুঁজিয়া,
মায়ার প্রভাবে শুধু হাসিয়া কাঁদিয়া ;
আমারই বহুল খেলা আমি ভুলে যাই।

(৪)

আধার আধেয় আমি আমি মূলাধার,
আমারি হৃদয় মাঝে আমারি উদয় ;
অন্তিমে তুরীয় আমি, আমি মন্ত্র সার,
নিত্য সত্য, বুদ্ধ মুক্ত, অচ্যুত অব্যয়।

(৫)

আমার এ সব খেলা দেখিতে দেখিতে,
নামের তরঙ্গে যবে আমি ডুবে যাই ;
আমি চাহি আমার (ই) চরণে লুটিতে,
বিশ্ব মাঝে একা আমি দুই কোথা নাই।

মূর্ত্তিপূজার যুক্তি।

কেহ পূজা করে, কেহ পূজা দেখে, কেহ বা করিতে দেখিয়া উপহাস করে। যাহারা উপহাস করে তাহারা ভাবে কল্পনায় পুতুল গড়িয়া পূজা করিলে যদি কিছু হইত তবে শক্তি পূজা করিয়া ভারত এত শক্তিহীনা হইত না।

জড়ের পূজা হয় না ; পূজা হয় চৈতন্যের। আত্মা ভিন্ন যা কিছু সবই জড়। সবই অনাত্মা। দেহকে যদি আত্মা ভাব তবে তুমি যেমন জড়োপাসক সেইরূপ আত্মাকে যদি মন ভাবনা কর তবে তুমি সেইরূপ জড়োপাসক। চৈতন্যকে যদি মনের গুণ দিয়া ভাবনা কর আর মনের স্বরূপের দিকে আদৌ লক্ষ্য না কর তবে তুমি যেমন জড়োপাসক সেইরূপ চৈতন্যকে দেহ ভাবিয়া শরীরের নাম রূপ লইয়া উপাসনা করিলেও সেই জড়েরই উপাসনা হয়। অথচ আত্মা মন রূপেও বিবর্ত্তিত হয়েন এবং দেহও ধারণ করেন। তখন নামরূপ গুণ কর্ম্ম সাহায্যে সেই স্বরূপেরই উপাসনা হয়। ইহা ভিন্ন উপাসনা হয় না। এইজন্য যাঁহারা নামরূপ গুণকর্ম্ম বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধরিয়া উপাসনা করেন তাঁহাদের যাঁহারা উপহাস করিয়া থাকেন তাঁহারা উপাসনার তত্ত্বটি বুঝিতে পারেন নাই। শ্রুতি যে বলিতেছেন "নেদং যদিদমু পাসতে" ইহাতে তিনি চৈতন্যের নিরালম্ব ভাবটিতে লইয়া যাইতেছেন। আচার্য্যগণ হিরণ্যগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মাকে বহুরূপে দেখাইয়া দিয়া থাকেন। আর আত্মা ঐ ঐরূপে সাধককে রক্ষাও করেন। আচার্য্য গৌড়পাদ ইহা লক্ষ্য করিয়াই মাণ্ডুক্য কারিকাতে বলিতেছেন—

যং ভাবং দর্শয়েদ্‌যস্য তং ভাবংসতু পশ্যতি।
তং চাবতি স ভূত্বাসৌ তদ্‌গ্রহঃ সমুপৈতিতম্‌॥

যে পদার্থকে যাঁহার আচার্য্য পরমেশ্বর বলিয়া দেখাইয়া দেন সেই পদার্থকে শিষ্য কিন্তু পরমাত্মারূপেই দেখেন। সেই দ্রষ্টাকে সেই পদার্থ আত্মা হইয়াই রক্ষা করেন এবং তদ্বিষয়ে যে আগ্রহ তাহাই দ্রষ্টাকে প্রাপ্ত হয়।

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ বৈতথ্য প্রকরণ ২৯ শ্লোক।

কোন কিছু অবলম্বন না করিয়া পরমাত্মাকে ধরা যায় না। বিনা অবলম্বনে পরমাত্মার কাছে যাওয়াও যায় না। কোন অবলম্বন্ নাই অথচ যে উপাসনা তাহার স্থায়িত্ব নাই বলিয়া এটা আঁটিয়া সাঁটিয়া সংসার করিবার কাঁচা কৌশল মাত্র। ধর্ম্মও করা গেল আর সংসারও বেশ চলিল এইরূপ একটা মতলব এখানে থাকে। ইহাতে আটপৌরে পোষাকী চরিত্র বেশ থাকে—আর লোককে ধর্ম্ম উপদেশ বেশ দেওয়া থাকে অথচ নিজে সেই উপদেশ মত চলাটা থাকে না। এই ধর্ম্ম যাঁহারা করেন তাঁহারা প্রতিদিন উপাসনার সময় যাহা বলেন সংসারের কাজে তাহার বিপরীত আচরণ করেন—তার সমস্ত জীবনটা ধরিয়া ক্ষমাই চাহিয়া মরেন। এই পথটি অশাস্ত্রীয় বলিয়া ইঁহাদের ধর্ম্মজীবনে প্রকৃত উন্নতি ঘটে না। যাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারে না, তাহারাই যখন শাস্ত্রীয় উপায়কে উপহাস করে তখন এই সমস্ত ব্যক্তির মূঢ় বুদ্ধিকে করুণার চক্ষে দেখা ভিন্ন আর কোন কিছুই থাকে না।

এখন আমরা মূর্ত্তিপূজকের অবশ্যকরণীয় ব্যাপারের উল্লেখ করিব। খুব নির্জ্জন স্থানের নিস্তব্ধতা কখন কি অনুভব করিয়াছ? দিবাভাগে একটা শব্দ তরঙ্গে লোকালয় যেন ডুবিয়া থাকে। উপরের শব্দ তরঙ্গের নীচে যদি যাইতে পার দেখিবে সে স্থান বড় নির্জ্জন বড় নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধ দেশে শত বিদ্যুৎ চমকায় আর অতি অপূর্ব্ব রাগ রাগিনী থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠে। ইহাতে, নিস্তব্ধতা অতি রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করে। বিনা সাধনায় এ অবস্থা অনুভব করা যায় না।

অন্তরের অন্তস্তলে এই নিস্তব্ধ দেশে মূর্ত্তি ভাসে। এ মূর্ত্তি জাগ্রত। এ মূর্ত্তি তিনি ধারণ করেন। ইহা পটের ছবিও নহে ধাতু পাষাণের ঠাকুরও নহে। এই মূর্ত্তি সজীব। ঋষিগণ ধ্যানে এই মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারই বর্ণনা করিয়া ধ্যানের শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ধ্যান মতই পটের ছবি বা ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি আঁকা হয়।

পাছে মূর্ত্তি উপাসনায় পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে তাই বেদাদি শাস্ত্র মূর্ত্তি অবলম্বনে স্বরূপ চিন্তা করিতে বলিয়াছেন। যেখানে মূর্ত্তি পূজা আছে কিন্তু স্বরূপ ভাবনা নাই সেখানে পৌত্তলিকতা আসিবেই। সেখানে চৈতন্যের পূজা হইবে না—হইবে জড়ের পূজা। এই স্থানে শক্তি পূজিয়াও মানুষ শক্তিহীন হইবে। যাহাতে পৌত্তলিকতা না আসে ঋষিপ্রদর্শিত সেই কথারই আলোচনা করা গিয়াছে প্রথম প্রবন্ধে।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

১

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহার অর্থ কি? সমস্তই ব্রহ্ম কিরূপে? মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, আকাশ, বায়ু, নদী, সমুদ্র, কুরূপ, সুরূপ, হিংসা, দ্বেষ, সব ব্রহ্ম কিরূপে?

২

ব্রহ্মই অধিষ্ঠান চৈতন্য। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জগৎ ভাসিয়াছে। সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া তরঙ্গ ভাসে যেরূপে সেইরূপে ভাসিয়াছে। রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া কল্পিত সর্প ভাসে যেরূপে সেইরূপে ভাসিয়াছে। রজ্জু ভিন্ন কল্পিত সর্পের পৃথক সত্তা ত নাই। সমুদ্র ভিন্ন তরঙ্গের পৃথক্ সত্তা ত নাই। সেইরূপ চৈতন্য ভিন্ন জল স্থল আকাশ বায়ু মানুষ পশু কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা রাগ দ্বেষ ইহাদের পৃথক সত্তা কোথায়? পরমপদ ভিন্ন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শিবা সীতা রাম রাধা কৃষ্ণ লক্ষ্মী নারায়ণ সূর্য্য বরুণ অগ্নি প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতা বৃন্দের পৃথক্ সত্তা কোথায়? শ্রুতি না বলেন "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ" ঋক্, অক্ষর, পরমব্যোমে সমস্ত দেবতা সত্তালাভ করেন!

৩

তবেই দেখা গেল চৈতন্য ভিন্ন জড় জগৎ সমূহের পৃথক সত্তা নাই। এখন জড় বলিয়া যাহা দেখা যায় তাহা কি? যদি বিচার করা যায় তবে বুঝা যায় বহির্জ্জগৎটা মনেই অনুভূত হয়। আর মনে যাহা থাকে তাহা কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। রজ্জুর উপর কল্পিত সর্পের মত ব্রহ্মের উপর কল্পিত জগৎ ভাসিয়াছে। সর্পের পৃথক সত্তা যেমন নাই সেইরূপ জগতের পৃথক সত্তাও নাই। যাহার অন্য পৃথক সত্তা নাই তাহা যাহাকে আশ্রয় করিয়া সত্তাবান তাহাই। সেই জন্য বলা হয় সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

তোমার ভাবনা।

তুমি গো আমার সেই প্রিয় দরশন
অনাদি অনন্ত আত্মা প্রেম নিরঞ্জন।
কত শত যুগ ধরে তোমায় আমায়
নিত্য-খেলা আসা যাওয়া কতরূপে হয়॥ ১

কভু সূক্ষ্ম ভাবে হয় ভাবের মিলন
কভু স্থূলরূপে এস হৃদয় রঞ্জন।
নিরাকার পরিপূর্ণ এক রূপে ভরা
অব্যক্তের ব্যক্তভাবে এ নিখিল ধরা॥ ২

জীব মাঝে আত্মারূপে হও হে প্রকাশ
ভক্তের হৃদয়াকাশে তোমারি বিকাশ।
নাশিতে অসাধু জনে রূপ ধর তুমি
শান্তি দাও সর্ব্ব জীবে হে জগৎস্বামী॥ ৩

তোমারে ভাবিতে ভব না পাই খুঁজিয়া
যে দিকে ফিরাই আঁখি রয়েছ সাজিয়া
নির্ম্মল সুন্দররূপে যাই ভরে আমি
যা দেখি সকলি মোর মনে হয় তুমি॥ ৪

যবে— তোমাতে ভরিয়া যাই আপনারে ভুলে,
বিমল পবিত্র ভাস হৃদয়-কমলে।
তোমায় আমায় ওগো পূর্ণ একাকার,
চির নিত্য এ সম্বন্ধ তোমায় আমার॥ ৫

ভাষা নাই প্রকাশিতে নিত্য জ্ঞানময়,
অনাদি অপার নাথ তুমি হে অব্যয়।
তুমি জান সর্ব্বকালে আমিগো তোমার
তোমাভুলে বারে বারে মম হাহাকার॥ ৬

[শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ-প্রণেতা কর্ত্তৃক লিখিত]

বর্ণাশ্রমবিবেক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বর্ণব্যবস্থিতি থাকাতে হিন্দুজাতির যে অধঃপতন হইয়াছে, তাহার কারণ।

জিজ্ঞাসু—বর্ণব্যবস্থিতি থাকাতে হিন্দুরা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে না, যাঁহাদের মধ্যে ভেদবৃত্তিক (Separative) বর্ণব্যবস্থিতি নাই, আচারের কড়াকড়ি নাই, আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, যাঁহাদের মনে ইহা কখনও উদিত হয় না, তাঁহারা অসঙ্কোচে পরস্পর সঙ্গত হইতে পারেন, পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নির্বন্ধপরতার (Dogged Perseverance) নিমিত্ত হিন্দুজাতি অন্য জাতির সহিত স্বচ্ছন্দতঃ ব্যবহার করিতে পারে না, জাতিভ্রংশের ভয়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুরা অন্যদেশে গমন এবং তদ্দেশবাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না, হিন্দুজাতির এই কারণে যে কত ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তাবধারণ অসম্ভব। একজন গণিত ও বিজ্ঞানকুশল, পাশ্চাত্য কবি বহু গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, হিন্দুস্থানীদিগের ধর্ম্মবিষয়ক (Moral Vis Inertia) অত্যন্ত অধিক, এইজন্য ইহাদের পরস্পর সম্মিলিত হইবার প্রবৃত্তি অল্প, হিন্দুস্থানীরা যদৃচ্ছাক্রমে যে অবস্থায় আপতিত হইয়াছে, তদবস্থাতেই ইহারা জড়ের ন্যায় অবস্থান করে, ধর্ম্মের বন্ধন মোচন পূর্ব্বক উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা করে না। ইংলণ্ড দেশীয় পুরুষদিগের জড়ত্ব (Inertia) অল্প, উক্ত দেশের মহিলাগণের

জড়ত্ব অল্পতর (Smaller) এই হেতু ইহাদিগের পরস্পর সম্মিলিত হইবার শক্তি অধিকতর বলবতী। *

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হিন্দুজাতির অধঃপতন কেন হইয়াছে তাহার কারণ অবধারিত হয় নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুজাতিই পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে সর্ব্বাগ্রে সভ্যতালোকে আলোকিত করিয়াছিল, ইহারাই সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও কলার আদিম উন্নতিবিধাতা।

বক্তা—তোমার এই সকল কথা শুনিয়া আমি সুখী হইতে পারিতেছি না, ইহাদের মূলে সত্য নাই বলিয়া আমি বাধা পাইতেছি।

জিজ্ঞাসু—আমার কথা ত আমি আপনাকে শুনাইতেছিনা।

বক্তা—হিন্দুজাতির অধঃপতন কেন হইয়াছে, কেন হইতেছে এবং কেন হইবে, তাহার প্রকৃত কারণ অবধারিত হয় নাই। যথাবিধি শাস্ত্র পাঠ করিলে, যথাসম্ভব বর্ত্তমান সংস্কারকে নিরোধ করিতে সমর্থ হইলে, উপলব্ধি হইবে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান হিন্দুজাতির অবনতির কারণ নহে, যথাশাস্ত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করাই হিন্দুজাতির অধঃপতনের হেতু। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত হিন্দুজাতিই সর্ব্বাগ্রে

---

* "Now, it happens that the moral vis inertia of the Hindustani is very great, hence their tendency to amalgamation is small, they remain in the state in which they happen to be. On the other hand, the inertia of the Englishmen is small, of the Englishwoman smaller, and therefore their power of combining is greater.—The Romance of Mathematics p. 85—86.

পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে সভ্যতার বিমল আলোকে আলোকিত করিয়াছিল, অনেকে বিরক্ত হইবেন জানিয়াও, ইহা সত্য, তাই বলিতেছি, এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের সমীপে পৃথিবীর সকল সভ্য জাতি যে চিরঋণী, অকৃতজ্ঞ না হইলে, তাহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যদি অবনতির কারণ হইত, তাহা হইলে বৈদিক আর্য্যজাতি চিরদিন অবনতির শেষ পর্ব্বেই অবস্থান করিত। গ্রীস, রোম, ইজিপ্ট্ ইত্যাদি দেশসমূহ বর্ণাশ্রমধর্ম্মপরায়ণ বৈদিক আর্য্যজাতি প্রভাকরের প্রভাতেই প্রভাত হইয়াছিল. গ্রীসাদি দেশসমূহ প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ বৈদিক আর্য্যজাতি প্রভাকরেরই প্রতিবিম্ব। ভারতের দর্শনই পৃথিবীর দর্শন, ভারতবর্ষীয় দর্শনের ইতিহাস, পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত দর্শনেতিহাস। ব্রাহ্মণেরা কেবল অত্যাশ্চর্য্য কল্পনাশক্তি বিশিষ্ট, সূক্ষ্মবিচারশীল দার্শনিক ছিলেন না, স্থূল, সূক্ষ্ম প্রকৃতিতত্ত্বসম্বন্ধীয় সমীচীন জ্ঞানও তাঁহাদের ছিল, সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরও তাঁহারা প্রকৃষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসু—হিন্দুজাতিই সর্ব্বাগ্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে সভ্যতালোক বিতরণ করিয়াছিল, সত্যসন্ধ কোন পাশ্চাত্য কোবিদ কি, এই সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন ?

বক্তা—নতুবা এ দুর্দ্দিনে আমি কি সাহস পূর্ব্বক এই সকল কথা বলিতে পারিতাম ?

জিজ্ঞাসু—কোন্ সত্যসন্ধ উদারদর্শন পাশ্চাত্য কোবিদ এইরূপ কথা বলিয়াছেন ?

বক্তা—একজন নহেন, বহুব্যক্তিই এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, পরে যথাপ্রয়োজন আমি তোমাকে তাহা জানাইব। 'লুইস্ জ্যাকোলিয়ট' (Louis Jacoliat) তাঁহার 'দি বাইবেল্ ইন্ ইণ্ডিয়া (The Bible in India) নামক গ্রন্থে এই সকল কথা বলিয়াছেন। ডাক্তার রয়েলের (J. F. Royle, M. D.) হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্রের পুরাতনত্ব (Antiquity of Hindu Medicine) নামক গ্রন্থে অথবা

স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্‌ ও কোল্‌ব্রুকের গ্রন্থ পাঠ করিলেও তুমি এ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিবে। কজিন্‌ (Cousin) কোন স্থলে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় দর্শনেতিহাস, পৃথিবীর দর্শনেতিহাসের সার (Cousin has somewhere said, "The history of Indian philosophy is the abridged history of the philosophy of the world,"—Louis Jacoliot.) ভারতবর্ষই পৃথিবীকে সভ্যতালোকে আলোকিত করিয়াছিল, লুইস্‌ জ্যাকোলিয়ট্‌ বলিয়াছেন, এই মতের সমর্থনের জন্য আমি হিন্দু বিধি তত্ত্বের মুখ্যতম স্থল সমূহের অবিলম্বে অনুসন্ধান করিতেছি ("In support of the theory that India has given civilisation to the world, I shall now rapidly explore the most salint points of Hindu legislation —The Bible in India)। বেদ শাস্ত্রের উপদেশ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই ত্রিবিধ ভাব স্বর্গাদি প্রত্যেক লোকে প্রত্যেক কালে, এক কথায় সৃষ্ট পদার্থ মাত্রে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে স্বর্গ আছে, নরক আছে, দেবতা আছেন, অসুর আছেন। সুশ্রুত সংহিতা ও চরক-সংহিতা পাঠ করিলে, জানিতে পারিবে, মানুষের মধ্যে হিংস্র-ব্যাঘ্রাদি পশু প্রকৃতি আছে, সর্পপ্রকৃতি আছে, দেবপ্রকৃতি আছে, গন্ধর্ব্বপ্রকৃতি আছে, পিশাচ ও রাক্ষসপ্রকৃতি আছে। বেদের বচনানুসারে বলিতেছি, পশ্বাদি ইতরজীবেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ আছে, বৃক্ষাদিও বর্ণভেদবিশিষ্ট। অতএব ইংলণ্ডাদি দেশসমূহেও যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণভেদ থাকিবে, তাহা অসম্ভব নহে। লুইস্‌ জ্যাকোলিয়ট, রয়েল্‌ প্রভৃতির হৃদয় কিরূপ সত্যপ্রিয়, কিরূপ উদার, কিরূপ নির্ভীক, কিরূপ অধ্যবসায়ী (Persevering, energetic) ছিল, তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে, তুমি তাহা জানিতে পারিবে। বৈদিক আর্য্যজাতির প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া, লুইস্‌ জ্যাকোলিয়ট্‌ ও ডাক্তার রয়েল্‌ যেরূপ উদারতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে

আমার মনে হয়, ইহাঁদের লিঙ্গদেহে ব্রাহ্মণভাব ছিল * আমাদের মধ্যে এইরূপ উদারতাদি মহদ্‌গুণ বিশিষ্ট পুরুষ এখন অল্পই আছেন।

---

* বর্ণ বিবেক এক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। উৎসবে ইহাকে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা হইবার পর আমার একজন বন্ধু এবং তৎপরে উৎসবের সম্পাদক মহাশয় এই উভয়ের মুখেই শুনি যে সত্যসন্ধ, উদার হৃদয়, মনুষ্যজাতিহিতৈষী স্যার জন্ উড্‌রফ্ (Sir John Woodroffe) 'Is India civilised' নামে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবার পর সেই গ্রন্থখানি দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। তদনুসারে উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি Thacker spink & Co মহোদয়গণকে যথোক্ত গ্রন্থের একখানি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখায় তদুত্তরে তাঁহারা জ্ঞাপন করেন যে, প্রাগুক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছে, গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে, মুদ্রাঙ্কন সমাপ্ত হইলে প্রেরণ করিতে পারিবেন। কয়েক দিবস হইল, গ্রন্থখানি হস্তগত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইলে বর্ণবিবেকের মধ্যেই ইহার উল্লেখ করিতাম; তথাপি আমার কৃতজ্ঞ হৃদয় আমাকে নিরন্তর প্রণোদিত করিতেছে বলিয়া অধষ্টিপ্পনীতেই এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। গ্রন্থ এখনও সমস্ত পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, তবে যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, যে বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের ধমনীতে এখনও অবিকৃত আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হইতেছে, যে বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ এখনও জন্মভূমির প্রতি, ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার কল্যাণবিধানে সদা তৎপর, পরহিতৈকব্রত, পরমকারুণিক, জ্ঞানদাতা, বেদজ্ঞ, শাস্ত্রবিৎ ঋষি ও আচার্য্যদিগের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাবান্, যাঁহাদের পরোপকারপ্রবৃত্তি সার্ব্বভৌম—জাতি ও দেশ দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে, তাঁহারা মহামতি স্যার জন উড্‌রফের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন, সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাঁর নীরোগ ও শান্তিময় দীর্ঘ জীবন কামনা করিবেন, করুণাময় ভগবান্ ইহাঁর হৃদয়ে সত্যগ্রহণযোগ্যতা সম্বর্দ্ধিত করুন এইরূপ প্রার্থনা করিবেন। স্যার জন্ উড্‌রফের সহিত আমার স্থূলভাবে পরিচয় নাই। তাহার স্থূলরূপের সহিত পরিচয় না থাকিলেও, তিনি আমার একেবারে অপরিচিত নহেন, আমি তৎপ্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ পড়িয়াছি. হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জর্জ আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়

জ্যাকোলিয়টের কথা শ্রবণ কর—"প্রাচীন ভারতের উন্নতির ইয়ত্তাব ধারণ করিতে য়ুরোপে যে সমস্ত জ্ঞান অর্জ্জিত হইয়া থাকে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে, প্রাচীন ভারতের উন্নতিসাগরের তলস্পর্শ করিতে হইলে, বালকের বর্ণশিক্ষারম্ভের ন্যায় নূতন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে ("To fathom ancient India, all knowledge acquired in Europe avails naught, the study must recommence as the child learns to read.—The Bible in India p. 21)। ডাক্তার রয়েল্ বলিয়াছেন, আমরা যদি হিন্দুদিগের

প্রভৃতি বহু ব্যক্তির মুখে তাঁহার সম্বন্ধে বহু কথা শ্রবণ করিয়াছি, সুতরাং আমি তাঁহাকে বহু দিন হইতেই স্নেহ (Love) করি, কর্ত্তব্যজ্ঞানে ভগবানের নিকট তাঁহার কল্যাণ ভিক্ষা করি। স্যার জন্ উড্রফ্ তাঁহার 'Is India civilisd' নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন উন্নতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ অসভ্য বর্ব্বর, ইহা কখনও সভ্যতার আলোক দেখে নাই এরূপ বিশ্বাস লইয়া যাঁহারা দিনযাপন করেন, তাঁহাদের মত যে সত্যভূমিক নহে, অনুপমেয় সত্যানুসন্ধিৎসাবশতঃ বিপুল পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক উক্ত গ্রন্থে তিনি যথাশক্তি তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সত্যপ্রিয়, উদারহৃদয় স্যার জন্ উড্রফের সমীপে সেই নিমিত্ত আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব, তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা আমার নিত্যব্রত হইবে। বিদেশীয় হইয়াও জেতৃজাতীয় হইয়াও সাধারণতঃ উপেক্ষিত ও অবগণিত পরাজিত ভারতবর্ষ কিরূপ উন্নত হইয়াছিল এই সত্য দেখাইবার জন্য যিনি এরূপ উদ্যমশীল, এমন ব্যাকুল, আমার পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহার স্থূল দেহ য়ুরোপীয় হইলেও, লিঙ্গ দেহ বৈদিক আর্য্যজাতীয় সংস্কার বিশিষ্ট। নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও আমার তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে। আমি ব্রহ্মচর্য্যতত্ত্ব (Philosophy of Brahmacharyya) এবং তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা বিষয়ক বিচার (Some Thought on Tarntra and Trantrik Sadhana) এই গ্রন্থদ্বয় লিখিতেছি, যদি তিনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন, তাহা হইলে আমি উক্ত গ্রন্থদ্বয় তাঁহাকে উপহার রূপে প্রদান করিয়া কিয়ৎপরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সমর্থ হইলাম জানিয়া শান্তি পাইব।

সাহিত্য ও দর্শনের উন্নতির গবেষণা ছাড়িয়া ইহাদের বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় উন্নতির অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, হিন্দুরা কেবল বিশদ কল্পনা ও দার্শনিক বিবেক শক্তিতেই উৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহারা সমভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞানেরও অনুশীলন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের আদিম বিজ্ঞানানুশীলন সাফল্যলাভ করিয়াছিল।*

জ্যাকোলিয়টের উক্তি—"রোম (Rome) তাঁহার গৌরবান্বিত বিধিতন্ত্রের (Principles of Legislation) জন্য ভারতবর্ষের কাছে ঋণী। রোমের পূর্ব্বপুরুষদিগের কি বর্ণব্যবস্থিতি ছিল না ?

"We have seen that Rome was indebted to India for her grand principles of legislation * * * Had not Rome her castes ? The Bible in India P. 87-88.

বর্ণব্যবস্থিতি সম্বন্ধে জ্যাকোলিয়ট্ অপিচ বলিয়াছেন, প্রাচীন হিন্দুসমাজে চতুর্বিবধ বর্ণভেদের পরিবর্ত্তে দ্বাদশবিধ বর্ণভেদ ছিল (Instead of four there were twelve castes * * *) অতএব বর্ণভেদ অন্য কোন জাতির নাই, এই মত যে সত্যভূমিক নহে, এবং বর্ণব্যবস্থিতি বশতঃ হিন্দুজাতির অবনতি হইয়াছে, বর্ণব্যবস্থিতিই হিন্দুজাতির অবনতির মূল কারণ এবম্প্রকার সিদ্ধান্তও যে, সৎসিদ্ধান্ত নহে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত দুই-এক কথা বলা হইল।

---

*"If from their literature and philosophy we pass to the science of the Hindoos, we shall find equal reason to conclude, that it was not only in vividness of imagination and powers of philosophical abstraction that they excelled, but that the exact sciences were equally cultivated and apparently with an original and successful result. Antiquity of Hindoo Medicine by T. F. Royle, M. D. P. 159

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তথাপি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করা যায়, তাহার মূলে যে কোনই সত্য নাই, আপাততঃ ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

জিজ্ঞাসু—বর্ত্তমানকালে যাঁহারা ক্রমশঃ উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে আমাদের ন্যায় বর্ণব্যবস্থিতি নাই, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুজাতি ছাড়া, অন্য সকল জাতিই যে, অল্পবিস্তর স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিতেছেন, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই; অতএব আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের "বর্ণব্যবস্থিতিই হিন্দুজাতির অবনতির প্রধান কারণ, বর্ণভেদের মূলোৎপাটন না করিলে আমাদের উন্নতির কোন আশা নাই" ইত্যাদি বচনসমূহকে একেবারে অসার জ্ঞানে উপেক্ষা করা যায় কি? "হিন্দুস্থানীদিগের ধর্ম্ম-জড়ত্ব, আচারের নিবন্ধশীলত্ব অত্যন্ত অধিক, এই নিমিত্ত ইহারা পরস্পর মিলিতে পারে না, ইহারা যে অবস্থায় আছে, ধর্ম্মের অনুরোধে ইহারা তদবস্থাতেই বদ্ধ হইয়া থাকে" যথোক্ত পাশ্চাত্যকোবিদের হিন্দুস্থানীদিগের অবনতির কারণ বিষয়ক এইরূপ অনুমানের মূলে যে কোনই সত্য নাই, আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। ফলতঃ আমি স্বয়ং এ সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্ত কি, তাহা স্থির করিতে পারি না। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার সংশয় দূর করিয়া দিন্। বর্ণব্যবস্থিতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ আমি এই মতের যে পক্ষপাতী হইতে পারি নাই, তাহা আপনি জানিতে পারেন, তবে ইহাও আমার আপনার কাছে স্বীকার্য্য, বর্ণব্যবস্থিতি হিতকর, আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার দিকে তাকাইলে, এইরূপ বিশ্বাস স্থির থাকে না, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপক্ষদিগের তর্ক শ্রবণ করিলে, বর্ণবিভাগের হিতকারিতাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

বেদবোধিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের হিতকারিতা সম্বন্ধে সংশয় হইবার কারণ।

বক্তা—বেদ-শাস্ত্রে যাহা হিতকররূপে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাকে তুমি বিনা সংশয়ে হিতকর বলিয়া বিশ্বাস কর, বহুবার তোমার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়াছি, অতএব বেদোপদিষ্ট বর্ণব্যবস্থিতিকে হিতকরী বলিয়া, বিশ্বাস করিতে তোমার সংশয় হইবার কারণ কি? যাহা বেদমূলক, তাহাতে আমার কোন সংশয় হয় না, তোমার এ কথা কি তাহা হইলে সত্য নহে?

জিজ্ঞাসু—মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শন ও পুরাণাদি পাঠপূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, বেদ ভিন্ন অন্য কোথাও হইতে ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় না, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, বেদভিন্ন অন্য কেহ পূর্ণভাবে তাহা নিরূপণ করিতে পারেন না, বেদই অখিল ধর্ম্মের মূল। পরম-কারুণ্যময়ী ভগবতী বলিয়াছেন, 'বেদ আমার রূপ—আমার পুরাতনী পরা শক্তিই 'বেদ' এই নামে উক্ত হইয়া থাকে, অতএব যাহারা ধর্ম্মার্থী, যাহারা মুমুক্ষু, তাহারা আমার সনাতনী পরাশক্তি বেদকে আশ্রয় করিবে।* বেদ কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝিবার আমি অধিকারী নহি, তবে সকল শাস্ত্র যাঁহার এত প্রশংসা করিয়াছেন, পরমকারুণ্যময়ী ভগবতী লোকহিতার্থ করুণা করিয়া যাঁহাকে নিজরূপ—স্বীয় সনাতনী পরাশক্তি বলিয়াছেন, আত্মকল্যাণার্থীর একমাত্র শরণ্য বলিয়াছেন, আমি সে বেদ ছাড়া আর কাহার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারি? যাবৎ

---

* "নান্যতো জায়তে ধর্ম্মো বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ।
তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থী মদ্রূপং বেদমাশ্রয়েৎ॥"
"মমৈবৈষা পরাশক্তি র্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী।
ঋগ্‌যজুঃ সামরূপেণ সর্গাদৌ সম্প্রবর্ত্ততে॥"

তত্ত্ব সাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ কোন বিষয়ে সংশয়বিরহিত জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। বেদের কথায় আমার যত বিশ্বাস হয় তত বিশ্বাস অন্য কাহারও কথায় হয় না। তবে যখন শুনি ইহা বেদের কথা নহে, বেদে ইহা নাই, অথবা বেদের ইহা প্রকৃত অর্থ নহে, স্থূল প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন বেদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে যাইলে বাধা দেয়, তখন সংশয় উপস্থিত হয়, তখন কাহাকে ধরি, কাহাকে ছাড়ি, এইরূপ দ্বৈধ (doubt) হইয়া থাকে। একালে বেদজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীও বলিয়াছেন, বর্ণব্যবস্থিতির বর্ত্তমানরূপ বেদানুমোদিত নহে, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার সমূহ সর্ব্বথা হিতকার নহে, সকল মনুষ্যেরই সত্যবিদ্যা বেদে অধিকার আছে, অন্য জাতিকেও হিন্দু করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তাহা করাই কর্ত্তব্য। এই সকল কারণ বশতঃ বিবিধ সংশয় উপস্থিত হয়, সত্যস্বরূপ বেদে সংশয় উপস্থিত হয় না। বহুব্যক্তির মুখে শুনিতে পাই বৈদিক কালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ব্যবস্থিতি ছিল না। বর্ণ ভেদের ব্যবস্থা স্মৃতি পুরাণাদি অর্ব্বাচীন শাস্ত্রসমূহের কল্পনা। দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী বলিয়াছেন, বেদে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা আছে সত্য কিন্তু তাহার রূপ স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস বর্ণিত বর্ণাশ্রমের বর্ত্তমান রূপের অনুরূপ নহে। যিনি বিদ্যাদি উত্তম গুণযুক্ত পুরুষ তিনই ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য ("ব্রহ্ম হি ব্রাহ্মণঃ।" শতপথ ব্রাহ্মণ)। যে মনুষ্য পরমৈশ্বর্য্যবান্, শত্রুদিগের ক্ষয়কারী, যুদ্ধ করিতে উৎসুক এবং প্রজাপালন তৎপর, তিনি ক্ষত্রিয় হইবার উপযুক্ত; ("ক্ষত্রং হীন্দ্রঃ ক্ষত্রং রাজন্যঃ।" শতপথব্রাহ্মণ)। দয়ানন্দ স্বামীর এই সকল কথা কি ঠিক?

নবম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমৎ দয়ানন্দ স্বামীর বর্ণবিষয়ক উপদেশ যথার্থ কি না।

বক্তা। আমি দয়ানন্দ স্বামীর এই সকল কথা কি ঠিক, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে পারিব না, কারণ ইহার উত্তর দিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হইবে। আপাততঃ শুনিয়া রাখ, উক্ত স্বামীজীর বেদব্যাখ্যা আমার অধিকাংশ স্থলে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয় না। স্বামীজী বহুস্থলেই নিজ প্রয়োজনের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপ্রদর্শিত যুক্তিসমূহকেও আমি সর্ব্বত্র সদ্‌যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। দয়ানন্দ স্বামীজীর কোন কথাই সত্য নহে, আমি তাহা বলিতেছি না। আমি এ স্থলে দয়ানন্দ স্বামী 'বর্ণ' শব্দের নিরুক্ত প্রমাণে যে প্রকার অর্থ করিয়াছেন তাহা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, এতদ্বারা তুমি বুঝিতে পারিবে, স্বামীজী নিজ প্রয়োজন ও প্রতিভারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন কি না।

দশম পরিচ্ছেদ।

নিরুক্তে 'বর্ণ' শব্দের নিরুক্তি এবং দয়ানন্দ স্বামীর ব্যাখ্যা।

"কল্যাণবর্ণরূপঃ কল্যাণবর্ণস্যেবাস্য রূপম্। কল্যাণং কমনীয়ং ভবতি। বর্ণো বৃণোতেঃ।"—নিরুক্ত।

ভগবান্ যাস্ক 'কল্যাণবর্ণরূপ' এই সমস্ত পদ দ্বারা রূপসমাসের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'কল্যাণবর্ণরূপ' এই পদের অর্থ হইতেছে, কল্যাণ বর্ণের ন্যায় ইহার রূপ। 'কল্যাণবর্ণের ন্যায় ইহার রূপ' এই অর্থেরও ব্যাখ্যা না করিলে 'কল্যাণবর্ণরূপ' এই পদের অর্থ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে না, তাই ভগবান্ কল্যাণ, বর্ণ ও রূপ এই পদত্রয়ের ব্যুৎপত্তি

দেখাইয়াছেন। 'কল্যাণ' শব্দের অর্থ কমনীয়। যাহা সকলের কমনীয়—যাহা সর্ব্বজনের প্রার্থিত হয়, তাহা 'কল্যাণ'। বৃধাতু হইতে 'বর্ণ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা আশ্রয়কে আবৃত করে ("আবৃণোতি হি স আশ্রয়ম্। নিরুক্তটীকা), তাহা বর্ণ, 'কল্যাণ বর্ণ' সুবর্ণের বাচক, কারণ সুবর্ণ সকলের কমনীয়, সকলেই ইহাকে প্রার্থনা করে। কল্যাণবর্ণ বা সুবর্ণের ন্যায় যাহার রূপ—যাহা সুবর্ণের ন্যায় রোচিষ্ণু দীপ্তিবিশিষ্ট, তাহা 'কল্যাণবর্ণরূপ'। 'অগ্নি অথবা সুবর্ণের ন্যায় রূপ বিশিষ্ট অন্য কোন বস্তুর বাচক। *

---

* "অধুনা রূপসমাসং দর্শয়তি—কল্যাণবর্ণরূপঃ কল্যাণবর্ণ স্যেবাস্য রূপম্।" কল্যাণ বর্ণং সুবর্ণম্, তস্যেব যস্য রূপম্ স কল্যাণবর্ণরূপঃ। অগ্নিরন্যো বা কশ্চিৎ। কল্যাণাদি শব্দান্ বিগ্রহসংজ্ঞান্ নির্ব্রবীতি। 'কল্যাণং কমণীয়ং ভবতি। প্রার্থ্যতে তৎ সর্ব্বৈনৈব। 'বর্ণো বৃণোতেঃ'। আবৃণোতি হি স আশ্রয়ম্। নিরুক্তটীকা।

আপনাকে পাওয়া।

চপল এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
সংসারের তরঙ্গ আঘাত
নাই দিবা নিশা জ্ঞান কি মোহ মদিরা পান
পাগল বাসনা অবিরত।

ভুলেছ আপন জন তাই জ্বালা সর্ব্বক্ষণ
হাহা-হিহি হেরিছ সংসার
আপন. স্বরূপ ভুলে রাজা তুমি নীচ হলে
ভার-গ্রস্ত জীবন তোমার।

কেবা এ বিচিত্র খেলে একা নট নটি হলে
আবার ধরিছ বহু কায়া
অনুপরমাণু মাঝে যেখানে যেমন সাজে
মিশাইলে ! তাও শুধু ছায়া।

জানিয়া খেলিতে আসি কোন ভাবে গেছ মিশি
বাসনা বসনে আঁখি ঢাকি
ভুলিলে স্বরূপ নিজ সংসার আপন রাজ্য
করেছ ধারণা মাত্র দেখি।

আসিয়াছ যেথা হ'তে যাও পুনঃ সেই পথে
ভুলে যাও বাসনা তোমার
দিবে না যাতনা আর তোমার মিছা সংসার
ছিন্ন হবে তব মোহ ডোর।

হইলে বাসনা শেষ মনোনাশ নির্বিশেষ
হবে স্থির তত্ত্বাভ্যাস তোর
হেরিবে আপন রূপ বিশ্বমাঝে ব্রহ্মরূপ
লয় হবে জগৎ সংসার।

শান্তির সুষমা ভরা প্রেম পূর্ণ এই ধরা
রবে না অভাব তব আর
আত্ম মাঝে আত্মা হেরি আপনাতে যাবে ভরি
চির স্থিতি পদে আপনার।

কাতর প্রার্থনা।

অসার ভবের মাঝে আমাকে পাঠায়েছিলে,
অসারে ডুবায়ে দিয়ে সারাৎসারা লুকাইলে।
কত যুগ, কত বর্ষ, গেল কত দিন রাত,
বৃথা কাজে গেল দিন বৃথা সার অশ্রুপাত॥

কতই ডেকেছ মাগো! স্নেহের মধুর স্বরে,
সাবধান করিয়াছ, কেশে ধ'রে বারে বারে।
সময়ে সে প্রেম ডাক শুনিনি মা প্রাণ খুলি,
মোহের মদিরা পিয়ে ছিলাম তোমায় ভুলি॥

ক্রমে হীন তনু ক্ষীণ, অবসন্ন দেহ মন,
পারেতে যাবার মাগো কিছু নাই আয়োজন।
একাকী আসিয়েছিনু একা ডাক শুনা যায়,
সম্বল কিছুই নাই, কি করিব, হায় হায়॥

মোহাঞ্জনে অন্ধ যে মা, দাও খুলে জ্ঞান আঁখি
অসারে ডুবায়ে মোরে অন্তিমে দিওনা ফাঁকি।
কেঁটে দাও মায়া-পাশ খুলে দাও মোহ ডোর.
প্রেম চক্ষে দেখি আমি যাই ধেয়ে কোলে তোর॥

দেখে তব প্রেম মুখ হয়ে যাই আত্মহারা,
সুধা পিয়ে যাক ক্ষুধা প্রেমে হই মাতোয়ারা।
ভুলে যাই ভেদাভেদ ভুলে যাই আমি তুমি
অনন্তে মিলাও অন্তে আমার হৃদয়স্বামী।
ভবকে ভবের খেলা খেলালিত শতবার
কোলে তুলে নিলে শেষ খেলা সার হয় তার।

গড়পার।

শ্রীভরত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাজা দশরথ রামাভিষেকের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ব্যষ্টি জীবের সঙ্কল্প সমষ্টিজীবের মধ্যেও কার্য্য করে। রাজা দশরথের সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে দেবলোকেও এক সঙ্কল্প উঠিল। দেবতাগণ দেবর্ষি নারদকে গোপনে অযোধ্যায় পাঠাইলেন। দেবর্ষি—শ্রীভগবানকে স্মরণ করাইয়া দিয়া গেলেন—ভগবন্ কাল তোমার অভিষেকের দিন কিন্তু ঐ দিনই তোমাকে বনে যাইতে হইবে। শ্রীভগবান হাসিলেন—বলিলেন ভূভার হরণের অঙ্গীকার আমার স্মরণ আছে। ইহার পরেই দুষ্টা সরস্বতী মন্থরা হইতে কৈকেয়ীতে আগমন করিলেন। রাম রাজা হইবেন শুনিয়া এবং ভরতের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া দুষ্টবুদ্ধি মন্থরার কুটিল হৃদয়ে প্রতিহিংসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে অবিলম্বে কৈকেয়ীহৃদয়ে দুষ্টবুদ্ধিরূপে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার ছলে ও কৌশলে কৈকেয়ীকে আপন অধীনে আনিল। কৈকেয়ীও রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে চীরবসন পরাইয়া বনে পাঠাইল! রাজা দশরথ রাম রাম করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

ভীষণ অজ্ঞানের কি জ্বালাময় খেলা! দুষ্ট সংসর্গের কি বিষময় ফল! দুঃসঙ্গ রামানুরাগিণী কৈকেয়ীর সমস্ত বিবেক নষ্ট করিয়া মতি ভ্রম করিয়া দিল। এই সংসর্গ দোষে কৈকেয়ীর হৃদয়ের সমস্ত সৎবৃত্তি দূর হইল এবং পৈশাচিক বৃত্তিতে হৃদয় মন পূর্ণ হইল। অতি ধীর বিবেকবান জ্ঞানী বা ভক্ত যে কেহই সর্ব্বদা এই পাপ পরিপূর্ণ দুষ্ট জন সংসর্গ করিয়া থাকেন তাঁহাকেই যে এই কৈকেয়ীর মত হইতে হয়, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অসৎসঙ্গ সৎএর শত গুণ নষ্ট করিয়া ইহাকে আপন আকারে আকারিত করিয়া অনন্ত নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত

করিয়া দেয়। আশি লক্ষ নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া জীব মানুষ হয়। কত দুঃখের এই মানবজন্ম। এই মানবজন্ম ত শুধু শ্রীভগবানকে লাভ করিবার জন্য। অসৎসঙ্গ তাহাকে ইহা একেবারে ভুলাইয়া চৌরাশি লক্ষের ফেরে নিক্ষেপ করে। আর সৎসঙ্গ অত্যন্ত দুর্লভ। বহুভাগ্য যাহার তাহারই এই সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। এই সৎসঙ্গে জীব চির অমরত্ব লাভ করিতে পারে। ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।" ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা" একথা দেবদেব শঙ্কর জীব হিতার্থে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক নিজমুখে গাহিয়া গিয়াছেন—মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেন"----

তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখধরীতুলা একসঙ্গ—"

তুলয়ন তাহি সকল মিলি যে সুখ নব সৎসঙ্গ ॥

সৎসঙ্গের মহিমা অতিশয়। যদি তুলে তোলো যায়, এক পার্শ্বে স্বর্গ ও মুক্তি, অন্য পার্শ্বে ক্ষণ মাত্র সৎসঙ্গের তুলনা হয়। অনাদি দুঃখ প্রদ এই সংসার নিবৃত্তির প্রথম উপায় সৎসঙ্গ ; সৎসঙ্গ না পাইলে সংসার নিবৃত্তি হয় না। কয়লার যেমন অগ্নি সংযোগে ময়লা ছুটিয়া তৎস্বরূপত্ব লাভ হয়, অজ্ঞানী ও অসৎ ব্যক্তি যদি যথার্থ ধর্ম্ম পিপাসু হইয়া জ্ঞানী বা সৎজনের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহারও অজ্ঞান কৃত পাপরাশি বা মনের সকল ময়লা সাধুদিগের জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। অজ্ঞানীও তখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভরিত হইয়া পরম সুখে পরম পদে মন সংলগ্নকরিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারে। পরম শুদ্ধ আনন্দময় চৈতন্য দেবের নিত্যলীলা হয় সাধুদিগের নির্ম্মল হৃদয়ে। আর সঙ্গ দোষে শত গুণ নাশে ইহা নিশ্চয়।

সত্যসন্ধ রাজা দশরথের নিকট কৈকেয়ী নিজ দুষ্ট অভিসন্ধি প্রকাশ করিল। রাজা সত্যবন্দী ছিলেন—সত্য তাঁহার প্রাণ। রাম তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তাহা হইতে প্রিয় তাঁহার সত্য। সত্যবন্দী রাজা সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া রাম বিরহে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তথাপি সত্যচ্যুত হইতে পারিলেন না।

কিছু পূর্ব্বে যে অযোধ্যার নর নারী, কীট পতঙ্গ, পশু, পক্ষী পর্য্যন্ত অপার আনন্দ সাগরে ভাসিয়াছিল এক্ষণে তাহাদের অবস্থা বর্ণনাতীত। একটু পূর্ব্বে যে রাজ প্রাসাদ নানাবিধ বাদ্য যন্ত্রে মুখরিত ছিল, এক্ষণে তাহা সাগরকল্লোল সদৃশ্য হৃদয়ভেদী ক্রন্দন ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইল। বিহগের কণ্ঠ নীরব হইল, কুসুম রাশি ঝরিয়া পড়িল, বৃক্ষ, লতা, ফুল, পাতা বিশুষ্ক হইল। কোথায় জগৎজীবন রামচন্দ্র আজ রাজা হইবেন শুনিয়া নগরবাসীর আনন্দ, আর কোথায় তাঁহার আজ দণ্ডকারণ্যে গমন! রাজা দশরথের অকালে রাম বিরহে প্রাণত্যাগ! কোথায় লোক-বিমোহনকারী রাম আজ সীতার সহিত রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া জনগণের প্রাণ, মন বিমোহন করিবেন, তাহা না হইয়া রাম আজ জটাবল্কলধারী হইয়া মুনিবেশে রাজপথে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পদব্রজে বন-গমন করিতেছেন। লীলাময় ঈশ্বরের বিচিত্র লীলাপূর্ণ বিশ্বরাজ্যের অচিন্তনীয় লীলা রহস্য ভেদ করা মানব বুদ্ধির অতীত।

তখন অযোধ্যা হইতে যুধাজিত নগরে ভরতের নিকট দূত প্রেরিত হইল। দূত প্রেরণ করিলেন ভগবান বশিষ্ঠদেব। অযোধ্যা হইতে যে রাত্রে দূতগমন করে, শ্রীভরত সেই রাত্রে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়াছেন। ভরত অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া অতীব চিন্তাকুল চিত্তে নির্জ্জনে উপবেশন করিয়াছেন। অযোধ্যার সংবাদের জন্য প্রতিক্ষণে ব্যাকুল হইতেছেন; তাঁহার অন্তর আপনা হইতে কাঁদিয়া উঠিতেছে। এখানে ভরতের বয়স্যগণ ভরতকে না দেখিতে পাইয়া অনুসন্ধান দ্বারা ভরতকে ভদবস্থাপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ভাই! আজ তোমার কি হইয়াছে? কেন ভাই! একাকী চিন্তাকুল চিত্তে নির্জ্জনে ভূমিতলে উপবিষ্ট রহিয়াছ? বল ভাই! আমরা কি কিছু অন্যায় করিয়াছি? অথবা তোমাকে কেহ কিছু বলিয়াছে অথবা শরীর অসুস্থ হইয়াছে? অন্যদিন আমাদের দেখিলে হৃষ্টচিত্তে শ্রবণ মন মোহিত কর, রাম কথা বলিয়া বিশুদ্ধ-আনন্দে আমাদের পরিপূর্ণ করিয়া দাও—আজ কেন অধোমুখে এমন নীরব হইয়া বসিয়া আছ?

বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে ব্যাকুলিত হৃদয়ে ভরত বলিলেন, ভাই! আমার শরীরে কোন ব্যাধি হয় নাই বা অন্য কিছুই হয় নাই; গত রাত্রে দুঃস্বপ্ন দর্শনে আমি যে কেমন হইয়াছি যেন কিছুতেই আমি স্থির হইতে পারিতেছি না। স্বপ্ন দর্শনে ভয়ের কারণ কিছুই নাই জানি তথাপি আমার প্রাণ কেন এমন করিতেছে?

কেন এমন চিন্তায় এবং ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে? স্বপ্ন দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, "অহং রামোঽথবা রাজা লক্ষ্মণো বা মরিষ্যতি" আমি রাম কিংবা রাজা অথবা লক্ষ্মণ কেহ না কেহ মরিবে। কারণ

"নরো যানেন যঃ স্বপ্নে খরযুক্তেন যাতি হি
অচিরাৎ তস্য ধূমাগ্রং চিতায়াং সম্প্রদৃশ্যতে।"

স্বপ্নে যে ব্যক্তিকে খরযুক্তরথে যাইতে দেখা যায়, শীঘ্রই সেই ব্যক্তির চিতার ধূমশিখা দৃষ্টিগোচর হয়।

"এতন্নিমিত্তং দীনোঽহং ন বচঃ প্রতিপূজয়ে"
"শুষ্যতীব চ মে কণ্ঠো ন স্বস্থমিব মে মনঃ।"

এইজন্যই আমি দীনভাবাপন্ন হইয়াছি, এবং আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, মনও সুস্থ নাই। এইরূপ কথোপকথন হইবার কিছুক্ষণ পরেই অযোধ্যা হইতে দূত আসিয়া, ভরত ও শত্রুঘ্নকে অযোধ্যায় গমন করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল। ভরত মাতামহ ও মাতুলের আদেশ লইয়া ত্বরায় অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আসিবার সময় ভরত পথিমধ্যে নানাবিধ অমঙ্গল দেখিতে পাইলেন। অযোধ্যায় আসিয়া ভরত আরও বিস্মিত এবং ভীত হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সারথি, অযোধ্যানগর এমন নিরানন্দ বোধ হইতেছে কেন? যে নগরের কোলাহল ধ্বনিতে পূর্ব্বে মেদিনী কম্পিত করিত, আজ তাহা শ্রীহীন নির্জ্জন অরণ্যের মত বোধ হইতেছে কেন? উদ্যানের সে মনোহারিণী শোভা আর নাই, মত্ত মৃগ পক্ষীদিগের মধুর ধ্বনি আর নাই, বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, যেন কাঁদিতেছে, এই প্রভাতকালে সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম রাশির মাঝে কত ভ্রমর গুঞ্জন করিত, কই আজ সে ফুল ত ফুটে

নাই, সে ভ্রমর ও আসে নাই, কুসুমেরও সুবাস লইয়া মৃদুমন্দ পবন দিক আমোদিত করিয়া নরনারীর প্রাণে কত প্রীতি উৎপাদন করিত আজ যেন নগর শশ্মান হইয়াছে। পূর্ব্বে এই প্রভাতে, এই নগরে বাদ্য-যন্ত্রে এবং সুন্দর বাঁশীতে সুন্দর করিয়া কত রাগ রাগিণী ঝঙ্কার দিত আজ সে সকল কোথায় গেল? সারথি! আমি কাল হইতে যে সমস্ত অমঙ্গল দর্শন করিতেছি তাহাতে আমার মুখ শুষ্ক হইয়া দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। কেনই বা গুরুদেব আমাকে ত্বরায় এখানে আসিতে আদেশ করিয়াছেন; আমার চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে অমঙ্গল আশঙ্কায় যেন কম্পিত হইয়া যাইতেছে। যতক্ষণ না আমি সকলকে কুশলে দেখিব ততক্ষণ আমার অস্থির চিত্ত কিছুতেই শান্ত হইবে না। রাজা বিনা রাজ্যের অবস্থা যেরূপ হয়, আজ আমার সেই রূপ বোধ হইতেছে। ওই দেখ সারথি, আমাকে দেখিয়া জনপদবাসীরা অধোমুখে অশ্রু মুছিতেছে। কেহ বা ঘৃণাসূচক কটাক্ষে একবারমাত্র আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক চলিয়া যাইতেছে। দেব মন্দির জনতা শূন্য, ধূপ, ধূনা কুসুমের পবিত্র গন্ধ আর নাই, গৃহস্থ ভবন ধূলিরাশিতে সমাচ্ছন্ন, দেবপূজা যজ্ঞানুষ্ঠানের কোন আয়োজন নাই, মাল্যবিপণিকুল মধ্যে পুষ্প বিক্রেতা আপন ব্যবসা বন্ধ করিয়া চিন্তা-ব্যাকুল-চিত্তে নীরবে যেন কি ভাবনা করিতেছে, সকলেই রোরুদ্যমান, সকলেই অধোবদনে অশ্রুপাত করিতেছে; কিন্তু কারণ কি এখন পর্য্যন্ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পুনঃ পুনঃ বিস্মিত হইয়া শ্রীভরত রাজ্যের সংবাদ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ইন্দ্রতুল্য রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। ব্যস্ত চিত্তে ত্রাস্ত পদে তিনি প্রথমে পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু একি! রাজগৃহ শূন্য, গৃহ এবং দ্বার কপাট ইত্যাদি ধূলিপূর্ণ, রাজলক্ষ্মী যেন ছাড়িয়া গিয়াছেন, পিতার ভবনে ভরত পিতাকে দেখিতে না পাইয়া কম্পিত হৃদয়ে দ্রুতপদে মাতা কৈকেয়ীর নিকট গমন করিলেন।

কৈকেয়ী এতক্ষণ হর্ষোৎকণ্ঠচিত্তে ভরতের আগমন প্রতীক্ষায় স্বর্ণ-

সিংহাসনোপরি বসিয়াছিলেন, এক্ষণে ভরত আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করার পরে ভরতকে আপন ক্রোড়ে বসাইয়া মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে আপন পিতৃকুলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অত্যন্ত চিন্তাকুল বলিয়া ভরতের মুখবর্ণ মলিন হইয়া অল্প অল্প ঘর্ম্ম বিন্দুতে বড় পরিশ্রান্ত বোধ হইতেছিল, তাহা দেখিয়া আপন হস্তদ্বারা ভরতের মুখের ঘাম মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন অতি শীঘ্র আসার জন্য বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছ তাই বুঝি আমার আশালতাবন্ধনকারী প্রাণানন্দকর মুখ এত মলিন হইয়া গিয়াছে? কৈকেয়ী এতক্ষণ এতকথা বলিল, ভরত কিন্তু এতই অন্যমনা হইয়া গিয়াছেন, যে সে সকল কথা কিছুই শুনিতে না পাইয়া শুধু নিস্পন্দ, নির্ব্বাক কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত কৈকেয়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। এক্ষণে তিনি আপন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। "মাতঃ পিতা মে কুত্রাস্তে একা ত্বমিহসংস্থিতা" মা পিতা আমার কোথায়? তুমি তো, মা পিতাকে ছাড়িয়া কখনও একাকিনী থাক নাই, "ত্বয়া বিনা ন মে তাতঃ কদাচিদ্রহসি স্থিতঃ" পিতা আমার তোমা ব্যতীত কখনও নির্জ্জনে থাকেন না, তবে আজ তুমি একাকিনী কেন মা? এই স্বর্ণভূষিত পর্য্যঙ্ক শূন্য পড়িয়া আছে, পিতার গৃহেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, তবে কি তিনি জ্যেষ্ঠ মাতা কৌশল্যা দেবীর গৃহে আছেন? মা, সত্বর আমায় বলুন আমি পিতার চরণে একবার প্রণাম করিয়া আসি। তখন সেই রাজ্যলোভে মোহিতা কৈকেয়ী, অজ্ঞাত বিষয়ক আপন শুভ সংবাদ বলিলেন। বলিলেন বৎস!

"যা গতিঃ সর্ব্বভূতাণাং তাং গতিংতে পিতা গতঃ।
রাজা মহাত্মা তেজস্বী যায়জূকঃ সতাং গতিঃ॥"

অন্তে সকল প্রাণীর যে গতি হইয়া থাকে, তোমার পিতা সাধুগণ-প্রতিপালক নিয়ত যাগশীল তেজস্বী মহাত্মা রাজা দশরথ সেই গতি লাভ করিয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র ভরত বজ্রাহতের ন্যায় ভূমিতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, "হা তাত ক্ক গতোহসি ত্বং ত্যক্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে" হা পিতঃ তুমি! আমাকে দুঃখ সাগর মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া

কোথায় যাইলে ? 'অসমর্প্যৈব রামায় রাজ্ঞে মাং ক্ব গতোঽসি ভো' পিতঃ ; আমাকে রাজা রামের হস্তে না অর্পণ করিয়া কোথায় যাইলে ? তখন সেই কৈকেয়ী, রোরুদ্যমান, ভূতলে পতিত আলুলায়িত কেশপাশ ভরতকে ধরিয়া তুলিয়া নয়ন মুছাইয়া বলিলেন "সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে সর্ব্বং সম্পাদিতং ময়া" আশ্বস্ত হও, তোমার মঙ্গল আমি সকল বিষয়ে সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছি। ভরত সে কথা শুনিতেই পাইলেন না। তখন ভরত অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। মা, এইজন্য আমি কাল হইতে ক্রমাগত অমঙ্গল ও কুলক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি। আমার ভাগ্যদোষে স্বপ্ন বৃত্তান্ত আজ সত্যে পরিণত হইল, হায় ! কি কুক্ষণেই আমি মাতুলালয়ে ছিলাম যে, পিতার শেষ সময়ে কোন উপকার করিতে পারিলাম না ; পরে রাম লক্ষ্মণকে স্মরণ করিয়া বলিলেন ভাই ! তোমরাই ধন্য, পিতার শেষ সময়ে পিতৃসেবা করিতে পারিয়াছ, আমি অতি অভাগা সন্তান, তাহা না হইলে, পিতার অন্তিমকালে কেন চলিয়া গেলাম ! বল মাতঃ, পিতা আমার কোন রোগাক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন ? সেই ধর্ম্মাত্মা আমার পিতা মৃত্যুকালে আমাকে কি আদেশ করিয়া গিয়াছেন ? পিতার নিকটে না থাকায় হয় ত তিনি শেষ সময়ে আমাকে কতই স্মরণ করিয়াছিলেন, হয় ত শেষকালে, আমার নাম ধরিয়া কতই ডাকিয়াছিলেন, আজ আমরা চারি ভাই অনাথ হইলাম। পিতা আমায় এইরূপে কাঁদিতে দেখিলে সেই সুখস্পর্শ শীতল হস্ত দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া, কোলে লইয়া নয়ন মুছাইয়া সকল জ্বালা নিভাইয়া দিতেন, হায় ! পিতা আমায় শোক সাগরে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় গমন করিলেন ? এক্ষণে সেইসর্ব্বজন জীবন, শান্তি দাতা একমাত্র রামের চরণ ভিন্ন আর আমার অন্য গতি নাই।

"যো মে ভ্রাতা পিতা বন্ধুর্যস্য দাসোঽস্মি সম্মতঃ
তস্য মাং শীঘ্রমাখ্যাহি রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ" ॥

যিনি আমার পিতা ভ্রাতা বন্ধু সকলই, এবং আমি যাঁহার অভিমত দাস, সেই রাম কোথায় আছেন আমাকে সত্বর বলুন ? বল মা,

আমার তাপিত হৃদয়ের শান্তিদায়ক আমার জীবন মরণের বন্ধু, আমার শেষের সম্বল প্রাণের চিন্তামণি, রাম এক্ষণে কোথায়? আমি সেই সর্ব্ব-দুঃখহারী রামের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া এ অসহ্য দারুণ পিতৃশোক নিবারণ করিব। আমি আশা করিয়াছিলাম, পিতা হয় ত রামকে রাজা করিবেন, তাই দূত পাঠাইয়া অতি ত্বরায় আমাকে আসিতে আদেশ করিয়াছেন, হায়! আজ আমার সকল আশা উৎপাটিত হইয়া সকল সাধে বাদ পড়িল। বল মা! ধর্ম্মজ্ঞ আর্য্যব্যক্তিরা যাঁহাকে পিতৃতুল্য মান্য করেন, পিতার প্রেতকার্য্য সমাধানান্তে রাম এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন? বল, বল, মা! আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হউক, আমি সেই জগত জীবন রামের শীতল চরণতলে লুটাইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া আসি, তাহা হইলে পিতৃ বিয়োগ জনিত এ ভীষণ বহ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। আর বল মা, পিতা আমার কেমন করিয়া কি বলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই ভয় বর্জ্জিতা কৈকেয়ী নির্ভয়ে ভরতকে বলিল,

"হা রাম রাম রামেতি লক্ষ্মণেতি পুনঃ পুনঃ
বিলপন্নেব সুচিরং দেহং ত্যক্ত্বা দিবং যযৌ।"

বৎস, তোমার পিতা বার বার হা রাম, হা সীতা, হা লক্ষ্মণ বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এবং নিগড় দ্বারা হস্তপদ বদ্ধ হস্তীর ন্যায় কাল পাশে বদ্ধ হইয়া রাজা এই বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন, যে যাঁহারা সেই রাম, লক্ষ্মণ, সীতাদেবীকে নগরে ফিরিতে দেখিবেন তাঁহারাই ধন্য! তখন সেই নিতান্ত সরল হৃদয় রাম ভক্ত ভরত, দুঃখে, বিষাদে, অতি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সে কি মা! সেই সত্যবাদী পুরুষ-প্রবর জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মা রাম এক্ষণে লক্ষ্মণ সীতার সহিত কোথায় গমন করিয়াছেন? অতি উৎসাহের সহিত কৈকেয়ী বলিল, রাজপুত্র রাম, চীর ও জটা বল্কলধারী হইয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছে, ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ ও পতিব্রতা রাজকুললক্ষ্মী সাধ্বী সীতাদেবী, উভয়েই রামের অনুগমন করিয়াছে। ভরত শিহরিয়া উঠিল, বলিল, মা, তুমিও কি

সন্তানের দুঃসময় দেখিয়া আমার সহিত ছলনা করিতেছ? আমি যে এ প্রহেলিকা কিছুই ভেদ করিতে পারিতেছি না, বল মা, আমার রাম কি সত্যই এখানে নাই? সেই জিতেন্দ্রিয় শ্রীরামের লোকবিমোহন চরিত্রে এমন কি দোষ হইয়াছে, যাহাতে তাঁহার প্রতি এ কঠোর শাসন করিয়া নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে? তিনি ত ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই? কোন নিষ্পাপ ধনাঢ্য ব্যক্তিকে হিংসা ত করেন নাই? রঘুবর দশরথ-কুল-গর্ব্ব, রাম ত কোন পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়েন নাই?

তখন কৈকেয়ী হর্ষ গদগদ চিত্তে বলিল, যে রাম কাহারও প্রতিহিংসা, দ্বেষ, বা কাহারও ধন অপহরণ করেন নাই, কোন পরস্ত্রীকে চক্ষেও দেখেন নাই। তোমার পিতা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার জন্য ত্বরা করেন, পূর্ব্বে, রাজার নিকট দুই বর আমার প্রাপ্য ছিল, তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া, এক বরে, রামকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে পাঠাইয়াছি, অন্য বরে তোমায় রাজ্য দিয়াছি। "ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রাহত ইব দ্রুমঃ" মাতার এই কথা শুনিবা মাত্র, ভরত হস্ত দ্বারা বুক চাপিয়া অচৈতন্য হইয়া, হা পিতা, হা ভ্রাতা, হা সীতা, বলিয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

"কৈকেয়ী পুনরপ্যাহ বৎস শোকেন কিং তব"
'রাজ্যে মহতি সম্প্রাপ্তে দুখস্যাবসরঃ কুতঃ'।

তুমি বিশাল রাজ্য পাইয়াছ, একি দুঃখ করিবার সময়? উঠ বৎস, শোক দূর করিয়া রাজ্য উপভোগ করিয়া আমার আশা পূর্ণ কর আমি যে তোমারই শুভ আগমন প্রতীক্ষায় পথ পানে চাহিয়া বসিয়াছিলাম।

হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল, নিষ্পন্দ নির্ব্বাক হইয়া ভরত কৈকেয়ীর মুখপানে চাহিয়া আছেন পরে ভাবিলেন, আমার এ কি হইল! একি স্বপ্ন দেখিতেছি, না ইহা যে স্বপ্নেরও অতীত, একি বিষম ভ্রমে পড়িলাম। নতুবা, মা হইয়া কে কোথায় সন্তানকে বধ করে, বল মা, আমার কি হইয়াছে? তুমি আমায় কি বলিতেছ, আমি সকলই তোমার অযোগ্য (বিপরীত) কথা শুনিতেছি।

কৈকেয়ী পুনরায় বলিল, তুমি বিপরীত কিছুই শুন নাই, আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই, এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছি।

এইবার ভরতের বাহ্যজ্ঞান আসিল, কুপিত এবং পদদলিত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া কৈকেয়ীকে দৃষ্টিদ্বারা দগ্ধ করতঃ বলিলেন ওরে পাপচারিণি! তুই কি পিশাচী? অথবা আমার সহিত প্রতারণা করিতেছিস্? ওরে রাক্ষসী তোকে "মা" বলিয়া "মা" নামে কলঙ্ক করিতে চাহি না। রে পাপীয়সি! তোর গর্ভে জন্মিয়াছি বলিয়া আমিও পাপিষ্ঠ। অতএব এ কলঙ্কিত জীবন আমি রাখিব না।

অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি বিষং বা ভক্ষয়াম্যহম্

খড়্গেন বাথ চাত্মানং হত্বা যামি যমক্ষয়ম্।

আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া অথবা বিষপান কিংবা খড়্গ প্রহারে আত্মহত্যা করিব। হায়! পিতা আমার এই মহাবিষ সম্পন্না কালভুজঙ্গিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এতদিন কি তাহা কিছু জানিতে পারেন নাই? ওরে সূর্য্যবংশ কলঙ্কিনি পতি পুত্রঘাতিনি, সেই বিশুদ্ধাত্মা নিষ্পাপ সর্ব্বজন প্রিয় কমলদললোচন রামকে বনে পাঠাইয়া এখনও তোর পাষাণ হৃদয় দ্বিখণ্ডিত হইতেছে না? রামের শোকে যে পাষাণও ফাটিয়া যায়। রাম যদি তোমাকে মাতৃতুল্য না দেখিতেন এখনি তোরে বিনাশ করিয়া আমার সকল জ্বালা দূর করিতাম্ অরে হতভাগিনি! তুই কোন্ দোষে ধর্ম্মনিরতা একমাত্র পুত্রবতী মাতা কৌশল্যাদেবীকে পতিপুত্র বিহীনা করিয়াছিস্? ক্ষণ কাল বিলম্ব কর, শীঘ্র তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছি। ঐ দেখ পাষাণি, পুরজন, রামশোকে প্রাণমাত্র রাখিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া আমার পাপমুখ দেখিয়া নিন্দা করিতেছে। রে ক্রূরাচারে! এ পাপের তোর আর প্রায়শ্চিত্ত নাই; তুই শীঘ্র বিষ ভক্ষণে বা উদ্বন্ধনে অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পাপপ্রাণ ত্যাগ কর। অন্য গতি নাই। রাম যেখানে গিয়াছেন আমিও সেখানে গিয়া অবিলম্বে তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছি। এই বলিয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গম্ভীর গর্জ্জনে পুরী কম্পিত

করিতে লাগিলেন। "ইতি নির্ভৎস্য কৈকেয়ীং কৌশল্যা ভবনং যযৌ" ভরত শিথিল বসনে স্খলিত ভূষণে, আরক্তলোচনে মাতা কৌশল্যা-দেবীর নিকট গেলেন। সাপি ত্বং ভরতং দৃষ্টা মুক্তকণ্ঠা রুরোদহ। কৌশল্যা ভরতকে দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ভরতও তখন রোদন করিতে করিতে কৌশল্যার পদতলে পতিত হইলেন। সাধ্বী যশস্বিনী, রামবিরহে-কাতরা, কৃশা, বিশুষ্কমুখী রামজননী কৌশল্যা তখন ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন। পুত্ররে! তোর অবিদ্যমানে যে সকল সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, সে সকলই কৈকেয়ীর মুখে শুনিয়াছ—

পুত্রঃ স ভার্য্যো বনমেব যাতঃ
সলক্ষ্মণো মে রঘুরামচন্দ্রঃ
চীরাম্বরো বদ্ধজটাকলাপঃ
সন্ত্যজ্য মাং দুঃখ সমুদ্র-মগ্নাম্।

আমার পুত্র রঘুনন্দন রামচন্দ্র চীরবস্ত্র পরিধান ও জটাভার বন্ধন পূর্ব্বক, দুঃখ-সাগর-নিমগ্না আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, ভার্য্যা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনে গমন করিয়াছে; পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

হা রাম হা মে রঘুবংশনাথ
জাতোহসি মে ত্বং পরতঃ পরাত্মা
তথাপি দুঃখং ন জহোতি মাং বৈ
বিধির্বলীয়ানিতি মে মনীষা ॥ ৮৬ ॥

হা রাম হা রঘুবংশনাথ, তুমি পরাৎপর পরমাত্মা আমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছ তথাপি দুঃখ আমায় পরিত্যাগ করিতেছে না। অতএব আমি নিশ্চয় করিয়াছি, বিধাতাই বলবান। এই বলিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভরত কৌশল্যা জননীকে দেখিয়া রাম বিরহ জনিত নিজ দুঃখ বিস্মৃত

হইলেন, তখন তাহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি অত্যন্ত দুঃখসূচক স্বরে কৌশল্যা দেবীকে বলিলেন, 'মা' কৈকেয়ী আমাদের হৃদয়ে যে ভীষণ শেলাঘাত করিয়াছে, ইহার বিন্দু বিসর্গ যদি আমার জানা থাকে, তবে শত ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যার পাতক যেন আমায় স্পর্শ করে। মা, তোমাকে আর আমি কি বলিব, খড়গ প্রহারে অরুন্ধতী সহিত বশিষ্টদেব বধে যে পাপ হয়, আমায় যেন সেই পাপস্পর্শ করে। আর্য্য, রঘুবংশ তিলক সাধু প্রবর সত্যসন্ধ রাম, যাঁহার মতানুসারে বন গমন করিয়াছেন, তাঁহার যেন কোন কালে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত বুদ্ধি না হয়, এবং গুরুপত্নী গমনে, মিত্রদ্রোহীতে, পিতা মাতার শুশ্রূষা না করিলে, তৃষ্ণার্ত্তকে জল না দিলে, পোষ্যবর্গকে পোষন না করিলে, অপাত্রে দান করিলে, প্রাতঃকালেও সন্ধ্যাকালে শয়ন করিয়া থাকিলে, পাদ দ্বারা গো শরীর স্পর্শ করিলে, যে পাপ হয়, সেই পাপ যেন আমার হয়। এই-রূপে ভরত অতি কঠোর কঠোর শপথ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'হা রাম' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন কৌশল্যাদেবী ভরতকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভরতের নয়ন মুছাইয়া বলিতে লাগিলেন, পুত্ররে, আমি কি তোর স্বভাব জানি না, তবে কেন এ কঠোর শপথ করিয়া আর দগ্ধ প্রাণের জ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতেছিস্? বল্ বাবা, কোথায় গেলে, কি করিলে আমি এককালে পতি পুত্র শোক উপশম করিতে পারিব? রামের সেই জলভারা আঁখি, সেই নব জলধর শ্যাম-কায়, সেই প্রাণ মন হরা 'মা' বলিয়া ডাকা, যতই মনে হইতেছে, প্রাণ আমার তত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, জানি না, বাবা! কৈকেয়ীর নিকট আমরা কোন দোষে দোষী ছিলাম। এইরূপ উভয়ে বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে সে রাত্রি এমনই করিয়া কাটিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

—※—
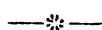
প্রভাতে ভরত আগমন কথার সংবাদ পাইয়া রাজগুরু বশিষ্ঠদেব রাজ ভবনে উপস্থিত হইলেন। ভরত বশিষ্ঠদেবের চরণ বন্দনা করিতে গিয়া, পদমূলে লুটাইয়া ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন লাগিলেন। তখন পুরহিত-কারী রামগুরু বশিষ্ঠদেব, সর্ব্ব শোক দুঃখ হর পরম ঔষধ একমাত্র তত্ত্ব জ্ঞান দিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

তিনি, স্নেহ সূচক স্বরে, হস্তদ্বারা ভরতকে উঠাইয়া অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া অতি আদরের সহিত বলিলেন, 'বৎস' শোক, পরিত্যাগ কর যে হেতু জ্ঞানী ব্যক্তির তাহা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য, তোমার পিতা দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং মহাজ্ঞানী সত্যধর্ম্ম তৎপর সত্য পালন করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন আর তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণকে পুত্ররূপে পাইয়া রাম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রাচীন দেহটা ত্যাগ করিয়া অক্ষয় আনন্দ ধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ নিজ মুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন.

'যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম'
তং তমৈবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ।

শেষ সময়ে যিনি যে ভাবে স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিবেন সেই ভাবনা দ্বারা তন্ময় চিত্ত হওয়ায় তিনি সেই ভাবই প্রাপ্ত হইবেন। তিনি রাম গত চিত্ত হইয়া, রাম নাম স্মরণ করিয়া, রাম রাম জপিতে জপিতে, চিরদিনের জন্য তাঁহার রামকে লাভ করিয়াছেন। বল ভরত! ইহা অপেক্ষা সুখের আর কি আছে? কোটী কোটী জন্ম তপস্যা করিয়া, কেহ বা শ্রীরামচরণ লাভ করিতে পারে, কেহ বা পারে না, জপ, ক্রিয়া পূজা, দান, ধ্যান, স্বাধ্যায় যাহা কিছু করিতে বলা যায়, শুধু এই শেষ স্মরণটুকু রাখার জন্য। জীবের যুগযুগান্তরের অজ্ঞানকৃত সংস্কার

সেই শেষদিনে জানি না কোন্ সংস্কার জাগিয়া উঠিবে, তাই উঠিতে বসিতে, চলিতে-ফিরিতে প্রতি শ্বাসে শ্বাসে নাম করিতে বলা যায়। রাজা দশরথ রাম ধ্যানে স্থিরনেত্রে রাম জ্ঞানে পরিপূর্ণ হৃদয়ে রাম নামে প্রাণ ভরিয়া, রাম নাম রসনায় উচ্চারণ করিয়া, জড় দেহটা জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপে প্রাণ প্রয়াণ ইহাত, 'উৎসবের' ন্যায় আনন্দ জনক, এবং বহুভাগ্যসাপেক্ষ, অতএব সেই মুক্তি ভাজন রাজার জন্য, কেন বৃথা শোক করিতেছ? আর জন্ম-নাশাদি বর্জ্জিত আত্মা, অব্যয় ও নিত্য শুদ্ধ। আত্মা, এবং অনাত্মা সম্বন্ধে বিচার করিলে, শোকের অবকাশ থাকে না, ভরত! আত্ম-স্বরূপ, সাধনা দ্বারা যদি একবার উপলব্ধি করিতে পার, তখন আর শোক মোহ তোমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না। জন্ম, অপক্ষয়, বৃদ্ধি, পরিণাম, বিনাশ, অস্তিত্ব, এই ষড়বিকার দেহেরই হইয়া থাকে; এই শরীর অতিশয় অপবিত্র এবং নশ্বর, পঞ্চভূতের গড়া পঞ্চভূতময় দেহটার জন্য শোকে অধীর হওয়া সাজে না, ভরত! রাম ভ্রাতা তুমি, তুমিও কি অজ্ঞজনের আচরণ করিবে? আর যাবজ্জননং তাবন্মরণং জন্মিলে অবশ্যই মৃত্যু আছে, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সাগর ও যখন শুষ্ক হয়, আর নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে অনিত্য কোন দ্রব্যের আবার আস্থা কি? নিয়তক্ষয়শীল সর্ব্বদা গতি শীল জগতের সকল দ্রব্যই ক্ষণভঙ্গুর,—

যচ্চেদং দৃশ্যতে কিঞ্চিজ্জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্,
তৎ সর্ব্বমস্থিরম্ ব্রহ্মণ স্বপ্নসঙ্গমসন্নিভম্।

এজগতের সমস্তই ত স্বপ্নসঙ্গমের ন্যায় অস্থির।

আপদঃ ক্ষণমায়াত্তি ক্ষণমায়াত্তি সম্পদঃ,
ক্ষণং জন্ম ক্ষণং মৃত্যুর্মুনে কিমিব লক্ষণং।

এখানে একক্ষণেই আপদ, আবার সম্পদ, দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়। তড়িত স্ফুরণের মত, "ক্ষণমৈশ্বর্য্য মায়াতি ক্ষণমেতি দরিদ্রতা," দগ্ধ

সংসার প্রত্যহ ক্ষয় হয়, "প্রত্যহ জায়তে পুনঃ," প্রত্যহ জন্মে, অতএব জগৎ অনিত্য সুখহীন, তৃষ্ণা দুর্ব্বহ, চিত্ত সদা আকুল। দেহের জরা মৃত্যু, মনের মোহ, প্রাণের ক্ষুধা তৃষ্ণা এই মিথ্যা ষড়ূর্ম্মির আঘাতে আপনাকে বাঁচাইতে হইলে অনন্যমনে শ্রীভগবানের শরণ লওয়া ভিন্ন ত্রিতাপ তাপিত ত্রিগুণ পীড়িত জীবের আর অন্য উপায় নাই।

জন্মমৃত্যু জরাদুঃখমনুযান্তি পুনঃ পুনঃ
বিমৃশন্তি ন সংসার পশবঃ পরমোহিতঃ॥

যাহারা এই সংসার বিচার না করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু, জরা দুঃখের অনুগামী হয়, তাহারা মানব হইয়াও পশু। অতএব শান্ত সুধীজন এই মায়ার খেলায় মোহিত হইতে পারে না। আর এই ত্বক্, অস্থি মাংস বিষ্ঠা মূত্র রেত রক্তাদিময় পরিণামী ও বিকারী দেহ আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। মনুষ্য অজ্ঞান জনিত এই দেহের ধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম মনে করিয়া দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ মনে করিয়া থাকে। নতুবা বিকার বর্জ্জিত অনন্ত সত্য নির্ব্বিকল্প জ্ঞান স্বরূপ আনন্দময় আত্মার কখনও বিনাশ নাই। আত্মা সর্ব্বদা নির্লিপ্ত আপনাতে আপনি পূর্ণ।

অতএব এই আনন্দময় জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া আত্মসংস্থ হও। জীব জন্ম জন্মকৃত কর্ম্মফলে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করে, তাহার মধ্যে এই মানব জন্ম লাভ করা বড় দুর্লভ, মানব-জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ করা। নতুবা শুধু মায়া হাটের ছায়ানাটে আপন স্বরূপ হারাইয়া, হাঁসিয়া কাঁদিয়া অভিনয় করিবার জন্য এই জীবন নয়। এই সুখ দুঃখ, হাসি কান্না সবই অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়ার রঙ্গ মাত্র। অতএব ইহাতে অভিভূত হওয়া তোমার মত লোকের কোন মতেই উচিত নহে। আর এই,—

"নিঃসারে খলুসংসারে বিয়োগোং জ্ঞানিনাং যদা"
ভবেদ্বৈরাগ্য হেতুঃ স শান্তি সৌখ্যং তনোতি চ"

এসার সংসারে প্রিয় বিয়োগ জ্ঞানিগণের বৈরাগ্যজনক হয় ও শান্তি

সুখ দান করে। এই নিখিল দোষের আকর সংসারে বৈরাগ্যই সার বস্তু। জ্ঞান লাভ ভক্তি লাভ সহজেই হইতে পারে, কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ ধন বৈরাগ্য লাভ বড় দুর্লভ। শোক অতি পবিত্র বস্তু। শোক মনুষ্যের চিত্তকে নির্ম্মল করে এবং চিত্তকে সমস্ত বহির্মুখী বৃত্তি হইতে গুটাইয়া অন্তরে অনন্তের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। আর শোক হইতেই এই বৈরাগ্য লাভ হয়। শুধু এই বৈরাগ্যকে সহায় করিতে পারিলেই সমস্ত বাসনা কামনা পুড়িয়া যায়, আর এই বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিতে পারিলেই, এই দুর্ব্বার মৃত্যু সংসারসাগরে শ্রীভগবানের অভয় চরণ তরণী লাভ করা যায়। শোকের আঘাতে হৃদয় যখন শ্মশান প্রায় হইয়া যায়, তখন সেই শ্মশানেই শ্মশান বাসিনীর শুভ পদার্পণ হইয়া থাকে।

অনিত্য ধনৈশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া অহঙ্কার-বশে আপন স্বরূপ হারাইয়া ভব বিকারে উন্মত্ত হইয়া, আশা বায়ুগ্রস্ত হইয়া, দুর্ভাগ্য জীবের যখন অধঃপতন হইতে থাকে, দুঃখহারী দয়াল ঠাকুর তখন দয়া করিয়া, রোগ, শোক, দুঃখে ম্রিয়মাণ জীবকে চৈতন্য দান করিয়া থাকেন, অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিয়া দিয়া বলিয়া দেন, "দেখ জীব! এখানে আস্থার বস্তু কিছুই নাই" অনিত্য জগতের সকল বস্তুই অনিত্য, এক-মাত্র সত্য, নিত্য ধন শ্রীশ্রীভগবানের অভয় চরণ"। কিন্তু জীব এমন সুন্দর বৈরাগ্যকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, কিন্তু ভরত! যাঁহারা এই বৈরাগ্যকে স্থায়ী করিয়া সাধনা করিতে পারেন, তাঁহারা এই শোক হইতেই অনন্ত কালের জন্য নিশ্চিন্ত হইবার উপায় লাভ করেন। তুমি অধৈর্য্য হইও না। ভরত! আমার মনে হইতেছে, দশরথ বিয়োগ জনিত, এবং শ্রীরামবিরহজনিত, শোক তোমার হইয়াছে, শোক জনিত হৃদয়ের এই বৈরাগ্য লইয়া, তোমা দ্বারা, জীবের কল্যাণের নিমিত্ত, ভগবান কোন মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া লইবেন; কারণ ভিন্ন কখন কার্য্য হয় না, আর মঙ্গলময়ের কার্য্যের উদ্দেশ্য সকলই আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত। দেখ ভরত! জ্ঞানী এবং ভক্ত

দুই প্রকারের সাধক আছেন। জ্ঞানী ব্যক্তি, জগতকে মিথ্যা বোধ করিয়া সুখ দুঃখ মায়ার রঙ্গ জানিয়া প্রকৃতি হইতে আপনাকে পৃথক জানিয়া সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত হইয়া শান্ত ভাবে আত্ম স্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া আনন্দময় হইয়া থাকেন। আর ভক্ত সমস্তই তাঁহার স্নেহের দান বলিয়া, আনন্দ মনে নত শিরে, সুখ দুঃখের পসরা বহন করিয়া থাকেন, সকল অবস্থায় সকল রূপের মাঝে, তাঁহার প্রাণপ্রিয়কে দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন। ভরত! তুমি অহংকর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিয়া, তাঁহারই আদেশ জানিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহার কর্ম্ম কর, তোমার আত্মাকে হৃদয় গুহা বাসী আত্মারামে সংলগ্ন করিয়া শোকজনিত মোহ ত্যাগ কর। ভরত বলিলেন, গুরুদেব রাম, এবং সীতা, ও লক্ষ্মণ, দণ্ডকারণ্যে গমন করায় রাক্ষসী সদৃশী আমার জননীকে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। অতএব আমি কৃত নিশ্চয় হইলাম, আমিও বনগমন করিয়া, 'রামং সীতাসমেতং স্মিত রুচিরমুখং নিত্যমেবানুসেবে,' ঈষৎ হাস্যযোগে রুচির বদন সীতা-সমেত রামকে আমি নিয়ত সেবা করিব।

ভরত এইরূপ কৃতনিশ্চয় করিয়া, বশিষ্ঠ দেবের আদেশানুসারে যথা বিহিত পিতৃ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

—✻—

ভরত পিতার প্রেতকার্য্য সমাধানান্তে করতলে কপোল সংন্যস্ত করিয়া অতি বিষণ্ণ চিত্তে ভূমিতলে উপবেশন করিয়াছেন। শত্রুঘ্ন এই লোমহর্ষণ কার্য্যের মন্ত্রণা দাত্রী "মন্থরা" ইহা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া তাহাকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ভরতের নিকট আনিয়া ক্রোধবশে তিরস্কার

পূর্ব্বক অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন। মন্থরা প্রাণভয়ে বিকট চীৎকার করিতেছে, তাহার চীৎকারে অন্তঃপুর নিবাসী রাজমহিলাগণ সকলেই ছুটিয়া সেইস্থানে আসিয়াছেন, সেই সঙ্গে কৈকেয়ীও আসিয়াছেন, কৈকেয়ীকে দর্শন করিবামাত্র শত্রুঘ্নের ক্রোধাগ্নিতে যেন কেহ ঘৃতাহুতি ঢালিয়া দিল। কৈকেয়ীও শত্রুঘ্নের রোষ কষায়িত-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রাণ-ভয়ে ধর্ম্মাত্মা ভরতের আশ্রয় লইলেন। তখন শান্তশীল ধর্ম্মাত্মা ভরত এই বলিয়া শত্রুঘ্নকে নিরস্ত করিলেন, ভাই শত্রুঘ্ন! অল্পবুদ্ধি ও মন্দমতি মন্থ-রাকে বধ করিলে বল কি ফল হইবে? আর স্ত্রীজাতি সকলেরই অবধ্য অতএব ইহাকে বধ করিলে 'সেই ক্ষমাশীল দয়াসিন্ধু রাম হয় ত স্ত্রীবধকারী বলিয়া আমাদের মুখ দর্শন করিবেন না, অতএব ভাই পাপরূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অবিহিত কার্য্য করা উচিত নয়, ক্রোধরূপ মহাশত্রু মোক্ষপথের পরম বিঘ্নদায়ক, ক্রোধ হইতে সকল অনর্থ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান শ্রীগীতায় কীর্ত্তন করিয়াছেন,

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।"
স্মৃতি-ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

অতএব, ক্রোধরূপ চণ্ডালকে পরিত্যাগ কর, ভাই! অন্যায়কার্য্য করিলে রাম নিদয় হইবেন, রাম, অপ্রসন্ন হইলে, আমাদের এ ছার জীবনই বা কোন্ কার্য্যে লাগিবে? মনুষ্য জীবনের উপার্জ্জনের বস্তু শুধু শ্রীভগবানের প্রসন্নতা। একমাত্র ভগবানের প্রসন্নতা অনুভব করিতে পারিলেই জীবনের সকল সাধ আশা মিটিয়া থাকে, অতএব যিনি সর্ব্বজনে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন, সেই রাম চরণে চিত্ত স্থির করিয়া, ক্রোধ পরিত্যাগ কর।

(ক্রমশঃ)

উৎসব।

—ঃ-*-ঃ—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৪শ বর্ষ। } সন ১৩২৬ সাল, অগ্রহায়ণ। { ৮ম সংখ্যা।

৺কালীপূজার ভাবনা--সাধনা রহস্য—প্রার্থনা।

নিজের ভিতর মিলাইয়া লইতে না পারিলে বেদ পাঠ ও যেমন নিষ্ফল সেইরূপ পুরাণপাঠ, রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ এমন কি পূজাপাঠ ও নিষ্ফল। নিজের প্রাণ দিয়াই প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিধি।

রক্ষা ও সংহার লইয়াই জগতের সৃষ্টি ও জগতের উন্নতি। সৃষ্টি-ব্যাপারে রক্ষা সংহার থাকাই চাই। যখন রক্ষার বল বেশী হয় তখন জগৎ চলে উন্নতির মুখে, আর যখন ধ্বংসের প্রকোপে রক্ষা দাঁড়াইতে পারে না তখন জগৎ ছুটে সংহারের পথে।

কালচক্র সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার লইয়া প্রবল বেগে ঘুরিতেছে। আজ আধুনিক পৃথিবীর দিকে চাহিলে আমরা কি দেখি? ধ্বংস যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া জগৎকে আক্রমণ করিয়াছে। ইউরোপের এই

মহাসমরে ধ্বংসের প্রচণ্ড পরাক্রমে রক্ষাকে যেন দাঁড়াইতে দিতেছে না। একস্থানে অগ্নি লাগিলে যেমন সকল দেশের মধ্যে তাহার ক্রিয়া হয়, সেইরূপ আজ সমস্ত পৃথিবীতে এক ভীষণ সংহার ক্রিয়া চলিতেছে।

আজ বাঙ্গালা দেশের এই হাহাকার কিসের সূচনা করে? সমস্তই ধ্বংসের চিহ্ন কিন্তু ধ্বংসের ভিতরেও রক্ষার শুভ চিহ্ন দেখা দিয়াছে! সকল সম্প্রদায়ের লোক আজ পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। এই রক্ষার সাড়া যখন প্রতি জীব হৃদয়ের দ্বারে প্রবল বেগে আঘাত করিবে, তখন এই ধ্বংস ব্যাপারের নিবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইবে কি? কে বলিতে পারে ইহা হইবে কি না? এটা যে কলিকাল!

মানুষের মধ্যে দেবতাও আছেন, মানুষের মধ্যে অসুর ও আছে। যখন রাগ দ্বেষ, ব্যভিচার লোভ, অসংযম হিংসা, আত্ম-প্রাধান্য-প্রয়াস, অপরের সুবিধা অসুবিধা না দেখা,—এক কথায় যখন কাম, ক্রোধ ও লোভ জীবের সম্মুখে, সমাজের সম্মুখে, দেশের সম্মুখে, পৃথিবীর সম্মুখে নরকের দ্বার খুলিয়া দেয়, তখনই সর্ব্বত্র একটা অশান্তি, একটা হাহাকার উঠে। তখন মানুষের অন্তরের অন্তরস্থিত দেবভাব গুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিতে চায়। দেবগণ মিলিত হইলে, দেবশক্তি সমূহের একত্র সন্নিবেশে যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে তাহাতেই সৃষ্টিস্থিতি সংহার-কারিণী আদ্যাশক্তি, মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিত হয়েন।

প্রাচীন আর্য্যগণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া দেখিয়া ধ্যানে তাঁহারা ইহা ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আজ পৃথিবীর দুই এক স্থানে, দুই এক জাতি মধ্যে ক্ষীণ ভাবে মূর্ত্তি পূজা থাকিলেও ভারতে বিশেষতঃ আমাদের বঙ্গ ভূমিতে মূর্ত্তি পূজা বিশেষরূপেই চলে। কে বলিতে পারে, কালে এই দেশ সমস্ত পৃথিবীকে ঈশ্বরের পূজা, ঈশ্বরের প্রকৃত সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ দিবে কি না? কে বলিতে পারে কালে এই বাঙ্গালী পৃথিবীর

সমস্ত জাতিকে স্বধর্ম্মে থাকিবার পথে অগ্রসর করিয়া দিবে কি না? আশ্বিনে জগদম্বাকে দুর্গামূর্ত্তিতে পূজা করার বিধি। তারপর মহালক্ষ্মীর পূজা। কার্ত্তিকে মহাকালীর পূজা, জগদ্ধাত্রীর পূজা, কার্ত্তিকের পূজা পরে পরে কত পূজারই বিধি। পূজা চৈতন্যেরই হয়—জড়ের পূজা হয় না। আমরা একটু ৺কালীপূজার কথা আলোচনা করিব।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ হইতেছে, ৺কালী পূজা তাঁহারই পূজা। যাঁহাকে জগতের জীব পূজা করে তিনি সৎ চিৎ আনন্দ এবং তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কারী বা কারিণী। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইহা সেই ব্রহ্মের, সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যের, তটস্থ লক্ষণ। আর "সচ্চিদানন্দ" হইতেছে সেই নির্ব্বিশেষের স্বরূপ লক্ষণ। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যিনি তাঁহাকে বিশেষণ দিয়া প্রকাশ করা হইতেছে না। বলা হইতেছে, সকল বিশেষণ ফুরাইয়া গেলে যিনি থাকেন তিনিই সৎস্বরূপ, তিনিই চিৎস্বরূপ, তিনিই আনন্দ স্বরূপ। ইহা অসৎ ইহা অসৎ এইরূপে সমস্ত অসৎকে তন্ন তন্ন করিলে যিনি থাকেন তিনিই সৎস্বরূপ। এইরূপ, ইহা জ্ঞান নয়, ইহা জ্ঞান নয়, এই-ভাবে তন্ন তন্ন করিতে করিতে যাঁহাকে পাওয়া যায় তিনি চিৎস্বরূপ। আবার ইহা আনন্দ নয় ইহা আনন্দ নয়, এই ভাবে তন্ন তন্ন করিতে করিতে যে নিরতিশয় আনন্দে স্থিতি লাভ করা যায় তাহাই আনন্দ স্বরূপে স্থিতি। তন্ন তন্ন ভিন্ন অন্য কোনরূপে সচ্চিদানন্দরূপে যাওয়া যায় না। লোকে স্বরূপের সাধনা একেবারে পারে না বলিয়া তটস্থ ধরিয়া, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ধরিয়া, সাধনার বিধি ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই ৺কালী পূজায় এই চিন্তাই হয়—এই জন্ম স্থিতি ভঙ্গ ধরিয়াই সচ্চিদানন্দে যাওয়া যায়।

আত্মতত্ত্বকে শিবতত্ত্বে লইয়া যাওয়াই সচ্চিদানন্দ পাওয়া বা সচ্চিদানন্দে স্থিতি লাভ করা। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা ইহারই জন্য, ব্রাহ্মণেতরের বিদ্মহে ধীমহি প্রচোদয়াৎ ইহারই জন্য; সকল পূজা বিশেষতঃ এই ৺কালী পূজা ইহারই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি।

আত্মতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের মধ্যে যে বিদ্যাতত্ত্ব, তিনিই ব্রাহ্মণের গায়ত্রী, ব্রাহ্মণেতরের ইষ্ট দেবতা, ৺কালী পূজার এই ৺কালী।

যত দিন না বিদ্যাতত্ত্ব স্বরূপিণী— মহাকালী, আত্মতত্ত্ব-জীব বক্ষে চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইতেছেন ততদিন আত্মতত্ত্ব শিবতত্ত্বে পৌঁছিতে-ছেনা। যত দিন না এই কদম্ব-বন-চারিণী মুনিকদম্বকাদম্বিনী, এই কদম্ববনবাসিনী, ষড়ম্বুরুহ বাসিনী, এই ত্রিলোচন কুটুম্বিনী মুক্তকেশী চতুর্ভুজা, এই সদ্যশ্ছিন্ন শিরখড়্গ বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজা, এই অভয়বরদ দক্ষিণোর্দ্ধাধপাণিকা—এই মহামেঘপ্রভা সুখপ্রসন্নবদনা স্মেরানন-সরোরুহা দিগম্বরী শ্যামা—যতদিন না এই বিশ্ববিনোদিনী বিষ্ণু-বিলাসিনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী রম্যকপর্দ্দিনী ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী জগজ্জননী জীববক্ষে প্রত্যালীঢ়পদে দাঁড়াইতেছেন ততদিন জীবের শিবত্ব নাই।

এস দেখি সাধক! আমার মাকে একবার ডাক দেখি। এই মুর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া ভাবনায় বল দেখি—মা মন্ত্রমূর্ত্তি তুমি, ওঁকার রূপিণী তুমি—তুমিই ত মা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষের অন্তরালে অব্যক্ত-রূপে সৎ চিৎ আনন্দ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছ। আবার মা তুমি ব্যক্ত রূপে সেই দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল দেবতার বরণীয় ভর্গরূপিণী—মা আমায় লইয়া চল—মা আমার হৃদয় কমলে একবার তোমার ঐ রমণীয় চরণ-কমল স্থাপন করিয়া আমাকে সেই রমণীয় দর্শনের সঙ্গে মিলাইয়া দাও মা—মা সাধু সঙ্গে পরোক্ষ জ্ঞানে তোমার কথা শুনিয়া শুনিয়া তোমার রূপ দেখিয়া দেখিয়া আমি যেন সর্ব্বদা তোমার ধ্যান করিতে পারি—তবেই আমি তোমার সাহায্যে সেই পরম পদে ডুবিতে পারিব।

আহা! দেখ দেখি সাধক! মায়ের এই প্রাণভরা মূর্ত্তি! এই সৃষ্টি ভাবনার বিচিত্র ভঙ্গী! মায়ের দক্ষিণ অঙ্গে না বর অভয়ের চিহ্ন—ইহাই না জগৎরক্ষার—জীব রক্ষার শুভ চিহ্ন। বাম ভাগে অসি মুণ্ড—এই লয়ের চিহ্ন। আর এই মূর্ত্তিই যে রক্ষাভঙ্গমাখা সৃষ্টি-মূর্ত্তি! জন্ম স্থিতি ভঙ্গ ভাবনার এত সমৃদ্ধ উপাদান কোথাও কি দেখিয়াছ? জন্ম, স্থিতি, মৃত্যু এককালে দেখাইতে আর কি কেহ

পারিয়াছে? সত্ত্বরজস্তম এক সঙ্গে দেখাইতে আর কি কেহ সমর্থ? আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব এক সঙ্গে ভাবনা করাইতে আর কি কেহ পারিয়াছে?

এস এস সাধক! এই পূজা করিয়া আমরা ধন্য হইয়া যাই—এই পূজা প্রাণ ভরিয়া করিয়া, এই পূজার নিত্য অনুষ্ঠানকে জীবন-ব্যাপী করিয়া, প্রতিদিনের কার্য্য করিয়া, ভাবনায়, বাক্যে, কার্য্যে এই ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণীর আশ্রয় লইয়া "সংসারমিথ্যাত্ব শিবাত্মতত্ত্বং উদ্‌যাপন করি এস। ইহা ভিন্ন অজ্ঞান অসুর নাশের—ইহা ভিন্ন পরম পদে স্থিতি লাভের অন্য উপায় নাই। ইহার জন্য ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-পূজা, ব্রাহ্মণেতরের জপাদির অভ্যাস। ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য। ইহাতেই সমকালে জগতের অভ্যুদয় এবং জীবের নিঃশ্রেয়স্।

(২)

এস মা ওঁকার-রূপিণি! চির পিপাসিতের সাধ মিটাও! কত জন্ম জন্মান্তরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া তোমার শরণ লইয়াছি,—বরণীয় ভর্গ তুমি—বিদ্যাতত্ত্ব রূপিণী তুমি, আমার অজ্ঞান-মোহ-পাশ ছিন্ন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল কর মা! আমি কে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। অনন্ত রূপিণী তুমি, আমি যে তোমার সন্তান তাহা ভুলিয়া দীন হীন কাঙ্গাল সাজিয়া আপনার দুঃখ আপনি সৃষ্টি করিতেছি। চৈতন্যরূপিণি! একবার চেতনা সঞ্চার কর মা! মহাশক্তিরূপিণি! শত্রু বিভীষিকায় বড় ভীত হইয়াছি, একবার আমার ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা ভুলাইয়া প্রাণ জাগাও মা!

ভক্তবাঞ্ছাকল্পলতিকা জননী আসিলেন। সুকোমল করস্পর্শে দুঃখজ্বালা ঘুচাইয়া—অশ্রু মুছাইয়া স্বপ্নময় রাজ্যে লইয়া গেলেন। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলাম।

দেখিলাম—জ্যোতির্বিমণ্ডিত রত্ন প্রাকারে ঘেরা সহস্রদল কমলোপরি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী অনন্তরূপে খেলা করিতেছেন—দিব্য সৌরভে

দশ দিক পরিপূরিত হইয়াছে! কত কোটী সূর্য্যশশাঙ্ক তাঁহার অঙ্গ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া শান্তোজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে—কত কোটী গ্রহ নক্ষত্র বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য করিতেছে—কত কোটী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যুক্তকরে স্তুতিগান করিতেছেন। তাঁহার প্রতি লোমকূপে কত কোটী কোটী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ত্রসরেণুবৎ উঠিতেছে—ভাসিতেছে—লয় হইতেছে। কত বিকট ভীষণ মধুর—কত সূক্ষ্ম স্থুল বিরাট দৃশ্য! আমি বিহ্বল হইলাম।

তারপর ব্যাকুলপ্রাণে সজল নয়নে ভাবিতে লাগিলাম, কোথায় তুমি মা আমার? একবার এস, একবার কৃপা করিয়া সেই প্রাণমন স্নিগ্ধকারিণী বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি দেখাও; আমার হৃদয় ভরিয়া যাক্।

মা আবার আসিলেন। চিনিলাম, এই সেই মা। চিনিলাম, সেই চিন্ময়ী বিদ্যাতত্ত্বরূপিণী মা অসিনৃমুণ্ডধারিণী রূপে বরাভয় করে লইয়া আসিয়াছেন। মা পদ চাপে কাম বিনাশ করিতেছেন। কত পশু-অসুররূপী কাম বিনাশ করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া হৃদয় পদ্মে চরণ পদ্ম স্থাপন করিলেন। তাঁহার সুধাবর্ষী নয়নে নয়ন মিলিত হইল—দৃষ্টি-মুগ্ধ-অচঞ্চল হইল। তখন দেখিলাম,—শব আমি শিব হইয়াছি—জড় আমি চেতন হইয়াছি—ক্ষুদ্র আমি বিরাট হইয়াছি—সান্ত আমি অনন্ত হইয়াছি—পুরুষ হইয়া প্রকৃতি দেখিতেছি—মহাকাল আমি, আমার বক্ষোপরি মহাকালীর নৃত্য হইতেছে। আত্ম-তত্ত্ব শিব-তত্ত্বে লয় হইয়াছে।

তার পর? তারপর কি হইল ভাষা সেখানে মূক—অনন্ত অব্যক্ত ভাব—অনন্ত মধুর রস—মধুর! মধুর! মধুর! সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন,—"সুরা পান করিনে আমি সুধা খাই জয়কালী ব'লে, আমার মন মাতালে মাতাল করে মদ মাতালে মাতাল বলে।" এ নেশায় বিভোর হইলে সাধক যে কি হইয়া যান, তাহা যে জানে সেই জানে। তাই রামপ্রসাদ মাতাল্ মনকে বলিয়াছিলেন—"প্রসাদ বলে

মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে, শেষে চাতরে কি ভাঙ্‌ব হাঁড়ী বুঝে নে মন ঠারে ঠোরে।”

দেখিতেছিলাম, মা অনন্তরূপে অনন্ত খেলা খেলিতেছেন। ঐই মা একদিন কালীরূপে কৃষ্ণ সাজিয়াছিলেন, আজ আবার রাধা সাজিলেন। আজ জগৎ শ্যামরূপে ভরিয়া গিয়াছে, সেই শ্যামরূপ অঙ্গে মাখিয়া মা আজ রাধা সাজিলেন। আজ সমস্ত শব্দ—সমস্ত ধ্বনিকে বাঁশীর সুর মনে করিয়া মা উন্মাদিনী হইয়াছেন।

ঠিক সেই সময়ে সাধকের একটী গান আত্মহারা হইয়া শুনিতে লাগিলাম—

“ও কার মুরতি রে মন চিন না কি উহারে।

ঐ ত করেছে এই বিশ্ব রচনা,
হেন দৃশ্য আঁকিতে আর কে পারে।

দশ ভুজা দেখে রে মন ভেবেছ রূপেরি শেষ,
অন্তরে দেখিলে উহার দেখিবে অনন্ত বেশ,
অনন্ত প্রেম লোলুপা,
কদাচিৎ চিৎস্বরূপা,
ক্বচিৎ আকাশ, ক্বচিৎ প্রকাশ, অনন্ত জগদাকারে।

ধরেরে সহস্র বাহু সহস্র প্রহরণ
সহস্র চরণে করে অজস্র বিচরণ,
সহস্র বদনে খায় সহস্র নয়নে চায়,
সহস্র শ্রবণে শুনে কথারে,—

সহস্র শির না হলে তবে কি ওরে অবোধ মন,
এতই গরবে করে সহস্র ধারাতে স্নান,
সহস্র ভাবে বিভোরা সহজ জ্ঞানের অগোচরা,
ওই ত অহরহ বাস করে তোমার সহস্রারে।

অজ্ঞান ভুলা'তে রে মন পাতে কত ইন্দ্রজাল
কভু কালী রূপে ধরে করে করাল করবাল,
কখন বা সীতা হয়, মুলে কিন্তু কিছু নয়
ব্রহ্মাদি ছলনা ইঁহার বুঝিতে নারে—

আজ যেই দুর্গারূপে গোবিন্দের কাছে এসেছে,
কাল দেখিবে রাধা রূপে শ্যামের বামে বসেছে,
তাই বলি ও কায়া কিছু নয় কেবলি মায়া
ধর্‌লে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় ও যে ওঁকারে।"

মা ওঁকারে লুকাইলেন—আবার নীলকাদম্বিনী এলোকেশী দিগ্‌বসনারূপে আসিয়া হৃদয়পদ্মে দাঁড়াইলেন। মন-ভ্রমর পাদপদ্মে-মকরন্দে বিভোর হইয়া সুষুপ্ত হইয়া পড়িল। আবার যখন সুষপ্তি স্বপ্নবৎ ভাসিল তখন ভাবনা রাজ্যে জাগ্রৎ আসিল। ঐ শুন কে গায়!

(৩)

রাম প্রসাদী সুর—একতালা।

চাই মা আমি বড় হ'তে।
আমি আর পারিনে থাক্‌তে বাঁধা আমার অহং শৃঙ্খলেতে।
ক্ষুদ্র খাঁচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ ঐ সম্মুখেতে
যাহে নীলবরণী নৃত্য কর শশীসূর্য্য লয়ে হাতে।

ক্ষুদ্র অহমিকা আমার বদ্ধ মা তোমার মায়াতে
এখন তোমারি মায়া তুমি লও মা আমি ছড়িয়ে পড়ি সর্ব্বভূতে।

অসীম অনন্ত তুমি পরিব্যাপ্ত এ বিশ্বেতে
হ'য়ে তোমার পুত্র আমি ক্ষুদ্র, সন্তানের মা লজ্জা তাতে।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র ভৌমিক।

অহল্যা।

দিন, মাস, বর্ষ, ক্ষণ, যুগ বহি যায়,
কত ঝঞ্ঝা উপেক্ষার শত বজ্রঘাত ;
কত বর্ষা কত বাত আতপ অনিল,
অসহ সে প্রকৃতির দৃপ্ত পদাঘাত
বহে যায় বক্ষ'পরে, তবু সে অচল।
নীলাকাশে অচঞ্চল তারকার মত,
তন্দ্রাহীন মুগ্ধদৃষ্টি চাহি ধ্যান রত ;
সে চরণ রেণু স্পর্শ—আকাঙ্ক্ষি সতত।
আপনার বক্ষ মাঝে "রাম" "রাম" ধ্বনি
শুনি চমকিত কভু,—রাম আসে বলি—
ফিরাতে চাহিত' স্কন্ধ ; পাষাণ সে বপু,—
ফিরাবার সাধ্য কোথা ; আসে ছলছলি
অচল পাষাণ চক্ষু, নাহি ঝরে টুটি,
অসহ বেদনা ভার গলিয়া সে ধারা।
করে কোন্ প্রভাতের সুনীল গগনে
আরক্তিম ভালে, সমুদিত সুখতারা,
মুছায়ে অশুভ রেখা, জানাল জগতে
দূর ভবিষ্যত খণ্ডি, আজি সুপ্রভাত।
বিহগ ছাইল কণ্ঠে মাঙ্গলিক গানে,
ছাড়িল নিশ্বাস, মলয় মধুর বাত।
বসন্তের সুরক্ত অধরে ছেয়ে তরুমুল,
তৃপ্তিবাসে কত হাসি ঢেলে দিল ফুল।
পতিত আতুর অন্ধ অকিঞ্চন আশা,
সে দয়াল, সে কি ভক্তে রাখে গো উপেখি।

এক নিষ্ট তটিনীর অদম্য উচ্ছ্বাস,
উন্মত্ত পাপিয়া কণ্ঠ 'পিউ কোথা' হাঁকি।
বক্ষে রাখি হিম স্নিগ্ধ দুখানি চরণ,
ভাঙাল যুগান্ত ঘুম অজ্ঞান স্বপন।
টুটে গেল মোহনিদ্, স্বপ্ন সত্য দেখি,
অবাক বিস্ময়ে—পাষাণী মেলিল আঁখি!
বিকশিত পদ্মপত্র বিশাল নয়ন,
সজল আরক্ত আভা, দয়াঘন দিঠি,
অপার করুণা মাখা ; নীলকান্ত মণি
চন্দ্র কোটী সুশীতল দীপ্তি সূর্য্য কোটী
সে আছে চাহিয়া, শুনায় আপন নাম ;
ছিঁড়িল নিমিষে, কঠিন কর্ম্মের ডোর।
গুঞ্জন থামিয়া গেল—প্রমত্ত মধুপ
বসিল সরোজে মাতি আবেশে বিভোর ॥

সংগ্রহ

(১)

দুঃখী দেখে দয়া করে, দীন দেখে কোলে লয়, তাপিত প্রাণ শীতল করে, ভবব্যাধি নিবারণ করে, এমন আর কি কেহ আছে ?

(২)

আজ আবার নূতন তেজে নূতন উৎসাহে জাগিয়াছি ; মনে হই-তেছে যুগযুগান্তরের মোহ একটি কথায় ছুটাইয়াছ—তোমার শক্তি যেন শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করিতেছে। সত্যইত "আমি তোমার"

হইলে পারা না যায় কি ? এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি যেন এই শক্তি চিরস্থায়ী হয়। সেই জন্যই তোমার আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ করি। আশীর্ব্বাদ কর যেন সকল বাসনার, সকল কামনার, সকল স্পর্শজা দুঃখ যোনি ভোগ সমূহের নিবৃত্তি হইয়া আত্মরামে ভরিত হইয়া থাকিতে পারি।

(৩)

আজ যেমন শীতল হাত মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়াছ চিরদিন সর্ব্বকালে আমার দেহ নাশের শেষ মুহূর্ত্তে পর্য্যন্ত এই রকম পূর্ণ করে দাঁড়াইও। আমি যে ঠাকুর তোমারই। আর আমার এই জীবন তোমার আজ্ঞা পালনেরই জন্য।

(৪)

তুমি যখন যা দাও তখন তাই দি তোমাকে—তাই তোমাকে খাওয়াই। নতুবা কোথায় কি পাব ? তাই রিক্ত হস্তে বার বার তোমার দ্বারে ভিক্ষা করি। কিন্তু "ক্ষুধা পেয়েছে" বলে আর অমন করে হাত পাতিওনা। "আয়রে মাখন লাল" বলে কাঁদ্‌তে আর পারি না।

(৫)

শুধু আরোপের ভক্তিতে স্থির হওয়া দূরে থাক্ সময়ে সময়ে এত ভাব প্রবল হয় যে জ্ঞানের অঙ্কুশ না থাকিলে বহু ছুটা ছুটি হইয়া যায় ইহা আমি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। এমনি অজ্ঞান বা কুশিক্ষাছিল যে জ্ঞানের নামে ভয় হইত—স্বরূপের কথা শুনিতেই পারিতাম না আর বিচারের ত্রিসীমানার আসিতাম না। তাই দেখিয়া কার যেন কষ্ট হইল। কি করে তখন ? জীবের উদ্ধার করাই তার কাজ। তাই সে সমকালে কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান শিখাইয়াছে। কে সে তার নাম জানি না। বুঝি নাম নাই।

(৬)

মানুষ চায় কি ?

শান্তি।

শান্ত হওয়া ভিন্ন শান্তি লাভের আর কোন উপায় আছে কি ? চির নিবৃত্তি—পরম পদে স্থিতি ভিন্ন কেমন করিয়া হইবে ? যতক্ষণ কোন কিছু লালসা, ভাবনা, দেখা, শুনা,—কোন কিছু আছে, যতক্ষণ ভয় ভাবনা—জন্ম মরণ ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহ চিন্তা কোন কিছু আছে ততক্ষণ শান্ত হওয়া হইতেছে না। এই ক্ষণভঙ্গুর মিথ্যার সংসারে কোন কিছু আস্থা করিবার আছে কি ? এ সকলই ত ভোজ বাজি, ভূতের নৃত্য। কখন একটু আনন্দ, একটু হাসি, একটু তৃপ্তি ; আবার কখন একটু জ্বালা পোড়া, একটু শোক সন্তাপ, একটু হা-হুতাশ ; কিন্তু এসব কতক্ষণ ? দৃশ্যমান সকল বস্তুই সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখানে সুখ শান্তির বস্তু আর কোন কিছুই নাই। তাই আমাদের চাহিবার বা পাইবার বস্তু একটিই আছে। সেটি তুমি। যখন সকল চাওয়ার শেষ করিয়া, সকল আশা বিসর্জ্জন দিয়া তোমাতে ভরিত হইয়া থাকা যাইবে তখনই চির নিবৃত্তি, চির তৃপ্তি, চির শান্তি আসিবে।

(৭)

ঠাকুর! ভোগ সুখ আশা আকাঙ্ক্ষা আর কিছু কি আছে ? অন্তরের অন্তস্তলে অনুসন্ধান করিলে একমাত্র তোমাকেই খুঁজিয়া পাই। কিন্তু তবু কেন এমন হয় ? প্রাণ পণে তোমার আজ্ঞা পালন করিব এইত বলি। কিন্তু এই কি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করা ? যারে ছাড়িয়া আর কোন কিছুই করিবার নাই তারে লইয়া থাকিলে আলস্য অনিচ্ছা নিদ্রা ভয় ভাবনা কেন আসিবে ? তবে কি আমি তোমার সঙ্গে কপটতা করি ? তাহাও ত হইতে পারে না। তুমিত অন্তর্যামী। অন্তর্যামী জানত সকলই। তোমার কাছে কি কপটতা

চলে? অহো। এই বুঝি অনাদি সঞ্চিত কর্ম্ম? এই বুঝি মায়া। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" কবে হইবে?

(৮)

আমার ত কিছুই নাই। কিন্তু তবু ত দেখি তুমি এই দীন হীন কাঙ্গালকে কেমন করিয়া তোমার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ! দীনের পূজা কত আদরে গ্রহণ করিয়াছ! যাহাদের অধিকার আছে তাহারা ত তোমার চরণ তলে নিশ্চয়ই স্থান পাইবে—কিন্তু আমি কি? কত ক্ষুদ্র! অণুহতেও অণু! তবুও তুমি ফেলিতে পার না। তোমার চরণতলে সকলের সমান অধিকার। তুমি নিজ মুখে বলিয়াছ "ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ" সত্য তোমার উপরে সকলের সমান অধিকার। তোমার স্নেহ, তোমার আদর, ভালবাসা—এ সব ত এ পার্থিব সংসারের সম্বন্ধ লইয়া নয়। তোমার রাজ্যে যে চাওয়া নাই আছে কেবল দেওয়া। তাই না এত আনন্দ এত তৃপ্তি এই পূর্ণতা। সব দিতে পারিলেই তৃপ্তি। যার যা ধার করিয়া সাজিয়া গুজিয়া তোমার কাছে যাইতে হয়— সবার সব ফেলিয়া দিয়া—পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতকে দিয়া—সব ধার শোধ করিয়া একবারে নগ্ন হইয়া তোমার কাছে গেলেই তোমার তৃপ্তিতে পূর্ণতা আইসে। যখন এই সব মনে হয় মনে হয় "তুমি মোর শিরায় শিরায় বিরাজ কর তাই শিরায় রক্ত বহিতেছে"—দিয়েছে বসন ঢাকা যায় কি ঢাকা তোমার ঐ চখের কাছে—যখন মনে হয়, দেহের ঢাকা মনের ঢাকা—বসন ঢাকা সব ফেলিয়া তোমার কাছে গিয়াছি তখন আর স্থির থাকা যায় না তখন যে কত কি হয় বলা যায় না। আবার যখন তোমায় লইয়া শত ইচ্ছা জাগে তোমার ছাড়িয়া কি থাকা যায়—সে যে কত করিয়া উপদেশ ধরাইল আবার যে সব ভাসিয়া যায়—তখনই আবার প্রণাম করিয়া শক্তি ভিক্ষা করিয়া বলি না আর নয়—তুমি এস। আমার সকল সাধনার

পূর্ণতা দিয়া—আমার অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া—অন্তর আলো করিয়া বস, তুমি ত সর্ব্বত্র সর্ব্বময় হইয়া আছ। তবে জানি না কি আছে তোমাতে—তোমার স্বরূপ তোমার ইষ্টরূপ মন্ত্ররূপ গুরুরূপ যেরূপ লইয়াই এস—একই ভাব বুঝি হয়। এরূপে সেরূপে বুঝি কোন ভেদ তখন থাকে না। কি যে হয় তখন তাহাত অন্তর্যামী তুমি তোমার অবিদিত কোন কিছুই নাই।

(৯)

প্রাণের ঠাকুরকে প্রাণের ভাষায় কত কি বলিতে ইচ্ছা হয় অন্তরের দেবতা অন্তরের ভাষা অন্তরে থাকিয়া শুনিও। এ বলার বিরাম নাই শেষ নাই। আমার সদা প্রসন্ন আনন্দময় ঠাকুর! প্রসন্ন থাকিও। "মন আমার সব ভুলে যা ভুলিস্‌নে সেই তত্ত্বধনে" অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডও লয় হইয়া গিয়াছে আর কোন কিছু নাই শুধু সে আছে আর আমি আছি। আবার আমিও নাই শুধু তুমি শুধু তুমি মায়ার অতীত। আবার মায়াকে লইয়া, মায়ার রূপে রূপবান হইয়া জগৎ সাজিয়া—মায়ার জগৎকে সত্তা দিয়া তুমিই খেলা করিতেছ।

(১০)

তোমাকে ধরার কৌশল হইতেছে হৃদয়ে তোমায় লইয়া থাকা। হৃদয়ে যা কিছু উঠে তার দ্রষ্টা স্বরূপে যিনি সেই তুমি। জপ যে উঠে তাহাকে উঠিতে যে দেখে সেই তুমি। আবার জপের অর্থে যাহাতে লক্ষ্য পড়ে তিনিই খণ্ডকে অখণ্ডত্বে লইয়া যান। থাক না এই দ্রষ্টা ভাবে এই সাক্ষী ভাবে। ইনিই যখন মূর্ত্তি ধরেন তখন ইনিই তোমার ইষ্ট দেবতা। সবার ইষ্ট দেবতাই এই চৈতন্য। শুধু নামরূপের ভেদে কালা কালী শিব রাম।

শ্রীভরত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহাধীর, এবং মহাবীর, শত্রুঘ্ন, ভরতের এই কথা শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন, রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রামের করুণাই যাঁহার একমাত্র ভরসা "রাম অপ্রসন্ন হইবেন, রাম স্ত্রীবধ কারীর মুখ দর্শন করিবেন না" এই একটি কথায় তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, এবং রামচিন্তা করিবামাত্র, রজস্তম পরাস্ত হইল, শুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হইল, তখন আপন স্বরূপ পরমাত্মায় দৃষ্টি পড়িয়া ক্রোধজনিত সকল মোহ ছুটিয়া গেল, কারণ, রামই যে তাঁহাদের একমাত্র বাঞ্ছনীয়।

হায়। জীব, এই বিষম মৃত্যু সংসার সাগরে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রূপ পরম শত্রুর কবলে পড়িয়া আত্মস্বরূপ হারাইয়া নিয়ত অজ্ঞান বশে কত অবিহিত কার্য্যই করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের সত্য সত্যই একমাত্র শ্রীভগবৎচরণ বাঞ্ছনীয় তাঁহারা যদিও দুরন্ত স্বভাব বশে প্রকৃতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, বিষম মায়ামোহে ভুলিয়া কোন অবিহিত কার্য্যও করিয়া ফেলেন, তাঁহারাও কিন্তু শত্রুঘ্নের মত বিবেকরূপ বুদ্ধির একটি কথায় জাগিয়া উঠেন। আমার প্রাণরূপী আত্মারাম পরমেশ্বর অপ্রসন্ন হইবেন, শুনিলে তাঁহারাও শিহরিয়া উঠেন, আর সেই সদা প্রসন্নময়ের মুখ কমল স্মরণ হইবামাত্র, কাম, ক্রোধাদি, সকল শত্রু ভয়ে পলাইয়া যায়, তিনি নিজেও তখন বিশুদ্ধান্তঃকরণে ভরিত হইয়া সেই বাঞ্ছিত দেবের চরণ কমলে হৃদয় মন লুটাইয়া থাকেন, তখন প্রকৃতি হইতে আত্মাকে ভিন্ন জানিয়া বিশ্ব বিমোহিনী ত্রিগুণের খেলায় আর বিমোহিত হয়েন না ; আত্মাতে লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে জগতের কোন বস্তু যে হেয় উপাদেয় এ জ্ঞান থাকে না বা রাগ দ্বেষের ও বশীভূত

হইতে হয় না। আমি মাত্র যন্ত্র, যন্ত্রী সেই একমাত্র রাম। তাঁহারই আদেশে সাধক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অতি সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে শুধু তাঁহারই স্মরণে সকল কামনা বাসনা বিনাশ করিয়া আপন আনন্দে আনন্দ স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারে।

ভরতের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন দোষ প্রযুক্ত উক্ত কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ দিবস গত হইল। চতুর্দ্দশ দিবস প্রভাত কালে, প্রভু বশিষ্ট দেব, মুনিগণের সহিত মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া দেব সভা তুল্য সেই রাজসভায় দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় মণিখচিত আসনে আসীন হইয়া শ্রীভরতকে আনয়ন পূর্ব্বক সেই স্থানে উপবেশন করাইলেন, পরে বলিলেন, "বৎস রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামস্ত্বামদ্য পিতৃশাসনাৎ" বৎস তোমার পিতার অনুমতি বশতঃ আজ আমরা তোমাকে রাজ্যে অভি-ষিক্ত করাইব, "অভিষেকোভবত্বদ্য মুনিভির্মন্ত্রপূর্ব্বকম্", মুনিগণ মন্ত্র পাঠ করিয়া অদ্য তোমার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তুমি অমাত্য দিগকে আনন্দিত করতঃ পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত এই অকণ্টক রাজ্য ভোগ কর।

তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং শোকেনাভিপরিপ্লুতঃ।
জগাম মনসা রামং ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষয়া॥

ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সেই কথা শুনিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন, এবং ধর্ম্ম লাভ আকাঙ্ক্ষায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিলেন।

স বাষ্পকলয়া বাচা কলহংস স্বরো যুবা।
বিললাপ সভামধ্যে জগর্হে চ পুরোহিতম্,

পরে সেই যৌবন সম্পন্ন, কলহংস তুল্য স্বরসম্পন্ন, ভরত সভা মধ্যে পুরোহিত বশিষ্টকে নিন্দা করতঃ অত্যন্ত কাতর হইয়া বিনয় নম্র

বচনে এই রূপ বলিতে লাগিলেন। শ্রীরাম বিরহ সন্তপ্ত শ্রীভরত বশিষ্টদেবের চরণ মূলে পতিত হইয়া বলিলেন, প্রভু! আমাকে ক্ষমা করিবেন, যে হেতু সন্তান পিতা মাতার নিকট চিরদিনই ক্ষমার পাত্র। প্রভু! সেই অনন্ত করুণাধার শ্রীরাম বিরহে, আমার প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে, তাহার উপর আপনি আমাকে রাজা হইবার কথা বলিয়া আমার ক্ষত স্থানে জ্বলন্ত অঙ্গার ধরিতেছেন।

'চরিতব্রহ্মচর্য্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ
ধর্ম্মে প্রযতমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধো হরেৎ'।

যিনি ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্টান পূর্ব্বক সম্যক কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানেই রত আছেন, আমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি সেই ধীমানের রাজ্য হরণ করিতে পারে? রাজাধিরাজ পরম দয়াল মহারাজ সেই একমাত্র শ্রীরাম চন্দ্র। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, বৃহৎ হইতে অণু পর্য্যন্ত সকল হৃদয়ের রাজা, একমাত্র পরম পুরুষ মায়া মানুষবেশী শ্রীরাম এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা, সকলের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, যিনি সর্ব্বদা স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াও জীব হিতার্থে অবতার গ্রহণ করিয়া জীব শিক্ষার্থে নানা লীলা প্রচার করেন, রাজা ত তিনিই, এ যে রামের রাজ্য—রামময় সব।

"কথং দশরথাজ্জাতো ভবেদ্রাজ্যা পহারকঃ।
রাজ্যাঞ্চাহঞ্চ রামস্য ধর্ম্মং বক্তুমিহার্হসি।"

যে ব্যক্তি রাজা দশরথের ঔরসে জন্মে গ্রহণ করিয়াছে, সে কেমন করিয়া পরের রাজ্য অপহরণ করিবে? রাজ্য রামের এবং আমরা তাঁহার অধীন। এমত স্থলে আপনার আমাকে, ধর্ম্মানুমোদিত বাক্য বলাই উচিত। সেই গুণশ্রেষ্ট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজা দশরথের রাজ্যলাভ করিবার উপযুক্ত।

ইহস্থো বন দুর্গস্থং নমস্যামি, কৃতাঞ্জলিঃ।
রামমেবানুগচ্ছামি স রাজা দ্বিপদাং বর।

আমি এখানে থাকিয়াই, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক, সেই দুর্গম অরণ্য স্থিত নরবর রামকে প্রণাম করিতেছি, তিনিই এ রাজ্যের রাজা, আমি তাঁহার চির কিঙ্কর মাত্র।

সভাসদগণ ভরতের সাধুবাক্যে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সকলেই অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন ভরত জননীদিগকে বলিলেন, মাতৃগণ, আমরা কল্য সুপ্রভাতে অযোধ্যাকুলভূষণ, রামকে ফিরাইবার মানসে বন গমন করিব, আর কৈকেয়ী! সে রাক্ষসী, আমার জননী হইলেও, আমি এই-ক্ষণে তাহাকে বধ করিতে পারি, কিন্তু, মাং নো রঘুশ্রেষ্ঠ স্ত্রীহন্তারং সহিষ্যতে" তাহা হইলে রাম আমাকে স্ত্রীহন্তা বলিয়া ক্ষমা করিবেন না, অতএব এক্ষণে তাহার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করুক্। রাম যত দিন না আসিবেন আমিও তাঁহার শুভাগমন কামনায় জটাবল্কলধারী হইয়া অনশনে কঠোর তপস্যা করিয়া এ জীবনপাত করিব, শুধু তাঁহার আশায় আশায় প্রাণ মাত্র রাখিব। সম্মুখে কৈকেয়ী। ভরত পুনরায় রোষকটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন ওরে হতভাগিনি তুই কি জানিস্ না "জ্যেষ্ঠং পিতৃসমং রামং কৌসল্যায়ামাত্মসম্ভবম্ এবং নিয়তং বন্ধুসং-শ্রয়ম্" কৌশল্যাগর্ভসম্ভূত রাম নিয়ত বন্ধুগণের আশ্রয় স্থান। ওরে পতিপুত্রঘাতিনি! অদ্য তোমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, রাম যেখানে গিয়াছেন আমিও চলিলাম, অবিলম্বে দেখিবি রামশূন্য অযোধ্যায় কেহ থাকিবে না, তুই সুখে এখন রাজ্য ভোগ কর্। তখন সুমন্ত্রকে ডাকিয়া ভরত বলিলেন,

তূর্ণং ত্বমুত্থায় সুমন্ত্র গচ্ছ
বলস্য যোগায় বলপ্রধানান্।
আনেতুমিচ্ছামি হি তং বনস্থং
প্রসাদ্য রামং জগতো হিতায়।

আমি সেই কাননস্থিত রামকে জগতের হিতার্থে এখানে আনিতে

ইচ্ছা করি, তুমি সত্বর সৈন্যদিগকে প্রস্তুত হইতে বল, এবং অযোধ্যা-বাসিগণকে এ শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করাও।

ভরত এইরূপ বলিলে, সুমন্ত্র অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে ইষ্ট বিবরণের ন্যায় সকলকে একথা জানাইল।

"ততঃ সমুত্থায় কুলে কুলে তে
রাজন্যবৈশ্যা বৃষলাশ্চ বিপ্রাঃ
অযূযুজন্নুষ্ট্ররথান্ খরাংশ্চ
নাগান্ হয়াংশ্চৈব কুলপ্রসূতান্।"

পরে গৃহে গৃহে, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা সচেষ্ট হইয়া উষ্ট্র, রথ, খর, হস্তী ও সংকুলজাত অশ্ব সজ্জিত করিলেন। যাহায় শ্রীরাম বিরহে যে ভীষণ শোক বহ্নি জ্বলিতেছিল, ক্ষণকালের জন্য তাহা নিভিল; শ্রীরাম দর্শন লালসায় সকলের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। অবিলম্বে অযোধ্যার নর নারী পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত বনগমনের জন্য উৎসুক হইল।

৭ম অধ্যায়।

আজ ভরত, অগ্রজকে অযোধ্যায় ফিরাইবার মানস করিয়া বনযাত্রা করিতেছেন, তাই সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা হয় হস্তী রথ লইয়া মহা সমারোহে রাম দর্শনে যাইতেছেন; আগে পাছে সকলে অতি আনন্দ সহকারে রাম জয় ধ্বনি দিতে দিতে মেদিনী কম্পিত করিতেছে, রাম দর্শন আশায় তাহাদের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে, তাই আরও উচ্চৈস্বরে জয়ধ্বনি দিতেছে। আর তৃষিত ভরত সেই নবঘন শ্যাম জলধর রামমুখ কমল সুধা পান করিয়া তাহার তাপিত হৃদয়ের অনন্ত তৃষ্ণা মিটাইতে যাইতেছেন, কিন্তু তবুও ভরত যেন শোকে হর্ষে বিষাদে কেমনই একরূপ হইয়া গিয়াছেন। তিনি শত্রুঘ্নের সহিত শ্রীরাম চরণ উদ্দেশে ভক্তিভরে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, শ্রীরামের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া পদব্রজে যেন

মন্ত্র মুগ্ধবৎ চলিতেছেন ; যাইতে যাইতে ভরত কত কি ভাবিতেছেন — কখন ভাবিতেছেন, আজ আমারই জন্য অতি সুকোমল রামলক্ষণ আর সেই নিতান্ত কোমলাঙ্গী জনকরাজনন্দিনী সীতার বনবাস ঘটিয়াছে। আমার এমনই মন্দ ভাগ্য যে এমন রাক্ষসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলাম এ কলঙ্ক কখনই মুছিবেনা—কেমন করিয়া আজ সেই স্নেহময় পিতৃতুল্য অগ্রজের নিকট মুখ দেখাইব—কেমন করিয়া বা পিতার দেহত্যাগের কথা জানাইব, তিনি এক্ষণে বনবাসী হইয়াও আমার জন্য সুখী হইতে পারিবেন না, কারণ এই সমস্ত দুঃখের কাহিনী তাঁহাকে জানাইতে যাইতেছি। আর রাম যদি অযোধ্যায় ফিরিয়া না আইসেন তবে রাম-শূন্য অযোধ্যায় আমি তিলার্দ্ধও থাকিবনা। যেথানে রাম নাই সে স্থান শ্মশান তুল্য, রাম যেথানে বাস করেন ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য অনন্ত কোটি জগৎ রাজ্য সেখানে। রাম শূন্য রাজ্য অরণ্য তুল্য। সেখানে শুধুই হিংস্র জন্তু শ্বাপদ কুলের কোলাহল, শুধুই অজ্ঞান জনিত শোক দুঃখ হাহাকার। শ্রীরাম যেখানে বাস করেন সে ধাম শুধুই আনন্দ, শুধুই শান্তি, জ্ঞান, ভক্তির মিশ্রনে ঐশ্বর্য্যর মাধুর্য্যে অপূর্ব্ব ভাব। আমি সেই দেব দুর্লভ শ্রীরাম চরণ কমল ছাড়িয়া কোথাও যাইবনা।

আর এই রাম শূন্য রাজ্য এবং ভগবান্ শূন্য সংসার, ইহা একই রূপ। ভগবান্ শূন্য সংসারে, শুধুই জ্বালা—মালা শুধুই হাহাকার। দেখনা কেন চির শান্তিময় ও চির তৃপ্তিময় ভগবানকে ভুলিয়া কে কবে নিত্য তৃপ্ত হইয়াছে? বল না ক্ষণ বিধ্বংসী জগতে, চির তৃপ্তিকর পরম রমণীয় এমন কোন্ বস্তু আছে যাহা দ্বারা সে চির নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে? এখানকার দুইদণ্ডের দ্রব্য বিদ্যুতের ন্যায়, নয়ন মন ঝলসাইয়া দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়, পরিণামে সেই প্রিয় বস্তুই, তাহার আরও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। আর ভগবানকে লইয়া সংসার করিতে পারিলে, তাহার আর সুখ দুঃখে কিছুই করিতে পারে না—"ও তার চৌদ্দভুবন ধ্বংস হলেও আস্‌মানেতে বানায় ঘর" শুধুই শান্তি ও আনন্দে সে যে পরিপূর্ণ হইয়া আত্মারামে ভরিত হইয়া

থাকে, সে যে আপন প্রেমাস্পদের প্রেম সমুদ্রের মাঝে ডুবিয়া সকল কামনা হইতে অবসর লইতে পারে। বাসনা ও কামনার নাশ হইলেই মনোনাশ এবং পরে তত্ত্বাভ্যাস হইয়া থাকে। মনকে জয় করিতে পারিলেই অনায়াসে জগৎ জয় করিয়া, আপন উৎপত্তি স্থানে মিশিয়া স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে। রাম ভক্ত ভরত তাহা জানিয়া-ছিলেন তাই বলিতেছেন, "রাম চরণ ছাড়িয়া আমি আর কোথাও যাইব না।

[শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ-প্রণেতা কর্তৃক লিখিত]

বর্ণবিবেক।

(পুনরাবৃত্তি)

যাহা আশ্রয়কে আবৃত করে, ঢাকিয়া রাখে তাহা "বর্ণ", 'বর্ণ' শব্দের এই নিরুক্তিগর্ভে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় আত্মার শক্তি, ইহারা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে, আত্মা ইহাদের আশ্রয়। গুণত্রয় স্বাশ্রয় আত্মার স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে, এই নিমিত্ত আত্মার স্বরূপ সাধারণ দৃষ্টিতে পতিত হয়না, আত্মার সগুণ রূপই আমরা সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি।

জিজ্ঞাসু—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহারা 'গুণ' নামে অভিহিত হই-য়াছে কেন? বৈশেষিকদর্শণে 'গুণ' শব্দের যদর্থে ব্যবহার হইয়াছে, 'গুণ' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহারা কি তদর্থের বাচক? সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহারা কি দ্রব্যের আশ্রয়ী? ইহারা কি কোন দ্রব্যকে আশ্রয় পূর্ব্বক বিদ্যমান থাকে?

বক্তা—'গুণ' শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান-

ভিক্ষু বলিয়াছেন, পুরুষ বা আত্মার উপকরণ (ভোক্তৃ আত্মার ভোগসাধন) বলিয়া, অথবা পুরুষরূপ পশুর বন্ধক ত্রিগুণাত্মক মহদাদি রজ্জুনির্ম্মাতৃত্ব নিবন্ধন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই দ্রব্যত্রয় হইতে আত্মার, বন্ধনরজ্জুস্বরূপ মহৎ, অহঙ্কারাদির পরিণাম হয়, এই নিমিত্ত সত্ত্বাদি দ্রব্যপদার্থত্রয়ের 'গুণ' সংজ্ঞা হইয়াছে। 'গুণ' শব্দের অভিধানে রজ্জু এবং উপকরণ অর্থও ধৃত হইয়াছে। সত্ত্বাদি গুণত্রয় সাংখ্যমতে বৈশেষিক দর্শনোক্ত গুণপদার্থ (Attribute) নহে। *

জিজ্ঞাসু—তবে আপনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে আত্মার আশ্রয়ী বলিলেন কেন?

বক্তা—তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিবার ইহা উপযুক্ত সময় নহে। যদি ইহার সমাধান আকাঙ্ক্ষিত হয়, তাহা হইলে সময়ান্তরে জিজ্ঞাসা করিও। আপাততঃ সংক্ষেপে বলিয়া রাখিতেছি, সাংখ্য—পাতঞ্জলমতে প্রকৃত্যাদি পঞ্চবিংশতিগণদ্রব্যপদার্থ, কণাদোক্ত গুণাদি পদার্থ প্রকৃত্যাদি পঞ্চবিংশতি দ্রব্য পদার্থেরই অন্তর্ভূত। সাংখ্য—পাতঞ্জলে সামান্য ও বিশেষ এই দ্বিবিধ দ্রব্য পদার্থই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্তীরা সমবায় পদার্থ স্বীকার করেন নাই, এই নিমিত্ত বৈশেষিকদর্শনোক্ত রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি গুণ তাঁহাদের মতে দ্রব্য হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। † 'জাতি' পদার্থের স্বরূপ প্রদর্শনকালে আমি

---

* পূজ্যপাদ ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন,—"গুণশব্দোঽয়ং বহ্বর্থঃ" পাণিনীয় মহাভাষ্যে 'তস্য ভাব স্ত্বতলৌ' এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

"সত্ত্বাদীনি দ্রব্যাণি ন বৈশেষিকা গুণাঃ সংযোগবিভাগবত্ত্বাৎ। লঘুত্ব; । স্ব—গুরুত্বাদি—ধর্ম্মকত্বাদি—ধর্ম্মকত্বাচ্চ। তেষ্বত্রশাস্ত্রে শ্রুত্যাদৌ চ গুণশব্দপুরুষোপকরণত্বাৎ, পুরুষপশুবন্ধকত্রিগুণাত্মকমহদাদিরজ্জুনির্ম্মাতৃত্বাচ্চ প্রযুজ্যতে।"—সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

† "তে চ চতুর্ব্বিংশতির্গুণাঃ সমবায় নিরাকরণেন দ্রব্যাভিন্না এবেতি সাংখ্যা বেদান্তিনশ্চ মন্যন্তে।"—

ন্যায়কোশ।

তোমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিব। সত্ত্বাদি গুণ বা রজ্জুত্রয় দ্বারা বিশ্বপাতা পরমেশ্বর জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, বিশ্বজগতের বন্ধন রজ্জুস্বরূপ পরমেশশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা। শতপথব্রাহ্মণে ও ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যে 'সর্ব্ববশী (ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই যাঁহার বশে বিদ্যমান, যিনি সকলের ঈশিতা—প্রভু—যিনি সর্ব্বাধিপতি, যিনি সর্ব্বকর্ম্মের—নিখিল শক্তির নিয়ামক), পরমপিতা ভূলোকাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অখিল লোকের মর্য্যাদা ভিন্ন না হয়, ব্যবস্থার বিপর্য্যয় না ঘটে, কেহ নিয়ম অতিক্রম করিতে না পারে, এই নিমিত্ত সেতুর ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা রক্ষা করিয়াছেন ("এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায়"—শতপথব্রাহ্মণ)

জিজ্ঞাসু—উক্ত শ্রুতিবচন হইতে পরমেশ্বর 'বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা রক্ষা করিতেছেন,' এই কথা পাওয়া যায় কি ?

বক্তা—বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে ভাষাকার শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্রুতির ভাষ্য করিবার সময়ে এই কথাই বলিয়াছেন ("এষ সেতুঃ। কিং বিশিষ্ট ইত্যাহ। বিধরণো বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থায়া বিধারয়িতা।"—শাঙ্করভাষ্য)।

বন্ধনার্থক 'সি' ধাতুর উত্তর 'তুন্' প্রত্যয় করিয়া 'সেতু' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা বন্ধন করে, বাঁধিয়া রাখে, তাহা সেতু। পরমেশ্বর যদ্দারা সেতুর ন্যায় বিশ্বজগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, পরমেশ্বরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রাখিবার যাহা বন্ধনরজ্জুস্বরূপ, তাহা সত্ত্বাদি শক্তিত্রয়, সত্ত্বাদি শক্তিত্রয় দ্বারাই পরমেশ্বর বিশ্বজগৎকে নিয়ামিত করিয়া রাখিয়াছেন। সত্ত্বাদি শক্তিত্রয়কে 'গুণ' নামে অভিহিত করিবার ইহাই কারণ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরই কার্য্য। যাহা ধারক—যাহা ধরিয়া রাখে, তাহা ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমব্যবস্থা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, ইহা বিশ্বজগতের প্রাকৃতিক নিয়মরজ্জু। ভাষ্যকার এইজন্য বলিয়াছেন, পরমেশ্বর বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থার বিধারয়িতা।

সত্ত্বাদিগুণত্রয়কে পরমাত্মার শক্তি বলিলে কোন দোষ হয় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপরি আবির্ভাব-তিরোভাবাত্মক ক্রিয়া ও স্থিতিশীল বা রাগ-বিরাগ স্বভাব রজঃ ও তমঃ এই শক্তিদ্বয়কৃত ভাববিকারই জগৎ। শ্রুতি সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে পরমাত্মার শক্তি বলিয়াছেন। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, তৎসমুদায় ত্রিগুণকার্য্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরই পরিণাম ; সুতরাং শব্দস্পর্শাদি গুণসমূহ ত্রিগুণাত্মক। অতএব আমরা ত্রিগুণকেই দেখি, ত্রিগুণ বা ত্রিগুণবিকারই দৃশ্য। আমরা আত্মার বিশুদ্ধরূপ দেখিতে পাই না। যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্তের সংস্কারকে সর্ব্বতোভাবে নিরোধ করিতে পারিলে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আত্মার স্বরূপদর্শন হইয়া থাকে। যাহা অবর্ণ, বর্ণবিরহিত, তাহা সদা একরূপ। পরমাত্মা অবর্ণ, জাত্যাদিরহিত, নির্ব্বিশেষ। স্বার্থনিরপেক্ষ (যাঁহার নিজ প্রয়োজন কিছুই নাই) পরমাত্মা নানা শক্তিযোগবশতঃ বহু বর্ণ ধারণ করেন, বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ("য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি"। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)। ইন্দ্র (পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বর) মায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন, ঋগ্বেদের ও শতপথব্রাহ্মণের এই কথাও এস্থলে স্মরণ করিবে। * নিরুক্তটীকাকারের বর্ণশব্দের নিরুক্তি কিরূপ মনোরম, কত সারগর্ভ তাহা চিন্তা কর। শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর 'বর্ণ' শব্দের ব্যাখ্যা, শ্রবণ পূর্ব্বক তোমার কি মনে হইয়াছে ?'

জিজ্ঞাসু—শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী বলিয়াছেন—'গুণ ও কর্ম্ম দেখিয়া যাহারা যথাযোগ্য বৃত হয়, তাহারা বর্ণ'।

বক্তা—দয়ানন্দ স্বামী ভগবান্ যাস্কের 'বর্ণো বৃণোতেরিতি' এই কথা হইতে কল্পনা করিয়াছেন 'যাহার যদ্রূপ গুণ ও কর্ম্ম, তাহাকে

---

* "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতি চক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ" পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥

ঋগ্বেদসংহিতা চতুর্থ অষ্টক।৩।৪।৪৭

তদ্রূপ অধিকার দেওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণভেদ গুণ ও কর্ম্মভেদ হইতেই করা হইয়াছে। যিনি বিদ্যাদি উত্তমগুণযুক্ত পুরুষ, তিনিই ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য, যে মনুষ্য পরমৈশ্বর্য্যবান্, শত্রুদিগের ক্ষয়কারী, যুদ্ধ করিতে উৎসুক এবং প্রজাপালনে তৎপর, তিনি ক্ষত্রিয় হইবার উপযুক্ত। স্বামীজী স্বমতের সমর্থনার্থ শাস্ত্র হইতে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের, চণ্ডাল মাতঙ্গের ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। আমি তোমাকে পরে দেখাইব, স্বামীজী ইচ্ছা পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তির শাস্ত্রোক্ত রহস্যের সম্পূর্ণরূপে উদ্ভেদ করেন নাই, মাতঙ্গের ইতিবৃত্ত ও যথাযথভাবে বর্ণন করেন নাই, তাহা করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। বর্ত্তমান জন্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ যে পূর্ব্বজন্মের শুভাশুভ কর্ম্মাপেক্ষ, স্বামীজী তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও যদি কোন পুরুষ ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হন, তবে স্বীকার করিতে হইবে, পূর্ব্বজন্মের শুভ কর্ম্মানুসারে তাঁহার লিঙ্গদেহে ব্রাহ্মণোচিত গুণ আহিত হইয়াছিল, অপিচ ইহাও মানিতে হইবে, জাতি বা জন্মতঃ ব্রাহ্মণ হইবার প্রবল প্রতিবন্ধক কর্ম্মসংস্কারও বিদ্যমান ছিল, যদি তাহা না থাকিত, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ জাতিতেই জন্মগ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাঁহারা গুণতঃ অব্রাহ্মণ হন, যাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করেন না, তাঁহাদের ও বুঝিতে হইবে, গুণতঃ ব্রাহ্মণ্যলাভের প্রতিবন্ধক কর্ম্ম ছিল। যিনি বিদ্যাদি উত্তমগুণযুক্ত পুরুষ, তিনিই ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য, স্বামীজীর এই সকল কথা বর্ত্তমান কালে অনেকের নিকটে যুক্তিসঙ্গতরূপে প্রতীয়মান হইলেও, সর্ব্বতোভাবে ইহারা শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। স্বামীজীর এই সকল কথা বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্রসমূহেরই প্রতিধ্বনি, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা সর্ব্বথা বিশুদ্ধ অনুকৃতি নহে। ইহারা স্বামীজীর প্রতিভা ও প্রয়োজন দ্বারা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত

(modified), অতএব বলিতে পারি, ইহারা বেদ-শাস্ত্রের বিকৃত প্রতিধ্বনি। শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ স্বামীজী যে সকল বচন উদ্ধৃত ও তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তুমি পরে জানিতে পারিবে স্বামীজীকৃত উদ্ধৃত শতপথব্রাহ্মণবচনসমূহের ব্যাখ্যাও তাঁহার প্রয়োজনানুরূপ, স্বামীজী অনেকস্থলে তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভারই অনুসরণ করিয়াছেন, পরম্পরাগত (traditional) বেদ-শাস্ত্র-ব্যাখ্যা তাঁহার হৃদয়গ্রাহিণী হইত না। স্বামীজীর বেদব্যাখ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে প্রতীতি হয়, স্বামীজী অনেকাংশে পাশ্চাত্য প্রতিভার পক্ষপাতী ছিলেন, বেদ অভ্রান্ত, বেদ নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রসূতি-স্বামীজী প্রাচ্যপ্রতীচ্য বিমিশ্রভাবে তাহা বিশ্বাস করিতেন।

জিজ্ঞাসু—'প্রাচ্যপ্রতীচ্য বিমিশ্রভাবে তাহা বিশ্বাস করিতেন', এই কথার অভিপ্রায় কি?

বক্তা—বেদ যে অভ্রান্ত, বেদ যে নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসূতি, তাহা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া স্বামীজী অনেকস্থলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে মানদণ্ডরূপে আশ্রয় করিয়াছেন, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সহিত বেদের সামঞ্জস্য আছে দেখাইতে পারিলেই যেন বেদের অভ্রান্তত্ব সপ্রমাণ হইবে দয়ানন্দ সরস্বতীর মস্তিষ্কে এইরূপ প্রতিভা ক্রীড়া করিত; এবং এইরূপ প্রতিভাপ্রেরিত হইয়া, তিনি বহুস্থলে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সহিত বেদের সঙ্গতি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে স্বামীজীর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিলনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নহে, ইহা যে পরিবর্ত্তনশীল, স্বামীজী অনেক সময়ে তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী ভগবান্ যাস্ক, পাণিনি, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব, মহর্ষি গোতম, ইত্যাদির উপদেশকে প্রামাণিক বলিয়া মুখে স্বীকার করিয়াছেন, বটে, কিন্তু, আমার বিশ্বাস, তিনি ইহাঁদের উপদেশকে সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই, প্রয়োজন হইলেই তিনি যাস্কের উপদেশ, পাণিনি পতঞ্জলিদেবের উপদেশ, গোতমের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, স্বীয় প্রতি-

ভানুসারে ইহাঁদের উপদেশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি যাস্ক ও শৌনক বলিয়াছেন, যাঁহারা ঋষি বা তপস্বী নহেন, বেদের প্রকৃতরূপ—যথাবৎ অর্থ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হয় না, (ন হ্যেষু প্রত্যক্ষমস্ত্যনৃষের তপসো বা।"—নিরুক্ত)। যাঁহারা ঋষি বা তপস্বী নহেন, তাঁহাদের কি প্রকারে বেদার্থের পরিজ্ঞান হইতে পারে? ঋষি ও তপস্বী যখন দুষ্প্রাপ্য হইবেন, তখন কাঁহারা বেদের উপদেষ্টা হইবেন? তখন কোন পুরুষকে আচার্য্যের আসনে বসান যাইবে? ভগবান্ যাস্কের উপদেশ, যাঁহারা পারোবর্য্যবিদ—যাঁহারা গুরুপরম্পরাগত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা ভূয়োবিদ্য—বহুশ্রুত, বহুবিদ্যাপারদর্শী, তাঁহারা বেদার্থপরিজ্ঞানে প্রশস্ত, তাদৃশ পুরুষগণকেই বেদের উপদেষ্টা করিতে হইবে ("পারোবর্য্যবিৎসু তু খলু বেদিতৃষু ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতীত্যুক্তং পুরস্তাৎ।"—নিরুক্ত)। দয়ানন্দ স্বামী যে মহর্ষি যাস্কের এই উপদেশ শিরোধার্য্য করেন নাই, তাহা তুমি অল্পায়াসেই বুঝিতে পারিবে। ইদানীং যাঁহারা বিদ্যাদি উত্তমগুণসম্পন্ন, দয়ানন্দ স্বামী বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণেতর জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ করা উচিত। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের উপদেশ—তপঃ, শ্রুত (বেদ-বেদাঙ্গাদির যথাযথভাবে অধ্যয়ন—আগমকাল, স্বাধ্যায়কাল, প্রবচনকাল ও ব্যবহারকাল এই চার প্রকারে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদপরিজ্ঞান) এবং যোনি—ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম, ইহারা ব্রাহ্মণকারক, যিনি তপস্যা ও বেদ—বেদাঙ্গাদিঅধ্যয়নবিহীন, তিনি জাতিব্রাহ্মণ ("তপঃ শ্রুতং যোনিশ্চেত্যেত দ্ব্রাহ্মণকারকম্। তপঃ শ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ।"—মহাভাষ্য 'নঞ' পা ২।২।৬ এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। দয়ানন্দ স্বামী পতঞ্জলিদেবের এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় প্রতিভার অনুসরণ করিয়াছেন কিনা তাহা তোমার সুখবোধ্য হইবে। শাস্ত্র পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়, জাতিগত ও গুণগত, ব্রাহ্মণ্যকে এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আমি 'ব্রাহ্মণ্য' শব্দ যদর্থে প্রয়োগ

করিলাম, তাহা পরে বুঝাইব। গুণগত ব্রাহ্মণ্যের অভাব হইলেও যাবৎ বর্ত্তমান শরীরের পতন না হয়, তাবৎ জাতিগত ব্রাহ্মণ্য থাকে। গুণগত ব্রাহ্মণ্যের বিকাশ হইলেও যাবৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম না হয় তাবৎ পূর্ণ ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন উঠিবে, আমি ক্রমশঃ যথাশক্তি প্রশ্নসকলের উত্থাপন ও সমাধান করিবার চেষ্টা করিব। সত্যের অপলাপ পূর্ব্বক দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা নাই, আমরা যে এক্ষণে জাতি ব্রাহ্মণ হইয়াছি, দুর্ভাগ্য বশতঃ অব্রাহ্মণ হইয়াছি, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, তথাপি প্রকৃত ব্রাহ্মণের রূপ কি, তাহা জানাইবার ইচ্ছা হয়, সত্যের রূপ দেখিতে ও দেখাইতে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। অব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণোচিত সম্মান পাইবার আশা করা যে হেয়স্বার্থপরতা, প্রকৃত ব্রাহ্মণের অনুচিত কার্য্য, তাহা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, প্রকৃত ব্রাহ্মণ প্রকৃতির প্রেরণায় কদাচ সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন না। দৃঢ় প্রত্যয়, শাস্ত্রোক্তলক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের প্রয়োজন চিরদিন থাকিবে, জগতের প্রকৃত কল্যাণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহার দ্বারা হয় নাই, হইবে না। একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ দ্বারা বিশ্বের জীবন সংরক্ষিত হইতে পারে, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে। আমি তোমাকে যে বর্ণ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাই তাহার কারণ। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে যদি কেহ প্রকৃত ব্রাহ্মণের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হন, আমি তাঁহাকে পূজা করিতে সদা প্রস্তুত। দয়ানন্দ স্বামী বেদের অভ্রান্তত্ব প্রাচ্য প্রতীচ্য বিমিশ্রভাবে বিশ্বাস করিতেন, আমি যে নিমিত্ত এ কথা বলিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা তোমাকে জানাইলাম। বর্ণভেদ যে গুণ ও কর্ম্মভেদ বশতঃ হইয়াছে, তাহা সনাতন বেদ ও তন্মূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্র সমূহেরই উপদেশ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "গুণ ও কর্ম্মবিভাগ দ্বারা আমা (সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ) কর্তৃক চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে ("চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।—গীতা ৪।১৩)।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নিরূপণ করিতে গিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতার অন্যস্থানে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের পৃথক্ পৃথগ্ রূপ কর্ম্ম সকল স্বভাবপ্রভব গুণত্রয় দ্বারা অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মসংস্কার হইতে প্রাদুর্ভূত সাত্ত্বিকাদি গুণানুসারে প্রবিভক্ত—পৃথক্ পৃথগ্ রূপে বিহিত হইয়াছে। * ভগবান মনু ও বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ, স্বর্গাদি লোকত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়, অধিক কি, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়-বর্ত্তী ভাববিকার মাত্রেই বেদসিদ্ধ ("চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্। ভূতং ভবদ্ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি॥" —মনুসংহিতা ১২।৯৭।

জিজ্ঞাসু—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণভেদ গুণকর্ম্মভেদ দেখিয়া করা হইয়াছে, দয়ানন্দ স্বামীর এই কথার অভিপ্রায় এবং গুণ ও কর্ম্ম বিভাগ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্য আমা (সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র) কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, গীতার এতদ্বাক্যের অভিপ্রায়, আমার ধারণা, একরূপ নহে।

বক্তা—তোমার ধারণা যথার্থ, ভ্রান্তিমূলক নহে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 'গুণ' শব্দ দ্বারা সত্ত্বাদিগুণত্রয়কে এবং 'কর্ম্ম' শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণোচিত শম-দমাদি অনাদি কর্ম্মসমূহকে লক্ষ্য করিয়াছেন। গীতার উক্তস্থলে 'কর্ম্ম' শব্দ দ্বারা বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি কর্ম্মই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টিবৈষম্য দর্শনপূর্ব্বক মনে হইতে পারে, বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী, তিনি সমদর্শী নহেন। পরমেশ্বর

---

* "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥"—গীতা, ১৮।৪১।
'স্বভাব ঈশ্বরস্য প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, স প্রভবো যেষাং গুণানাংতে স্বভাবপ্রভবাস্তৈঃ। অথবা জন্মান্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং বর্ত্তমানজন্মনি স্বকার্য্যাভিমুখত্বেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ স প্রভবো যেষাং গুণানাস্তে স্বভাবপ্রভব গুণাঃ।"—শাঙ্করভাষ্য।

যদি সমদর্শী হইতেন তাহা হইলে, ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ থাকিত না। তাহা হইলে একজাতি বা এক বর্ণ হইত, সকল মনুষ্যের তাহা হইলে সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার থাকিত, বিশ্বস্রষ্টা যদি সর্ব্বত্র সমদর্শী ও করুণাময় হইতেন, তাহা হইলে কেহ অত্যন্ত সুখী, কেহ নিরতিশয় দুঃখী, কেহ বিদ্বান্ কেহ মূর্খ, কেহ ধনকুবের, কেহ নির্ধন, কেহ সুস্থ, কেহ রুগ্ন, কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রজোগুণপ্রধান, কেহ বা তামস হইত না, তাহা হইলে কেহ গৌরবর্ণ, কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ বা রক্তবর্ণ হইত না। পরমেশ্বর যে বস্তুতঃ রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী, নির্দ্দয় বা অসমদর্শী নহেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন, পরমেশ্বর জীবের অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করেন। বিশ্বস্রষ্টা সৃজ্যমান প্রাণিসকলের ধর্ম্মাধর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করেন বলিয়া বিষম সৃষ্টি হইয়া থাকে, গুণ ও কর্ম্মভেদ বশতঃ সংসারে সকলে সর্ব্ববিষয়ে সমান হইতে পারে না, সমদর্শী পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে তাঁহার সকল প্রজা সমান হইলেও, "জীবগণের অনাদি শুভ, অশুভ এবং শুভাশুভ বা মিশ্রকর্ম্ম নিবন্ধন সৃষ্টিবৈষম্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে, ইহাতে পরমেশ্বরের কোন অপরাধ নাই। *

---

* "কিংস্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎ স্বিৎ কথাসীৎ। যতোভূমিং বিশ্বকর্ম্মা বিদ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥ বিশ্বতশ্চক্ষুরুতবিশ্বতো মুখোবিশ্ব-তোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা। ৮।১০।৮১। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা। ১৭।১৮ ও ১৯। তার্কিকের অসেচনক, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনোজ্ঞ, নাস্তিকের ভীমমুদ্গর তর্ককেশরী পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্যপাদপ্রণীত ন্যায়কুসুমাঞ্জলিনামক অমূল্য গ্রন্থে, বিশ্বের বিশ্বশক্তিময়পরমেশ্বরসৃষ্টত্ব প্রতিপাদনাবসরে এই মন্ত্রটী উদ্ধৃত ও বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকের মনোরম হইবে বলিয়া কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থস্থ উক্ত মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা এইস্থলে আমরা সন্নিবেশিত করিলাম—

জিজ্ঞাসু—সৃষ্টির প্রথমে ত কর্ম্মবিভাগ ছিলনা, তবে কি নিমিত্ত প্রথমে বিষম সৃষ্টি হইবে? অতএব সৃষ্টির প্রথমাবস্থাতে যে এক বর্ণ ছিল, তখন যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মহাভারতের ভৃগু ও ভরদ্বাজসংবাদে এই কথাই উক্ত হইয়াছে, পদ্মপুরাণাদি পাঠ করিয়াও বিদিত হইয়াছি, প্রথমে এক বর্ণ—নির্ব্বিশেষ এক ব্রাহ্মণ জাতি ছিল, পরে কর্ম্ম-ভেদনিবন্ধন ব্রাহ্মণজাতিই ক্ষত্রিয়াদিবর্ণে পরিণত হইয়াছে।

বক্তা—ভগবান্ বাদরায়ণ শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, সংসার অনাদি, কর্ম্ম ও বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি, সুতরাং জগতে সৃষ্টি ও প্রলয় প্রবাহরূপে নিত্য, অতএব প্রথম সৃষ্টিকালে কর্ম্মবিভাগের অভাব বশতঃ বিষমসৃষ্টি হইতে পারে না, এবম্প্রকার সংশয় উঠিবার কোন কারণ নাই। বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা অপবাদের বেদান্তদর্শন এইরূপে পরিহার করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও গীতাতে "গুণ ও কর্ম্মবিভাগ দ্বারা আমাকর্ত্তৃক চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে" এই কথা বলিয়া নিজ বৈষম্য অপবাদের অপনোদন করিয়াছেন। দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী গুণ ও কর্ম্ম বলিতে

"অত্র প্রথমেন সর্ব্বজ্ঞত্বং, চক্ষুষা দৃষ্টেরুপলক্ষণাৎ। দ্বিতীয়েন সর্ব্ববক্তৃত্বং, মুখেন বাগুপলক্ষণাৎ। তৃতীয়েন সর্ব্বসহকারিত্বং, বাহুনা সহকারিত্বোপলক্ষণাৎ। চতুর্থেন ব্যাপকত্বং, পদাব্যাপ্তেরুপলক্ষণাৎ। পঞ্চমেন ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণপ্রধানকারণত্বং, তৌ হি লোকযাত্রাবহনাদ্বাহূ। ষষ্ঠেন পরমাণুরূপপ্রধানাধিষ্ঠেয়ত্বং, তেহি গতিশীলত্বাৎ পতত্রব্যপদেশাঃ, পতন্তীতি। সন্ধমতি সঞ্জনয়ন্নিতি চ ব্যবহিতোপসর্গসম্বন্ধঃ। তেন সংযোজয়তি, সমুৎপাদয়ন্নিত্যর্থঃ। দ্যাবা ইত্যূর্দ্ধসপ্তলোকোপলক্ষণং, ভূমীত্যধস্তাৎ, এক ইত্যনাদিতেতি।"—

ন্যায়কুসুমাঞ্জলী, ৫ম স্তবক।

"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি॥"

"ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ॥"

"উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ॥"—বেদান্তদর্শন। ২।১।৩৪,৩৫ ও ৩৬

সত্ত্বাদিগুণ ও কর্ম্ম বলিতে সত্ত্বাদিগুণ ও অনাদি কর্ম্মকে লক্ষ্য করেন নাই। চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি যে পরমেশ্বরের বিরাড্‌রূপ দ্বারা হইয়া থাকে, ইহা যে মানুষকৃত নহে, মানুষের গুণ ও কর্ম্ম দেখিয়া যে বর্ণভেদ ব্যবস্থা করেন নাই চাতুর্ব্বর্ণ্য যে পরমেশ্বরের বিরাড্‌রূপ কর্ত্তৃক সৃষ্ট, স্বামীজী বেদ ও বেদমূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট এই মতের প্রকাশ করেন নাই।

জিজ্ঞাসু—'বর্ণ সকলের বিশেষ নাই, নিখিল জগৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণজাতিমৎ ছিল, পরে কর্ম্মানুসারে বিবিধবর্ণ হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ কামভোগে অনুরক্ত, তীক্ষ্ণস্বভাব, ক্রোধন, সাহসিক, স্বধর্ম্মত্যাগী ও লোহিতাঙ্গ, তাহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা গো সমুদায় হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যাহারা কৃষিজীবী, এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্‌মুখ, সেই সকল পীতবর্ণ ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ হিংসা ও মিথ্যারত, যাহারা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যাহারা শৌচভ্রষ্ট সেই সকল কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়াছে। এই সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা পৃথক্ কৃত ব্রাহ্মণেরাই বর্ণান্তরে গমন করিয়াছে। ইহাদের যজ্ঞ-ক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিষিদ্ধ নহে, বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইলেও, সকলেরই বেদে অধিকার ছিল, কেবল যাহারা লোভবশতঃ জ্ঞানহীন হইল, সেই শূদ্রদিগের বেদে অধিকার নাই, বিধাতাকর্ত্তৃক ইহাই বিহিত হইয়াছে। যে সকল ব্রাহ্মণ বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের তপস্যার ক্ষয় হয় না, যাঁহারা পরমশ্রেষ্ঠ বেদে অনভিজ্ঞ, তাহারা ব্রাহ্মণ নহে, বহুবিধ জাতি তাহাদিগের তুল্য। পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত এবং বহুপ্রকার ম্লেচ্ছজাতি প্রনষ্ট-জ্ঞান-বিজ্ঞান হইয়া স্বেচ্ছাচারে কর্ম্ম করিয়া থাকে। মহাভারতে, ভৃগু ও ভরদ্বাজ সংবাদে এই সকল কথা আছে।

বক্তা—ভৃগু ও ভরদ্বাজ সংবাদ পাঠপূর্ব্বক তোমার কি মনে হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—ভৃগু ও ভরদ্বাজ সংবাদ পাঠপূর্ব্বক আমার ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে বিবিধ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ভৃগুদেব বলিয়াছেন বর্ণসকলের বিশেষ নাই, পূর্ব্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে কর্ম্মানুসারে বিবিধ বর্ণ হইয়াছে, ভৃগুদেবের এই সকল কথা হইতে সৃষ্টির প্রথমে কর্ম্মবিভাগ ছিলনা, ইহাই কি প্রতিপন্ন হইতেছেনা? সৃষ্টি যদি প্রবাহরূপে নিত্য হয়, কর্ম্ম যদি বীজাঙ্কুরবৎ নিত্য হয়, বর্ণভেদ যদি সত্ত্বাদিগুণ ও সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মভেদ বশতঃ হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্তকে সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে কিরূপে? সিত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণ এই শব্দ চতুষ্টয়ের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। সিতলোহিতাদি যে নয়নেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপ বা বর্ণ বিশেষের বাচক, তাহা আমার জানা আছে, কিন্তু লোহিতাঙ্গ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, পীতব্রাহ্মণ বৈশ্য হইয়াছে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়াছে ইত্যাদি বাক্যের আমি তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারি নাই। 'বর্ণ' শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'বর্ণ' শব্দ যে নিমিত্ত শুক্ল, লোহিতাদির বাচক হয়, সেই নিমিত্তই কি ইহা ব্রাহ্মণাদির বাচক হইয়া থাকে? দয়ানন্দ স্বামী 'বর্ণ' শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহা কি শাস্ত্রানুমোদিত নহে? স্বামীজী বলিয়াছেন গুণ ও কর্ম্ম দেখিয়া যাহারা যথাযোগ্য বৃত হয়, তাহারা বর্ণ। মহাভারতের ভৃগু ও ভরদ্বাজ সংবাদ পাঠ করিলে আপাততঃ মনে হইয়া থাকে, স্বামীজীর মতের সহিত ভৃগুদেবের মতের অনেকতঃ মিল আছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ সৃষ্টির সমসাময়িক, জাতিভেদ না হইলে সৃষ্টি হয় না, জাতিভেদ না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না, শতপথব্রাহ্মণ হইতে এতৎপ্রতিপাদন এবং বর্ণ শব্দের নিরুক্তি ও দয়ানন্দ স্বামীর বর্ণব্যুৎপত্তি শাস্ত্রানুমোদিত কিনা, তদ্বিচার।

বক্তা—ভৃগু ও ভরদ্বাজ সংবাদ পাঠপূর্ব্বক তোমার যে সকল সংশয় হইয়াছে আমি ক্রমশঃ যথাশক্তি সেই সকল সংশয় বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিব। শতপথব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে—জগৎ জগদ্রূপে ব্যাকৃত হইবার অগ্রে কেবল এক ব্রহ্মাই ছিলেন, তখন এক-বর্ণ (জাত্যাদিরহিত নির্ব্বিশেষ অবস্থা) ছিল, তৎপরে অগ্নিকে সৃষ্টি করিয়া, অগ্নিরূপাপন্ন ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণজাত্যভিমানবশতঃ 'ব্রহ্মা' এই আখ্যায় আখ্যাত হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণজাত্যভিমানী এক ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টিস্থিত্যাদি বিশ্বরাজ্যের সর্ব্বকার্য্যের নির্ব্বাহ হইতে পারে না, এক ব্রহ্মা সৃষ্টি-স্থিত্যাদি নিখিল কার্য্য সম্পাদন করিতে পর্য্যাপ্ত নহেন; কর্ম্মচিকীর্ষাত্মা পরমেশ্বর তাই প্রশস্তরূপ ক্ষত্রিয়জাতিভাবাপন্ন হইলেন; ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু ও ঈশান রূপে অভিব্যক্ত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্ষত্রিয়জাতীয় দেবতা। কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেবতা দ্বারাও সকল কার্য্য চলিতে পারেনা, বিত্তার্জ্জন-কর্ম্মকর্ত্তৃ-দেবতারও প্রয়োজন আছে, তাই বিত্তার্জ্জনপটু বৈশ্যজাতির সৃষ্টি হইল। ব্যবসা-বাণিজ্য একা একা হয় না, বৈশ্যেরা এই নিমিত্ত গণপ্রায়, পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন ("প্রায়েণ সংহতা হি বিত্তোপার্জ্জনে সমর্থাঃ নৈকৈকশঃ।"—বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য)। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য ইত্যাদি গণদেবতা সকল বৈশ্য। কিন্তু ইহাতেও পূর্ণ হইল না, তাই শূদ্র বর্ণ সৃষ্ট হইল। তমোগুণবহুলা পৃথিবী শূদ্র দেবতা, ইনি সকলকে

পোষণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াও সৃষ্টিকার্য্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল, বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর তাহা মনে করিতে পারিলেন না, সৃষ্টিকার্য্য এখনও যে, অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহা বুঝিলেন। ক্ষত্রিয়বর্ণকে জগতের শাসনকর্ত্তা করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা কোন্ নিয়মে শাসন করিবেন, তাহা নিশ্চিত না হইলে, শাসনকার্য্য সুনিয়মে নির্ব্বাহিত হওয়া অসম্ভব, পরমেশ্বর তাই ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি নিয়ামক করিয়া দিলেন, সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবে, সকলকেই ধর্ম্মের শাসনবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইবে। কিরূপ কর্ম্ম ধর্ম্ম্য, কিরূপ আচরণ করিলে স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করা হইবে, তাহা নির্ণয় হইবে কিরূপে? পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাসবৎ সহজভাবে আবির্ভূত বেদই ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ব্বাচক। বেদই ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থাপক, বেদের আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে তাহা অধর্ম্ম হইবে, সত্য-বিদ্যাপ্রকাশক, সত্যবিদ্যাময়, নিখিল-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রসূতি বেদই ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়হেতু, বেদ ব্রাহ্মণকে যেরূপ কর্ম্ম করিতে আদেশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের তাহাই ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম, অন্যান্য জাতির পক্ষেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ সৃষ্টির সমসাময়িক, জাতিভেদ না হইলে, সৃষ্টি হয় না, জাতিভেদ না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না, জাতি ভেদই জগতের জগত্ত্ব। * জাতি বা বর্ণভেদ দেবতাদিগের মধ্যে আছে, জাতি বা বর্ণভেদ উদাত্তাদি স্বরত্রয়ে

---

* "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্নব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রাক্ষত্রাণীন্দ্রোবরুণঃ সোমোরুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি * * * স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবামরুত ইতি। স নৈব ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মম্। * * * তদেতদ্ ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রস্তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মা-দগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে, ব্রাহ্মণমনুষ্যেষ্বেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ।"—

শতপথব্রাহ্মণ বা বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

অথবা ষড়জাদি সপ্তস্বরে আছে, জাতি বা বর্ণভেদ গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দে আছে, এক কথায় সৃষ্ট পদার্থমাত্রেই জাতি বা বর্ণভেদ আছে। রসায়নতন্ত্র (Chemistry) ও ভূততন্ত্র (Physics) জাতি বা বর্ণভেদেরই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, বর্ণ ও বর্ণবৈশেষ্যের তত্ত্ব নিরূপণই বিজ্ঞানের কার্য্য।

জিজ্ঞাসু। উদাত্তাদি স্বরত্রয়ে বর্ণভেদ আছে? উদাত্তাদি স্বরত্রয়ে অথবা ষড়জাদি সপ্তস্বরে বর্ণভেদ আছে? সৃষ্ট পদার্থমাত্রেই জাতি বা বর্ণভেদ আছে? আপনার এই সকল কথার নিগূঢ় রহস্য আছে, কিন্তু আমি ইহাদের রহস্যোদ্ভেদ করিবার অনুপযুক্ত। উদাত্তাদি স্বরত্রয়ে বর্ণভেদ আছে এ কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? বর্ণ ও বর্ণবৈশেষ্যের তত্ত্বনিরূপণ বিজ্ঞানের কার্য্য, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই কথা শুনিয়া বোধ হয় হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেন না।

বক্তা। এই সকল কথা আমার কথা নহে। যোগিশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্য স্বপ্রণীত শিক্ষাগ্রন্থে বলিয়াছেন, উদাত্তস্বর ব্রাহ্মণ, অনুদাত্ত স্বর ক্ষত্রিয় এবং স্বরিত স্বর বৈশ্য (উদাত্তং ব্রাহ্মণং বিদ্যান্নীচং ক্ষত্রিয় মেব চ। বৈশ্যং তু স্বরিতং বিদ্যাদ্ভারদ্বাজমুদাত্তকম্ ॥"—যাজ্ঞবল্ক্যকৃত শিক্ষা। নারদীয় শিক্ষাতে উক্ত হইয়াছে, পঞ্চম, মধ্যম ও ষড়জস্বর ইহারা ব্রাহ্মণ; ঋষভ ও ধৈবত ইহারা ক্ষত্রিয়; গান্ধার ও নিষাদ ইহারা বৈশ্য। 'বর্ণ ও তদ্বৈশেষ্যের তত্ত্বনিরূপণ বিজ্ঞানের কার্য্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই কথা শুনিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেন না, ইহা জানিয়াই আমি এইরূপ কথা বলিয়াছি, তবে আমার বিশ্বাস, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সকলেই আমার এই কথা শুনিয়া হাস্য করিবেন না, কোন কোন সত্যসন্ধ, ধীমান্ বিজ্ঞানকুশল পুরুষ 'বর্ণ ও তদ্বৈশেষ্যের তত্ত্বনিরূপণ বিজ্ঞানের কার্য্য', এতদ্বাক্যের প্রকৃত আশয় কি, তাহা জানিতে পারিলে, আনন্দিত হইবেন, ইহা যে অতিমাত্র সারগর্ভ কথা তাহা

অঙ্গীকার করিবেন। ভৃগুদেব মহর্ষি ভরদ্বাজকে বর্ণসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় সাধারণতঃ যথাবৎ বুঝা হয় না, আমি তোমাকে পরে আমার এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলিতেছি। এখন 'বর্ণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধে দয়ানন্দ স্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা দেখিব।

'বর্ণ' শব্দের বহু অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, ইহার নিরুক্তিও বহুপ্রকার করা হইয়াছে। স্বাদিগণীয় বরণার্থক 'বৃঞ্' ধাতুর উত্তর 'ন' প্রত্যয় করিয়া ("কৃবৃজৃষিদ্রু পণ্যনিস্বপিভ্যো নিৎ"—উণা ৩।১০), অথবা চুরাদিগণীয় প্রেরণার্থক 'বর্ণ' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া কিম্বা চুরাদিগণীয় বর্ণক্রিয়া বিস্তার ও গুণ বচনার্থক 'বর্ণ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'বর্ণ' পদ নিষ্পন্ন হয়। নিরুক্তকার ভগবান্ যাস্ক স্বাদিগনীয় 'বৃঞ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বর্ণ শব্দেরই নিরুক্তি করিয়াছেন। দয়ানন্দ স্বামী ভগবান্ যাস্কের নিরুক্তিই যে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তুমি অবগত আছ। যদ্দ্বারা বৃত হয় ("ব্রিয়তেঽনেন") দয়ানন্দ স্বামী 'বর্ণ' শব্দের এই অর্থই লইয়াছেন। যাহা বৃত হয়—বরণীয়রূপে নির্ব্বাচিত বা প্রার্থিত হয়, বর্ণ শব্দ তাহার অথবা যিনি বৃত হন তাঁহার বাচক হইতে পারে। গুণ ও কর্ম্ম দেখিয়া যাহারা যথাযোগ্য বৃত হয়, তাহারা 'বর্ণ' 'বর্ণ' শব্দের এবম্প্রকার নিরুক্তি হইতে ইহার স্বরূপের ঠিক প্রকাশ হয় না, মানুষ গুণকর্ম্ম দেখিয়া কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য এবং কাহাকেও শূদ্ররূপে নির্ব্বাচন করিয়াছে এবং করিবে, 'বর্ণ' শব্দের এইরূপ অর্থ 'বর্ণ' পদার্থের তত্ত্বনিরূপণে কোন উপকার করে না। বস্তুর গুণ ও কর্ম্মানুসারেই যে উহা বৃত হয়, বরণীয় (কমনীয় বা প্রার্থিত) হইয়া থাকে, তাহা সত্য, কিন্তু যে নিমিত্ত 'বর্ণ' শব্দ ব্রাহ্মণাদির বাচক হইয়াছে, 'বর্ণ' শব্দের উক্ত ব্যুৎপত্তি হইতে তাহা স্পষ্ট ও বিশুদ্ধভাবে বুঝিতে পারা যায় না। যাহা বরণীয়রূপে বিনিশ্চিত হয়, যদ্দারা প্রয়োজন সিদ্ধ হয়,

যাহা সুখজনক, তাহাকেই সকলে প্রার্থনা করে, তাহাই সকলের-প্রিয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহারা পরস্পর পরস্পরের বরণীয়, ইহাদের একের অভাবে অন্যের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, ইহাদের একের অভাবে অন্যের তিরোভাব হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা পরস্পর, পরস্পরের বরণীয়, ইহাদের একের অভাবে অন্যের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, ইহাদের একের অভাবে অন্যের তিরোভাব হইয়া থাকে, এ কথার অর্থ কি ?

বক্তা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহারা যথাক্রমে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য ; সত্ত্বাদি গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে, পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে প্রকটিত হইয়া থাকে, ইহাদের একের অভাবে অন্যের ক্রিয়াকারিতা থাকে না। গুণত্রয় ইতরেতরাশ্রয়ী, অতএব ইহাদের পরস্পর পরস্পরের বরণীয়, ইহাদের পরস্পর দ্বারা পরস্পর বর্ণীভূত হয়, ব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত (Manifested) হয়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি যখন গুণত্রয়ের কার্য্য, তখন ইহারাও যে ইতরেতর আশ্রয়ী হইবে, তাহা সুখবোধ্য। যাহা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়—বর্ণীভূত হয়, তাহা 'বর্ণ', যাহা স্তুত হয়, বর্ণিত হয়, তাহা 'বর্ণ', যদ্দারা কোন কিছু স্তুত বা বর্ণিত হয় তাহা 'বর্ণ', আমরা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা গুণত্রয়ের ব্যক্ত রূপ, অতএব তাহা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, তাহা অবর্ণের গুণবিশেষযোগনিবন্ধন বিশেষ বিশেষ বর্ণ। এক কথায় বর্ণই জগৎ।

জিজ্ঞাসু—'বর্ণ' শব্দের অর্থগর্ভে যে এত তথ্য লুক্কায়িত ছিল, তাহা জানিতাম না। 'বর্ণ' শব্দের এইরূপ নিরুক্তি শ্রবণপূর্ব্বক প্রকৃত বিজ্ঞানকুশল যে আনন্দিত হইবেন, তাহা বিশ্বাস করিবার পথ সুপরিষ্কৃত হইল, বর্ণ ও তদ্বৈশেষ্যের তত্ত্বনিরূপণই যে বিজ্ঞানের কার্য্য, রসায়নতন্ত্র ও ভূততন্ত্র যে বর্ণ ও তদ্বৈশেষ্যের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা কোন দিন পূর্ণভাবে বুঝিতে পারিব,

হৃদয়ে এইরূপ আশাবীজ অঙ্কুরিত হইল। দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর বর্ণ শব্দের ব্যাখ্যা যে ঠিক নহে, এখন মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিব। 'যাহা স্বাশ্রয়কে আবৃত করে, ঢাকিয়া রাখে। তাহা 'বর্ণ', নিরুক্তটীকাকারের এতদ্বাক্য কত সারগর্ভ, তাহা কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিয়া, মন আনন্দে পূর্ণ হইতেছে।

বক্তা—শব্দ বা বেদ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, শব্দ বা বেদ হইতে দেবতাদিগের সৃষ্টি হইয়াছে, বেদ, বেদাঙ্গ ও বেদের উপাঙ্গ সকলের মুখ হইতে তুমি এই কথা শুনিয়াছ, সন্দেহ নাই। বর্ণসমাম্নায়ই বেদ, মহাভাষ্যকার অনন্তাবতার ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই কথা, অপিচ 'মহর্ষি কাত্যায়নের পঞ্চষষ্টি বর্ণ সমস্তই ত্রয়ীলক্ষণ ব্রহ্ম বা বেদরাশি, ইহারাই আনুপূর্ব্ব ব্যবস্থিত হইয়া, উদাত্তাদিস্বরশুদ্ধ হইয়া, গায়ত্র্যাদিছন্দ বিশিষ্ট হইয়া, ঋক্, যজুঃ ও সাম এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয় ("এতে পঞ্চষষ্টি বর্ণা ব্রহ্মরাশিরাত্মবাচঃ"—শুক্লযজুর্ব্বেদপ্রাতিশাখ্য) এতদ্বাক্য স্মরণ কর; অকারাদি বর্ণ সমূহের বর্ণ নাম হইবার কারণ কি তাহাও চিন্তা কর; এক প্রাণবায়ু অনুপ্রদানাদি গুণবিশেষযোগবশতঃ বর্ণীভূত হয়, বিশেষ বিশেষ বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, একশ্রুতি কর্ম্মনিবন্ধন বহুরূপ হইয়া থাকে (প্রযোক্তুরীহা গুণসন্নিপাতে বর্ণীভবন্ গুণবিশেষযোগাৎ। একশ্রুতীঃ কর্ম্মণাপ্নোতি বহ্বীঃ॥"—ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য।)' বেদজ্ঞ, বেদপ্রাণ মহর্ষি শৌনকের এই অমূল্যোপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহার্থ যত্ন কর।

জিজ্ঞাসু—এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের তত্ত্বনিরূপণের কি উপকার হইবে?

বক্তা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ, স্বর্গাদি লোকত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়, অধিক কি, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালবর্ত্তী ভাববিকার মাত্রেই বেদসিদ্ধ, ভগবান্ মনুর এই কথাতে যে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? বেদ হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়

সিদ্ধ হয়, ভগবান মনুর এই উপদেশের সাধারণতঃ যে অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা ইহার পূর্ণ বা যথাবৎ অর্থ নহে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ভেদের কথা বেদে আছে, ভগবান্ মনু কেবল এই কথা জানাইবার নিমিত্ত এবম্প্রকার উপদেশ প্রদান করেন নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, 'বিধাতা গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ) এবং কর্ম্ম (পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সদসৎ কর্ম্ম) এতদুভয়ের একীকরণাত্মক বিভাগ দ্বারা প্রাগ্বৎ (পূর্ব্বসৃষ্টি ক্রমানুসারে) সুর, নর, অসুর, ভূমি, পর্ব্বত প্রভৃতি চরাচর জগৎ সর্জ্জন পূর্ব্বক বেদদর্শন করিয়া যথা দেশে, যথাকালে সৃষ্টপদার্থ সমূহের অবস্থান বিভাগের কল্পনা করিলেন ("গুণকর্ম্মবিভাগেন সৃষ্ট্বা প্রাগ্‌বদনুক্রমাৎ। বিভাগং কল্পয়ামাস যথাস্বং বেদদর্শনাৎ॥"—সূর্য্যসিদ্ধান্তের এই কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলে তোমার বিশ্বাস হইবে, দেশভেদ ও নিষ্কারণ নহে, দেশভেদ ও মনুষ্যাদি জাতিভেদের ন্যায় জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে হয়, দৈশিক প্রকৃতি যে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস হইয়া থাকে, সৃজ্যমান প্রাণি-দিগের কর্ম্মইতৎপ্রতি কারণ। মানুষ কর্ম্মানুসারেই পৃথক্ পৃথক্ দেশে জন্মগ্রহণ করে। শব্দ বা বেদ হইতে জগৎ সৃষ্ট হয়, অতএব শব্দ বা বেদ হইতেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বেদ ও ব্রহ্ম এক পদার্থ; অতএব চাতুর্ব্বর্ণ্য পরমেশ্বরের বিরাড্‌রূপ হইতে বিসৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ গায়ত্র্যাদি ছন্দ হইতে জন্মলাভ করে, গায়ত্রীই ব্রাহ্মণ ("ব্রহ্ম বৈ গায়ত্রী"—তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ।) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য যে মানুষকৃত নহে, তাহা সপ্রমাণ হয়। বেদ হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে, এই কথার প্রকৃত অভি-প্রায় কি, তাহা জানিবার প্রয়োজন হইলে, প্রথমে বেদের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। 'বর্ণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে যথা প্রয়োজন কিছু বলিলাম, দয়ানন্দ স্বামীর বর্ণ নিরুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করিলাম। যতই বলি না কেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায়, এ যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা বর্ণাশ্রম

ধর্ম্মের মূলোৎপাটনে যত্নশীল হইয়াছেন তাঁহাদের ইহা শুভসংবাদ, সন্দেহ নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এ যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিলোপে হিন্দুজাতির উন্নতি হইবে কি? উন্নতি বলিতে অভ্যুদয়শীল বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজ যাহা বুঝিয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু—এ যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিলোপ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, আধুনিক শিক্ষিত ও অভ্যুদয়শীল হিন্দু-সমাজের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি যে বিষম বিদ্বেষ হইতেছে, তাহাতে কালের প্রেরণা আছে।

বক্তা—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিলোপের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে শত, সহস্র শাস্ত্র প্রমাণ দেখাইলেও, অখণ্ডনীয় যুক্তিশর প্রয়োগ করিলেও, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রাণরক্ষা হইবে না। রোগীর জীবনীশক্তি যখন বিলুপ্তপ্রায় হয়, চিকিৎসকগণ তখন বিবিধ উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাড়িত শক্তি বা অক্‌সিজেন গ্যাস প্রয়োগ দ্বারা রোগীর অবসন্ন জীবনীশক্তিকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইলে, এতদ্দারা বিশেষ উপকার হয় না, ক্ষণিক প্রতীকার হইলেও, স্থায়ী ফল হয় না। জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, উৎপত্তিশীল বা কার্য্যপদার্থের এই ষড়্‌বিধ অবস্থা। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের এক্ষণে বিনাশাবস্থা সমাগত হই-হইয়াছে, অতএব ইহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা দ্বারা আংশিক ও ক্ষণস্থায়ী উপকার হইলেও, পূর্ণ ও স্থায়ী উপকার হইবে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে যাঁহারা হিন্দুজাতির অবনতির কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলোৎপাটনার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিনাশাবস্থা সমাগত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইলে অনেকতঃ আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইবেন, তাঁহারা যাহা চাহিতেছেন, বিনা আয়াসে তাহা পাইবেন, ইহা তাঁহাদের শুভসংবাদ, সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু—বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে যাঁহারা হিন্দুজাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ রূপে অববারণ করিয়াছেন, তাঁহারা এ সংবাদকে শুভসংবাদ মনে করিবেন বটে, কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইলে, হিন্দুজাতি একবর্ণীভূত হইলে, ইহার উন্নতি হইবে, না আরও অবনতি হইবে?

বক্তা—তোমার কি মনে হয়?

জিজ্ঞাসু—অভ্যুদয়শীল অন্যান্য জাতির ন্যায় হিন্দুজাতি যদি একবর্ণীভূত হয়, তাহা হইলে, যাঁহাদের বর্ণবিভাগ নাই, তাঁহাদের ন্যায় হিন্দুজাতির উন্নতি না হইবে কেন? বর্ণবিভাগ না থাকিলে বিনা বাধায় সকলেই একদেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিতে পারিবেন, সকলের সহিত অসংকোচে মিলিতে পারিবেন, সকলের সহিত আহারাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন, হিন্দুদিগের তাহা হইলে বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, শিল্প ও কলার অভ্যুদয় হইবে, হিন্দুরা তাহা হইলে, বিজ্ঞানকুশল হইবেন, লৌকিক স্বাধীনতা লাভার্থ প্রয়োজনীয় বিবিধ উপকরণ সম্পন্ন হইবেন, শত্রু সংহার করিবার অমোঘ অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার করিতে পারগ হইবেন। উন্নতি বলিতে বর্ত্তমান কালে সুশিক্ষিত মনুষ্যসমাজ এতদ্ব্যতীত আর কিছু বুঝেন বলিয়া আমার মনে হয় না।

বক্তা—তুমি যাহা যাহা বলিলে, বর্ণব্যবস্থিতি-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইলে, এই অধঃপতিত বর্ত্তমান হিন্দুজাতির যদি তাহা তাহা হয় তবে মন্দ কি? হিন্দুজাতির যদি সর্ব্বাংশে য়ুরোপাদি দেশবাসীদিগের প্রকৃতির আপূরণ সম্ভব হয়, তাহা হইলে, এই অতি পুরাতন হিন্দুজাতি ইংলিশাদি জাতিতে পরিণত হইবে, হিন্দুনামে কোন স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব তাহা হইলে বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু তাহা কি হইবে? হিন্দুজাতির বিলোপ হইতে পারে, কিন্তু ইংলিশাদি জাতির ন্যায় ইহার উন্নতি হইবে কি? আমার বিশ্বাস, হিন্দুজাতির তাহা হইলে অবনতিই হইবে।

নিত্যক্রিয়া শেষে মনন।

গুরু মুখে ও শাস্ত্র মুখে অনেক উপদেশ শ্রবণ করা হইয়াছে। লাভবান যে না হইয়াছি একথা বলিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। তবে জীবন্ত উপদেশে যতটা হওয়া সম্ভব ততটা হয় নাই; সেটা পাত্রের দোষ। সূর্য্য-কর চুম্বিত সূর্য্যকান্ত মণির অন্তর্নিহিত প্রভা-পটল স্বতঃই বিচ্ছুরিত হয় কিন্তু মৃত্তিকা-খণ্ডের সে প্রভাব আদৌ নাই। যাহা হউক শ্রীগুরুর উপদেশ মত সন্ধ্যা-পূজা প্রভৃতি নিত্য-কর্ম্মের পর "ততঃ একান্ত-মাশ্রিত্য সুখসন-পরিগ্রহ" করিলাম এবং আসনে বসিয়া মনন করিতে লাগিলাম।

এই যে যাঁহার উপাসনা করা হইল ইনি কি শুধুই ধ্যেয়? এই যে ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং 'যাঁহার ধ্যান' উপাসনা প্রভৃতি করা হইল ইহাতেই কি আমার আত্মজ্ঞান লাভ হইবে? ইহাতেই কি আমার দুঃখের আত্যন্তিক অবসান হইবে? হইবে, আরও কিছু চাই। শুধু ধ্যেয় হইলে চলিবে না, জ্ঞেয় চাই অর্থাৎ ধ্যেয় এবং জ্ঞেয় দুই সাধনাই সমকালে করিতে হইবে। একটী দেহ অন্যটী প্রাণ। আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে, মন যখন নিতান্ত বহির্মুখ হইয়া থাকে তখন প্রাণায়াম্ ইত্যাদি ক্রিয়াযোগে মনকে ভিতরে লইয়া গিয়া ধ্যেয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হয়। তার পর ধ্যেয় ঈশ্বরের উপাসনায় যখন মন ভগবৎরসে গলিয়া যায় তখন জ্ঞেয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হয়। এই ধ্যেয় ঈশ্বরই তখন বুদ্ধিযোগ দ্বারা জ্ঞেয় ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া স্থিতি লাভ করেন। অর্থাৎ স্বচ্ছ বুদ্ধি-দর্পণে আত্ম-দর্শন করিয়া সাধনার উৎকর্ষ লাভ করেন। শাস্ত্র বলেন,

অনবিদ্ধায় রূপস্তস্থূলং পর্ব্বত-পুঙ্গব!
'অগম্য-স্থূল-রূপং মে যদ্দৃষ্ট্বা মোক্ষ-ভাগ্ ভবেৎ।

তস্মাৎ স্থূলংহি মে রূপং মুমুক্ষু পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ।
ক্রিয়যোগেন তান্যেব সমর্ভ্যর্চ্চ বিধানতঃ।
শনৈ রালোচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ম্।
(শ্রীভগবতী গীতা)

শ্রীজগদম্বা হিমালয়কে বলিতেছেন হে পর্ব্বত শ্রেষ্ট! আমার এইস্থূল রূপের ধ্যান না করিয়া মুমুক্ষু সাধক আমার সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব যত্ন পূর্ব্বক মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমে আমার স্থূল রূপের আশ্রয় করিবে। ক্রমে বিধিপূর্ব্বক আমার স্থূলরূপের অর্চ্চনা করিতে করিতে আমার পরম অব্যয় সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিবে।

তাই বলা হইতেছিল ধ্যেয় ব্রহ্মোসর তত্ত্বতঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় প্রণালীতে ভাবনাপ্রযুক্ত হইলে ইনিই জ্ঞেয় ব্রহ্ম। ধ্যেয় ঈশ্বরের উপাসনা অন্তে জ্ঞেয় ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা শ্রুত হইয়াছি তাহারই মনন করা হইল। শ্রীভগবান্ মহেশ্বরের ধ্যানে পাওয়া যায়—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং।
চারুচন্দ্রাবতংশং রত্না কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং॥
পরশু মৃগবরা ভীতি হস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিংবসানং।

এই পর্য্যন্ত ধ্যেয় ব্রহ্মের উপাসনা। অপূর্ব্ব রূপের ছবি! সাধক নির্ন্নিমেষলোচনে এই মূর্ত্তি দর্শনে কৃতার্থ হইতেছেন। ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের সম্বন্ধ যতই ঘনীভূত হইতেছে, সাধক দেখিতেছেন যে এই ধ্যেয় পদ্মাসীনমূর্ত্তি তাঁহারই হৃদয়পদ্মে সমাসীন। সাধক আরও পুলকিত হইতেছেন। তারপর বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং এইখানে জ্ঞেয় ব্রহ্মের উপাসনার উপাদান। বিশ্বাদ্যং—যখন বিশ্ব ছিল না—যখন সৃষ্টি হয় নাই—যখন প্রকৃতি সাম্যা-

বস্থায় স্থিতা—শক্তি শক্তিমানে লীনা, তখন যিনি থাকেন তিনিই জ্ঞেয় ব্রহ্ম। রূপ গলিয়া হইল তত্ত্বে স্থিতি। ইহাই তুরীয় অবস্থা। বিশ্ব-বীজং—রজক্ষোভ হইয়াছে কিন্তু তখনও বিশ্ব সৃষ্টি হয় নাই ইহাই বীজ বা কারণ অবস্থা। নিখিল-ভয়-হরং—ইহাই প্রাণভয়ে ভীত মার্কণ্ডকে রক্ষা করিবার জন্য শিব-লিঙ্গ হইতে উদ্ভূত নিখিল-ভয়-হারী মূর্ত্তি—সূক্ষ্মাবস্থা। তারপর শক্ত্যালিঙ্গিত শিব-লিঙ্গমূর্ত্তি নিখিল জীবের শেষের অর্থাৎ স্থিতির স্থান। এই শিব-লিঙ্গ-বিগ্রহ স্থূল-মূর্ত্তি। এই স্থূল-মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ভাবনা প্রয়োগে সাধক স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে বীজে, বীজ হইতে সাক্ষী অবস্থায় উপনীত হয়েন। জল বিন্দু সিন্ধুতে পৌঁছিলে যে অবস্থা হয়, সাধক এইখানে পৌঁছিলে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন।

তাই বলা হইতেছিল প্রবৃত্তি—নিবৃত্তি মার্গের সাধকের অবলম্বনীয় ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং 'ইনি ব্রহ্ম' ইনি অধিষ্ঠান চৈতন্য। এই যে জগৎ প্রত্যক্ষ হয়, ইহা তাঁহার শক্তির ব্যক্ত অবস্থা মাত্র। অর্থাৎ তাহার প্রকৃতিদত্ত অষ্টমূর্ত্তির বিকাশ। শক্তিমান্ ভিন্ন শক্তি কোথায় আছে বা কার্য্য করিতেছে ইহা চিন্তা করা যায় না। শক্তিমান্ যিনি তিনি অধিষ্ঠান চৈতন্য, তিনি জ্ঞেয় ঈশ্বর।

যিনি অধিষ্ঠান চৈতন্য, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি নিত্য। শক্তি যখন তাহাতে এক হইয়া মিশিয়া থাকেন তখন মহাপ্রলয় অবস্থা। মহাপ্রলয়ে শক্তির কোন কার্য্য থাকেনা যাহা শক্তির অস্তিত্ব অর্থাৎ কম্পন, চলন, তাহা পর্য্যন্ত থাকে না তিনিই মাত্র থাকেন। মহা-প্রলয়ে জগৎ, শক্তিতে লয় হয়, শক্তি, শক্তিমানে লয় হয়। কাজেই বলা হয়, শক্তি আছে বা নাই কিছুই বলা যায় না। যদি থাকে তবে তাহার অনুভব নাই কেন? বলা যাইতে পারে আমি রক্তসঞ্চালন অনুভব করি না বলিয়া উহা নাই কি বলিতে হইবে? আমার অনুভব নাই অথচ অস্তিত্ব আছে ইহা যখন বলা হয় তখন বলিতে হইবে আমার অনুভবে না থাকিলেও অন্য কাহারও অনুভবে আছে। যাহার অনুভবে

আছে এই অনুমান করা যায় তিনিই অধিষ্ঠান চৈতন্য। সেইজন্য বলা হয় জ্ঞানস্বরূপ যিনি, তিনিই সকলের মূলে আছেন। এই অধিষ্ঠান চৈতন্যই জ্ঞেয় ঈশ্বর।

এই জ্ঞেয় ঈশ্বর সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে পৃথক। মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার হইতে পৃথক। উৎসবের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় তিনি আপনি আপনি, কাহারও সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই। জ্ঞানী সাধক এই জ্ঞেয় ঈশ্বরকে জানিয়া তাঁহার মত নিঃসঙ্গ, নিঃসম্পর্ক হইয়া স্থিতি লাভ করিতে প্রয়াস করেন। যাঁহারা জ্ঞেয় ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য-এই ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহারই নাম সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি বা পরমানন্দপ্রাপ্তি ইহারই নাম-কৈবল্য-মুক্তি।

কোন্ সাধনায় জ্ঞানী সাধক এই মোক্ষ পদ—এই পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন তাহাই মনন করা হইল। সত্য বটে বিহিতরূপে সদাচার পালন করা হয় নাই আহার-শুদ্ধি হয় নাই, ফলে সাত্ত্বিক মন প্রস্তুত হইল না, বুদ্ধি শাস্ত্রোজ্জ্বলা হইল না, বিচার-শুদ্ধি হইল না। তাই শিশ্নোদর-পরায়ণ-সাধনকুণ্ঠ জীব জ্ঞান-মার্গের সাধনায় সম্পূর্ণ অনধিকারী। তবুও হতাশ, হইবার—কিছুই নাই। শ্রীগুরু আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথমঃ লক্ষণঃ॥ তাঁহার আশীর্ব্বাদই কাঙ্গালের একমাত্র সম্বল। দৈব, কাল ও পুরুষকার এই ত্রিধারার মিলন সময়ে শ্রীগুরুকৃপায় নিশ্চয়ই তখন ভাগ্যের উদয় হইবে। তখন শ্রীগুরুপ্রদত্ত এই জ্ঞানমার্গের উপদেশ; কুসুমস্তবক শ্রীগুরু সেবকের গলদেশে বিজয় মাল্য প্রদান করিয়া আনন্দ-ধামে লইয়া যাইবে; অর্থাৎ এই উপদেশরাশি এখন যেমন খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের অভিব্যক্তি স্বরূপ তখন অর্থাৎ হৃদয় শুদ্ধ-সত্ত্বময় হইলে এই উপদেশ-মালা যুগপৎ খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের একত্র সমাবেশে এক অসম্ভ অদ্বয় জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইবে। শাস্ত্র বলেন নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। কর্ম্ম ও উপাসনার শেষে জ্ঞান মার্গের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায় নাই।

[illegible]ক্রিয়া শেষে মনন।

বলা হইতেছিল জ্ঞানমার্গগামী সাধকের সাধনা কি ?

ইতি পূর্ব্বে উৎসবে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু আলোচনা করা হইয়াছে। আমি সেই আত্মতত্ত্ব। আমি দেহ নহি—দেহের জরামৃত্যু আমার নাই—আমি প্রাণ নহি প্রাণের ক্ষুধা পিপাসা আমার নাই। আমি মন নহি—মনের শোক মোহ আমার নাই। তাই দেহ হইতে আমি পৃথক, ইহা সর্ব্বদা অনুভব করা চাই। যদি এক মুহূর্ত্ত কালও দেহ হইতে আমি পৃথক ইহা অনুভব করা যায় তবে মুক্তির সুখ-স্থিতির সুখ এই মুহূর্ত্তেই অনুভূত হইবে। ইহা ক্রিয়াযোগ ও অনুভব সাপেক্ষ—বর্ণনার আয়াস করা বৃথা।

স্থূল দেহ হইতে যেমন আমি পৃথক ; সূক্ষ্ম-দেহ মন হইতে ও আমি পৃথক। মন সর্ব্বদা সঙ্কল্প, বাসনা তুলিতেছে তাই সর্ব্বদা চঞ্চল। আমি কিন্তু স্থির আত্মা—আমি-চঞ্চল মন নহি। সুতরাং মন যে সকল সঙ্কল্প তুলিতেছে আমি তাহার সাক্ষী—দ্রষ্টা। মনে সঙ্কল্প উঠিয়াই আত্মাকে যেন বশীভূত করিয়া কর্ম্মরূপে পরিণত হয়। কিন্তু দ্রষ্টা স্বরূপে যখন থাকা যায় তখন সঙ্কল্প উঠিলে তাহার দ্রষ্টারূপে থাকা হয় বলিয়া সঙ্কল্প আপনি উঠিয়া আপনি লয় হইয়া যায়। সঙ্কল্পে অভিমান করা হইল না বলিয়া মণির ঝলকের মত উহা উঠিয়াই মিলাইয়া যায়, ক্রমে দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থিতি পরিপক্ক হইলে ঐ ঝলক আর উঠিবে না।

এই দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে—অবস্থিতির জন্য বিচারই প্রধান অবলম্বন। আমি আত্মা—আমি দেহ প্রাণমন নহি। বিচার দ্বারা এই অনুভূতি যে পরিমাণে গাঢ় হইতে থাকে, সঙ্কল্প, বাসনা ও কর্ম্ম হইতে চিত্ত সেই পরিমাণে নির্ম্মুক্ত হইতে থাকে। ফলে বিষয় ভোগে অরুচি জন্মে। ইহাই ফল ভোগ বিরাগ। ভোগ্য বস্তুর বিচার—নারীস্তন-ভরনাভিবেশং। মিথ্যা মায়া মোহাবেশং। এতন্মাংস বসাদি বিকারং মনসি বিচারায় বারং বারং॥ অত্যন্তং মলিনো দেহঃ দেহী চাত্যন্তঃ নির্ম্মলঃ—এই বিচার প্রবল হইলে তখন মনে হইবে দেখিবার, শুনিবার কিম্বা ভোগ করিবার কিছুই নাই। এক দিকে বাহিরের ভোগ্য বস্তুর [illegible] [illegible] বিরাগ আসিবে কারণ এগুলি সকলই মলিনতা, অপরদিকে [illegible]

রের আত্মদেবতার দিকে মন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে থাকিবে। ফলে একটী ছাড়িবার এবং আর একটী গ্রহণ করিবার বস্তু পাওয়া গেল। তবেই বুঝা গেল যে ভিতরের জিনিষটি পূর্ণভাবে গ্রহণ করা না হইলে বাহিরের জিনিষ পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য।

মনের যতক্ষণ পর্য্যন্ত আস্তিত্ব আছে মন ততক্ষণ কিছুনা কিছু লইয়া থাকিবে। যখন বাহিরে মনের কিছুই রহিল না তখন অন্তর্দেবতার রূপ, গুণ, লীলা ও স্বরূপ আলোচনায় রসলোলুপ মনের ক্রমশঃ নিত্য বস্তুর প্রতি অনুরাগ এবং বাহিরের ভোগ্য বস্তু—অনিত্য বস্তুর প্রতি বিরাগ জন্মিতে লাগিল। ইহাই নিত্যানিত্য বস্তু বিচার।

ক্রমে বৈরাগ্য ও শম দমাদির অভ্যাসযোগে এবং নিত্যানিত্য বস্তু বিচারে ইহা অনুভবে আসিবে যে "অহংদেবো, ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্"। কিন্তু কি এক মায়ার ঘোরে—কোন্ এক স্মরণাতীত কালে অন্য বস্তুকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহারই ফলে, তাহাদের ধর্ম্মকে অর্থাৎ সুখ দুঃখকে নিজের ধর্ম্ম বা সুখদুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। এই যে মায়ায় বন্ধন তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ক্রমে প্রাণে অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগিবে। ইহাই মুমুক্ষুত্ব। এই অবস্থা যে পরিমাণে পরিপক্ক হইবে সেই পরিমাণে হৃদয়-গুহাশায়ী আত্মদেব শ্রীগুরু বর এবং অভয় মুদ্রা হস্তে লইয়া সন্তানের জন্য সতত অপেক্ষা করিতেছেন ইহা স্পষ্টতঃ অনুভব হইবে। এই অনুভূতিপ্রবাহ ক্রমে গাঢ়তম হইলেই সাধক ইষ্টমন্ত্রাদি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য যথার্থ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন হৃদয় দেবতা কিম্বা তাঁহার প্রতিচ্ছাস স্থূল গুরু বিগ্রহের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। এইরূপে সাধক স্থূল অবলম্বন ইষ্টমন্ত্র সূক্ষ্ম অবলম্বন ইষ্ট দেবতা এবং স্থূল সূক্ষ্মের অতীত শ্রীগুরু যে একই বস্তু তাহা শাস্ত্রীয় প্রণালীতে সাধন করিতে করিতে তত্ত্বতঃ অনুভব করতঃ অ—উ ম, জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্তির পরপারে সৃষ্টির উৎস কলা এবং তারপর বিন্দু আনন্দ রাজ্যের সিংহদ্বার পার হইয়া শ্রীগুরু পাদমূলে অর্থাৎ পরম পদে চিরদিনের জন্য অবস্থিতি করেন।

উৎসব।

—ঃ-*-ঃ—

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৪শ বর্ষ।	সন ১৩২৬ সাল, পৌষ।	৯ম সংখ্যা।

উল্লাস—ব্রহ্মের ও জীবের।

ব্রহ্মের উল্লাস প্রাপ্তিতে এই দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষ---এই অনন্ত কোটি জীব পরিপূরিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল। অথচ ব্রহ্ম চির-দিনই একা। আর কেহ নাই, আর কিছু নাই। ব্রহ্মের যে উল্লাস তাহাও বিচিত্র। 'স্বয়মন্যইবোল্লসন্' স্বয়ংই স্বয়ং। স্বয়ং অন্যমত এই তাঁহার উল্লাস। স্বয়ং যিনি তিনি চিৎ---তিনি জ্ঞান। সৎ ও আনন্দই এই জ্ঞান। আপনি আপনি ইনি ইঁহাকে জানিবারও কেহ নাই, জানাইবারও কেহ নাই।

চিতের দুই স্বভাব—স্পন্দ ও অস্পন্দ। চিরদিন তিনি আপনার অস্পন্দ স্বভাবে পরিপূর্ণ। চিতের যে স্পন্দস্বভাব তাহাই চেত্যতার মত—বহির্ম্মুখতার মত। চিতের এই স্পন্দন, কম্পন, চলন প্রথম অবস্থায় যাহা তাহা কিন্তু অব্যক্ত। ইহাই সাম্যাবস্থা। ভিতরে বৈষম্যের বীজ, বাহিরে কোন কিছু এখনও ব্যক্তাবস্থায় আইসে নাই। [illegible] প্রথম উল্লাস এই অব্যক্ত-মায়াজড়িত এই অব্যক্ত চৈতন্য।

আদিস্পন্দন, আদিচলন, আদিকম্পনের ভিতরে এই অনন্ত, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড। এই মায়াশবলিত ব্রহ্মই সগুণব্রহ্ম, ইনিই ঈশ্বর, ইনিই আদি নারায়ণ, ইনিই বিষ্ণু। ইনিই বেষণশীল। ইনিই অব্যক্ত মায়াকে, ইনিই ভাবী সৃষ্টিকে বেষ্টন করিয়া আছেন। ইনিই মায়ার ভিতরে যে ভাবী সৃষ্টিবীজ তাহার নিয়ামক। ইনিই অন্তর্যামী, ইনিই মায়াধীশ ঈশ্বর। অব্যক্তকে ব্যক্ত ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের সঙ্গে, অনুত্তরঙ্গ তোয়নিধির সঙ্গে, নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্যের অনুমান করা যায়। অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহ দেখা যায়। অনুত্তরঙ্গ জলনিধি দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরও হয়, নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখা চক্ষেও পড়ে কিন্তু ইনি—এই ঈশ্বর বড়স্থির, বড় শান্ত—ভিতরে অস্থির অশান্তের ঘনীভূত মূর্ত্তি লইয়াও ইনি শান্ত। এই সগুণ ব্রহ্ম, এই ঈশ্বর—ইনি এখনও গুণাক্ষোভবিশিষ্টা অব্যক্ত সাম্যাবস্থারূপিণী মায়ারাণীকে বক্ষে লইয়া—এখনও অব্যক্ত স্বরূপ। ইনিই ভাবী বিশ্বের "পরিবেষ্টিতারং"-বিশ্বের পরিবেষ্টিতার কথাই শ্রীগীতা বলেন "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

বলিতেছিলাম চিৎএর প্রথম উল্লাস এই অন্তর্যামী ঈশ্বর। চিৎ ধৌতবস্ত্র। ঈশ্বর ধৌতবস্ত্রের ঘটিত অবস্থা। ধৌতবস্ত্রস্বরূপ চিৎ-ব্রহ্মে মায়ার মাড় দিয়া উচ্চ নীচ সমস্ত সমান করা অবস্থা এই ঘট্টিত ঈশ্বর উল্লাস। মায়ারাণীকে অব্যক্ত অবস্থায় দেখিয়া আপনাকে অন্যমত ভাবনা করাই ঈশ্বর অবস্থা।"

ধৌতবস্ত্র ঘট্টিত হইয়া দাঁড়াইলে তাহাতে যে চিত্রকরের এখানে ওখানে রেখাপাত তাহাই লাঞ্ছিত উল্লাস। ঈশ্বর মায়ারাণীকে ঈক্ষণ করিতে করিতে যে সঙ্কল্পের রেখাপাত করেন তাহাই দ্বিতীয় উল্লাস—তাহাই মহামন—তাহাই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা প্রজাপতি। তখনও স্থূল কিছুই নাই। হিরণ্যগর্ভ শুধু ভাবনাময় শুধু আতিবাহিক। হিরণ্যগর্ভ যিনি তিনিই সূক্ষ্মদেহধারী, আতিবাহিকদেহধারী ঈশ্বর। ইনিই যখন স্থূলদেহ ধারণ করেন, তখন ইনি বিরাট পুরুষ। ইহা

হইতেছে ধৌতবস্ত্রের রঞ্জিত অবস্থা। ইহাই ধৌতবস্ত্রের বিচিত্র ছবি অঙ্কিত অবস্থা।

দেহদ্বয়মদেহস্য তব বিশ্বং রিরিক্ষিষোঃ।
বিরাট্ স্থূলশরীরং তে সূত্রং সূক্ষ্মমুদাহৃতম্॥

আদি নারায়ণ মহাবিষ্ণু, সগুণঈশ্বর, অন্তর্যামী ইঁহারা একই। বিষ্ণুং ব্যাপনশীলং ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্যং ব্রহ্ম ইতি। অব্যক্ত ইনি অব্যক্ত মায়ার পরিবেষ্টিতা। ভাবিজগতে যাহা কিছু আসিবে সেই সমস্তকে অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবেন এই বেষণ-শীল বিষ্ণু।

সর্ব্বব্যাপী এই নারায়ণ ব্যাপক বস্তু। কাজেই ইনি অদেহ। অদেহ বলিয়াই সজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত এই ত্রিধা ভেদশূন্য ইনিই।

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎসর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥

অদেহ হইয়াও এই ঈশ্বর বিশ্বরক্ষার জন্য দুইটি দেহ ধারণ করেন। সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর আর বিরাট্ হইতেছেন তাঁহার স্থূলদেহ।

ব্রহ্মের শেষ উল্লাস হইতেছে অবতার। সমস্ত অবতার, এই "সহস্র শীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ বিরাট্ পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত।

বিরাজঃ সম্ভবন্ত্যেতে অবতারা সহস্রশঃ।
কার্য্যান্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন॥

সহস্র সহস্র অবতার এই বিরাট্ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়েন। অবতারের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে ইঁহারা সেই বিরাট্ দেহে পুনঃ প্রবেশ করেন।

উল্লাস—ব্রহ্মের উল্লাস চিতের উল্লাস তবে (১) অন্তর্য্যামী ঈশ্বর—(২) মহামন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা (৩) বিচিত্রসৃষ্টিবিশিষ্ট বিরাট্ এবং

(৪) পরম রমণীয় দর্শন রাম কৃষ্ণাদি অবতার। ব্রহ্মের অসত্য উল্লাসের কথা বলা হইল। আর জীবের উল্লাস?

স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতে জীবের যে উল্লাস তাহাই যথার্থ উল্লাস—আর বাহিরের প্রকৃতি ভোগ করিতে যে উল্লাসমত অবস্থা তাহা পুনঃ পুনঃ জননমরণের উল্লাস—অকথ্য যাতনা পাইবার প্রলোভনের উল্লাস মাত্র।

জীবের ঊর্দ্ধ উল্লাস—সত্য উল্লাস দেখাইবার পূর্ব্বে আর একবার অল্প কথায় সৃষ্টির কথাটা বলা হউক তারপরে জীবের উত্তম, মধ্যম, অধম অবস্থা দেখান যাউক পরে অধম অবস্থা হইতে ঊর্দ্ধ উল্লাসের কথা বলা যাইবে।

অব্যক্তনামরূপ পরমব্রহ্ম হইতে নামোল্লেখের অযোগ্য কোন স্পন্দন, কোন চলন, কোন কম্পন স্বভাবতঃ উঠে। এই স্পন্দনই সর্ব্বপ্রপঞ্চ বীজ। কল্পারম্ভসম্বন্ধীয় পরিণামে নিতান্ত সূক্ষ্ম—নামোল্লেখের অযোগ্য ঐ স্পন্দনই আপনি আপনি ঘনতা প্রাপ্ত হইয়া—নিবিড় হইয়া—সঙ্কল্পবিকল্পশক্তিমৎ মনোরূপে পরিণত হয়। এই মনই মহামন—ইনিই হিরণ্যগর্ভ। মহামন বা হিরণ্যগর্ভপুরুষ আপনাতে পঞ্চতন্মাত্রা বা সূক্ষ্মভূতের কল্পনা করেন—"যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" করিয়া তদ্বারা আপনার স্বাপ্ন শরীরের ন্যায় বাসনাময় শরীর কল্পনা করেন। এই তেজঃপ্রধান—তৈজসপুরুষ আপনার নাম কল্পনা করেন পরমেষ্টী ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই মহামন। জীবের মনই সৃষ্টিকর্ত্তা জীবব্রহ্মা। মহামন যাহা সংকল্প করেন তাহা দেখিতে পান। ইনি সত্যসংকল্পপুরুষ। জীবও সত্যসংকল্প হইতে পারিলে আপনার কল্পিত সৃষ্টি দেখিতে পান।

এই মন দ্বারাই অনাত্মায় আত্মাভিমানরূপিণী অবিদ্যার কল্পনা হয়। সেই অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মা এই জগতপ্রপঞ্চ রচনা করেন।

জীবের উত্তম, মধ্যম, অধম অবস্থা এখনও দেখা যায়। কাহারা এইরূপ—শাস্ত্র তাহাই দেখাইতেছেন।

(১) পূর্ব্ব কল্পীয় শেষ জন্মে যাঁহারা শম দম সাধনা করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা মনের নিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ সাধিয়াছেন কিন্তু মোক্ষ-দাতা গুরু লাভ করিতে পারেন নাই অথবা অন্য প্রতিবন্ধক থাকায় তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেইরূপ সাধক এতৎ কল্পের প্রথম জন্মেই জ্ঞানলাভের যোগ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইহাই উত্তম জন্ম। উত্তম জন্ম পাইলে এই জন্মেই লোকে সংসারমুক্ত হয়।

(২) বৈরাগ্যের অল্পতাবশতঃ শুভ লোক প্রাপ্তির ইচ্ছায় সাধক যখন উপাসনাদিতে নিযুক্ত থাকেন এবং তজ্জন্য বিচিত্র সংসার বাসনা তাঁহার সঞ্চিত হয় এইরূপ হইলে সাধককে পরে পরে কতিপয় শত জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে বাসনা ক্ষয়ের পরে সংসার মুক্তি। এইরূপ জন্ম মধ্যম।

(৩) যে জন্ম দুর্ব্বাসনা ও দুষ্কর্ম্মবহুল—যে জন্ম বিচিত্র সংসার বাসনাযুক্ত ও সহস্র সহস্র জন্মের পরে জ্ঞানপ্রদ তাহাই অধম জন্ম।

কিন্তু যে সমস্ত জন্ম অত্যন্ত শাস্ত্রাদিবহির্ম্মুখ আর অসংখ্য জন্ম লাভের পরেও মোক্ষ সন্দিগ্ধ তাহা নিতান্ত তামস জন্ম।

পৃথিবীতে উত্তম মধ্যম অধম ও অধমাধম এইরূপ মানুষই দেখা যায়। জীবের উল্লাসের কথা এখন আমরা কহিব।

মিথ্যা লইয়া ব্রহ্মের উল্লাস ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি কিন্তু সত্য ধরিয়াই জীবের উল্লাস। ব্রহ্ম মিথ্যা ধরিয়া খেলা করেন—করিয়া এই বিচিত্র সৃষ্টি করেন আর জীব সত্য ধরিয়া এই মিথ্যা খেলা শেষ করিয়া স্বরূপপ্রাপ্ত হয়।

মিথ্যা খেলা ভাঙ্গিবার ক্রম হইতেছে—

(১) কর্ম্মদ্বারা সত্যের পূজা।

(২) এইরূপ কর্ম্মে ভক্তি লাভ।

(৩) ভক্তির পরে জ্ঞান।

(৪) জ্ঞানের পরে মুক্তি।

ইহার পরের দুই প্রবন্ধে সাধনার কথা কতক কতক আলোচনা করা যাইতেছে।

কে তুমি—কি আমি ?

তুমি—অনাদি কারণ   সৃজন পালন
বিশ্ব তোঁহে রয় মিশিয়া ;
আমি—বুদ্ বুদ্ মতন   তোমা লয়ে ভাসি—
আছি-আপনারে ভুলিয়া।
ওগো !—মায়াতীত তুমি   মায়া লয়ে সাথে
আছ মায়াজাল পাতিয়া
আমি মায়াধীনে ঘুরি   মিছে কেঁদে মরি
মায়াখেলা খেলি মাতিয়া।
প্রভু ! গুণাতীত তুমি   তবু গুণময়
আছ-বিরাট বিশ্ব ব্যাপিয়া,
আমি মোহের আঁধারে   তোমাকে হারাই
তোমারই হৃদয়ে থাকিয়া।
ওগো !—আমিঅন্য হব   খেলার উল্লাসে
থাক-আপনিই বহু সাজিয়া
তবে—তোমারই আমি   আমারই তো তুমি
কেন—ঘুরে মরি ভেদ ভাবিয়া।
এযে—তোমার পরশ   জাগায় হরষ—
অলক্ষ্যে অন্তর মাঝারে
আমি—ধরি ধরি যেন   পাইনা ধরিতে
সখা—কেমনে পাইব তোমারে।
আমি—তোমারই কণা   তব করুণায়
জেনেছি এবার তোমারে,
ওই—নীলাম্বুর বক্ষে   ক্ষুদ্র জলবিন্দু
মিশাইয়া লহ এবারে।

ওগো—মমতার পাশ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে
বসগো হৃদয় আসনে
মোর—পরাণের প্রিয় জীবনের সাথী
এস—এস আজি গোপনে।
ওগো—নিমিষের তরে দেখা দিয়ে যেন
যেও নাকো পুনঃ সরিয়া,
আমি—আমিত্ব সঁপিয়া ও রাঙ্গা চরণে
পড়ি চিরতরে লুটিয়া ॥

তুমি কি দেখ ?

তুমি কি দেখ—আমি কি করি, কি ভাবি, কি বলি ? স্থির হইয়া, শান্ত হইয়া যখন এই চিন্তা করি তখন কি এক ভাবে যেন আক্রান্ত হই। আহা! যদি সর্ব্ব ব্যাপারে এইটি মনে রাখিতে পারি তখন মনে হয় আমার সকল কাজেই যেন তোমার সাড়া পাই।

তুমি ত আছই। তোমার সাড়া পাওয়াই আমার ভরিত হইয়া যাওয়া। তুমি যে কে, একথা যেন আর আলোচনা না করিলেও চলে। তুমি আমারই পূর্ণত্ব। তুমি খণ্ডের অখণ্ডভাব। তুমি আত্মতত্ত্বেরই শিবতত্ত্ব।

তুমি কি দেখ আমি কি করি ইহার উত্তর ত সহজ। অংশ কি করে, পূর্ণ কি তাহা দেখেন না ? খণ্ড কি করেন অখণ্ড কি তাহা জানেন না ? ব্যষ্টি কি করে সমষ্টি কি তাহা জানেন না ? মানুষ কি করে অন্তর্য্যামী ঈশ্বর কি তাহা দেখেন না ? আমাকে লইয়াই না তুমি পূর্ণ ? আমাকে লইয়াই না তুমি সমষ্টি ? আমাকে লইয়াই না তুমি বিরাট, তুমি হিরণ্যগর্ভ তুমি ঈশ্বর ? আরও অনেককে তুমি ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছ সত্য, আমার তাহাতে বিশেষ প্রয়োজন না থাকিতে পারে।

আমার দিকে চাহিয়াই তোমাকে বলি—আমি এই যে কত সময় কি ভাবি—কখন রুষ্ট, কখন তুষ্ট, কত কি হই তাহা কি তুমি ?

যখন এক কাজ করিতে গিয়া অন্য কত কি ভাবি তখন যদি মনে এই যে কি করিতে আসিয়া কি করিতেছি তাহা কি তুমি দেখিতেছ খন বলিতে পারিতেছি তাহা কি দেখিতেছ—তখন তোমার সাড়া , তখন বুঝিতে পারি নিশ্চয়ই তুমি দেখিতেছ। তখন কত লজ্জিত । বাজে চিন্তা তখন আর হয় না। তখন তোমার কাজ যেন মার দিকে চাহিয়া চাহিয়া করিতে পারি। তখন যে তোমাতে ভরিত য়া কর্ম্ম করি, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তোমার কর্ম্ম করা যায়। অহং অভিমান যেন তখন থাকেনা—কর্ম্ম হইয়া তেছে আমি যেন আর কোথাও আছি। কর্ম্মে তখন অকর্ম্ম া হয় অকর্ম্মেও তখন কর্ম্ম দেখা হইয়া যায়। তুমি কি দেখ— ভাবনার অভ্যাস আমার পক্ষে যেন উৎকৃষ্ট সাধনা। অন্যে ভাবে ইহা গ্রহণ করিবে জানিনা, জানিতে চাইওনা।

তুমি কি দেখ ? ইহা মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে বুঝি র্ম্মের কোন কিছুরই ভুল হয় না। ঐ যে যখন উৎপীড়িত হইয়া মন করিতে গেলে অভ্যাসবশে কর্ম্ম করে বটে কিন্তু তাহাতে যেন রস না, আবার সময়ে সময়ে বিক্ষেপের বেগে "মার্জ্জন" কি করা হইয়াছে ভ্যাস' বুঝি করা হয় নাই—অথচ অভ্যাসবশে সব করা হয়—এই এইরূপ বিস্মৃতি—ইহা আদৌ হইতে পারেনা---যখন মনে থাকে তুমি তেছ। এই যে অধিক সংখ্যায় কর্ম্ম করিতে করিতে মনে হয় বুঝি কর্ম্ম করা যাইবেনা —এত সময় পর্য্যন্ত এইভাবে কর্ম্ম করা বড় কর—এইরূপ কর্ম্মের ক্লেশও বুঝি থাকে না যদি মনে রাখিতে পারা তুমি দেখিতেছ। তুমি দেখিতেছ ইহা মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিতে রিলে কর্ম্মে কোন ক্লেশই থাকিতে পারেনা। তুমি দেখিতেছ ইহা রাখিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে দৃষ্টি থাকে তোমার দিকে—তাহাতে

তোমার সাড়ায় মন তোমাতে ভরিয়া যায়, কর্ম্মে তখন অকর্ম্ম দেখা হইয়া যায়। তখন কর্ম্মের ক্লেশ আর অনুভব করিবে কে? শ্রীগীতা বুঝি ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"— যত অল্পই হউক তোমার সাড়া পাইলে সংসারভয় থাকিতেই পারে না।

তুমি দেখিতেছ মনে রাখিতে পারিলে তোমার সাড়া পাওয়া যায়— কিরূপে পাওয়া যায় একথা আর লেখা হইল না। যিনি বুঝেন তাঁহার পক্ষে ইহার অভ্যাস করা উচিত।

শোকের সময়েও যদি কেহ মনে করিতে পারেন—তুমি ত দেখিতেছ আমার শোক হইতেছে, তখন কি শোক থাকে? যদি শোক পূর্ব্ব সংস্কারবশে দূর করা নাও যায় তবে অন্ততঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে শোক সহ্য করিবার সামর্থ্য সেই দিয়া দেয়। প্রারব্ধভোগ ত সকলকেই করিতে হয় কিন্তু তুমি দেখিতেছ মনে করিয়া যে প্রারব্ধভোগ তাহাই প্রকৃত প্রারব্ধভোগ। অন্য যাহা তাহা নূতন কর্ম্মসঞ্চয় মাত্র। তুমি ত দেখিতেছ ইহা বলা অনুরাগেও হয়—বিশ্বাসেও হয়। নাস্তিকতার কুযুক্তিতে ইহা হয় না।

ঈশ্বরভাবনা—নিষ্কাম কর্ম্ম।

১

ঈশ্বর ভাবনা করিতে করিতে যদি কর্ম্ম করিতে পার তবে হয় নিষ্কাম কর্ম্ম। ঈশ্বর ভাবনা ভিতরে রাখিয়া—ঈশ্বরের প্রসন্নতা মনশ্চক্ষে দেখিতে দেখিতে যখন কর্ম্ম হয় তখন হয় নিষ্কাম কর্ম্ম। এই কর্ম্মে ফলাফলে লক্ষ্য পড়েনা—লক্ষ্য থাকে ঈশ্বরের প্রসন্নতার দিকে। এই কর্ম্মের পরিপক্ক অবস্থায় অহং কর্ত্তাতে অভিমান থাকেনা— মনে হয়—যাঁহার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে যাঁহার কর্ম্মে ছুটিতেছে তিনিই কর্ম্ম করাইয়া লইতেছেন। তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। তিনি বীর আমি

তাঁহার হাতের অস্ত্র। কাটিতেছেন তিনি, অস্ত্র সংহার করিতেছে অস্ত্রের এই অভিমান, বৃথা অভিমান।

কর্ম্ম এইভাবে করিতে যিনি অভ্যাস করেন তিনি কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন। এইজন্যই ঋষিগণ শাস্ত্রবাক্য বুঝাইয়া বলেন কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি হয়। তাঁহারা আরও বলেন ভক্তি দ্বারা জ্ঞান হয়; জ্ঞান হইলে তবে সংসারমুক্তি। নতুবা জয়বিজয় হইলেও পতন আছে।

ঈশ্বর ভাবনা করিতে না শিখিলে যখন নিষ্কামকর্ম্ম হইবেনা—নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করিতে না পারিলে যখন ভক্তি হইবেনা; ভক্তি বিনা যখন জ্ঞান হইবেনা আর জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুতেই যখন সংসারমুক্তি হইতেই পারেনা তখন ঈশ্বরভাবনাই সংসারমুক্তির প্রধান অবলম্বন।

ঈশ্বরের পরোক্ষ জ্ঞানের কথা শাস্ত্রমুখে ও সদাচারসম্পন্ন সাধুমুখে শুনিয়া রাখিতে হয়। সেই পরোক্ষ জ্ঞান অবলম্বনে ঈশ্বরভাবনা করিতে হয় এবং কর্ম্মের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হয়।

ঈশ্বর ভাবনার জন্য ঋষিগণ বহু উপায় করিয়া দিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, সমস্তই ঈশ্বরভাবনা কিরূপে করিতে হয় তাহার উপদেশ করিতেছেন। সর্ব্বশাস্ত্রের মূল হইতেছে শ্রুতি। শ্রুতিতে যাহা নাই তাহা হিন্দুশাস্ত্রের বাহিরের বস্তু। শ্রুতি এবং ঈশ্বর দুইকেই এক বলা হইয়াছে। যেমন ঈশ্বরে যাহা নাই তাহা অলীক, সেইরূপ বেদে যাহা নাই তাহা জগতের কোথাও থাকিতে পারেনা। তবু থাকে যদি বল তাহা অশ্বডিম্ব তাহা শশবিষাণ, তাহা মরুপ্রবাহিনী, তাহা রজ্জুসর্প, তাহা নাই তথাপি অজ্ঞানে মনে হয় আছে। এই অজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের প্রসবকর্ত্তা।

শ্রুতিই যখন ঈশ্বরভাবনার নিত্যপ্রবাহিত প্রস্রবণ, তখন শ্রুতিবাক্য ধরিয়াই ঈশ্বর ভাবনা করিবার কথা, যথাসাধ্য আলোচনা করা যাউক।

(২)

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ইদং সর্ব্বং এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে যাহা কিছু আছে—হইতেছে—হইবে বা হইয়াছিল এই সমস্তকে ঈশা ঈশ্বরেণ,

এই সমস্তকে ঈশ্বর দ্বারা বাস্যং আচ্ছাদয়িতব্যং আচ্ছাদন করা উচিত। যদি মৃত্যু-সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর তবে তোমার শেষকার্য্য হইবে সমস্তকে ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করা।

জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তকে ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন কর ইহাই এই শ্রুতি বাক্যাংশের অর্থ। ইহা প্রভুসম্মিত বাক্য।

প্রভুসম্মিতবাক্য যুক্তি দ্বারা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। যিনি সাধক—যিনি ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন করিতে ইচ্ছা করেন তিনি স্বভাবতঃই জানিতে চান সকল বস্তুকে ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন করিব কিরূপে? কিরূপে আচ্ছাদন করিব ইহার উত্তর দিবার প্রয়াস জন্য এই প্রবন্ধ।

"ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদন কর এই সমস্তকে" এই কথাতে জানিবার বিষয় হইতেছে ঈশ্বর কি—আচ্ছাদন করা কি—এই সমস্ত কি।

প্রথম আচ্ছাদনের কথাই লওয়া যাউক। বৃহৎ বস্তুই ক্ষুদ্র বস্তুকে আচ্ছাদন করিতে পারে। ব্যাপক যাহা তাহাই ব্যাপ্যবস্তুকে আচ্ছাদন করে। ঈশ্বর দ্বারা জগতের সমস্ত বস্তুকে আচ্ছাদন করিতে হইলে জানা যাইতেছে ঈশ্বর বৃহৎ, জগৎ তাঁহার সম্বন্ধে ক্ষুদ্র।

হৃদয়পদ্মে যে ঈশ্বরের ধ্যান কর তাঁহাকে কখন বৃহৎ ভাবে দেখিয়াছ কি?

যে সূর্য্যকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখ তাঁহাকে কখন বৃহৎভাবে দেখিয়াছ কি? কখন ভাবিয়াছ কি একই সূর্য্যকে সকলদেশের নরনারী নিজের চক্ষের নিকটে দেখিতেছে কিরূপে?

বিজ্ঞান বলিয়া দিতেছে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়। কখন বড় করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছ কি?

ক্ষুদ্রায়তন মানুষের চর্ম্মচক্ষে কিন্তু সূর্য্যকে বড় করিয়া দেখা যায় না। চর্ম্মচক্ষের উপরে একটি মানস চক্ষু আছে। সেই চক্ষে সূর্য্যকে বড় করিয়া দেখা যায়।

তুমি ভাবনা কর দেখি এই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড় একটি

জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বহু উর্দ্ধে শূন্যে ঝুলিতেছে। এই জ্যোতির্ম্ময় বস্তুটি যখন পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড় তখন পৃথিবীর নর নারী যেখানেই থাকুক না কেন সর্ব্বস্থান হইতেই সূর্য্যদেবকে দেখিতে পাইবেন। আর সকলেই যে একভাবে দেখেন তাহার কারণ সকলেই সমান দূর হইতে দেখিতেছে।

এই স্থূল দৃষ্টান্তে বলা হইতেছে হৃদয়গুহাশায়ী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে ভাবনা কর ইনিই বিরাট পুরুষ। অজ্ঞানটাই দূর। দূরঅজ্ঞানের চক্ষে দেখ বলিয়া ক্ষুদ্র মনে হয়। নতুবা ইনি ক্ষুদ্রমত দেখা গেলেও ইনিই ব্রহ্ম, ইঁহা অপেক্ষা বৃহৎ আর কিছুই নাই। অন্তরীক্ষমণ্ডল ইঁহার নাভিদেশ, বিশ্বভূতসকল ইঁহার পাদদেশে। এক বিরাট ইষ্ট-দেবতা পৃথিবীতে চরণ রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মস্তক ইঁহার জ্যোতির্ম্মণ্ডিত স্বর্গলোক, নাভিদেশ ইঁহার এই মহান্ অন্তরীক্ষমণ্ডল, পাদদেশে এই বিপুলা পৃথ্বী। পদতলে পাতালপ্রদেশাদি।

যদি এই বিরাটপুরুষের ভাবনা করিতে পার তবে মনে মনে দেখিতেও পাও—হৃদয়ে যাঁহার ধ্যান কর তিনিই সর্ব্বত্র বিরাজ করেন। যখন ইনি সর্ব্বত্র বিরাজিত তখন ইনি ব্যাপক—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এইটি স্থূল কথা। এখন একটু সূক্ষ্মভাবে ঈশ্বরের সম্বন্ধে আলোচন করা যাউক।

(৩)

সৎচিৎআনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম—অন্তর্যামী ঈশ্বর—মহামন বা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা প্রজাপতি এবং বিরাটপুরুষ—ব্রহ্ম, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এই চারিটির চৈতন্য হইতেছেন স্বরূপ, আর স্বরূপে ইঁহারা একই বস্তু। ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট—উপাধিভেদে ইহাদের পার্থক্য।

সৃষ্টিতত্ত্বের কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনাই আবশ্যক। সেই জন্য প্রথম প্রবন্ধের কথা ধরিয়া আর একবার আলোচনা করা যাউক।

চিৎ হইতেছেন ব্রহ্ম। ধৌতবস্ত্রের সহিত ইঁহার তুলনা হয়। ধৌতবস্ত্র মাড়যোগে ও উচ্চনীচ সম্মার্জ্জন করিলে যাহা হয় তাহা ঘট্টিত

অবস্থা। ব্রহ্ম মায়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া হয়েন—অন্তর্যামী ঈশ্বর। ইনি মায়াকে নিয়মিত করেন এবং মায়ার ভিতরে যাহাকিছু তাহাকে বশে রাখিয়া ইনিই মায়াধীশ ঈশ্বর। এই মায়াধীশ ঈশ্বর হইতে প্রথম বিবর্ত্ত হইতেছেন মহামন বা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মাপ্রজাপতি। ধৌতবস্ত্রের লাঞ্ছিত অবস্থার সহিত ইঁহার তুলনা হয়। শুভ্র ঘট্টিতবস্ত্রের উপরে রেখাপাত হইলে হয় লাঞ্ছিত অবস্থা। মনই মায়াশবলিত ঈশ্বরে সঙ্কল্প বিকল্পের রেখাপাত করেন। পটের শেষ অবস্থার নাম রঞ্জিত অবস্থা। এখানে পটের উপরে স্পষ্টছবি ভাসিতে সকলে দেখে। ইহাই বিরাট পুরুষের বিরাটমূর্ত্তি।

বায়স্কোপের ক্যানভাসের উপরে নানাবিধ ছবির খেলা হইতেছে। এত ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে যে ক্যানভাসে আর লক্ষ্য থাকে না। মানুষ ছবি দেখিতে দেখিতে আর সব ভুলিয়া যায়। মায়াশবলিতব্রহ্ম এই বিচিত্র জগতের বিচিত্র খেলা দেখিতে দেখিতে মানুষ ব্রহ্ম বস্তুটি ভুলিয়া যায়। ভুলিয়া মায়াতরঙ্গে কখন ভাঙ্গে, কখন ভাসে, কখন হাঁসে, কখন কাঁদে। ইহাই সংসার।

এখন দেখ ঈশ্বর দ্বারা জগতের এটা ওটা, সেটা ঢাকা যায় কিরূপে? ইহার পূর্ব্বে চিৎ কিরূপে ঈশ্বরভাবে আইসেন, মায়া কোথা হইতে আইসেন তাহারও একটু আলোচনা আবশ্যক। পরে বাস্যং আলোচনা করা যাইবে। চিৎ বস্তুর উপরে মায়া ভাসেন। যদি জিজ্ঞাসা কর মায়া আসে কোথা হইতে? শুভ্র ধৌতবস্ত্রে মায়ার মাড় পড়ে কিরূপে? চিৎ এর স্বভাব আলোচনা কর উত্তর মিলিবে। চিৎ-এর দ্বিবিধ স্বভাব। স্পন্দ ও অস্পন্দ। অস্পন্দ স্বভাবে চিৎ সম্পূর্ণ চলনরহিত সচ্চিদানন্দ। কিন্তু স্পন্দস্বভাবে চিৎ চেত্যতা যেন প্রাপ্ত হয়েন—বহির্ম্মুখতা যেন প্রাপ্ত হয়েন। চিৎ এর মধ্যে যে স্পন্দন কম্পন, চলন উঠে তাহাই মায়া, তাহাই আদিকর্ম্ম। ব্রহ্ম অনাদি বলিয়া এই কম্পন অনাদির আদি। শব্দ হইতে এই জগৎ উঠিয়াছে শাস্ত্র ইহা বলেন। এই শব্দ কিন্তু যে স্থূলশব্দ আমরা শুনি সে শব্দ নহে।

ইহা শব্দতন্মাত্রা। স্থূলশব্দরাশির ভিতরে একটি আপাতস্থির কম্পন আছে। সেই কম্পনের জ্যোতিঃ অতি অদ্ভুত। সাধনা দ্বারা স্থূলশব্দ-রাশি ভেদ করিয়া যিনি সেই স্তিমিত গম্ভীর স্পন্দনে পৌঁছিতে পারেন তিনি যাইবার পথে শত সৌদামিনীর চমক দেখিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হয়েন।

স্পন্দন স্বভাব। স্বভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। স্বভাব স্বভাবই। স্বভাবের আর কারণ নাই। স্বভাব নিষ্কারণ।

এখন শেষ কথা। ঈশ্বর দিয়া আচ্ছাদন করি কিরূপে ইহাই না প্রশ্ন?

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং" শুনিতে বুঝিতে বেশ কিন্তু করিতে ভারি সাধনার প্রয়োজন।

ভিতরে যে যাহা লইয়া থাকে বাহিরে তাহার দ্বারাই অন্য সকলকে আচ্ছাদন করিতে পারে। ভিতরের বস্তুটিই বাহিরে আসিয়া জগৎ আচ্ছাদন করে। ভক্তিমার্গে যাঁহা যাঁহা নেত্রে পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে এ হয় কখন, না যখন কৃষ্ণ অনুরাগে চিত্তেতে সর্ব্বদা কৃষ্ণ লইয়া থাকা হয়। জগতের সকলবস্তুকে তুমি ভাবিয়া নিরন্তর প্রণাম করা যায়, কখন, না যখন ভিতরে প্রণামটি সর্ব্বদা অভ্যাস চলে। ইহা হইল উপাসনার কথা। উপাসনার শেষফল নিরন্তর চৈতন্যসঙ্গ। ভিতরে যিনি নিরন্তর চৈতন্যসঙ্গ করিতেছেন তিনি বাহিরে যদি আসেন তবে সেখানেও ভিতরের চৈতন্য সব ছাইয়া আছে দেখিবেনই। যেমন স্থির সমুদ্র যিনি নিরন্তর ভাবিতে পারেন তিনি তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে তরঙ্গ না দেখিয়া স্থির সমুদ্র দ্বারাই সমস্ত আচ্ছাদিত দেখিবেন সেইরূপ। তাই বলা হইতেছে "আমি তোমার" সাধনা করিতে করিতে যিনি কর্ম্ম, বাক্য ও ভাবনা দিয়া তাঁর উপাসনা করেন তিনিই "তুমি আমার" সাধিয়া "তুমি আমি" একের সাধনায় ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং দেখিতে সমর্থ। নতুবা সব মৌখিক স্বরূপ ধরিয়া "ঈশাবাস্যের" সাধনা বলা হইল। কিন্তু ঈশ্বর সমকালে নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার। সেইজন্য আমরা ঈশ্বরের

নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও স্বরূপ এই সকল ভাবেই ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকি। নামের দ্বারাও ঈশাবাস্য করা যায়, রূপের দ্বারা ও হয়; শুধু নামরূপ কিন্তু নিম্ন অধিকারীর জন্য। স্বরূপে ঈশাবাস্যের কথাই শ্রুতি বলিতেছেন।

[শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ কর্ত্তৃক লিখিত।]

বর্ণবিবেক।

(পুনরাবৃত্তি)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বর্ণব্যবস্থিতিশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইলে হিন্দুজাতির যদি তাদৃশ উন্নতি হয়, তবে মন্দ কি? কিন্তু তাহা কি হইবে?

জিজ্ঞাসু—ইদানীন্তন শিক্ষিত হিন্দুসমাজ, হিন্দুজাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ হইলে অতিমাত্র সুখী হইবেন, ইহাঁরা ত ইহাই চান্। বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে কোন উপায়ে ধ্বংস করিতে পারিলেই ত ইহাঁরা কৃতকৃত্য হন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিরহিত হিন্দুসমাজ, ও ইংলিশাদিজাতি এতদুভয়ের মধ্যে তাহা হইলে ইতরব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম থাকিবে না, তাহা হইলে একাকার হইয়া যাইবে, একজাতি পরিণাম হইবে, 'আমরা কেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অর্দ্ধসভ্য বা অসভ্যহিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, কি নিমিত্ত অভ্যুদয়শীল সুসভ্য য়ূরোপে, আমেরিকাতে, অন্ততঃ জাপানে জন্মিতে পারি নাই, অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী, শিক্ষিত হিন্দুসমাজকে তাহা হইলে, আর এই প্রকার অনুতাপ করিতে হইবে না।

বক্তা—তুমি যাহা মনে করিতেছ, তাহা কি হইবে? সর্ব্বতোভাবে একাকার হইবে না, দৈশিকপ্রকৃতিভেদবশতঃ আকৃতিগত পার্থক্য থাকিবেই, লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহের (Astral body) সংস্কার বা বাসনানুসারে স্থূল দেহের পরিণাম হইয়া থাকে, লিঙ্গশরীরই মানুষকে

মানুষ করে, লিঙ্গ শরীরই মানবকে মানবীয় আকারে পরিণত করে, মানবোচিত বুদ্ধিযুক্ত করে, লিঙ্গশরীরই ব্যক্তিগত মানবীয় অস্তিত্বের নানাবিধত্বের কারণ, এই অতীব সূক্ষ্মতথ্য ইদানীন্তন ভারতবর্ষীয় যথোক্ত শিক্ষিত পুরুষগণের অসভ্য স্বার্থপর ব্রাহ্মণদিগের সনাতন বেদ-শাস্ত্র-প্রসাদে লব্ধ সামগ্রী বলিয়া বিশেষতঃ লক্ষ্যীভূত না হইলেও, উপেক্ষিত থাকিলেও, মনে রাখিও, ইহা বস্তুতঃ পরম হিতকর সত্য, রিচমণ্ড প্রভৃতি সূক্ষ্মচিন্তাশীল বিজ্ঞানকুশল কবিগণের নয়নে এ সত্য পতিত হইয়াছে। রিচমণ্ডের কথা স্মরণ কর। *

জিজ্ঞাসু—কেন হইবে না? বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে বাদ দিলেই ত হিন্দুজাতির সহিত অন্যান্য জাতির পার্থক্য বিদূরিত হইবে। লিঙ্গ শরীরের বাসনা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, অতএব উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ নিষ্কণ্টক হইবে।

বক্তা——তাহা হইবে না, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও, আন্তর ও বাহ্য বর্ণগতভেদ থাকিবে, ঠিক এক আকার হইবে না, একবর্ণীভূত হইবে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিরহিত হিন্দুজাতি ও ইংলিশাদিজাতি এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে কিনা, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রথমে হিন্দু ও ইংলিশাদিজাতির স্বরূপদর্শন করিতে হইবে। ভারতবর্ষেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের জন্মাদি ষড়্ভাববিকার হইয়া থাকে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ভারতবর্ষের ন্যায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রবৃত্তি কদাচ পরিদৃষ্ট হয় নাই, কদাচ হইবে না। বলিতে পার, ভারতবর্ষে বৈদিক আর্য্যজাতির বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রবৃত্তি হইয়াছিল, অন্যদেশে অন্য কোন জাতির বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রবৃত্তি হয় নাই কেন? ভারতবর্ষীয় বৈদিক

---

* "The Astral, or the Astral body as it is sometimes called, is the spiritnal entity, the Ego, the real personality, the I am that has lived in the past for ages and ages, and has gained the present power, knowledge, experience and general status as an individual being by the experience gained in the past"—Religion of the Stars P. 300-301.

আর্য্যজাতিতে যে এই অসাধারণ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার কি কোন কারণ নাই? ইহা কি সাময়িক? বৈদিক আর্য্যজাতি ইচ্ছা পূর্ব্বক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা এ জাতির বিশিষ্ট আন্তর ও বাহ্য প্রকৃতি ইঁহাকে বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট করিয়াছিল? বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অহিতকারিতা বুঝাইবার নিমিত্ত বহুব্যক্তি সচেষ্ট হইয়াছেন, অনিষ্টকর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল উৎপাটিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, কিন্তু যাহা অন্য জাতিতে নাই, এই ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতিতে তাহা থাকে কেন, কোন সত্যানুসন্ধিৎসু, চিন্তাশীল, সুশিক্ষিত পুরুষ তাহা চিন্তা করিয়াছেন কি? তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ক্রমবিকাশ বাদীদের (Evolution Theory) ইহা কি অনুসন্ধান যোগ্য বিষয় নহে? জাতির স্বরূপ কি জাত্যন্তর পরিণাম প্রকৃতির আপূরণ হইতে হইয়া থাকে, অথবা নিষ্কারণ হয়? বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিলে হিন্দুজাতি ইংলিশাদি জাতিতে পরিণত হইবে কি না, হিন্দুজাতির ইংলিশাদি জাতির ন্যায় উন্নতি হইবে কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে, যে কারণে বৈদিক আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্য জাতিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হয় নাই, জাত্যন্তর পরিণাম কোন্ নিয়মানুসারে হইয়া থাকে, এই সমস্ত বিষয়ের সম্যগ্ রূপে আলোচনা করিতে হইবে। অপিচ, প্রকৃত উন্নতির স্বরূপ কি উন্নতিস্রোতস্বিনী কোন্ মহাসাগরে উপনীত হইলে, কৃতার্থ হয়, আপ্ত কামের ন্যায় প্রশান্তভাবে অবস্থান করে, তাহাও চিন্তা করিতে হইবে। যে সকল হিন্দুগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত অভ্যুদয়শীল ইংলিশাদি জাতির তুলনা করিলে, কি শিক্ষা লাভ হয়? অপেক্ষাকৃত উন্নতম্মন্য শিক্ষিত হিন্দুবংশধরদিগের মধ্যে যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে হিন্দুজাতির অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে অনেকতঃ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। কেবল শিক্ষিত হিন্দুগণ কেন, যুগধর্ম্ম প্রভাবে এক্ষণে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত হিন্দুরাও ঠিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মরাজ্য এক্ষণে অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় প্রায়শঃ

প্রজাতন্ত্র হইয়াছে। শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত উন্নতম্মন্য হিন্দুসন্তান-গণের মধ্যে অনেকেই ইদানীং বিনাসংকোচে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার করিয়াছেন, স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন, নির্ভয়ে শাস্ত্রশাসন অতিক্রম করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে, বেদ এবং স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র সমূহকে অবজ্ঞা করিতে, বিশ্ব সুহৃদ ঋষি ও আচার্য্যদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে, এখন অত্যল্প ব্যক্তিরই হৃদয়ে ভয়ের উদয় হয়। উন্নতির ফল সুখ, স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দুগণ সুখী হইতে পারিয়াছেন কি? আশানুরূপ উন্নতি হইবার আশা হৃদয়ে স্থান পাইতেছে কি? বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অভাবই কি ইংলিশাদিজাতিত্বপ্রাপক কারণ? কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলেই কি বৈদিক আর্য্যজাতির ইংলিশাদি উন্নত জাতিতে পরিণতি হইবে? বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে ছাড়িলেই যদি ইংলিশাদি জাতির পরিণাম হইত, তাহা হইলে জাত্যন্তর পরিণাম প্রকৃতির আপূরণের আবশ্যকতা থাকিত না, যাহা আছে, তাহাকে ত্যাগ করিলেই যদি জাত্যন্তর পরিণাম হয়, তবে কোন কিছু গ্রহণের প্রয়োজন থাকে না। ধর্ম্ম উন্নতির, এবং অধর্ম্ম অবনতির কারণ। যে যে ধর্ম্মের গ্রহণ ও যে অধর্ম্মের ত্যাগ করাতে য়ুরোপ আমেরিকা ও জাপানের উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, য়ুরোপাদির ন্যায় উন্নতি করিতে হইলে, হিন্দুজাতিকে সেই সেই ধর্ম্মের গ্রহণ ও তত্তৎ অধর্ম্মের বর্জ্জন করিতেই হইবে, কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে না, স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দুজাতি ইংলিশাদিজাতির ন্যায় উন্নত হইবে না। স্বধর্ম্মত্যাগ অবনতিরই হেতু হইয়া থাকে, কদাচ উন্নতির হেতু হয় না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বৈদিক আর্য্যজাতির অসাধারণ ধর্ম্ম, বৈদিক আর্য্যজাতির স্বধর্ম্ম। সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে বিগুণ—কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেয়-স্কর, স্বধর্ম্মের (বৈদিক আর্য্যজাতির বেদবোধিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের) অনুষ্ঠান করিতে করিতে হিন্দুজাতির যদি নিধন প্রাপ্তি হয়, তাহাও মঙ্গলজনক, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ—অনিষ্টকর "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" গীতা (৩।৩৫)।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে ত্যাগ করিলেই যদি ইংলিশাদি জাতির পরিণাম হইত তাহা হইলে, জাত্যন্তর পরিণামে প্রকৃতির আপূরণের আবশ্যকতা থাকিত না। এতদ্‌বাক্যের আশয়।

জিজ্ঞাসু—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে অন্য কোন জাতির নাই, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম যে প্রাকৃতিক, তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। ধর্ম্ম উন্নতির এবং অধর্ম্ম অবনতির হেতু, সাধারণের সুখবোধ না হইলেও, ইহা যে সত্য তাহা নিঃসন্দেহ। অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে ত্যাগ করিলে, বৈদিক আর্য্যজাতির যে কল্যাণ হইবে না, আমার তাহা এক্ষণে বিশ্বাস হইতেছে, "স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে নিধনপ্রাপ্তিও কল্যাণকরী, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ" মহদনিষ্টজনক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই অতিমাত্র গম্ভীরাত্মক পরমহিতকর উপদেশ আপনার কৃপায় স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিতেছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সনাতন বেদমূলক, ইহা মানুষকল্পিত নহে, ইহা পরমেশ্বরের বিরাড্‌রূপ হইতে আবির্ভূত, অতএব ইহা বস্তুতঃ অক্ষয়, নিত্যধর্ম্ম, মানুষের চেষ্টায় এ ধর্ম্মের কি বিলোপ হইতে পারে? মানুষের ইচ্ছায় সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ধ্বংসপ্রাপ্তি হওয়া কি সম্ভরপর? কলিযুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী, আপনি এইরূপ কথা বলিলেন কেন? কলিযুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিলোপ হইবে, পুরাণাদি পাঠ করিয়াও তাহা অবগত হইয়াছি, কিন্তু মন জানিতে ইচ্ছা করে, সনাতন বেদবোধিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিলোপ কেন হইবে? যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি তখনই ধর্ম্মস্থাপনার্থ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হই" ভগবানের এই কথার কি ব্যভিচার হইতে পারে? বৈদিক আর্য্যজাতির বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিলোপ এযুগে অবশ্যম্ভাবী এই কথা যে মিথ্যা নহে, তাহাও অবিশ্বাস করিতে পারি না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে ত্যাগ করিলেই কি, বৈদিক আর্য্যজাতি ইংলিশাদি জাতিতে পরিণত হইয়া যাইবে? বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ছাড়িলেই এই দুর্গত অধঃপতিত, ইংলিশাদি জাতির ন্যায় অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী শিক্ষিত হিন্দুগণ উন্নত হইবেন কি না, স্বাধীন-

হইবেন কি না, সুখী হইবেন কি না, বহুবার এইরূপ প্রশ্ন মনে উঠিয়াছে, অদ্যাপি উঠিয়া থাকে, কিন্তু ইহার কোন প্রকার সমাধান করিতে সমর্থ হই নাই। আপনি বলিলেন, 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে ত্যাগ করিলেই যদি ইংলিশাদি জাতির পরিণাম হইত তাহা হইলে জাত্যন্তর পরিণামে প্রকৃতির আপূরণের আবশ্যকতা থাকিত না। আপনার এই কথার অভিপ্রায় কি, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—"যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়। আমি তখনই ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ হই" ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই কথার কদাচ ব্যভিচার হয় নাই, কদাচ হইবেনা, সত্যময় পরমেশ্বরের কথা কি মিথ্যা হইতে পারে? ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ ভগবানের অবতার বর্ত্তমান কালের কৃতবিদ্য পুরুষদিগের মধ্যে অনেকের সমীপে অসম্ভবরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ অসম্ভব নহে, ইহা সত্যের সত্য। ব্যাবহারিক বা জাগতিক ধর্ম্ম প্রবাহরূপে নিত্য, ইহা জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়্‌ভাববিকারাত্মক, তাহা তুমি অবগত আছ। সৃষ্টির পর লয়, এবং লয়ের পর আবার সৃষ্টি হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থার আগমন এবং ব্যক্ত অবস্থা হইতে পুনরপি অব্যক্ত অবস্থায় গমন করিয়া থাকে, অতএব প্রকৃতি পরিণামিনী। গুণত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হয়। তমোগুণের প্রাবল্যে কলিযুগ হইয়া থাকে, চতুষ্পাদ্‌ ধর্ম্মের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে হইতে এই তামস যুগে ধর্ম্মের এক পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অতএব এ যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিলোপ বা অন্তর্ধান অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্ম সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দ্বিবিধ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অসাধারণ ধর্ম্ম, ইহা বৈদিক আর্য্যজাতির বিশেষ ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অন্য জাতিতে পরিদৃষ্ট হয় না। বৃদ্ধ সূর্য্যারুণ কর্ম্মবিপাক নামক গ্রন্থে (বলা বাহুল্য, অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থেও) স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে, 'ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র। ভারতবর্ষ নবখণ্ডাত্মক। নবখণ্ডাত্মক ভারতবর্ষের কুমারিকাখণ্ডেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্যবস্থিতি আছে.

এই কুমারিকাখণ্ডেই পূর্ব্বপুণ্যাতিশয্যনিবন্ধন জাতিস্মর পুরুষবৃন্দের জন্ম হইয়া থাকে। অন্য কোন খণ্ডে বর্ণব্যবস্থিতি নাই। অন্য কোন খণ্ডে জাতিস্মর পুরুষগণের আবির্ভাব হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মরণ হইতে পারে, অন্য কোন দেশে কেহ তাহা অদ্যাপি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ পুরুষ অন্যদেশে আছেন কি না, তাহা বলিতে পারিনা, যদি থাকেন, তবে তাদৃশ পুরুষগণের সংখ্যা স্বল্প, তাহা স্থির। *

জিজ্ঞাসু—ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র হইল কেন? কর্ম্মভূমি কাহাকে বলে? ভারতবর্ষ বলিতে আমরা এক্ষণে যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা এবং বৃদ্ধ সূর্য্যারুণ নামক কর্ম্মবিপাক গ্রন্থে ও পুরাণাদি শাস্ত্রে যে ভারতভূমির বর্ণন আছে, যে ভারতভূমিকে নবখণ্ডাত্মক বলা হইয়াছে তাহা কি এক? কুমারিকাখণ্ডেই বর্ণব্যবস্থিতি থাকিবার কারণ কি? প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে নিরত, পাশ্চাত্য কোবিদগণ বহুগবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন ভারতবর্ষ আর্য্যজাতির আদিবাসস্থান নহে, আর্য্যগণের

---

* "কিরাতা যস্য পূর্ব্বেঽন্ত্যে পশ্চিমে যবনা স্মৃতাঃ।
উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্॥
বর্ষং ভারতং নাম কর্ম্মক্ষেত্রং ভুবি স্থিতং।
শুভাশুভানি কর্ম্মাণি তস্মিন্ বীজানি চাণ্ডজ॥
সুখস্বর্গাপবর্গাণাং প্রাপ্তি পুণ্যফলং স্মৃতম্।
তির্য্যঙ্নরকদুঃখানাং ভোগঃ পাপফলং তথা॥
পূর্ব্বাদিকৃক্রমাদৈন্দ্রং তাম্রপর্ণং গভস্তিমান্।
বারুণং খণ্ডকং তস্মিন্ গান্ধর্ব্বমথ নাগকম্॥
সৌম্যং কশেরুখণ্ডং স্যাদেষু সর্ব্বেঽন্ত্যজাঃ স্থিতাঃ।
মধ্যে কুমারিকাখণ্ডমত বর্ণব্যবস্থিতিঃ॥
জাতিস্মরাণাং সততং প্রসূতিরিহ জায়তে।
পূর্ব্বপুণ্যবশেনৈব কদাচিদ্ গরুড়াগ্রজ।
এতত্তে সমাখ্যাতং কর্ম্মক্ষেত্রং হি ভারতম্॥"—বৃদ্ধসূর্য্যারুণকর্ম্মবিপাক।

একদল মধ্য আশিয়া হইতে ভারতবর্ষে বাস করিয়াছে। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে কি আর্য্যদিগের বর্ণ-ব্যবস্থিতি ছিল না? কুমারিকা ও বর্ত্তমান ভারতবর্ষ কি একদেশ? কুমারিকাতে আসিবার পর কি বর্ণব্যবস্থিতি হইয়াছে? উন্নতম্মন্য আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুবংশধরদিগের দৃষ্টিতে সর্ব্বানিষ্টের মূল এই বর্ণভেদব্যবস্থা কল্পিত হইয়াছে?

বক্তা—এই সকল জানিবার বিষয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু এখন আমি তোমার এই সমস্ত প্রশ্নের সমীচীন উত্তর দিতে পারিব না। অথর্ব্ববেদ সংহিতাতে 'নবভূমীর' কথা আছে; অথর্ব্ববেদে 'নবভূমী' এই শব্দ দ্বারা বর্ত্তমানকালে প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়াছেন কি না তাহা বলা যায় না। সায়ণাচার্য্য অথর্ব্ববেদের ভাষ্যে 'নবভূমী' শব্দের নবখণ্ডাত্মক পৃথিবী এই অর্থ আর্য্যজাতির স্বাভাবিক, যাঁহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, মানুষ কর্ম্মানুসারে (যাবৎ মোক্ষপ্রাপকজ্ঞানের আবির্ভাব না হয়) উচ্চাবচ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে বৈদিক আর্য্যজাতির ইহা ইতরজাতি ব্যাবর্ত্তক সহজ সংস্কার। ঋগ্বেদে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে, "যাহারা দেব, পিতৃ ও মনুষ্যদিগের উপকার করে না, ইহলোক ব্যতীত লোকান্তর নাই যাহাদের এইরূপ বিশ্বাস, যাহারা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করে না, যাহারা তপশ্চরণে বিমুখ, তাহারা নাস্তিক, তাহারা অনার্য্য, তাহারা যে দেশে বাস করে সেই দেশ কীকট ("কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্ম। * * ঋগ্বেদসংহিতা ৩।৩।২১৪)। ঐতরেয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, যাহারা আসন্নচেতন, স্থূল প্রত্যক্ষের অগম্য বিষয়-সমূহের জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহাদের আত্মার সমধিক বিকাশ হয় নাই। বেদের এই সমস্ত উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক আমি বিশ্বাস করিতে পারি, নাই বৈদিক আর্য্যজাতির ভারতবর্ষ আদিবাসস্থান নহে।

শাস্ত্রের ভাষা সাধনসম্পন্নের, শুদ্ধচিত্তের তপস্যানির্দ্দগ্ধকল্মষের সুখবোধ্য, অন্যের নহে। বর্ত্তমানকালের শিক্ষিতম্মন্য পুরুষদিগের এ

কথা শ্রুতিকটু হইবে, তাহা জানি, তথাপি বেদশাস্ত্রের উপদেশ বলিয়া এ দুর্দ্দিনেও সাহসপূর্ব্বক এই কথা বলিতেছি। শাস্ত্র যে ভাবে, যে ভাষায় তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন, তাহা যে কেন এক্ষণে দুর্বোধ্য হইতেছে, কি শাস্ত্রব্যবসায়ী, কি শাস্ত্রসম্পর্কবিহীন আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য পুরুষগণ এতদুভয়ের সাধারণতঃ কেহ তাহা চিন্তা করেন না। বেদ-শাস্ত্রবিশ্বাস, কেবল যে শাস্ত্রসম্পর্কবিহীন পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরই বিচলিত হইয়াছে, হ্রাস হইয়াছে বা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে, শাস্ত্রীদিগের মধ্যে ও বহুব্যক্তি আর শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নাই। বেদশাস্ত্রের ভাষা বুঝিতে হইলে, বেদশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বেদ-শাস্ত্র যাহা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আর তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দেশভেদও নিষ্কারণ নহে, দেশভেদ ও মনুষ্যাদি জাতিভেদের ন্যায় জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে হয়, দেশ ও সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস হইয়া থাকে, কর্ম্মানুসারেই পৃথক্ পৃথক্ দেশে জন্ম হয়। জন্মকুণ্ডলী গ্রহণ করিয়াছেন। নবভূমী যে পৃথিবীর বাচকরূপে উক্তমন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমার তাহাই মনে হয়। অথর্ব্ববেদ *উক্তমন্ত্রে যদি পৃথিবী-কেই নবখণ্ডাত্মক বলিয়া থাকেন, এবং পুরাণাদিশাস্ত্রোক্ত ভারতবর্ষের ঐন্দ্র, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্ বারুণ ইত্যাদি নবখণ্ডই যদি অথর্ব্ববেদের

---

* "নবভূমীঃ সমুদ্রা উচ্ছিষ্টেধি শ্রিতা দিবঃ।
আ সূর্য্যো ভাত্যুচ্ছিষ্টেহোরাত্রে অপি তন্ময়ি॥"

অথর্ব্বদেবসংহিতা ১১।৪।৯

"নবভূমীঃ নবখণ্ডাত্মিকা পৃথিব্যঃ। সমুদ্রাঃ সপ্তসংখ্যাকাঃ। দিবঃ দ্যুলোকা উপরিতনাঃ। উচ্ছিষ্টে অধি উচ্ছিষ্যমাণে ব্রহ্মণি শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ।"—সায়ণভাষ্য।

নবভূমি হয়, তাহা হইলে, বলিতে পারা যায়, ভারতবর্ষ পৃথিবীর এবং কুমারিকা বর্ত্তমানকালে প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।* বৈদিক আর্য্যজাতি মধ্যআশিয়া হইতে ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন, ভারতবর্ষ বৈদিক আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান নহে, আমি নানাকারণে এই মতের পক্ষপাতী হইতে পারি নাই। বৈদিক আর্য্যগণের মূল উৎপত্তিস্থান যে, কুরুক্ষেত্রাদিপ্রদেশ, মনুবশিষ্ঠাদি ঋষিবৃন্দ একস্বরে তাহাই বলিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রাদি প্রদেশসমূহের প্রশংসা বেদে শুনিতে পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণে, জাবালউপনিষদে কুরুক্ষেত্রের প্রশংসা আছে। ঋগ্বেদে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রি প্রভৃতি ভারতখণ্ডান্তর্গত নদীসকলের নাম আছে; অথর্ব্ববেদে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে অযোধ্যার বিশেষ প্রশংসা আছে। অতএব কুরুক্ষেত্রাদিই যে বৈদিক আর্য্যদিগের অভিজনদেশ তাহা বিশ্বাস হয়। দেশভেদে ভাষার ভেদ হইয়া থাকে। দেশভেদে যে ভাষার ভেদ হয় তাহা নিষ্কারণ নহে। বৈদিকভাষার পুরাতনত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। বৈদিক ভাষার সহিত ভারতবর্ষে প্রচলিত লৌকিক ভাষাসকলের যত সাদৃশ্য আছে, বোধ হয় অন্যদেশীয় কোন ভাষার সহিত বড় সাদৃশ্য নাই। অতএব বৈদিক আর্য্যজাতির ভারতবর্ষ মূল উৎপত্তিস্থান নহে, এইরূপ অনুমানকে আমি বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই। ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি হইতে স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ হয়, ভারতখণ্ডই আর্য্যদিগের মূলতঃ জন্মভূমি। ব্রহ্ম বা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যেখানে আবর্ত্তন করেন—উৎপন্ন হন, তাহা ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যগণ যেখানে আবর্ত্তন করেন তাহা আর্য্যাবর্ত্ত। ব্রাহ্মণাদি আর্য্যজনগণ যে স্থানে বাস করিতেন না, সেস্থান বেদে 'কীকট' শব্দ দ্বারা নিন্দিত হইয়াছে। 'কীকট' শব্দ অনার্য্যনিবাসের বাচক ("কীকটা নাম দেশোঽনার্য্যনিবাসঃ।" নিরুক্ত)। ভগবান্ যাস্ক নিরুক্তের ষষ্ঠঅধ্যায়ের দ্বাত্রিংশখণ্ডে কীকট শব্দের যেরূপ নিরুক্তি করিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর। পরলোকে বিশ্বাস,—প্রেত্যভাব বা পুনর্জ্জন্মে দৃঢ় প্রত্যয় বৈদিক

আর্য্যজাতির স্বাভাবিক, যাঁহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, মানুষ কর্মানুসারে (যাবৎ মোক্ষ প্রাপক জ্ঞানের আবির্ভাব না হয়) উচ্চাবচ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে বৈদিক আর্য্যজাতির ইহা ইতরজাতি ব্যাবর্ত্তক সহজ সংস্কার। ঋগ্বেদে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে, "যাহারা দেব, পিতৃ ও মনুষ্যদিগের উপকার করেনা, ইহলোক ব্যতীত লোকান্তর নাই, যাহাদের এইরূপ বিশ্বাস, যাহারা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করেনা, যাহারা তপশ্চরণে বিমুখ, তাহারা নাস্তিক, তাহারা অনার্য্য, তাহারা যে দেশে বাস করে সে দেশ কীকট ("কিংতে কৃন্বন্তি কীকটেষু গাবো নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্ম্মম্। * ণ ঋগ্বেদসংহিতা ৩।৩।২১৪)। ঐতরেয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, যাহারা আসন্ন চেতন, স্থূল প্রত্যক্ষের অগম্য বিষয়সমূহের জ্ঞান যাহাদের নাই তাহাদের আত্মার সমধিক বিকাশ হয় নাই। বেদের এই সমস্ত উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই বৈদিক আর্য্যজাতির ভারতবর্ষ আদিবাস স্থান নহে।

-শাস্ত্রের ভাষা সাধনসম্পন্নের, শুদ্ধচিত্তের, তপস্যানির্দ্দগ্ধকল্মষের সুখবোধ্য, অন্যের নহে। বর্ত্তমানকালের শিক্ষিতম্মন্য পুরুষদিগের এ কথা শ্রুতিকটু হইবে, তাহা জানি, তথাপি বেদ-শাস্ত্রের উপদেশ বলিয়া এ দুর্দ্দিনেও সাহসপূর্ব্বক এই কথা বলিতেছি। শাস্ত্র যে ভাবে, যে ভাষায় তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন, তাহা যে কেন এক্ষণে দুর্বোধ্য হইতেছে, কি শাস্ত্রব্যবসায়ী, কি শাস্ত্রসম্পর্কবিহীন আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য পুরুষগণ এতদুভয়ের সাধারণতঃ কেহ তাহা চিন্তা করেন না। বেদশাস্ত্রবিশ্বাস, কেবল যে শাস্ত্রসম্পর্কবিহীন পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরই বিচলিত হইয়াছে, হ্রাস হইয়াছে বা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে, শাস্ত্রীদিগের মধ্যেও বহুব্যক্তি আর শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নাই। বেদশাস্ত্রের ভাষা বুঝিতে হইলে, বেদ-শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বেদ-শাস্ত্র যাহা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আর তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দেশভেদও নিষ্কারণ নহে, দেশভেদও মনুষ্যাদি জাতিভেদের ন্যায় জীবের

ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে হয়, দেশও সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস হইয়া থাকে, কর্ম্মানুসারেই পৃথক্ পৃথক্ দেশে জন্ম হয়। জন্মকুণ্ডলী দেখিয়া জাতক কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, বর্ত্তমান জন্মে কোন্ দেশে জন্মিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেই বা কোথায় জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা জানিতে পারা যায়। জন্মকুণ্ডলী হইতে জাতকের কেবল জন্মদেশের পরিজ্ঞানই হয়, তাহা নহে, ব্রাহ্মণাদি কোন্ বর্ণে জাতক পূর্ব্বজন্মে জন্মিয়াছিল, কি কি কর্ম্ম করিয়াছিল, বর্ত্তমান জন্মেই বা কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ভাবিজন্মেই বা কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিবে তৎসমুদয় অবধারিত হইয়া থাকে। জন্মকালে সূর্য্যের স্ফুট হইতে জাতকের জন্মদেশের এবং চন্দ্রের স্ফুট হইতে ব্রাহ্মণাদি জাতির জ্ঞান হয় ("জন্মদেশপরিজ্ঞানং প্রাগ্ভবে হৃত্র জন্মনি। তদাচক্ষ্ব ত্রিলোকেশ কথং সূর্য্যস্ফুটাৎ স্ফুটম্॥" "চন্দ্রাজ্জাতি-পরিজ্ঞানং যত্ত্বয়োক্তং পুরা বিভো। তন্মে ব্রূহি মহাভাগ শ্রোতুমি-চ্ছামি তত্ত্বতঃ॥"—বৃদ্ধসূর্য্যারুণ কর্ম্মবিপাক)। যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হও তবে ভৃগুসংহিতা ও বৃদ্ধসূর্য্যারুণ কর্ম্মবিপাক গ্রন্থ দেখ, যথাপ্রয়োজন ও যথাশক্তি পরীক্ষা কর, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য কি না, তাহা হইলে তাহা জানিতে পারিবে। সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশে যাহা কেহ বিশ্বাস করেন নাই, আমরা আবার তাহা বিশ্বাস করিব? আবার অসভ্য বর্ব্বরোচিত অন্ধবিশ্বাসকে মনে স্থান দিয়া সুসভ্যগণের ঘৃণার্হ হইব, যাঁহারা এবম্প্রকার দৃঢ়মতাবলম্বী তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার এই সকল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিবেন। যে দেশের সৌভাগ্যরবি যখন অস্তমিত হয়, অবনতির ঘোরা তামসী রজনী স্বীয় কৃষ্ণবসন দ্বারা যে দেশকে যখন আবৃত করে, তখন তদ্দেশবাসীর মতিভ্রম হয়, বিপরীত বুদ্ধি ও অকল্যাণকর ধারণা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য আলোক প্রাপ্ত উন্নতম্মন্য ভারতবর্ষীয় আর্য্যবংশধরদিগের আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যদি বিলুপ্তপ্রায় না হইত, তাহা হইলে, তাঁহারা জানিতে পারিতেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কিরূপ হিতকর, কিরূপ সত্য, তাহা হইলে তাঁহারা

বুঝিতে পারিতেন, স্বপ্রকাশ সনাতন বেদপ্রভাকর স্বয়ং নিস্প্রভ জড়বিজ্ঞানচন্দ্রমাকে আলোকিত করিয়াছেন বলিয়াই, ইনি প্রকাশিত হইয়াছেন, কলিতে জড়বিজ্ঞানের মান বাড়াইবার নিমিত্তই যেন বেদরবি অস্তমিত হইয়াছেন, জড়বিজ্ঞানচন্দ্রমার তাই মান বাড়িয়াছে, তাই ইহার এত আদর হইয়াছে। জড়বিজ্ঞান বেদপ্রভাকরের প্রতিফলিত ও ও প্রতিভগ্ন (Refletcted and Refracted) রূপ, জড়বিজ্ঞান তাঁহার যথার্থ রূপ নহেন, জড়বিজ্ঞানের দৃশ্যমানরূপে বেদপ্রভাকরের স্বাভাবিক শুক্লতা, সর্ব্বদিগ্‌বিভাসক অমলজ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায় না, জড়বিজ্ঞানের দৃশ্যরূপ সমল, পরিচ্ছন্ন, বহির্দৃষ্টি স্নিগ্ধ হইলেও, এতদ্দারা অন্তর্দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয় না, বাহ্যনয়নের ক্ষণিক তৃপ্তিসাধন করিতে পারিলেও, জড়বিজ্ঞান অন্তরের স্থায়িতৃপ্তিসাধনে সমর্থ নহেন, উপদ্রবের কিছু শান্তিবিধান করিতে পারিলেও, ইনি মূল রোগের প্রতীকার করিতে অক্ষম ; ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ অত্যন্তপুরুষার্থ জড়বিজ্ঞান দ্বারা সাধিত হয় না, জড়বিজ্ঞান জড়ের বিজ্ঞান বলিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান বা চৈতন্যের দিকে ইহাঁর দৃষ্টি নাই, ইনি জড়কেই দেখেন, ইনি জড়ভাবে ভাবিত, চৈতন্যকে দেখিতে ইহাঁর ইচ্ছা হয় না, স্বায় আত্মদাতাকে—স্বীয় প্রকাশের প্রকাশিয়তাকে ইনি জানেন না, আমি ছাড়া বিশ্বজগতে আর কিছুই নাই, জড়বিজ্ঞানের ইহাই বিশ্বাস, ইহাই উপদেশ। এই জড়বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া যাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন, আত্মহারা হইয়াছেন, তাঁহারা কি বৃদ্ধসূর্য্যারুণের বা ভৃগুসংহিতার কথাতে কর্ণপাত করিতে পারেন? প্রায় আট বৎসর বিবিধ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আমি তাহাই তোমাকে জানাইতেছি।

জিজ্ঞাসু—বর্ণভেদ প্রাকৃতিক কিনা তাহা স্থির করিবার ইহা হইতে প্রকৃষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? জন্মকুণ্ডলী দেখিয়া যদি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মদেশের, পূর্ব্ব, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মের পরিজ্ঞান হয়, তাহা হইলে জাতিভেদ যে পূর্ব্বজন্মানুসারে হইয়া

থাকে, পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্ম হয়, কে তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন ? ভারতবর্ষ বৈদিক আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান নহে, সে কথায় আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যাইবে না।

বক্তা—তুমি ভ্রান্ত, তোমার কথা যথার্থ হইলেও, তুমি বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত হিন্দুসন্তানদিগের হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা জান না, বহুলোক ভৃগুসংহিতা দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তিরই যথোচিত উপকার হইয়াছে। যাক্ এ সকল কথা, এখন জাত্যন্তর পরিণাম সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। তুমি পাতঞ্জলদর্শন পড়িয়াছ, অতএব জাত্যন্তর পরিণাম কিরূপে হয়, তাহা তোমার জানা আছে সন্দেহ নাই। মনুষ্যাদি জাতি দেবাদি অন্য জাতিতে পরিণত হইতে পারে, তুমি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছ কি ? অধর্ম্মের প্রাবল্যে মানুষ পশুপক্ষ্যাদি জাতিতে এবং ধর্ম্মের প্রাবল্যে দেবজাতিতে পরিণত হইতে পারে, ইহা শুনিয়া তোমার কি ধারণা হইয়াছে ?

জিজ্ঞাসু—পাতঞ্জলদর্শন পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি, প্রকৃতির আপূরণ (অনুপ্রবেশ) বশতঃ এক জাতির অন্য জাতীয় পরিণাম হইতে পারে, মানুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের, পশ্বাদি নিকৃষ্ট জাতীয় দেহ ও ইন্দ্রিয়ে পরিণতি হইতে পারে, আবার দেবাদি উৎকৃষ্টজাতীয় পরিণাম ও সম্ভবপর ("জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।" পাং দং কৈ পা ২ সূ)।

বক্তা—কিরূপে তাহা হইতে পারে ?

জিজ্ঞাসু—ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও যোগসূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ বেদব্যাস এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই, তবে যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলিতেছি।

বক্তা—তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহাই ত আমি শুনিতে চাহিতেছি।

জিজ্ঞাসু—সংসারে উচ্চাবচ নানাজাতীয় পদার্থ আমরা দেখিতে পাই; আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা ছাড়া, শাস্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, বহুজাতীয় পদার্থ আছে, দেবতা আছেন, সিদ্ধপুরুষগণ আছেন, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ইত্যাদি নানাজাতীয় পদার্থের সংবাদ শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যেও বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতিভেদ বশতঃ বিবিধ বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রকৃতির মানুষ আছে. প্রত্যেক জাতির অবান্তরভেদের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। মানুষের মধ্যে দেবপ্রকৃতি আছে, পশ্বাদির প্রকৃতি আছে। উচ্চ প্রকৃতির নীচ প্রকৃতিতে এবং নীচ প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত উচ্চ প্রকৃতিতে পরিণত হওয়া যে অসম্ভব নহে, তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এক জাতীয় শরীর ও ইন্দ্রিয় যে অন্য জাতীয় শরীর ও ইন্দ্রিয়ে পরিণত হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও, আপ্ত-প্রমাণবশতঃ কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাস করি। মৃত্তিকা যে পাষাণে পরিণত হয়, তাহা দেখিয়াছি, নিতান্ত অধার্ম্মিকও যে ধার্ম্মিক হয়, পিশাচ প্রকৃতির মানুষ যে দেবপ্রকৃতির হয়, তাহা শুনিয়াছি। এক জাতীয় বৃক্ষকে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অন্যজাতীয় বৃক্ষে পরিণত করা যে অসাধ্য নহে, তাহা বিশ্বাস হইয়াছে। কিরূপে ইহা হয় তাহা চিন্তা করিয়াছি, শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, যাহা সৎ—যাহা সূক্ষ্মভাবে—শক্তি বা ধর্ম্মরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহাই অভিব্যক্ত হয়, অসতের (অবিদ্যমানের) উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয় না সতের অসদ্ভাব এবং অসতের সদ্ভাব সম্ভবপর নহে। অতএব ধারণা হইয়াছে, মানুষ যদি দেবতা হন, তবে মানুষে দেবতা হইবার প্রকৃতিও যে সূক্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমতী, প্রকৃতি দেবতা প্রসব করেন, প্রকৃতিই মনুষ্য প্রসব করেন, প্রকৃতি ধার্ম্মিকের জনয়িত্রী, বিদ্বানের প্রসবিত্রী, এক কথায়, যাহা আছে, যাহা হইয়াছে, যাহা হইবে বা হইতে পারে, তৎসমুদায় প্রকৃতি গর্ভে বিদ্যমান।

বক্তা—প্রকৃতি যখন সর্ব্বশক্তিমতী, তখন ইনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্ব-

প্রকার পরিণাম সাধন করেন না কেন? তখন বিশেষ বিশেষ কার্য্যের উৎপাদনে বিশেষ বিশেষ উপাদানের সংগ্রহ আবশ্যক হয় কেন? তৈলার্থী তিল, সর্ষপাদি সস্নেহ বস্তু সংগ্রহ করেন, বালুকা-মৃত্তিকাদি সংগ্রহ করেন না, ভারতবর্ষের দৈশিক প্রকৃতি ইংলণ্ডাদিদেশের প্রকৃতি হইতে যে বিভিন্ন, ভারতবর্ষে যে সকল বৃক্ষাদির উৎপত্তি হয়, সর্ব্বাংশে সমান সেই সকল বৃক্ষাদি যে ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রকৃতিক দেশান্তরে জন্মে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃতি যদি সর্ব্বশক্তি-মতী হন, তবে মৃত্তিকা হইতে তৈলের উৎপত্তি হয় না কেন? এক দেশের প্রকৃতি অন্যদেশীয় প্রকৃতিতে পরিণত না হইবার কারণ কি? মানুষের দেহ ও ইন্দ্রিয় ইচ্ছামাত্রেই অন্যজাতীয় দেহ ও ইন্দ্রিয়ে পরিণত হয় না কেন? দেশভেদে ভাষার যে ভেদ হয় তাহার কারণ কি? দেশভেদে ভাষার যে ভেদ হয় তাহা কি মানুষের ইচ্ছাধীন? ভারতবর্ষীয় মনুষ্যদিগের শরীরের বর্ণগত পার্থক্য কত অধিক, এক পিতা-মাতা হইতে জাত সন্তানদিগের মধ্যে বর্ণগত কত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু—আমি আপনার এই সকল প্রশ্নের যথেষ্ট সমাধান করিবার উপযুক্ত নহি। পাতঞ্জলদর্শন ও ভগবান্ বেদব্যাসের ভাষ্য পাঠপূর্ব্বক আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা জানাইতেছি। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, প্রকৃতি যে সর্ব্বশক্তিমতী, তাহা সত্য, মানুষের দেহ ও ইন্দ্রিয় যে অন্যজাতীয় দেহ ও ইন্দ্রিয়ে পরিণত হইতে পারে তাহা মিথ্যা নহে। একজাতীয় দেহ ও ইন্দ্রিয় যখন অন্যজাতীয় দেহ ও ইন্দ্রিয়ে পরিণত হয় তখন তাহাদের পূর্ব্ব পরিণামের অপায় (নাশ) এবং উত্তর পরিণামের আবির্ভাব হইয়া থাকে। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের এইরূপ পরিণাম প্রকৃতির আপূরণ হইতে হয়, মানুষের দেহ যখন দেবতার দেহ হয়, মানুষের ইন্দ্রিয় যখন দেবতার ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইয়া থাকে, তখন দেবদেহ ও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতির আপূরণ হয়, দেবদেহের ও দৈব ইন্দ্রিয়ের উপাদানের অনুপ্রবেশ হইয়া থাকে।

দেহেন্দ্রিয়ের প্রকৃতিসকল আপূরণ বা অনুপ্রবেশ দ্বারা স্ব স্ব বিকারকে অনুগ্রহণ করে। এই অনুপ্রবেশে দেহেন্দ্রিয়প্রকৃতি বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্তের অপেক্ষা করিয়া থাকে "তত্র কায়েন্দ্রিয়াণামন্যজাতীয়-পরিণতানাং পূর্ব্বপরিণামাপায় উত্তরপরিণামোপজনস্তেষামপূর্ব্বাবয়-বানুপ্রবেশাৎ ভবতি কায়েন্দ্রিয়প্রকৃতয়শ্চ স্বং স্বং বিকারমনুগৃহ্নন্ত্যা-পূরণেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তমপেক্ষমাণা ইতি।"—যোগসূত্রভাষ্য,।

বক্তা—'দেহ ও ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি (উপাদান) সকল আপূরণ বা অনুপ্রবেশ দ্বারা স্ব স্ব বিকারকে অনুগ্রহণ করে, এই অনুপ্রবেশে দেহেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্তের অপেক্ষা করিয়া থাকে? তুমি এই সকল কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ কি না, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

জিজ্ঞাসু—সম্পূর্ণভাবে ইহাদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বক্তা—একজাতীয় দেহ ও ইন্দ্রিয় অন্যজাতীয় দেহ ও ইন্দ্রিয়ে পরিণত হইতে পারে, মানুষের দেহ, বানর, কুক্কুরাদির দেহে, অপিচ দেবজাতীয় শরীরে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তুমি কি ইহা সম্ভবপর মনে কর? নন্দীশ্বর না মরিয়াই তপঃপ্রভাবে দেবশরীর লাভ করিয়াছিলেন, নহুষ রাজার দেহ সর্পদেহে পরিণত হইয়াছিল, তুমি পুরাণেতিহাসের (যাহা এক্ষণে স্বল্পসার বৃদ্ধ পিতামহীর গল্প জ্ঞানে অবগণিত হইতেছে) এই সকল কথা বিশ্বাস কর কি? মনুষ্যশরীরের উপাদান একরূপ দেবাদির শরীরের উপাদান অন্যরূপ অতএব একরূপ কারণ হইতে অন্যরূপ কার্য্যের উৎপত্তি কিরূপে হইবে?

নবানুরাগে।

কুরঙ্গ নয়নে সদা চাহে ধ্যানে
কেনগো এমন রহে,
আকাশের চাঁদে ধরিবে কি ফাঁদে
কে তারে বুঝায়ে কহে ?

২

অন্তরে অন্তরে কেন গো শিহরে
কে যেন পরশে তারে,
চকিত নয়নে চাহে চাঁদ পানে
হরষে নয়ন ধারে।

৩

রহে গো একলি, না রহে একলি
কে যেন অন্তরে জাগে ;
চিত্ত-দরপণে ভাসে কার ছায়া
ফুটে সে নয়ন রাগে।

৪

কোন ভুলে ভুল কেন সে আকুল,
কি যেন পেয়েছে আশা ;
লুকায়ে মরমে পেয়েছে কি নিধি
সাধে কোন্ ভালবাসা !

৫

অনঙ্গ চাহিয়ে স্বঅঙ্গ নিরখি
ঝুরয়ে নয়ন ধার ;
পরশ পিয়াসে সর্ব্বাঙ্গ শিহরে
অঙ্গ সঙ্গ মাগি তার।

৬

মরমে বিচারি ধরিতে না পারি
কেন সে গোপতে রাখে,
অন্তর চিরিয়া কাড়ি নেবে তাই
গোপনে পরাণে মাখে ?

শ্রীরাধা !

মানুষ বড় আদরের কাঙাল। এই আদর যখন আপনার মধ্যে উপভোগ করিয়া আপনাতে আপনি ভরিয়া যায় তখন কত পবিত্র, কত সুন্দর হয় ? যাহারে বড় ভালবাসি প্রাণের প্রাণ হইয়া হৃদয়ের রাজা রূপে যে অন্তরে বাহিরে পূর্ণ হইয়া আছে তাহার আদর উপভোগ করিতে সর্ব্বদাই সাধ যায়। তার একান্ত প্রিয় হই, সে ভাল বলিয়া তার জিনিষ গ্রহণ করুক, তাহার আনন্দে ভরিয়া উঠি, এ সাধ না যায় কার ? সে যে জগত-রমণ। ভালবাসা ভরা তার প্রাণ, এত ভালবাসিতে এত আদর করিতে আর কে জানে ? আদর করিতেই সে সর্ব্বদা চায়

অনুরাগই তাহার রূপ। বড় ভালবাসে বলিয়াই সর্ব্বদা ফুটিয়া থাকিতে বলে। যেখানে অনুরাগ নাই সেখানেই বিষাদ, আদর পাইলেই সকল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে যদি ব্যাভিচারদুষ্ট না হয়। চিরদিনই প্রকৃতির পূজা পুরুষের প্রতি এবং পুরুষের আদর প্রকৃতির প্রতি। প্রকৃতি পুরুষের এ খেলা বড় সুন্দর। প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন। শ্রীরাধিকা সাধকের অনুরাগের মূর্ত্তি, কে বলিবে এ মূর্ত্তি কেমন! অনুরাগের রূপ ধারণ কত সুন্দর! এ যেন কিসে গড়া কি দিয়ে আঁকা অপূর্ব্ব রসের মূর্ত্তি! আলম্বিকুন্তলভরা বিদ্যুৎবিলাসমনোহর মুখ কমলের সৌরভ মুগ্ধ দুটী নয়ন ভ্রমরের সান্দ্রানুরাগভরা তরল চকিত দৃষ্টি, লাবণ্য বারি ভরিত নব যৌবন মণ্ডিত তনুর কান্তিতে দামিনী চমকিত, আর এই ললিত কলার অপূর্ব্ব মূর্চ্ছণার চরণ তলে হৃদয় পাতিয়া দিতে ইচ্ছা কার না যায়? প্রতি পদ ক্ষেপে নুপুর গুঞ্জনে কমল ফুটিতে থাকে। শ্রীরাধিকার হরি অভিসারে গমন, কৃষ্ণ দর্শনোৎকণ্ঠিত প্রাণের উন্মাদিনী মূর্ত্তি, এ রূপের কি বর্ণনা হয়? তার পরে কত বাধা বিপত্তি কাটাইয়া বহু কষ্টের পর বাঞ্ছিতের দর্শন লাভ—কতদিনের কত উৎকণ্ঠা, কতভাব লইয়া অভিগমন—প্রথম দর্শনে কি ভাষা থাকে? "থির নয়ন জনু ভৃঙ্গ আকার, মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার" পরে যখন ভাব কিছু তরল হয় তখন অনুরাগের ভাষা ফুটে, একবার দর্শনেই নয়নে নয়ন মিলিতেইত অধরে আনন্দ-হাসি ফুটিয়া নিমিষের মধ্যে সকল কষ্টের অবসান হইয়া যায়। তাহার দর্শনে আর কি কিছু থাকে? তবু অনুরাগ বাড়াইবার জন্য যে সব জানে তার কাছে দুঃখ বর্ণনায় বড় সুখ। এ ভাষা বড় মিষ্ট ভাবে গদ গদ, এ শুধু আদর জানাইয়া আদর বাড়াইবার কৌশল। হাতে হাত খানি ধরা, নয়নে নয়ন অর্পিত, ভাবের তখন ভাষা ফুটে—

"মাধব কি কহব দৈব বিপাক,
পথ আগমন কথা কত বা কহব হে,
যদি হয় মুখ লাখে লাখ।

মন্দির ত্যজি যব পদ চারি আইনু
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ,
তিমির দুরন্ত পথ আগে নাহি জানমু
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ।

একে পথ নাহি জানি তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর
আর তাহে জলধর বরিষয়ে ঝর ঝর
কেমনে যাইব সেই পুর!

একে পদ অচল পঙ্কে নিমজ্জিত
কণ্টকে জর জর ভেল,
তুয়া দরশন আশে কিছু নাহি জানমু
চিরদুখ এবে দূরে গেল।

তুঁহার মুরলী যবে শ্রবণে প্রবেশিল
ছাড়নু গৃহ সুখ আশ,
পথেরি দুখ যত তৃণ সম মানমু
কহয়িছে গোবিন্দ দাস॥"

চিত্তাকাশে প্রণয়রূপিণী বীজ রূপিণী নাম রূপিণী প্রেমময়ী আর প্রেমময়ের মিলন-অভিসার কত সুন্দর।

এটী হইতেছে ভাব; ভাব আসে, আসিয়া চকিতের মত হৃদয় ছুইয়া চলিয়া যায়, কত কি দিয়া যেন হৃদয় ভরিয়া একক্ষণে পূর্ণ করিয়া যায়। কিন্তু এত সব সময়ে থাকে না, এই ভাবকে ধরিয়া রাখা যায় কিরূপে? ভাবকে আয়ত্বে আনিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন, নহিলে ভাবে হাঁসা কাঁদা নাচা কুঁদা হইবে ও ভাবের হাতে খেলার পুতুল হইয়া যাইবে ও আবার অভাবে হা, হুতাশ। অজ্ঞানী ভাবের উদয়ে ও অভাবে আছাড় খায় স্থির থাকিতে পারে না। আর জ্ঞানী ভাব লইয়া খেলিতে ও খেলা

ইতে পারেন এবং সর্ব্বদাই ভাবময় জ্ঞানময় আনন্দ ময় আত্মাকে আপনা হইতে অভিন্ন জ্ঞানে আত্মসংস্থ থাকিতে পারেন। ভাব ও অভাব এই দুইটীর খেলা যুগপৎ অজ্ঞানীর হৃদয়ে হইতে থাকে, অজ্ঞানী তাহা-তেই আত্মহারা হইয়া যান, কিন্তু জ্ঞানী আত্মশীতলতাহেতু আপনাতে আপনি পূর্ণ, আপনার মধ্যে ভাব উঠাইয়া ভাবের খেলা খেলিয়াও তিনি প্রশান্ত, আপনাকে হারাইয়া ফেলেন না। ইহা তাঁহার আজ্ঞাধীন। তিনি জানেন এক আত্মরূপী সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানই আছেন, আর অন্য কিছুই নাই, তিনিই আত্মমায়ায় আপনার শক্তির সহিত অভিন্ন থাকিয়াও ভিন্ন ভাব লইয়া খেলিতেছেন মাত্র। ইহা মায়াবীর ইন্দ্রজাল বৈ ত নয়! সৎবস্তু একমাত্র শ্রীভগবান, আর সব মায়ার বিচিত্র রঙ্গ॥

চূড়ালার এক অধ্যায়।

একি চূড়ালা?

কি!

এমন সময়?

কেন—আস্‌তে নাই?

সন্ধ্যা পূজা কর্‌ব না?

না।

রাজা মুখপানে চাহিয়াই ছিলেন;—বড় ভাল লাগিতেছিল।—চূড়ালা যে ভাবে, যে স্বরে "না" কথাটা উচ্চারণ করিল তাহাত আঁকা গেলনা—গেলে বলিতাম এমন সুন্দর স্বর—এমন সুন্দর ভাব এমন সুন্দর ভঙ্গী বুঝি রাজা কখন শুনেন নাই, দেখেন নাই বুঝি কল্পনাতেও

আনিতে পারেন নাই। রাজা বিস্ময়ে দেখিতেছেন চূড়ালা কত সুন্দর, ভাবিতেছেন কে এ? স্বর্ণ পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজলের দিকে দৃষ্টি পড়িল রাজা বলিলেন "না" কি—সন্ধ্যার কাল ত বহিয়া যায়—তুমি এই কাজ করিতে বল চূড়ালা?

চূড়ালা। সন্ধ্যা করিতে বসিয়া ত ভাবিবে চূড়ালা কত সুন্দর, চূড়ালা কত রঙ্গ জানে, চূড়ালার কি গভীর প্রেম, কি সুন্দর হৃদয়, ইহার কত সুন্দর রূপ, ইহার কি সুন্দর হাসি, কত সুন্দর চাহনি—কি শ্রুতিসুখকর কথা—সম্যকরূপে ধ্যান ত এই—তা ভাবনা-রাজ্যে চূড়ালাকে লইয়া থাকা কেন? কাছে থাকিতে মানসে দেখার দরকার কি স্থূলেই চূড়ালা আসিল। এখন দেখ আর সন্ধ্যা কর। এই ত আমি।

রাজা কি বলিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। মনে হইতেছে সত্যই-কিন্তু চূড়ালা কাছে থাকিলে সন্ধ্যা পূজা ভাল হয়। অন্য সময় সন্ধ্যা পূজায় ভুলিয়া যাই যে তার কাছে আসিয়াছি—চূড়ালা কাছে থাকিলে মনে হয়, তার অতি নিকটে আসিয়াছি তার অতি নিকটে বসিয়াছি—তার নিকটে বসাই ত উপাসনা।

রাজা ভিতরের ভাব চাপা দিলেন—দিয়া বলিলেন আর তোমার কোন কাজ নাই রাণি!

আমার কাজেই ত আসিয়াছি। আমার ত রাজ্য পালনও নাই রাজ্য শাসনও নাই—আমার রাজ্য আমার রাজার সামনেই ত আমি।

চূড়ালার একক্ষণেই একটু পরিবর্ত্তন ঘটিল। চূড়ালা বলিল—থাকিতে পারিলাম না বলিয়া আসিলাম—একি করিলে আমায়—এক দণ্ড না দেখিলে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে—আসনে বসিয়া—মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে পরস্পর পরস্পরকে তাকার চাইতে—একঘরে পূজা করার কি আপত্তি হইবে? আমি তোমার দাসী—তোমার পূজার জিনিষ যিনিই হউন—আমার পূজার

জিনিষ ত তুমি। তবে সহধর্ম্মিণীকে কাছে রাখিয়া ধর্ম্ম করিলে ক্ষতি কি ?

রাজা চুড়ালার অভিপ্রায় বুঝিলেন—কথার ঠিক উত্তর না দিয়া বলিলেন—তোমার পূজার দেবতা আমি চুড়ালা ? এই অস্থি মাংস—এই জড়ের মধ্যে দিয়া তুমি তার উপাসনা কর ? না, জড়েরই উপাসনা কর ?

চুড়ালা। জড়ের উপাসনা কখন করিতে শিখি নাই। প্রতিমাও জড়। প্রতিমার মুর্ত্তিকেইত 'সে' বলা হয় না। প্রতিমার মুর্ত্তিতে সে আসে—প্রতিমার মূর্ত্তিকে সজীব করিয়া সে ভাসে—তাই প্রতিমা পূজা। প্রতিমাতে কি আর ঠিক তার ছবি পাওয়া যায়, সে যে বড় সুন্দর ! তার ছবি কোন্ পটুয়ায় তুলিতে পারে ? কোন্ চিত্রকরে তার রং ফলাইতে পারে ? তারে প্রতিমাতে পূজা করা—যার হয় তার হউক, আমার কিন্তু পতির ভিতরে নারায়ণের পূজা করা আরও ভাল লাগে।

চুড়ালা দ্রুতপদে রাজার গৃহ ত্যাগ করিল—রাজা অস্পষ্ট ভাবে যেন শুনিলেন "রাজপরিবারের চিরন্তর প্রথা"।

রাজা বুঝিলেন সব। ভাবিলেন এ প্রথার পরিবর্ত্তন করাও যায়। শাস্ত্র ইহাতে বাধা দেন না। কিন্তু এই চিত্তবৃত্তানুসারিণী কে ? কে এই দেহ আশ্রয় করিয়া আমার গৃহে ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে—ইহার মধ্যে আমার উপাস্যের ভজনা ? শাস্ত্র কি ইহার অনুমোদন করেন ?

রাজার মনে পড়িল "করেন"।

ইতি।

সমরাবসনে—দ্রৌপদী।

(১)

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে যে ভীষণ প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ভারতের বীরেন্দ্রমণ্ডলীর রক্তস্রোতে তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে। আজ আর বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদলের গর্ব্বিত পদভরে সমরক্ষেত্র কম্পিত হইতেছে না—আর সে অগণিত বিরাট বাহিনীর বিকট উল্লাস ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে না। যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগর-গর্জ্জনবৎ অসংখ্য সৈন্যের ভীষণ কোলাহল প্রতি বীরহৃদয়ে তড়িৎ সঞ্চার করিত—যে ভেরী দামামা দুন্দুভির ভীষণ ধ্বনি ধমনী নাচাইয়া তুলিত, তাহা আর নাই। আজ শব-মাংসভোজী শৃগাল কুকুরের বিকট চীৎকার এবং শুষ্ককণ্ঠ মুমূর্ষু সৈনিকের করুণ আর্ত্তনাদ যে বিশাল সমর প্রান্তরকে বিভীষিকাময় মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছে! কৌরব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণ প্রায় সকলেই সেই মহাশ্মশানে শায়িত হইয়াছেন, কেবল ভারতাকাশের ধূমকেতুরূপী দুর্য্যোধন কক্ষচ্যুত হইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে ভূপতিত রহিয়াছেন—মহাবীর ভীম আজ ভীষণ গদাঘাতে তাঁহার উরু ভগ্ন করিয়াছেন।

আজ রাজাধিরাজ দুর্য্যোধন জলহীন হ্রদের তীরে একাকী—উত্থান শক্তি রহিত হইয়া মৃত্যুবিভিষিকা দেখিতেছেন! নিতান্ত বিপন্ন সহায়শূন্য উপায়শূন্য আশাশূন্য! আজ তাঁহার মত দুঃখী কে? সেই দাস দাসী পরিবৃত বিলাস ভবন; সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সমন্বিত হস্তিনার অতুল ঐশ্বর্য্য; সেই অতীত গৌরবের সুখস্মৃতি, আজ দুর্য্যোধনের স্বপ্নবৎ মনে হইতেছে। চিরদিন হিংসা ও স্বার্থান্ধ হইয়া শত শত পৈশাচিক অত্যাচার করিতে যে নিষ্ঠুর হৃদয়ে করুণা-সঞ্চার হয় নাই—দ্বিধা হয় নাই; কিন্তু আজ এ কি! সেই অভিমানী রাজাধিরাজ আজ দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া ব্যাকুলপ্রাণে কাঁদিতেছেন! কখনও উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন,

কিন্তু পারিতেছেন না, পুনরায় পড়িয়া যাইতেছেন। অবিরল শোণিত নির্গত হওয়াতে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। তিনি ছটফট করিতেছেন! এমন সময়ে সহসা মনুষ্যের পদ শব্দ শ্রুত হইল। দুর্য্যোধন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন সম্মুখে কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা দাঁড়াইয়া আছেন। দুর্য্যোধনের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অশ্বত্থামা বড় আকুল হইলেন—তাঁহার রুদ্ধ শোকাবেগ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। অশ্বত্থামা বলিতে লাগিলেন, "হায়! মহা-রাজ! আজ আমাদের সব আশা নির্ম্মূল হইল। আপনাকে দেখিয়া স্নেহ মধুর বাক্য শুনিয়া পিতৃশোক সংবরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ সব শেষ হইল। বলুন মহারাজ! কোন্ নরাধম মায়াবী এমন অদৃশ্য মায়াজাল ভেদ করিয়া আপনার এদুর্গতি করিল?" দুর্য্যোধন ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন;—কিরূপে মায়া বলে হ্রদের জলে অদৃশ্য হইয়াছি লেন—কিরূপে গুপ্তচরমুখে সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—কিরূপে যুধিষ্ঠিরের তীব্র ভর্ৎসনায় ক্রোধান্ধ হইয়া প্রকা-শিত হইয়াছিলেন—বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন,—কিরূপে ভীমের অন্যায় যুদ্ধে উরু ভগ্ন হইয়াছে, সমস্তই বর্ণনা করিলেন। তারপর সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন, "এই বাহুবলে বিপুল রাজ্য শাসন করিয়া অমরাবতী বিনিন্দিত অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছি, এই চরণে কত রাজ মুকুট লুণ্ঠিত হইয়াছে! জীবনে সমস্ত সুখই সম্ভোগ করিয়াছি—সমস্ত সাধই পূর্ণ হইয়াছে। আজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিতে চলিলাম, ইহা আমার পরম গৌরব। আর চিরশত্রু পাণ্ডবগণ এই মহাশ্মশানের চিতাভস্মের উপর বসিয়া রাজ্য শাসন করিবে—পতি পুত্র হীনা ভারতরমণীর হাহাকার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে, ইহাও আমার মৃত্যুকালের অসীম সুখ-প্রদ সান্ত্বনা। কিন্তু ভীম—আমার চিরশত্রু ভীম—হায়! বিষ প্রদানেও পাপিষ্ঠ মরিল না—জতুগৃহ দাহও বিফল হইল!—

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভৌমিক।

উৎসব।

—ঃ-*-ঃ—

আত্মরামায় নমঃ।
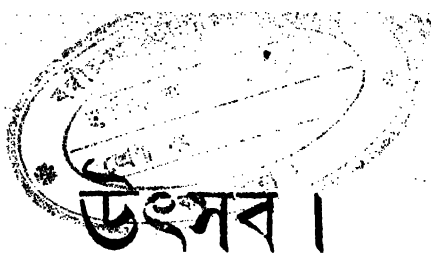
অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৪শ বর্ষ। } সন ১৩২৬ সাল, মাঘ। { ১০ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রী৺সরস্বতী।

সরস্বতি! মহাভাগে! বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে! বিশালাক্ষি! বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তে।
স্তৌমি ত্বাং ত্বাঞ্চ বন্দে ভজ মম রসনাং মা কদাচিত্ত্যজেথাঃ
মা মে বুদ্ধির্ব্বিরুদ্ধা ভবতু ন চ মনো দেবি মে যাতু পাপং।
মা মে দুঃখং কদাচিদ্বিপদি চ সময়েহপ্যস্তু মে নাকুলত্বং।
শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসবতু মম ধীর্ম্মাস্তু কুণ্ঠা কদাচিৎ॥

নির্লজ্জ তুমি।

একটু লজ্জা করে না? যাহা করিবে বলিয়া অঙ্গীকার কর কার্য্যে তাহার বিপরীত করিতে একটু লজ্জা করে না? ছি ছি কি নির্লজ্জ!

এই না অঙ্গীকার করিলে সংসার সমুদ্রপারে তোমার সর্ব্বস্ব—সেখানে যাইবে—সেইজন্য তাকেই ডাকিতেছ "ওগো! পার কর পার কর"—আমি তোমার ওপারে যাইব—এই না অঙ্গীকার করিলে এই ভাবিতে ভাবিতে নিত্যক্রিয়া করিবে?

এই না অঙ্গীকার করিলে শেষের সেই অসহায় অবস্থা স্মরিয়া স্মরিয়া নিত্যক্রিয়া করিবে?

এই না অঙ্গীকার করিলে নিত্যক্রিয়ার পরে স্থির হইয়া বসিয়া বিচার করিবে অ উ ম শক্তির উপরে নাদ; নাদের উপরে বিন্দু; দৃশ্যদর্শনরূপ অজ্ঞানটাই জড়ের আদি বিকাশ—যাহা অপরিমিত চৈতন্যকে আবরণ করিয়া অন্যরূপে দেখাইতেছিল—সেই দৃশ্যদর্শন যখন বিন্দুমত হইয়া মুছিয়া গেল তখনই সেই পরমপদ ভাসিল—যেমন পরমপদ ভাসিল অমনি চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ তোমার সবটি আকর্ষিত হইয়া পরমপদে ডুবিয়া পরম পদ হইয়া স্থিতি লাভ করিল—এই না অঙ্গীকার করিলে নিত্যক্রিয়ার পরে স্থির হইয়া বসিয়া বিচার করিবে সেই পরমপদ—আর তাড়াইবে যাহা কিছু অসম্বন্ধপ্রলাপ বা যাহা কিছু বাসনা কামনা?

আর সবই যে মিথ্যা। তবে মিথ্যা লইয়া থাকিতে একটু লজ্জা করেনা? নির্লজ্জ হওয়া আর কেন?

অনেকবার ঘুরিতেছ। আর ঘুরিও না। সর্ব্বদা আপনার প্রিয়দর্শনের ভাবনায় থাক। ভয় নাই। সেই বক্ষে টানিয়া লইয়া পার করিয়া দিবে আর ফেলিয়া দিবে না। চিরদিন মিশাইয়া রাখিবে। ১৪ই আশ্বিন ১৩২৬।

আর ভাল লাগে না।

এখুনি ?

নাগো আর যে পারিনা—আর যে আদৌ ভাল লাগে না!

দাঁড়াও! এখুনি "ভাল লাগে না" বলিলে চলিবে কেন? তবে যে বলিয়াছিলে "যাহা হয় হউক"—যাহা ধরিয়াছি তাহা লইয়াই থাকিব? এখুনি বিরক্ত হইলে চলিবে কেন?

তবে না বলিয়াছিলে "বৃক্ষ যেন বারিধারা মাথাপাতি লয়? মরণ? হয় হউক। আমি তোমায় লইয়াই থাকিব। মরণ ত আছেই। তাতে ভয় কি?

এ সব কি তবে মৌখিক?

ঠাকুর! মৌখিক বা মৌখিক নয় তাহা তুমি কি জান না? কি লইয়া থাকিতে সাধ তাহা ত তুমি জান। জানি। আমাকে লইয়া থাকিতেই সাধ। কিন্তু ধৈর্য্য ধরিতে না পারিলে কি আমাকে লইয়া থাকিবার সাধ মিটিবে? কত যে গলদ ভিতরে করিয়া ফেলিয়াছ। সে গুলি দাঁড়াও আমি মুছিয়া দিই। যত আসক্তি করিয়া গলদের দাগ দৃঢ় করিয়াছ তত জোরে রগড়াইয়া দাগ তুলিতে হইবে। সে সময়ে কষ্ট হইবেই। অপরাধের ফোঁড়া অস্ত্র করিতে কিছু লাগিবেই ত। ইহা সহ্য করিতেই হইবে। আমি ফোঁড়া অস্ত্র করিয়া নির্ম্মল করিয়া দিতেছি মনে করিয়া সব সহ্য কর। আরও ভাবনা কর আমি হৃদয়ে তুলিয়া লইব বলিয়াই নির্ম্মল করিয়া চাঁছিয়া পুঁছিয়া লইতেছি। এই সব ভাবনা কর। সহ্য করিতে পারিবে। তখন দুঃখও ভাল লাগিয়া যাইবে।

অনেক দুঃখ সহ্য করিলে আমাকে পাওয়া যায়। "পাবেই ত" এই ভাবিয়া ভাবিয়া দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে সব জানান অভ্যাস কর, পাইবে। ইতি

প্রতিজ্ঞাতে পরিত্যক্তে ধর্ম্মো ভবতি নিষ্ফলঃ।

"আপন আপন ধর্ম্মে থাক" ইহাই জীবের উপরে শ্রীভগবানের আজ্ঞা। "স্বধর্ম্মে থাক" ইহাই শ্রুতির আজ্ঞা। স্মৃতি, শ্রুতির প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ"। স্বধর্ম্মে থাকিতে গেলে যদি মৃত্যু হয় তাহাও ভাল তথাপি অপরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিও না। অপরের ধর্ম্মের মত সর্ব্বনাশকর নিত্য দুঃখপ্রদ আর কিছুই নাই।

ভারত ত এখন মৃতপ্রায়। মৃতপ্রায় ভারত জীবিত হইবে—ভারত আবার উঠিবে এই স্বধর্ম্মসেবায়। তুমি অন্য জাতির সর্ব্বাহার, সর্ব্বসঙ্গে আহার, অন্য জাতির যাহাকে তাহাকে বিবাহ, অন্য জাতির অনুকরণে ঋষি আচরিত সন্ধ্যাবন্দনাদি বিসর্জ্জন, অন্য জাতির অনুকরণে ত্যক্ত স্বজাতি কর্ম্মাদি ব্যাপার ভারতে যখন চালাইতে চেষ্টা কর তখন তুমি হিন্দুজাতিকে মৃত্যুর পথ দেখাইয়া দাও মাত্র।

হিন্দু হইয়াও তোমার বুদ্ধি এইরূপ হইল কেন জান? তোমার যাহা তাহা আহার করা ইহার মূখ্য কারণ। শ্রুতি কি বলেন? কায়-মন বাক্য এই, তিনের বিশুদ্ধি হয় আহারে। তোমায় কে বলিল যে যা তা খাইয়া ধর্ম্ম করা যায় বা স্বধর্ম্মে থাকা যায়? বেদ ইহা বলেন না। কোন সাধুই ইহা বলিতে পারেন না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন, "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ"।

সর্ব্বদা শ্রীভগবানকে স্মরণে যদি না রাখিতে পার—সর্ব্বদা স্মরণের অনুষ্ঠান যদি না করিতে পার তবে বিষয়-সমুদ্রে তুমি ডুবিয়া মরিবে।

সংসার-সাগরটা কি তাহা কি কখন চিন্তা করিয়াছ? তুমিত সংসারকে সুখের স্থান মনে কর। কিন্তু বাস্তবিক কি সংসার সুখের স্থান? যাঁহারা একটু জাগিয়াছেন তাঁহারা সংসারকে বড় ভয়

করেন। যাঁহারা সংসার জানিয়াছেন তাঁহারা সংসারকে কি বলেন দেখ ঃ—

ক্লেশাদিপঙ্ককতরঙ্গযুগং ভ্রমাঢ্যং
দারাত্মজাপ্তধনবন্ধুঝষাভিযুক্তং।
ঔর্ব্বানলাভনিজরোষমনঙ্গজালং
সংসারসাগরমতীত্য হরিং ব্রজামি॥

সাগরত সর্ব্বদাই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। কিন্তু সংসারকে যে সাগর বল এখানে তরঙ্গ কোথায়? অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশা ইতি যোগশাস্ত্রোক্তাঃ (১) বাস্তবরূপ ভুলে যাওয়া (২) মিথ্যা দেহাদিকে আত্মা ভাবিয়া লওয়া (৩) বিষয়ে অনুরাগ করা (৪) বিষয়ে দ্বেষ করা (৫) মৃত্যুভয় করা এই পাঁচ তরঙ্গের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিরূপ ভ্রমে সংসার সর্ব্বদা আন্দোলিত হইতেছে।

সমুদ্রে মকর কুম্ভীর থাকে এখানে মকর কুম্ভীর কি? স্ত্রী, পুত্র মিত্র, ধন, কুটুম্ব, এই সমস্ত মকর কুম্ভীর বিশিষ্ট এই সংসার সাগর; নিজের ক্রোধরূপ বাড়বানল এই সমুদ্রে থাকিয়া উত্থিত হয়; অনঙ্গ-কাম এখানে বন্ধন করে বলিয়া জালস্বরূপ—কাম থাকার জন্যই মানুষ বিষয়ে বদ্ধ—এইরূপ সংসার সমুদ্রকে উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীহরিকে নিত্য স্মরণে রাখিতে হইবে নতুবা তরঙ্গাঘাতে তুমি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। স্ত্রী পুত্রকে মকর কুম্ভীর মনে করিতে কেমন কেমন হয় নয়? যদি স্ত্রীরূপে সে, পুত্ররূপে সে—নারায়ণ সব, ভাবনা করিয়া সংসার কর তবে ইহারা হিংস্র জন্তু নহে নতুবা বটে।

এই সর্ব্বদা স্মরণ কিছুতেই হইবে না যতক্ষণ না তুমি সাত্ত্বিক হইতে পার। সাত্ত্বিক হইতে হইলেই তোমাকে সাত্ত্বিক বস্তু আহার করিতে হইবে।

শ্রুতির কথা না শুনিয়া—শ্রীভগবানের কথা না শুনিয়া বল

কোন্ আধুনিকের কথায় তুমি আত্মবধে ছুটিতেছ? শ্রুতি বলিতেছেন—

অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ। ১।

আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ। ২।

তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠোধাতু স্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্। ৩। ছান্দোগ্যঃ—৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ—৫ম খণ্ডঃ। অশিতং = ভুক্তং। ত্রেধা বিধীয়তে = জাঠরেণাগ্নিনা পচ্যমানং ত্রিধা বিভজ্যতে। কথং তস্যান্নস্য ত্রেধা বিধীয়মানস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ স্থূলতমো ধাতুঃ স্থূলতমং বস্তু বিভক্তস্য স্থূলোংঽশস্তৎ পুরীষং ভবতি।

যো মধ্যমোংঽশো ধাতুরন্নস্য তদ্রসাদি ক্রমেণ পরিণম্য মাংসং ভবতি যোঽণিষ্টোঽণুতমো ধাতুঃ স ঊর্দ্ধং হৃদয়ং প্রাপ্য সূক্ষ্মাসু হিতাখ্যাসু নাড়ীম্বনুপ্রবিশ্য বাগাদিকরণসংঘাতস্য স্থিতিমুৎপাদয়ন্ মনো ভবতি।

ভুক্ত অন্ন জঠর অগ্নি দ্বারা পক্ক হইয়া তিন ভাগ হয়। অন্নের স্থূলতম অংশ বিষ্ঠারূপে বাহির হইয়া যায়। মধ্যম অংশ রসাদিক্রমে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া মাংস হয় আর সূক্ষ্মতম অংশ উর্দ্ধে হৃদয়ে যাইয়া সূক্ষ্মহিতানাড়ীতে প্রবেশ করে—করিয়া বাক্যাদি ইন্দ্রিয় সংঘাতের স্থিতি বিধান করিয়া মন হয়।

পীত জলের স্থূলতম অংশ মূত্র হয়, মধ্যম অংশ রক্ত হয় এবং সূক্ষ্মতম অংশ প্রাণ হয়।

তেজ হইতেছে তৈল ঘৃতাদি সাত্ত্বিক পদার্থ। তৈল ঘৃতাদি ভক্ষণ করিলে স্থূলতম অংশে হয় অস্থি; মধ্যম অংশে হয় মজ্জা-অস্থির অন্তর্গত স্নেহ। সূক্ষ্মতম অংশ হয় বাক্। সাত্ত্বিক বস্তু আহার করিলে স্পষ্ট ভাষা উচ্চারণে সামর্থ্য জন্মে। তাই শ্রুতি বলেন—

অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি।

মন হইতেছে অন্নময়, প্রাণ হইতেছে জলময়, আর বাণী হইতেছে তেজোময়ী। সার জগদীশ, প্রফুল্ল চন্দ্রাদি বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সত্য কি আজ হিন্দুসমাজকে দেখাইতে পারেন না? তবেই ত আহারের শুদ্ধিতে ধর্ম্ম হয় কিরূপে, আজ ভ্রান্ত সমাজ তাহা বেশ করিয়া বুঝিতে পারে। তবেই ত দেখান যায় ধর্ম্মের সঙ্গে আহারের বড় নিকট সম্বন্ধ। নিকট সম্বন্ধই বা কেন বলি—আহার পবিত্র না হইলে মন কলুষিত হয়, বাক্য কলুষিত হয়, এবং প্রাণ কলুষিত হয়। মন প্রাণ বাক্য কলুষিত হইলে কি ধর্ম্ম হয়? মন একক্ষেত্রে একাগ্র হইবে কিরূপে? ভগবানকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে কিরূপে?

এই ত শ্রুতি এই উপদেশ করিলেন। কিন্তু তুমি কে যে তুমি বল আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন যোগ নাই? বল বল তুমি কে, যে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মবধ নাটকের অভিনয় করিয়া সমাজকে বধ করিতে ছুটিয়াছ? অথচ তুমি জানিতেছ না তোমার অজ্ঞান তোমাকে কোন্ পথে লইয়া যাইতেছে। তুমি নিশ্চয় করিতেছ আর কোন দেশের লোক ত আহার বিচার করেনা। কিন্তু সে সব দেশেও ত ধার্ম্মিক লোক আছে। তবে বেদ যে এই কথা বলিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই ভ্রম। এই যে বেদকেও ভ্রান্ত বলিতে তুমি ছুটিয়া যাও—বল দেখি কোন্ দেশ তুমি পাইলে যে দেশ ধর্ম্মের পূর্ণমুখ দেখিয়াছে? কোন্ দেশের লোক অর্থ ও কামকে ধর্ম্ম ও মোক্ষের দ্বারা চালিত করিয়া জাতি গঠন করিয়াছে?

যদি প্রথমে ধর্ম্ম না থাকে আর শেষ লক্ষ্য মোক্ষ না হয় আর অর্থ ও কামকে ইহাদের মধ্যে রাখা না যায় তবে জগতের যথার্থ উন্নতি কি কখন হয়? তাই বলি তোমার ভ্রম স্বীকার কর—অন্য দেশের লোকের অনুকরণ করিয়া আত্মবধ ও সমাজবধ নাটকের অভিনয় করিও না।

তোমাদের দেশের আদর্শ স্বধর্ম্মে থাকা। স্বধর্ম্মের কুৎসিত ব্যাখা করিয়া আর আপনি মজিও না ও অন্যকেও মজাইও না। ঋষিদিগের কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ দেখিবে তাঁহারা স্বধর্ম্ম অর্থে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কর্ম্মদ্বারা জাতি হয় না। জাতি হয় জন্ম দ্বারা। আত্মার জাতি নাই—সূক্ষ্মদেহের বা লিঙ্গ দেহের বা আতিবাহিক দেহের ও জাতি নাই। জাতি আছে স্থূল দেহের। স্থূলদেহ পিতা মাতার শুক্র শোণিত হইতেই জন্মে। জাতি এই স্থূলদেহ লইয়া। তুমি স্থূলদেহে যতদিন থাকিবে ততদিন তোমার এক জাতিই থাকিবে। এই জন্যই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি এক জন্মেই বদলায় না।

তবেই ত হইল বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মই ধর্ম্ম। বর্ণ ও আশ্রম মত কর্ম্ম না করিয়া তোমার এই হিন্দুজাতি মরণ পথে ছুটিতেছে।

শাস্ত্র বলিতেছেন প্রতিজ্ঞা যাহা কর সেই মত কার্য্য যদি না কর তবে ধর্ম্ম নিষ্ফল হয়। তবে জীবনও ত নিষ্ফল হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপালন জন্য কত ক্লেশ করিয়াছিলেন—রাজা রামচন্দ্র ধর্ম্মরক্ষা জন্য লক্ষ্মণকেও বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি স্বধর্ম্ম বুঝ—বুঝিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষার প্রতিজ্ঞা কর—প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিও না—তাহা হইলে আত্মবধ ও পরবধনাটকের অভিনয় মাত্র হইবে।

২৪শে বৈশাখ, ১৩২৬; বুধবার। চক্রতীর্থ। ৺পুরী।

শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজা—১৩২৬।

সূর্য্যদেব উত্তরায়ণে গমন করিয়াছেন। কাল পুণ্যসময় আনিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতি পূর্ব্বেই শ্রীবিনায়কের পূজা করিয়াছেন। কোকিলের স্বর সুমিষ্ট হইয়াছে— বর্ষার সেই ধরাগলার বিকৃত সুর আর নাই। আম্র মুকুল চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইতেছে। ভ্রমর-কুল মধুমক্ষিকার ঝঙ্কারে ঝঙ্কার মিলাইয়া চ্যূতবৃক্ষকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গার জল নির্ম্মল হইয়াছে। মধু পুষ্পও রাশি রাশি ফুটিতেছে। শ্রীমাতেশ্বরী সরস্বতীর পূজার এই সময়।

সকল পূজায় একেরই পূজা হয়। ইহা যদি না হয় তবে পূজার রস কোথায়? দেবতা একটি, মূর্ত্তি বহু। হিন্দু তেত্রিশ কোটী দেবমূর্ত্তিতে—তাই বা কেন অনন্ত অনন্ত মূর্ত্তিতে একেরই পূজা করেন। হিন্দুর ঈশ্বর সমকালে নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার। হিন্দু নাম রূপ গুণ লীলা ও স্বরূপ ধরিয়াই পূজা করেন। এই পূজা শ্রীচৈতন্যেরই পূজা। জড়ের পূজা, হিন্দুর চক্ষে পূজাই নয়।

ইষ্টমন্নং ক্ষুধার্ত্তস্য কৃপণস্য প্রিয়ং ধনং।
তৃষিতস্য জলং মিষ্টং চৈতন্যং মম বল্লভম্॥
বিশালদৃষ্টৌ রমতে ন ত্বন্যত্র পতির্ম্মম।
যেন দৃষ্টির্ব্বিশালা স্যাৎ স মন্ত্রো মম দীয়তাম্॥
জানাতু বা ন জানাতু ব্রহ্ম জীবস্য জীবনং।
জানাতি চেৎ পরো লাভো ন জানাতি ভয়ং মহৎ॥

অন্নই ক্ষুধিতের ইষ্ট, কৃপণের কাছে ধনই প্রিয়, তৃষিতের কাছে জলই বড় মিষ্ট। ইহা যেমন সেইরূপ চৈতন্যই আমার বল্লভ। আমার পতি বিশাল নয়নেই রমণ করেন, অন্যত্র নহে। আত্মাতে-

দৃষ্টি বিশাল হয় সেই মন্ত্রই আমাকে প্রদান করুন। জান বা না জান, ব্রহ্মই—চৈতন্যই—জীবের জীবন। জানিলে পরম লাভ, না জানিলে মহৎ সংসার ভয়।

এস দেখি একটু দৃষ্টি বিশাল করা যাউক।

আমার ইষ্ট দেবতাই সরস্বতী সাজে সাজিয়াছেন এই ভাবনাতে যত রস তত রস কি মাকে ইষ্টদেবতা হইতে পৃথক্ ভাবনায় হয়? তা হয় না। আর আমার ইষ্টদেবতা—রামই হউন, জগদ্ধাত্রীই হউন, অন্নপূর্ণাই হউন, কালীই হউন, কৃষ্ণই হউন, বা শিবই হউন, আমার ইষ্ট-দেবতা যদি সরস্বতী না সাজিতে পারেন তবে আমি ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে আটকাইয়াছি। দৃষ্টি বিশাল আমার হয় নাই। আমি কোন্ মন গড়া দেবতার পূজা করি।

এস এস এই সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করি। করিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোক ইষ্ট দেবতাকে বাগ্‌বাদিনী ভাবনায় পূজা করি।

পূজা করিব কোন্ প্রয়োজনে যদি ইহা জিজ্ঞাসা কর তবে উত্তরে বলি পূজা করিবার প্রয়োজন ত বাল্যকাল হইতেই আছে কিন্তু প্রয়োজন অপ্রয়োজনের বোধ কি এই পতিত জাতির আর আছে? যখন প্রয়োজন বোধ ছিল তখনকার কথা আলোচনা করিতে কি কষ্ট হয় না? সে দিন কি আর ফিরিয়া আসিবে?

সেই বিশ্বাসের কালে ত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রয়োজন সকলেই বোধ করিতেন।

দুই একটি দৃষ্টান্ত শাস্ত্র হইতে উল্লেখ করা যাউক। ভগবান্ সনৎকুমার যখন শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে জ্ঞান কি জিজ্ঞাসা করেন ব্রহ্মা তখন জড়বৎ হইয়া কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বাণীর স্তব করিতে বলেন। ব্রহ্মা তখন মা সরস্বতীকে প্রসন্ন করিয়া সনৎকুমারের প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

বসুন্ধরা যখন অনন্তদেবকে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি নিজে কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। ভগবান্ কশ্যপের

আজ্ঞামত সরস্বতীকে স্তব করিয়া তিনি বসুন্ধরার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

ভগবান ব্যাসদেব যখন ভগবান বাল্মীকিকে পুরাণ সূত্র কি হইবে—জিজ্ঞাসা করেন তখন বাল্মীকি মা তোমাকেই স্মরণ করিয়া তোমার প্রসাদেই ব্যাসদেবকে পুরাণ রচনার সূত্র ধরাইয়া দিয়া ছিলেন।

ভগবান্ বাল্মীকি যে প্রথম শ্লোক রচনা করেন এবং রাম-কথামৃত বর্ণনা করেন তাহা ব্রহ্মার বরে, দেবি! তোমারই অধিষ্ঠান-বশতঃ।

ব্যাসদেব ভগবান্ বাল্মীকির নিকটে পুরাণ সূত্র জানিয়া শতবর্ষ ধরিয়া পুষ্করে দেবী সরস্বতীর উপাসনা করেন। সরস্বতীর কৃপাতেই তিনি কবীন্দ্র হইয়াছিলেন।

শ্রীপার্ব্বতী যখন মহাদেবকে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করেন তখন দেবাদিদেব "ক্ষণং ত্বামেব সঞ্চিন্ত্য তস্যৈ জ্ঞানং দদৌ বিভুঃ" মা! দেবাদি-দেব ক্ষণকাল তোমাকে চিন্তা করিয়াই জগজ্জননী পার্ব্বতীকে জ্ঞানশিক্ষা দিয়াছিলেন।

সুরপতি ইন্দ্র যখন ভগবান্ বৃহস্পতিকে শব্দশাস্ত্র ও তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, তখন বৃহস্পতি পুষ্করে সহস্র বৎসর তোমার ধ্যান করিয়াই সুরেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। গুরু শিষ্যকে যাহা শিক্ষা প্রদান করেন, মা বাগ্‌বাদিনি! তোমার কৃপাতেই গুরু ও শিষ্য উভয়েই কৃতার্থ হয়েন।

হরিহর ব্রহ্মা সকলেই তোমার আবশ্যকতা অনুভব করেন। এ বোধ কি আমাদের আছে? বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইলে তোমাকে প্রয়োজন, কাহাকেও কিছু উপদেশ করিতে হইলে তোমার প্রয়োজন, কোন কিছু বুঝিতে হইলে তোমার প্রয়োজন—এই প্রয়োজন বোধ কি আমাদের আছে? যদি থাকিত তবে কি আজকালকার

লেখকের অবিদ্যার অজীর্ণ উদ্গারে সমাজ এত ব্যাধিগ্রস্ত হইত ?

তবে কি আমরা আজকালকার পুস্তকে পড়িতাম, সীতা অতৃপ্ত-বাসনার তৃপ্তির জন্য রামের সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন, তবে কি শুনিতাম, রাবণ সীতাকে অশোক কাননে রাখিয়া বড়ই ভুল করিয়াছিল— অন্তঃপুরে রাখিলে সীতাকে নিশ্চয়ই অঙ্কশায়িনী করিতে পারিত—" অবিদ্যা উদ্গার যদি এসব না হয় তবে রাবণ অপেক্ষা এ বিষয়ের অভিজ্ঞতা আজকালকার গ্রন্থকারের হইবে কিরূপে ?

বিদ্যার প্রয়োজন আজকাল কি আছে ? অবিদ্যা অন্ধকারে বিশ্ব সংসার বুঝি ছাইয়া পড়িল। নতুবা ভগবান বাল্মীকির দেখা কথার উপরেও মুন্সিয়ানা করিতে কোন্ লেখকের সাহস হয় ? নতুবা কেহ কি বলিতে পারেন নিরপরাধিনী সীতাকে গর্ভাবস্থায় বিসর্জ্জন দিয়া রাম নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য করিয়াছিলেন। ভরতকে রাজ্য দিয়া সীতার সঙ্গে আবার তাঁহার বনে যাওয়া উচিত ছিল—এই সমস্তই আমরা দুষ্টা সরস্বতীর অবিদ্যা বলি। মা ! তোমার কৃপা যদি লেখক পাইত তবে বুঝিত বিসর্জ্জনই এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা।

তাই বলিতেছিলাম আহারভ্রষ্ট আচারভ্রষ্ট আজকালকার হিন্দু নামধারী লোকে ভগবতি ! তোমার প্রয়োজন বুঝিতে পারে না, তাই যাহার প্রয়োজন বুঝিতেছে তারই উপাসনা করিতেছে।

বেদের ঋষি আশ্বলায়ন তোমায় ভজিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। পদ্ম-বিদূরথ-মহিষী লীলা তোমারই উপাসনা করিয়া নিজে মুক্ত হইয়াছিলেন, স্বামীকে জীবন্মুক্তি দিয়াছিলেন। আর বেদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপে স্মৃতিভ্রষ্ট বিদ্যাভ্রষ্ট হইয়া নিরাহারে মুহুর্মুহু রোদন করিতে করিতে তোমায় ভজিয়া জ্যোতিঃস্বরূপা তুমি তোমার দর্শন লাভ করেন এবং নষ্টবিদ্যা নষ্টস্মৃতি পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীভগবানের গুণের অনুকরণ করিলে মানুষ চরিত্রবান হয় ইহা কি আমাদের আর মনে হয় ?

স চ নিত্যং প্রশান্তাত্মা মৃদুপূর্ব্বং চ ভাষতে।
উচ্যমানোঽপি পরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে॥

কেহ কঠিন কথা কহিলেও মৃদু উক্তি পূর্ব্বক পরুষ কথার পরুষ উত্তর প্রদান না করা ইহা কি আমরা অভ্যাস করি?

কদাচিদুপকারেণ কৃতেনৈকেন তুষ্যতি।
ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া॥

যে কেহ একটি মাত্র উপকার করে তাহাতেই সন্তুষ্ট। সে ব্যক্তির শত অপকারও স্মরণ করিতে নাই ইহা কি আর আমাদের ধারণা হয়?

কেহ কাছে আসলে অগ্রেই তাঁহার সহিত কথা কহিতে হয় "মধুরাভাষী পূর্ব্বভাষী প্রিয়ম্বদঃ" আর কি এসব আছে? "ন বিরুদ্ধ-কথা রুচিঃ" বেদ বিরুদ্ধ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথায় রুচি নাই—ইহা কি আর আছে?

এই সকলের প্রয়োজন যদি বুঝিতাম তবে মা! তোমার উপাসনার প্রয়োজনও হইত—শ্রীভগবানের গুণের অনুকরণ করিতেও ইচ্ছা হইত। তখন ভগবান যাজ্ঞবল্ক্যের মত আমরাও উপাসনা করিতে করিতে প্রার্থনা করিতাম—

জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।
*   *   *   *
লুপ্তং সর্ব্বং দৈববশাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু॥

আমাদের স্কুল কলেজের হিন্দুছাত্রগণ ও হিন্দু অধ্যাপকগণ যেখানে সেখানে সরস্বতী পূজা করিয়া বিড়ম্বিত হইতেছেন। সকল কলেজের স্কুলের হিন্দুছাত্রগণ একত্রিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া মনের মত করিয়া পূজা করিবার কি কিছুই আয়োজন করিতে পারেন না? সকলে চেষ্টা করিয়া কি ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যায় না? পল্লীগ্রামের ছাত্রেরা ইহার কতক কতক কার্য্যে করেন বটে কিন্তু আরও ভাল করিয়া

ইহা ত করা যায়। এই সকল বিষয়ে হিন্দু মাত্রেরই উত্তম থাকা আবশ্যক।

আমরা ভগবান যাজ্ঞবল্ক্যের পূজার কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া সরস্বতী পূজার প্রবন্ধের শেষ করিতেছি।

ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।
সর্ব্ব বিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বৎ জীবন্মৃতং ভবেৎ।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমোনমঃ॥
যয়াবিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥
হিম-চন্দন-কুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজ সন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমোনমঃ॥

* * *

ব্যাখ্যা স্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃ দেবতা।
ভ্রম সিদ্ধান্তরূপা যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥
স্মৃতিশক্তি-জ্ঞানশক্তি-বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিণী।
প্রতিভা কল্পনা শক্তি র্যা চ তস্যৈ নমোনমঃ॥

ইতি—

সমরাবসানে—দ্রৌপদী।

(পুনরাবৃত্তি)

সেই দুরাত্মা ভীম আজ অন্যায় যুদ্ধে আমার উরু ভগ্ন করিয়াছে—বহুজন সমক্ষে আমার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছে! এ দুঃখ—এ অপমান রাখিবার স্থান নাই।" ভীমের কথা স্মরণ হওয়ামাত্র দুর্য্যোধনের মুখ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। উত্তেজিত হইয়া শরাহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভীষণ কাল সর্প যেমন অস্থিভগ্ন হইলেও ফণা উন্নত করিয়া দংশনোদ্যত হয়, দুর্য্যোধনও তেমনি মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পারিলেন না, অবসন্ন হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন ক্ষোভে, দুঃখে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! জীবন ভরিয়া এত ব্রত-যজ্ঞ-দান করিলাম, সবই বিফল হইল? আজ অধার্ম্মিক ভীমের হাতে অন্যায় যুদ্ধে মরিলাম?

কৃপাচার্য্য অতি দুঃখেও মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন, মানুষ যদি নিজের পাপ—নিজের দোষ বুঝিয়া চলিত, তবে বুঝি সংসার স্বর্গ হইত।

দুর্য্যোধনের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় অশ্বত্থামার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল—ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। অশ্বত্থামা ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! অধার্ম্মিক পাণ্ডবগণের অন্যায় যুদ্ধেই সোণার হস্তীনারাজ্য ছারখার হইল—বীরপ্রসূ ভারতভূমি বীরশূন্য মহাশ্মশানে পরিণত হইল। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ—যাঁহাদের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সুরলোক ভীত—সন্ত্রস্ত,—কি ছার পাণ্ডব! ন্যায়যুদ্ধে অগ্রসর হইলে এক মুহূর্ত্তের

উড়িয়া যাইত—ভীষণ সমরানলে পাণ্ডবগণ পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইত। কিন্তু অধার্ম্মিক-কপট পাণ্ডবগণ সেই সকল মহারথগণকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক হত্যা করিয়াছে! সেই অধর্ম্মেরই ফলে আজ আপনার এই অপমান—তাহারই ফলে এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে আপনার পতন হইল। কিন্তু আর সহ্য করিব না; আজ প্রতিহিংসানলে পিতৃঘাতী পাণ্ডবগণকে ভস্ম করিব। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজই পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিব—যেমন করিয়া পারি, অন্যায়ের প্রতিশোধ লইব—সমস্ত প্রেতাত্মার তৃপ্তি সাধন করিব। মহারাজ! অনুমতি করুন, আমি এখনই পাণ্ডব বিনাশের জন্য যাত্রা করিব।"

প্রতিহিংসালোলুপ দুর্য্যোধন উল্লসিত হইলেন—নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ জ্বলিয়া উঠিল! দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে অভিষেক করিয়া ছিলেন। কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা চলিয়া গেলেন।

কিছুদূর যাইয়া কৃপাচার্য্য বলিলেন, "অশ্বত্থামা! তুমি যুদ্ধবিশারদ, বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ। একটু না ভাবিয়া হঠাৎ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কেন এমন অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করিলে? যাঁহার কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিলয় হয়, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের সখা-সারথি-মন্ত্রী,—দেবাদিদেব মহাদেব যাঁহাদের সহিত রণে পরিতৃপ্ত হন, যাঁহারা ধর্ম্মবলে দেব অস্ত্র প্রাপ্ত করিয়া ভুবনবিজয়ী হইয়াছেন, তুমি এখনও তাঁহাদিগকে পরাভূত করিবার দুরাশা কর? ভাবিয়া দেখ, ভীষ্ম দ্রোণাদি মহাবীরগণ সিংহ পরাক্রমে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ কুরুকুল ধ্বংস হইল। কেবল তুমি, কৃতবর্ম্মা ও আমি মাত্র অবশিষ্ট আছি। আর পাণ্ডবগণ? এখনও সপ্ত সহস্রাধিক সৈন্যসহ অক্ষতদেহে বিরাজমান। তাঁহাদের সহিত তুমি একাকী যুদ্ধ করিবে? অতি অসম্ভব কথা! বৎস, ক্ষান্ত হও।

অশ্বত্থামা ক্রোধান্ধ হইয়াছেন। কৃপাচার্য্যের সমস্ত কথাই তাঁহার নিকট বিরক্তিকর বোধ হইতে লাগিল। প্রতিহিংসানল ক্রমেই ভীষণ জ্বলিয়া উঠিল। অশ্বত্থামা যে কোন রূপেই হউক প্রতিহিংসা চরিতার্থ

করিবেন বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। কৃপাচার্য্য ধীরপদবিক্ষেপে পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

অশ্বত্থামা ক্রোধবশে কিছুক্ষণ দ্রুতপদে চলিয়া এক বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই? কিরূপে পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিব? যাঁহাদের ভীষণ পরাক্রমে অত্যল্প সময়ের মধ্যে কুরুকুল ধ্বংস হইল, কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করিব? ভাবিতে ভাবিতে অশ্বত্থামা ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন আত্মগ্লানি হইতে লাগিল। অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কেন না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম? কেন কৃপাচার্য্যের উপদেশ শুনিলাম না? এখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই। কিন্তু কি করিব? প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিয়া অধর্ম্ম করিব? লোকসমাজে কাপুরুষের ন্যায় চিরদিন হাস্যাস্পদ হইয়া থাকিব? কখনই নয়। মহাবীর দ্রোণের পুত্র হইয়া পিতৃঘাতীর দণ্ড না দিয়া কিছুতেই নিরস্ত হইব না। যেমন করিয়া পারি, প্রতিশোধ লইবই"।

প্রতিহিংসার জ্বালায় অশ্বত্থামার হৃদয় পৈশাচিকভাবে পূর্ণ হইয়াছে; বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল প্রতিহিংসার কথাই ভাবিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি—স্থির; কখনও ঊর্দ্ধদিকে, কখনও অধোদিকে। হঠাৎ অশ্বত্থামার ভাবান্তর হইল—উন্মত্তবৎ বিকট হাসি হাসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিতে লাগিলেন, "ইহাই ঠিক—অধার্ম্মিকের প্রতিশোধ অধর্ম্ম দ্বারাই লইতে হয়। এই বৃক্ষারূঢ় হিংস্র জন্তুটি যেমন নিদ্রিত পক্ষীগুলি অনায়াসে বধ করিল, আমিও তেমনি গভীর অন্ধকারে শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত পাণ্ডবদের শিরশ্ছেদন করিব; আজই করিব। মহারাজ দুর্য্যোধন! এতদিনে যদি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি! যদি পারি, তবে মৃত্যুকালে তোমার চির আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইবে—তুমি সুখে মরিতে পারিবে।"

কৃপাচার্য্য পশ্চাৎ হইতে শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বৎস! এ ঘৃণিত সংকল্প পরিত্যাগ কর। পাপের ফল কখনই ভাল

হয় না। ব্রাহ্মণ তুমি, মহাবীর ধার্ম্মিক দ্রোণের পুত্র তুমি, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া এরূপ পৈশাচিক কার্য্য কখনই করিও না। পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কারদাতা সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বশক্তিমান যিনি, তিনি করিবেন। আর পাণ্ডবেরা অধার্ম্মিক নয়। ভাবিয়া দেখ।"

অশ্বত্থামা নিতান্ত অধীর হইলেন, আর শুনিতে পারিলেন না। তিনি কৃপাচার্য্যের সমস্ত উপদেশ বিরক্তির সহিত উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কৃপাচার্য্য বিস্ময় বিহ্বল হইয়া রহিলেন। ভাবিলেন, ক্রোধান্ধ হইলে সকল অশ্বত্থামাই এইরূপ নীতি ও ধর্ম্মোপদেশ উপেক্ষা করিয়া অমঙ্গল আহ্বান করিয়া থাকে।

(২)

আজ পাণ্ডবশিবির জয়শ্রীমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। কত বিবিধ বর্ণের শত সহস্র পতাকা বায়ুতরঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া সগৌরবে নৃত্য করিতেছে! কত রাশি রাশি সুগন্ধি কুসুম স্তবকে স্তবকে গ্রথিত হইয়া বৃক্ষ বাটীকায় পরিশোভিত হইয়াছে;—সান্ধ্য সমীরণ সেই স্নিগ্ধ সৌরভ লইয়া পুলকে বিভোর হইয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। কোথাও ভ্রমরগুঞ্জনবিনিন্দিত অপ্সরাকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার সুধাবর্ষণ করিতেছে—কোথাও বীরকণ্ঠনির্গত ভৈরব গীতি জলদ গম্ভীর মৃদঙ্গবাদ্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ জাগাইয়া তুলিতেছে! নহবৎ ও বিজয়বাদ্যের উল্লাস ধ্বনিতে আজ পাণ্ডব শিবির মুখরিত! কোথাও বহু মূল্য ধনরত্নাদি অজস্র বিতরিত হইতেছে—কোথাও রাশি রাশি সুমিষ্ট দ্রব্যসম্ভার বিরাট জনতার তৃপ্তি সাধন করিতেছে! দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে রাষ্ট্র হওয়ায় চারিদিক হইতে জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত সে আনন্দসাগর পানে ছুটিয়া চলিয়াছে!

দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। তাঁহার কনককিরণ অঙ্গে মাখিয়া রক্তাম্বুদ কিরীটিনী রঙ্গময়ী প্রকৃতি আনন্দ

সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইলেন। পুষ্পাভরণা হাস্যময়ী প্রকৃতি দীপমাল্যে পরিশোভিত হইয়া মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; নভোম্বর ভেদী সহস্র নয়নের সহিত দৃষ্টি মিলিত হইল! ব্রীড়াময়ী প্রকৃতি কি ভাবিয়া যেন অবগুণ্ঠনবতী হইয়া তিমিরময়ী হইলেন! কত অনন্ত খেলা হইতে লাগিল! অনাদি-অতীত-মহাকাল-বক্ষে রঙ্গময়ীর এ রঙ্গ অনন্তকাল চলিতেছে—অনন্ত কাল চলিবে।

তুমি যুক্তি অভিমানী স্থূলবুদ্ধি বলিয়া স্থূলচক্ষে প্রকৃতির এ খেলা দেখিতে পাও না। একটু স্থির হইয়া বুঝিতে চেষ্টা কর, দেখিবে—এ খেলা নিত্যই হয়! বড় মধুর—বড় আশ্চর্য্য এই খেলা। বুঝিবে—তোমার অন্তঃপ্রকৃতিও এই বহিঃ প্রকৃতির সূক্ষ্মরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু যেমন বিরাট সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ করে, তোমার অভ্যন্তরেও তেমনি অনন্তকোটী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিরাটরূপ সূক্ষ্মভাবে সমাবেশিত রহিয়াছে। এই আলো-আঁধার—হাসি কান্না, ইহাই প্রকৃতির খেলা—ইহাই মানব জীবন।

রাত্রি গভীর অন্ধকারময় হইল। পাণ্ডবগণ আজ বহুদিন পরে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রিত হইলেন। জয়োল্লাসের মদিরাবেশে সৈন্যগণ সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। এই সুযোগে অশ্বত্থামা রক্তপিপাসু শার্দ্দুলের ন্যায় পাণ্ডব শিবিরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার কাকধ্বজরথ দূরে—অদৃশ্য স্থানে রাখিয়া পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ লইয়া শিবির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, সম্মুখে পর্ব্বতপ্রাচীরের ন্যায় কি এক বিরাটমূর্ত্তি পথ রোধ করিয়া রহিয়াছেন! তাঁহার জটা বিহারিণী তরঙ্গিণী ললাট শোভিত চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া কুলকুল রবে চরণ চুম্বন করিতে ছুটিয়াছে! কি অপরূপ দৃশ্য! গিরি শিখর স্থিত শুভ্র তুষার যেন বিগলিত হইয়া পদতল প্রক্ষালন করিতে করিতে চলিয়াছে! তাঁহার প্রদীপ্ত নয়নের অপূর্ব্বজ্যোতি বিমণ্ডিত হইয়া অনন্তসর্প মণিময় রত্নভূষারূপে শোভা পাইতেছে! বিভূতিভূষিত জ্যোতিঃ পুঞ্জ কলেবর, রজতময় জীবন্ত আগ্নেয়-গিরি বলিয়া বোধ হইতে

লাগিল।—অশ্বত্থামা স্তম্ভিত হইলেন। কিছুকাল পরে ক্রোধান্ধ হইয়া শিবিরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। এবার সচলরজতগিরি জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কে তুই পাষণ্ড, অকালে মৃত্যু আহ্বান করিস্? আমি দ্বার রক্ষা করিলে ত্রিভুবনে কার সাধ্য শিবিরে প্রবেশ করে?"

অশ্বত্থামার ভীষণ ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, উন্মত্তভাবে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেবের প্রদীপ্তনয়ন হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল—শিরস্থিত অনন্ত সর্প ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—জটা কম্পিত হইতে লাগিল। মহাদেব ভীষণ ত্রিশূল করে লইয়া অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। অশ্বত্থামার অস্ত্ররাশি ধূর্জ্জটীর অঙ্গে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। অশ্বত্থামা ত্রিশূলাঘাতে জর্জ্জরিত হইলেন। তখন ভীত ও বিস্ময় বিমুক্ত হইয়া মহাদেবের চরণে প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

উগ্রং স্থাণুং শিবং রুদ্রং সর্ব্বমীশানমীশ্বরম্।
গিরিশং বরদং দেবং ভবভাবনমীশ্বরম্॥
শিতিকণ্ঠমজং শুক্রং দক্ষ ক্রতু হরং হরম্।
বিশ্বরূপং বিরূপাক্ষং বহুরূপ মুমাপতিং॥—

অশ্বত্থামার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। বড় আর্ত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! স্বয়ং শক্তিধর তুমি পাণ্ডব শিবিরের দ্বার রক্ষায় ব্রতী, স্থূল বুদ্ধি আমি, পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। তাই পরিনাম না ভাবিয়া পাণ্ডব বিনাশের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি যাহার বিরোধী; তাহার প্রতিজ্ঞাপালনের সম্ভাবনা কোথায়? প্রভো! আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ-কলুষিত এই জীবনভার তোমারই চরণে সমর্পণ করিতেছি।

ইমমাত্মানমদ্যাহং জাতমাঙ্গিরসে কুলে।
অগ্নৌ জুহোমি ভগবন্ প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মাং বলিং॥

ভবন্তভক্ত্যা মহাদেব পরমেণ সমাধিনা।
অস্যামাপদি বিশ্বাত্মন্নুপাকুর্ম্মি তবাগ্রতঃ॥
ত্বয়ি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বভূতেষু চাসি বৈ।
গুণানাং হি প্রধানানামেকত্বং ত্বয়ি তিষ্ঠতি॥
সর্ব্ব ভূতাশ্রয় বিভো হবির্ভূতমবস্থিতম্।
প্রতিগৃহাণ মাং দেব যদ্যশক্যাঃ পরে ময়া॥

অর্থাৎ—এই আমি অগ্নিতে আত্ম বলিদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। হে মহাদেব! এই আমি তোমার সমক্ষে চিরসঞ্চিত ভক্তি লইয়া আত্মসমর্পণ করিতেছি। সর্ব্বভূত তোমাতেই বিরাজমান আবার তুমিও সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত; শ্রেষ্ঠগুণরাশির তুমিই একাধার। হে সর্ব্বভূতের আশ্রয়, হে বিভো, যদি তুমি আমাকে শত্রুজয়ে অসমর্থ মনে কর, তবে এই আমি তোমার নিকট নৈবেদ্যরূপে উপস্থিত হইলাম আমাকে গ্রহণ কর।

ভক্তবৎসল আশুতোষ অশ্বত্থামার স্তবে সন্তুষ্ট হইলেন—তাঁহার মূর্ত্তি প্রসন্ন গম্ভীর হইল। সহসা ভাবান্তর হইল; মহাদেব বলিলেন, 'অশ্বত্থামা! আমি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু; আমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে আমি তাহার সেই অভীষ্টই পূর্ণ করি। একদিন পার্থ আমাকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া বর লাভ করিয়াছিল, তাহারই ফলে এক বৎসরের জন্য পাণ্ডব শিবিরের দ্বার রক্ষায় ব্রতী হইয়াছিলাম। কালপূর্ণ হইয়াছে; আজ আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়াছি। বীর তুমি, লও এই ভীষণ খড়গ; সহস্র অরাতিশোণিতে ধরাতল সিক্ত করিতে পারিবে—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

মহাশক্তিরূপিণী নিয়তি অলক্ষ্যে হাসিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন—মহাদেব সেই নৃত্যে বিভোর হইয়া অদৃশ্য হইলেন। পাণ্ডব শিবির গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইল।

অশ্বত্থামা ধীর পাদবিক্ষেপে দেবদত্ত খড়গহস্তে পাণ্ডব শিবিরাভিমুখে চলিলেন। দেখিবেন, অসংখ্য শিবিরে অসংখ্য সৈন্য নিদ্রা

যাইতেছে। প্রথম শিবিরে প্রবেশ করিয়া দীপালোকে চিনিলেন, সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে ধৃষ্টদ্যুম্ন নিদ্রিত রহিয়াছেন। তাঁহার শরীরের তড়িৎ প্রবাহ বহিতে লাগিল। তিনি সজোরে পিতৃঘাতীর মস্তকে পদাঘাত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে তাকাইলেন, সহসা উদ্যতফণা ফণী দেখিয়া পথিক যেমন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়, ধৃষ্টদ্যুম্ন তেমনি ভীতি বিহ্বল হইয়া রহিলেন। অশ্বত্থামা ক্রোধে ধৃষ্টদ্যুম্নের গলদেশ চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'অশ্বত্থামা! বীর তুমি, আমাকে বীরের ন্যায় মরিতে দাও—অস্ত্রাঘাতে আমাকে বধ কর।" অশ্বত্থামা আরও সজোরে গলদেশ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'নরাধম, গুরুহন্তা তুই, এই তোর প্রায়শ্চিত্ত!" ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাণত্যাগ করিলেন।

অশ্বত্থামা খড়গহস্তে অন্য শিবিরাভিমুখে চলিলেন। সম্মুখে যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই খড়গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া যাইতেছেন। বহু শিবিরের অসংখ্য সৈন্য ধ্বংস করিতে করিতে অন্য এক শিবিরাভিমুখে চলিলেন। ক্রোধোন্মত্ত অশ্বত্থামার দূর হইতে বোধ হইল, যেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব শিবিরাভ্যন্তরে শায়িত আছেন। অশ্বত্থামা দ্রুতবেগে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সকলের শিরচ্ছেদন করিলেন। রক্তস্রোতে শিবির প্লাবিত হইল। অশ্বত্থামা রক্তাক্তকলেবরে প্রেতবৎ তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে পঞ্চপাণ্ডবের ছিন্নমুণ্ড লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট চলিলেন। বলিতে লাগিলেন, এতদিনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল—এতদিনে পিতৃঘাতীর দণ্ড এবং প্রভু দুর্য্যোধনের অপমানের প্রতিশোধ হইল—এতদিনে পাণ্ডবদের অন্যায়ের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইল।

দুর্য্যোধন অবসন্নদেহে ভূলুণ্ঠিত হইতেছেন। মৃত্যুর করাল ছায়ায় তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়াছে। কখনও ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন—কখনও মূর্চ্ছিত হইতেছেন। চারিদিক হইতে শিবা-শকুনি ও গৃধিনীকুল মুখব্যাদন করিয়া অগ্রসর হইতেছে। এমন সময়ে অশ্বত্থামা রক্তাক্ত-

কলেবরে দ্রুতপদে উপস্থিত হইলেন। উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ দুর্য্যোধন! আশ্রয়দাতা প্রভু! আজ আমি কৃতার্থ—আজ আমার প্রতিহিংসা সার্থক! আজ পিতৃঘাতীর উষ্ণশোণিতে দেবদত্ত খড়গ রঞ্জিত করিয়াছি—আজ পাণ্ডবশিবির রক্তস্রোতে প্লাবিত করিয়াছি—আজ আপনার চিরশত্রু পাণ্ডবদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছি! এই দেখুন মহারাজ! পঞ্চপাণ্ডবের ছিন্ন মুণ্ড!"

দুর্য্যোধনের হৃদয় উল্লাসে নাচিয়া উঠিল—আবার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ জ্বলিয়া উঠিল। দুর্য্যোধন বলিলেন, "অশ্বত্থামা! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার বীরত্ব! ভীষ্ম দ্রোণাদি মহাবীরগণ যাহা করিতে পারেন নাই, আজ তুমি সেই অসাধ্য সাধন করিলে! আজ আমার চিরশত্রুর ছিন্নমুণ্ড স্বহস্তে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সুখে মরিতে পারিব।"

দুর্য্যোধন সাগ্রহে ছিন্নমুণ্ড হস্তে লইয়া চিরশত্রু ভীমের মস্তকে সজোরে মুষ্টাঘাত করিলেন, মুণ্ড অনায়াসে চূর্ণ হইয়া গেল। দুর্য্যোধন বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "একি? ভীষণ গদাঘাতে যে ভীমের লৌহ-কঠিন-মস্তক অক্ষত থাকিত, আজ আমার অবসন্ন দেহের ক্ষীণ শক্তিতে সেই মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হইল? অতি অসম্ভব! হায় অশ্বত্থামা! সর্ব্বনাশ করিয়াছ—আজ কুরুপাণ্ডবের জলপিণ্ডের শেষ সম্বল দ্রৌপদীর পুত্রদিগকে পাণ্ডব ভ্রমে হত্যা করিয়াছ। আজ কুরুবংশ নির্ব্বংশ হইল। হায়! অশ্বত্থামা! কি করিলে?"

দুর্য্যোধন ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন—শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। হায় হায় করিতে করিতে দুর্য্যোধনের চক্ষু স্থির হইল—সব শেষ হইল।

আর অশ্বত্থামা? দুঃখ, অনুতাপ, লজ্জা ও ভয়ে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। যুধিষ্ঠির প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে রাজসভায় উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে রক্তাক্তকলেবরে অতি দ্রুতবেগে একজন সৈনিক রাজসভায় উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে সজলনয়নে বলিল, "মহারাজ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" সৈনিক আর বলিতে পারিতেছে না—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। যুধিষ্ঠির শিহরিয়া উঠিলেন; কি যেন একটা অমঙ্গলের আভাস তাঁহার প্রাণে বিষাদ মাখিয়া দিয়া গেল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কৃষ্ণ স্মরণ করিলেন। তারপর চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চিনিলেন, সৈনিক—ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি। বলিলেন, "সারথি! শীঘ্র বল কি হইয়াছে?" সারথি কাঁদিতে কাঁদিতে নিষ্ঠুর-অশ্বত্থামার গুপ্ত হত্যার কথা সমস্ত বর্ণন করিলেন। বলিলেন, "আমি ছিন্নশির সৈনিকদিগের শবদেহের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলাম বলিয়া জীবিত রহিয়াছি। হায়! হায়! নরাধম পিশাচ সমস্ত সৈন্য সামন্ত এবং নিদ্রিত কুমারদিগকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়াছে—আর পাণ্ডবশিবিরে একটী সৈন্যও জীবিত নাই।"

যুধিষ্ঠির শোকে অধীর হইলেন; সকলের হৃদয়ভেদী ক্রন্দনরোলে পাণ্ডবশিবির ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দ্রৌপদী এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। কিছুক্ষণ পরে কখনও উঠিতেছেন, কখনও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছেন। তারপর আলুলায়িত-কুন্তলা দ্রৌপদী উন্মাদনীর ন্যায় পুত্রদের শবদেহ দেখিতে ছুটিলেন; সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দ্রৌপদী সে লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। আবার সংজ্ঞা লাভ করিয়া আকুল হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। পক্ষিনী যেমন নিদ্রাভঙ্গে মৃত শাবকের অস্থিপঞ্জর দেখিয়া তাহার চারিদিকে আকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তারপর পক্ষপুটে জড়াইয়া ধরিয়া ছটফট করিতে থাকে, পুত্র-শোকাতুরা দ্রৌপদীও তেমনি উন্মাদিনীর ন্যায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন, তারপর শবদেহ বক্ষে তুলিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভীমার্জ্জুন তথায় উপস্থিত হইলেন। এই মর্ম্মভেদী করুণ দৃশ্যে তাঁহাদের বীর-হৃদয় গলিয়া

গেল—সকলেই শোকে অধীর হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভীম দ্রৌপদীকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন। দ্রৌপদী এতক্ষণ কাঁদিতে পারেন নাই—নিদারুণ শোকানলে তাঁহার অশ্রু যেন শুকাইয়া গিয়াছিল, এখন কাঁদিতে লাগিলেন। বর্ষাবারি নিষিক্ত স্থলকমল হইতে যেমন বায়ুস্পর্শ মাত্র ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে থাকে তেমনি অশ্রুপরিপ্লুত ভীমের সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়া অবিরলধারে দ্রৌপদীর অশ্রুপাত হইতে লাগিল। দ্রৌপদী কথা কহিতে পারেন না—কেবল কাঁদিতেছেন। আজ শত সহস্র দুঃখের স্মৃতি তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। যেমন বীণার একটী তারে আঘাত লাগিলে সমস্ত তার ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, তেমনি দ্রৌপদীর এই নিদারুণ আঘাত অতীতের সমস্ত দুঃখ জাগাইয়া তুলিল। দ্রৌপদী বলিতে লাগিলেন, "হায়! কি অভাগিনী আমি, চিরকাল আমার দুঃখে দিন গেল। অমঙ্গলরূপিণী আমি, আমারই ভাগ্যদোষে এমন রূপগুণ শৌর্য্য বীর্য্যের আধার পাণ্ডবগণ একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াও দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছেন। হায়! হিংস্রক-স্বার্থান্ধ-জ্ঞাতিশত্রু! এত করিয়াও তোমাদের পৈশাচিক পিপাসা মিটিল না! সেই কপট দ্যুতে নির্ব্বাসন—রজঃস্বলা অবস্থায় সভামধ্যে বস্ত্রহরণ—উরুপ্রদর্শন—জয়দ্রথের পৈশাচিক ব্যবহার! সেই বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাতবাসের সময় সৈরিন্ধ্রীরূপে কত দুঃখ! সকল দুঃখই পুত্রমুখ চাহিয়া সহ্য করিয়াছিলাম। আজ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। হায়! এমন মহা প্রতাপশালী স্বামিগণ জীবিত থাকিতেও আমার দুঃখ ঘুচিল না।"

স্বামিগণের বীরত্বের কথা মনে উদয় হইবামাত্র দ্রৌপদীর ভাবান্তর হইল। শোকগলিত হৃদয় হঠাৎ পুত্রঘাতীর দণ্ডবিধানের জন্য ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। দ্রৌপদী বীররমণী—দৃপ্ত সিংহীর

ন্যায় তেজস্বিনী; ক্রোধে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল;—পদদলিতা ফণিণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। ভীমার্জ্জুনকে বলিলেন, "বীরশ্রেষ্ঠ তোমরা, তোমাদেরই অতুলনীয় বীরত্বে—তোমাদেরই ভীষণ গদা ও অস্ত্রাঘাতে অসংখ্য শত্রু ধ্বংস হইয়াছে—সতী আমি, আমার ধর্ম্ম, মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষা হইয়াছে। আর একবার যাও বীরগণ! শেষ শত্রু নিপাত করিয়া—পুত্রঘাতীর ছিন্নমুণ্ড আনিয়া আমার শোকানল নির্ব্বাপিত কর। পাপিষ্ঠের রক্তাক্ত মুণ্ডে দাঁড়াইয়া রণচামুণ্ডার ন্যায় নৃত্য করিব—তাহার মাথাব মণি ধারণ করিয়া পুত্রশোক ভুলিব।"

ভীম ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ হুঙ্কার করিয়া অশ্বত্থামা বধের জন্য ছুটিলেন। নকুল সারথি হইলেন।

ভীমকে যোদ্ধৃবেশে যাইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্বিগ্ন হইলেন। যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে ভীমকে পাঠাইও না, অমঙ্গল হইবে। অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির অস্ত্র জানে, তাহা প্রয়োগ করিলে মৃত্যু নিশ্চিত।" যুধিষ্ঠির বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। বলিলেন, "কৃষ্ণ! তুমিই আমাদের ভরসা—তুমিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা—তুমিই আমাদের সর্ব্বস্ব। যাহা করিতে হয় তুমি কর, আমি আর তোমায় কি বলিব? যাহাতে আমাদের ভাল হয় তাহা তুমিই জান।'

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া ভীমের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন। ঘোর রবে সমরবাদ্য বাজিতে লাগিল।

---

(৫)

অশ্বত্থামা স্বীয় পৈশাচিক কার্য্যের জন্য প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ব্যাসদেবের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। ভীম ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় অশ্বত্থামাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। সমর-বাদ্য এবং মহাবীর ভীমের ভীষণ হুঙ্কার শুনিয়া অশ্বত্থামার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। ভীম ভীষণ বেগে অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিলেন। অশ্বত্থামা আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ভাবিয়া ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র প্রচণ্ডতেজে কালাগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল—সধূম অগ্নিরাশি আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সখে! ইহা ব্রহ্মাস্ত্র; অশ্বত্থামা প্রাণভয়ে ইহা নিক্ষেপ করিয়াছে। সে ইহার সংহার জানে না। ব্রহ্মাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রদ্বারা ইহা নিবারণ করা যায় না। শীঘ্র অস্ত্র ত্যাগকর, নতুবা মুহূর্ত্ত মধ্যে সৃষ্টি ধ্বংস হইবে।" অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আচমনাদি যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। উভয় অস্ত্রের ভীষণ দৃশ্যে জগৎ সন্ত্রাসিত হইল! দ্বাদশ সূর্য্য যেন প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়া প্রচণ্ড তেজ উদ্‌গীরণ করিতে লাগিল! সহসা প্রলয়াশঙ্কা করিয়া মর্ত্ত্যবাসীগণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভীত চিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিল! শত বজ্রধ্বনি-কঠোর গগন বিদারী ভীষণ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল! ধনঞ্জয় সৃষ্টিনাশ আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে উভয় অস্ত্রই সংহার করিলেন। তার পর দুরাত্মা অশ্বত্থামাকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া শিবিরে

লইয়া চলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে বধ করিতে উপদেশ দিলেন। বলিলেন—

তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহা।
ভর্ত্তুশ্চ বিপ্রয়ং বীর কৃতবান্ কুল পাংশনঃ॥

অর্থাৎ—এই কুলাঙ্গার অতিতায়ী এবং বন্ধুঘাতী; এই দুষ্কার্য্য দ্বারা সে তাহার প্রভু দুর্য্যোধনেরও অতি অপ্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছে সুতরাং ইহাকে বধ করা উচিত।

কৃষ্ণসখা কৃষ্ণের আদেশের অন্তরালে কি যেন লক্ষ্য করিলেন। তার পর অশ্বত্থামাকে লইয়া দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। আর দ্রৌপদী? অশ্বত্থামাকে বন্ধন অবস্থায় দেখিয়া দ্রৌপদী কি যেন কেমন হইয়া গেলেন। নারী সুলভ কোমলতা আসিয়া তাঁহার হৃদয় দেব ভাবে পূর্ণ করিল। দ্রৌপদী অশ্বত্থামার চরণে প্রণত হইলেন এবং স্বীয় দুষ্কার্য্যের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অর্জ্জুনকে বলিলেন, "নাথ! শীঘ্র ইঁহাকে বন্ধন মুক্ত করুন। ইনি যে আমাদের গুরু—ব্রাহ্মণ। যিনি পুত্রাধিক স্নেহ করিয়া আপনাকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ দ্রোণাচার্য্য আত্ম পুত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী—আমাদের গুরু পত্নী কৃপী, বীর পুত্র প্রসব করিয়াছেন বলিয়া স্বামীর সহগমন করেন নাই,—এখনও তিনি জীবিতা। আহা! আমার ন্যায় পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়া এই বৃদ্ধ বয়সে যেন তাঁহাকে অশ্রুত্যাগ না করিতে হয়। নাথ! পাণ্ডবগণ চিরদিন দেব, দ্বিজ এবং গুরুর প্রতি ভক্তিমান; এই ধর্ম্ম যাহাতে চিরদিন অক্ষুন্ন থাকে—পাণ্ডবকুলবধূ আমি, চিরদিন যাহাতে এই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি—এই গৌরব লইয়া মরিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা। নাথ! শীঘ্র ইহার বন্ধন মোচন করুন, ইহার শুষ্ক মুখ দর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

দ্রৌপদীর এই অলৌকিক ধর্ম্মানুরাগ এবং দয়ার পরিচয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকী প্রভৃতি সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল—গৌরবে ও উল্লাসে হৃদয় ভরিয়া গেল।

দ্রৌপদীর বাক্যে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু ভীমের ক্রোধ কিছুতেই দূর হইল না। ভীম সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বলিলেন "এই দুরাত্মকে বধ না করিলে ইহার পৈশাচিক পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে না—এই ক্রোধাগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবেনা। হায়! নরাধম নিদ্রিত বালকদিগকে বধ করিয়াছে; বধ ভিন্ন ইহার অন্য দণ্ড নাই।" বিষম ক্রোধে ভীমের দর দর ধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

দ্রৌপদী এবং ভীমের সমস্ত কথা শুনিয়া বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; উভয়ের প্রতি শান্ত মধুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন;

ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ।
ময়ৈ বোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনম্॥

"সখে! ব্রাহ্মণ অবধ্য কিন্তু আততায়ী বধ্য, আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছি। ভীম এবং তুমি পুত্র শোকাতুরা পাঞ্চালীকে সান্ত্বনা দিতে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্য পালন কর, তাহাহইলে প্রতিজ্ঞা ও ধর্ম্ম রক্ষা হইবে এবং সকলে সন্তুষ্ট হইবে। শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্মপথে চলিয়া, তাহার সূক্ষ্মগতি এবং তাৎপর্য্য বুঝিয়া কর্ম্ম করিলে, সকল কর্ম্মই যশঃস্কর, সুশৃঙ্খল এবং মঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণসখা কৃষ্ণের আদেশের তাৎপর্য্য বুঝিয়া অশ্বত্থামার মস্তকজাত মণি ছেদন করিয়া দ্রৌপদীকে দিলেন এবং অশ্বত্থামাকে শিবির হইতে দূর করিয়া দিলেন।

অশ্বত্থামা প্রভুর সন্তোষ সাধনের জন্য যে পৈশাচিক কার্য্য করিয়াছেন, দুর্য্যোধনের নিকট হইতে মৃত্যুকালে তাহার বিপরিত ফল প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। অধিকন্তু তিনি মস্তকজাত মণি ছেদন করায় নিতান্ত নিস্তেজ, প্রভাশূন্য ও ম্রিয়মান হইয়া জীবন্ত দগ্ধ হইতে লাগিলেন, ইহাই তাঁহার মৃত্যু। অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের প্রাণবধ না করিয়া এইরূপ মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন; হৃদয়কে বিসর্জ্জন না দিয়া প্রতিজ্ঞা, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম রক্ষা হইল।

দ্রৌপদী অশ্বত্থামার মাথার মণি ধর্ম্মরাজের নিকট দিলেন। তার পর শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া বিহ্বল হইলেন,—তাঁহার হৃদয় স্থির—শান্ত হইল।

মা দ্রৌপদী! গরীয়সী নারী তুমি, কবে তোমার পূত চরণ রেণু অঙ্গে মাখিয়া এই অধঃপতিত ভারত ললনা তোমার ন্যায় বজ্রাদপি কঠোর হইয়া সতীত্ব ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবে—কবে তোমার ন্যায় অপার্থিব কুসুম কোমল হৃদয় লইয়া পুত্রঘাতীকে দেবতা ভাবিয়া ধন্য হইবে? মা! কৃষ্ণসখী তুমি—লক্ষ্মী স্বরূপিণী, তোমার ভারত-লীলা যেন সার্থক হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভৌমিক।

(শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপকার লিখিত।)

বর্ণবিবেক।

(পুনরাবৃত্তি)

জিজ্ঞাসু—একরূপ কারণ হইতে অন্যরূপ কার্য্য হইতে পারে না, মানুষের শরীর যে উপাদান কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই উপাদান কারণ হইতে দেবশরীরের পরিণাম হয় না। মানুষের শরীর মানবীয় শরীরের উপাদান হইতে, দৈব শরীর দৈব শরীরের উপাদান হইতে এবং পশু-পক্ষ্যাদির শরীর পশু-পক্ষ্যাদির শরীরের উপাদান হইতেই হইয়া থাকে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাস বোধ হয় এই কথাই বলিয়াছেন। শরীরমাত্রের সামান্য উপাদান কারণ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত এবং ইন্দ্রিয়গণের সামান্য প্রকৃতি—সাধারণ উপাদান কারণ 'অস্মিতা' (এই অস্মিতা নামক পদার্থকেই আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, বৈজ্ঞানিক সুধীশ্রেষ্ঠ রিচ্‌মণ্ড্ 'The Ego, the real personality, the I am'—অহমস্মি—ইহার ভাব বলিয়াছেন)। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত শরীরমাত্রের সামান্য উপাদান হইলেও বিশেষ বিশেষ শরীরের উৎপত্তি পঞ্চভূতের বিশেষ বিশেষ অংশ দ্বারা হইয়া থাকে। এইরূপ 'অস্মিতা' ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ প্রকৃতি হইলেও, পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের পরিণাম ইন্দ্রিয়কারণ অস্মিতার বিশেষ বিশেষ ভাব হইতে হয়, একরূপ অস্মিতা হইতে সুর-নরাদি সকল জীবের ইন্দ্রিয় নির্ম্মিত হয় না।

বক্তা—জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাস কতিপয় অক্ষর দ্বারা যে গভীর তত্ত্বের দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় আবরণের উন্মোচন,

করিয়াছেন, অন্য কোন দেশে কোন বিজ্ঞানকুশল অদ্যাপি সে তত্ত্বের প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। মানুষ দেবতা হইতে পারে, মানুষের দেহ সর্পাদির দেহে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে—এই কথা শুনিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি নাসাস্যবিকার পূর্ব্বক হাস্য করিবেন না.? নহুষের সর্পশরীরে পরিণতির কথা শ্রবণপূর্ব্বক 'ইহা নিতান্ত অসভ্য অবস্থার লোকের কল্পনা ভিন্ন আর কিছু নহে', বোধ হয়, অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ মত প্রকাশ করিবেন। তবে অতিমাত্র আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, অভ্যুদয়শীল পাশ্চাত্য দেশে জড়বিজ্ঞানের যাদৃশ উন্নতি হইতেছে, যদি কোন কারণে তাহার স্রোত অবরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে কোন সময়ে কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের সমীপে :ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাস কর্ত্তৃক বিশেষতঃ প্রকটীকৃত এই সকল সত্যের কিয়ৎ পরিমাণে আদর হইবে। ঋষিরা পৃথিবীর কত উপকার করিয়াছেন, ভাগ্যবান্ পাশ্চাত্য কোবিদগণই, আশা হয়, ইতঃপর যথাসম্ভব তাহা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইবেন। একজাতীয় পদার্থ যে অন্য জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়, তাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের নিকটে সুবিদিত কথা। সজীব পদার্থের রূপবিপরিণামের—আকার পরিবর্ত্তনের (Metamorphosis) কথা প্রাণিবিদ্যাতে (Zoology) বর্ণিত হইয়াছে। একজাতীয় প্রাণিশরীর যে অন্যজাতীয় প্রাণিশরীরে পরিবর্ত্তিত হয়, প্রাণিবিদ্যা তাহা বুঝাইয়াছেন। ভেক (Frog) চিত্রপতঙ্গ বা প্রজাপতি (Butterfly) এবং অন্যান্য প্রাণীর অবস্থানুসারে আকৃতিগত পরিবর্ত্তন হয়, একজাতীয় জীব অন্যজাতীয় জীবে পরিণত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য প্রাণিবিদ্যাতে এতাদৃশ পরিবর্ত্তন (change) মেটামরফসিস্ (metamorphosis) এই নাম দ্বারা উক্ত হইয়াছে। *

---

* "This is expressed by saying that development is in this case accompanied by a metamorphosis, this word literally meaning simply a change, being always used in

জিজ্ঞাসু—পাশ্চাত্য প্রাণিবিদ্যা এইরূপ পরিণামের কারণ সম্বন্ধে যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহা অবগত হইয়া, আমি তৃপ্তিলাভ করি নাই।

বক্তা—প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকেই (Natural Selection) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন। তাপ, শৈত্য ইত্যাদির ন্যূনাধিক্য, দৈশিক প্রকৃতিগত ভেদ, অভ্যাসবিশেষ (adaptation) ইত্যাদি কারণবশতঃ প্রাণিদিগের আকৃতিগত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। পক্ষপাতশূন্যহৃদয় হইয়া এ সম্বন্ধে বহু বিচার করিয়াছি, এবং ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাস জাত্যন্তর পরিণাম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এতদ্বিষয়ক বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিয়া আমি বুঝিয়াছি, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের অনুমান সদোষ। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, মনুষ্যে যে প্রকার শক্তি-সম্পন্ন ইন্দ্রিয়-চিত্তাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহারা মনুষ্য-প্রকৃতিক, এইরূপ দেবতাদিতে যে প্রকার শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়-চিত্তাদি আছে, তাহারা দেবাদিপ্রকৃতিক। সর্ব্বজীবের করণ শক্তিতে, সেই করণের যত প্রকার পরিণাম হইতে পারে তাহার প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। যখন একজাতি হইতে অন্যজাতিতে পরিণাম হয়, মনুষ্য যখন দেবজাতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তখন সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান বা অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে যেটী উপযুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত দ্বারা অবসর পায়, সেই প্রকৃতি

---

biology to express a striking and fundamental difference in form and habit between the young and the adult; as for instance, between the tadpole and the frog, or between the caterpillar and the butterfly.

—Biology by T. J. Parker, DSc, F.R.S. p. 133,

আপূরিত—অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজ অনুরূপ ভাবে সেই করণকে পরিণত করায়।

জিজ্ঞাসু—প্রকৃতির আপূরণ কিরূপে হয়? ধর্ম্মাধর্ম্ম কি প্রকৃতির প্রয়োজক, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত দ্বারা কি প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে?

বক্তা—পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—না, তাহা হয় না, নিমিত্ত প্রকৃতি সকলের প্রয়োজক—প্রবর্ত্তক নহে, কার্য্য দ্বারা কখন কারণ প্রবর্ত্তিত হয় না। ক্ষেত্রিক—কৃষক (husbandman) যখন একটী জলপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে অন্য একটী সম, নিম্ন বা নিম্নতর ক্ষেত্রকে জলে প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করে, তখন হস্ত দ্বারা জল সেচন করে না, সে ক্ষেত্রের আবরণ ভেদ করিয়া দেয়, ক্ষেত্রের আবরণ ভিন্ন হইলে জল স্বতঃই সেই ক্ষেত্রকে প্লাবিত করে, সেইরূপ ধর্ম্ম প্রকৃতি সকলের আবরণভূত অধর্ম্মকে ভেদ করে,ধর্ম্ম কর্ত্তৃক অধর্ম্মের আবরণ ভিন্ন হইলেই প্রকৃতি স্বতঃই নিজ নিজ বিকারকে আপ্লাবিত করে, ধর্ম্ম প্রকৃতি সকলের আবরণকে—অধর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধককে অপনোদিত করিলেই প্রকৃতি আপনা হইতে স্ব স্ব কার্য্যরূপে পরিণত হয়। কৃষক ক্ষেত্রের জলীয় বা ভৌম রস ধান্যমূলে অনুপ্রবেশ করাইতে পারে না, কিন্তু সে ক্ষেত্রমল—ক্ষেত্রের আগাছা সকলকে ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিতে, পারে; ক্ষেত্র হইতে উহারা উৎপাটিত হইলে রসসকল স্বয়ং ধান্যমূলে অনুপ্রবেশ করিয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—ধর্ম্ম শব্দের অর্থ কি? ধর্ম্ম দ্বারা অধর্ম্মের আবরণ অপনোদিত হইলে, প্রকৃতি স্বয়ং যথাযোগ্য পরিণাম সাধন করেন, আর একটু বিশদভাবে এই সকল অতিমাত্র প্রয়োজনীয় কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—পূর্ব্বে বলিয়াছি, সর্ব্বপ্রকার জীবের করণশক্তিতে সেই করণের যতপ্রকার পরিণাম হইতে পারে, তাহাদের প্রকৃতি অন্তর্নিহিত আছে। মানুষের করণশক্তিতে দেবতার করণশক্তি, সিদ্ধের

করণশক্তি, তির্য্যক্‌জাতির করণশক্তি অন্তর্নিহিত আছে। যোগাভ্যাস দ্বারা মানুষের দিব্যশ্রবণ ও দিব্যদর্শন শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে তাহা হয়?

বক্তা—দিব্যশ্রুতি ও দিব্যদর্শন নামক প্রকৃতির ধর্ম্ম দূরশ্রবণ, দূরদর্শন। যে প্রকৃতির বিকাশ হইবে, তাহার বিপরীত ধর্ম্মের নাশ হইলেই, তৎপ্রকৃতি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই করণকে পরিণামিত করে।

জিজ্ঞাসু—যদি দূরশ্রবণ ও দূরদর্শনের অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে কি দিব্যশ্রুতি ও দিব্যদর্শনের বিকাশ হইতে পারে?

বক্তা—মানুষভাবে দূরশ্রবণ দূরদর্শন অভ্যাস করিলে দিব্যশ্রুতি দিব্যদর্শনের বিকাশ হয় না। মানুষপ্রকৃতির ধর্ম্ম দৈবপ্রকৃতির বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, দৈবপ্রকৃতির তুলনায় অধর্ম্ম। অতএব মানুষভাবে দূর শ্রবণাদির অভ্যাস করিলে, দৈবপ্রকৃতির আবরণ অপনোদিত হয় না। যে প্রকৃতির যাহা নিজগুণ তৎপ্রকৃতির তাহা ধর্ম্ম। মানুষপ্রকৃতির যাহা গুণ তাহা মানুষপ্রকৃতির ধর্ম্ম, কিন্তু তাহা দৈবপ্রকৃতির অধর্ম্ম, দৈবপ্রকৃতির বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। অতএব মানুষধর্ম্মের নিরোধরূপ নিমিত্ত হইতে দিব্য প্রকৃতি স্বয়ং অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। কুমার নন্দীশ্বর দেবত্বপ্রাপক ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা অধর্ম্মকে নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাই ইহজীবনেই তাঁহার দৈবপ্রকৃতি আবির্ভূত হইয়াছিল, ইহজীবনেই তিনি দেবতা হইয়াছিলেন। নহুষ রাজার অধর্ম্ম দ্বারা দিব্য ধর্ম্ম নিরুদ্ধ হওয়ায় তিনি অজগর সর্পরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। যেরূপ কর্ম্ম করা যায়, তদ্রূপ প্রকৃতির আপূরণ হইয়া থাকে। * ত্রিগুণানুসারে বহুবিধ দেহ ও ইন্দ্রিয়প্রকৃতি হইতে পারে।

---

* "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।"

পাং দং কৈ পা ৩ সূ।

"নহি ধর্ম্মাদি নিমিত্তং প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং ভবতি, ন কার্য্যেণ কারণং প্রবর্ত্ত্যত ইতি। কথং তর্হি, বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিক বদ্ যথা ক্ষেত্রিকঃ কে।

একরূপ প্রকৃতির ধর্ম্মকে নিরোধ করিলে, অন্যরূপ প্রকৃতি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয়। মানুষভাবে দূর শ্রবণাদির অভ্যাস করিলে, দিব্য শ্রবণের পরিণাম হইতে পারে না, মানুষভাবে দূর শ্রবণাদির অভ্যাস করিলে, তদ্দ্বারা অন্য প্রকৃতির—মানুষব্যতিরিক্ত দেবাদিপ্রকৃতির শ্রবণশক্তির আবির্ভাব হয় না। মানুষভাবে দূরশ্রবণাদির অভ্যাস করিলে দিব্যশ্রবণ শক্তির আবির্ভাব হয়না, এই কথার তাৎপর্য্য যথাবৎ গৃহীত হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, "দেবতা হইয়া দেবতার অর্চ্চনা না করিলে, দেবতার প্রকৃত অর্চ্চনা হয় না", তাহা হইলে, অর্চ্চনার প্রকৃতরূপ তোমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে। অর্চ্চনীয়ের দর্শন লাভ করিতে হইলে কিরূপে অর্চ্চনা করা উচিত, তাহা তুমি জানিতে পারিবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কি জাত্যন্তর পরিণামের এমন ব্যাপক, এমন বিশুদ্ধরূপ দেখাইতে পারিয়াছেন? যে নিমিত্ত জাত্যন্তর পরিণামের কথা উঠিয়াছে তাহা এখন স্মরণ কর।

জিজ্ঞাসু—আপনি বলিয়াছেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ত্যাগ করিলেই যদি ইংলিশাদি জাতির পরিণাম হইত, তাহা হইলে, জাত্যন্তর পরিণামে প্রকৃতির আপূরণের আবশ্যকতা থাকিত না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ত্যাগ করিলেই ইংলিশাদি জাতির পরিণাম হয়না, জাত্যন্তর পরিণামে প্রকৃতির আপূরণ আবশ্যক, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত জাত্যন্তর পরিণাম সম্বন্ধে ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ উক্ত হইল। এখন দেখিতে হইবে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ছাড়িলে, আধুনিক শিক্ষিত বৈদিক আর্য্যজাতির কিরূপ পরিণাম হওয়া সম্ভব।

বক্তা—এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে পরিণত হইতে হইলে, তজ্জাতীয় প্রকৃতির আপূরণ হওয়া আবশ্যক। প্রকৃতির আপূরণে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্তের অপেক্ষা আছে। অতএব বৈদিক আর্য্যজাতির ইংলিশাদি জাতিতে পরিণত হইতে হইলে বৈদিক আর্য্যজাতীয়

প্রকৃতিকে নিরোধ করিতে হইবে, যে ধর্ম্মবশতঃ ইংলিশাদি জাতির পরিণাম হইয়া থাকে, বৈদিক আর্য্যজাতিকে সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যে যে রূপ কর্ম্ম করিলে ইংলিশাদি জাতিতে পরিণত হওয়া যায়, বৈদিক আর্য্যজাতিকে সেই সেই রূপ কর্ম্ম করিতে হইবে। বৈদিক আর্য্যজাতীয় প্রকৃতির যাহা অসাধারণ ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম, ইংলিশাদিজাতীয় প্রকৃতির তাহা পরধর্ম্ম, এবং ইংলিশাদিজাতীয় প্রকৃতির যাহা অসাধারণ ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম, বৈদিক আর্য্যজাতীয় প্রকৃতির তাহা পরধর্ম্ম, তাহা অধর্ম্ম বা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে যে দ্বিবিধ, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। * মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্ম মনুষ্য মাত্রের অনেকতঃ একরূপ,

---

* সাধারণ ও অসাধারণ এই দ্বিবিধ ধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে কিছু বলিব। মহর্ষি পরাশর এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর।

"সর্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥"—পরাশরসংহিতা।

দেশ, কাল ও অবস্থাদিভেদে ধর্ম্মসকলের বহুবিধত্ব হইয়া থাকে। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে—উমা মহেশ্বর সংবাদে ইহা প্রপঞ্চিত হইয়াছে। কলিতে মনুষ্যদিগের প্রয়াসসাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবেনা, ধর্ম্মের জন্য কলির মানুষগণ বিশেষ প্রয়াস করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে ধর্ম্ম দ্বিবিধ। সাধারণ ধর্ম্মসম্বন্ধে বৃহস্পতি ও বিষ্ণু এইরূপ উপদেশ দিয়াছেনঃ—"দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস (যে সকল কর্ম্মের, সুশুভ হইলেও, অনুষ্ঠানে শরীর পীড়িত হইতে পারে, সেই সকল কর্ম্ম অধিক না করার নাম অনায়াস), মঙ্গল (প্রশস্ত আচরণ, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যে সমস্ত আচরণকে হিতজনক বলিয়াছেন, সেই সমস্ত কল্যাণকর আচরণ প্রশস্ত এবং যে সকল আচরণকে তাঁহারা অকল্যাণকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সকল অপ্রশস্ত। নিত্য প্রশস্ত আচরণ করা এবং অপ্রশস্ত আচরণের বিবর্জ্জন মঙ্গলকর বলিয়া উহারা মঙ্গল নামে উক্ত হইয়াছে), অকার্পণ্য, অস্পৃহত্ব ইত্যাদি সাধারণ ধর্ম্ম, ইহারা মনুষ্য মাত্রের ধর্ম্ম। বিষ্ণু সাধারণ ধর্ম্মের

কিন্তু অসাধারণ ধর্ম্ম জাতিভেদে, দেশভেদে, বিশিষ্টপ্রকৃতিভেদে বিভিন্ন হওয়া প্রাকৃতিক। মানুষের দেহধারী হইলেই ঠিক মানুষ হয়না। মনুষ্য দেহধারীর অন্তরে হিংস্র পশ্বাদি সদৃশ প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়া, লিঙ্গ দেহে পিশাচ বা রাক্ষস এবং স্থূলদেহে মানুষ হওয়া. অসম্ভব নহে। সূক্ষ্মদর্শীর নয়নে তাদৃশ মানুষদেহধারীর প্রকৃত রূপ পতিত হইয়া থাকে। অতএব মানুষমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম যে একরূপ হয়না, তাহা মনে রাখিও। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে বৈদিক আর্য্যজাতি ভিন্ন (বৈদিক আর্য্যজাতিতে যে ভাব ছিল বা এখনও কিয়ৎপরিমাণে আছে ঠিক তদ্ভাবে) অন্য কোন জাতিতে নাই, তাহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বলা যাইতে পারে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কুমারিকা দেশবাসী আর্য্যজাতির অসাধারণ ধর্ম্ম। দৈশিক প্রকৃতি ভেদ বশতঃ মানুষের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ভেদ হয়। সকল দেশে যে সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষের উৎপত্তি হয়না, সকল প্রাণি যে সর্ব্বদেশে জন্মগ্রহণ করেনা, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা স্বীকার করেন। একজাতীয় বৃক্ষের ফল দেশভেদে একটু ভিন্ন আকারের হয়, রসাদি সম্বন্ধেও অন্যরূপ হইয়া থাকে। অতএব বৈদিক আর্য্যজাতির পরিণামে যে কুমারিকার বিশিষ্ট প্রকৃতির কার্য্যকারিতা আছে, তাহা মানিতে হইবে। বৈদিক আর্য্যজাতি যদি ক্রমশঃ অভ্যাস করেন, বৈদিক আর্য্যজাতীয় অসাধারণ ধর্ম্মকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে, এ জাতির কিরূপ পরিণাম হইবে. তাহা চিন্তা কর।

স্বরূপ বর্ণনার্থ বলিয়াছেন, 'ক্ষমা সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা গুরুশুশ্রূষা, তীর্থানুসরণ, দয়া, আত্মরক্ষিত্ব, অলোভত্ব, দেবতাদিগের পূজন ও অনভ্যসূয়া, ইহারা সামান্য ধর্ম্ম। অসাধারণ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম। পরাশর সংহিতা ও মাধবাচার্য্য কৃত তদ্ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

জিজ্ঞাসু—আমার এখন উপলব্ধি হইতেছে বৈদিক আর্য্যজাতির তাহা হইলে 'ইতোভ্রষ্ট ততো নষ্ট' অবস্থা হইবে, বৈদিক আর্য্যজাতি তাহা হইলে, না পারিবেন ঠিক ইংলিশাদি জাতিতে পরিণত হইতে, না পারিবেন বৈদিক আর্য্যজাতীয় প্রকৃতিতে (স্বভাবে) অবস্থান করিতে। ভারতবর্ষে থাকিয়া ঠিক য়ুরোপীয়, আমেরিকান বা জাপানী হওয়া সম্ভবপর নহে। সম্পূর্ণরূপে ইংলিশাদি জাতির প্রকৃতি পাইতে হইলে, ইংলণ্ডাদি দেশে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, অনেকতঃ ইংলিশাদি জাতিতে পরিণত হইলেও অন্ততঃ তত্তদ্দেশে দীর্ঘকাল বাস করিতে হইবে, তাহা না করিলে, বৈদিক আর্য্যজাতি সম্পূর্ণরূপে ইংলিশাদিজাতিতে পরিণত হইতে সমর্থ হইবে না। যে কারণে মানুষভাবে দূরদর্শনাদি অভ্যাস করিলেও দিব্যকরণপ্রকৃতি বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, সেই কারণে বৈদিক আর্য্যজাতীয়ভাবে থাকিয়া বৈদিক আর্য্যজাতির দেশে থাকিয়া পূর্ণভাবে ইংলিশাদিজাতিতে পরিণত হওয়া অসাধ্য ব্যাপার।

বক্তা—দৈশিক প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা তুমি স্বীকার কর না কি? ভারতবর্ষের প্রকৃতি এক্ষণে যে অনেকতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। দেশের প্রকৃতি যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ও কর্ম্মের ভেদানুসারে ভিন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখন কলিযুগ চলিতেছে। কলিযুগ তমোগুণ প্রধান অতএব এ যুগে ভারতবর্ষের দৈশিক প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। ভারতবর্ষের আন্তর ও বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না হইলে, বৈদিক আর্য্যবংশধরগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে (বৈদিক আর্য্যজাতির যাহা অসাধারণ ধর্ম্ম, এ জাতির যাহা স্বধর্ম্ম তাহাকে) পরিত্যাগ করিতে সমুৎসুক হইতেন না। আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, কেবল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ত্যাগ করিলেই ইংলিশাদি জাতির ন্যায় উন্নত হওয়া সম্ভবপর নহে, ধর্ম্ম উন্নতির এবং অধর্ম্ম অবনতির কারণ, যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বশতঃ য়ুরোপাদির উন্নতি হইতেছে সেইরূপ উন্নতি করিতে হইলে,

বৈদিক আর্য্যজাতিকে সেই সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এবং যে অধর্ম্মবশতঃ বৈদিক আর্য্যজাতি ইংলিশাদি জাতিতে পরিণত হন নাই, সেই সেই অধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে হইবে। (বলা বাহুল্য, তদুদ্দেশ্য-সিদ্ধিপথে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিবন্ধক) ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ এবং ভারতবর্ষে বাস ঠিক ইংলিশাদি জাতিতে পরিণত হইবার পক্ষে আবরণ স্বরূপ। আবরণ যাবৎ ভিন্ন না হইবে, তাবৎ উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সিদ্ধ হইবে না। জাত্যন্তর পরিণামে প্রকৃতির আপূরণের—অনুপ্রবেশের যে আবশ্যকতা আছে, তাহা বোধ হয় এখন তোমার উপলব্ধি হইয়াছে। এখন চিন্তা কর—ইংলিশাদিজাতির ন্যায় উন্নত হইতে হইলে বৈদিক আর্য্যজাতির কি কর্ত্তব্য।

উৎসব।

—ঃ*ঃ—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৪শ বর্ষ। } সন ১৩২[illegible] সাল, ফাল্গুন। { ১১শ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

জল শূন্য শুষ্ক মাটী কঠিন যেমন।
রসশূন্য শুষ্ক হিয়া কর্কশ তেমন॥
তথাপি কমল আছে সবার হিয়ায়।
রসশূন্য বলি পদ্ম ফুটিতে না পায়॥
মহাপুরুষের সঙ্গ ভাগ্যে যদি হয়।
হৃদয়-সরোজ তবে ধীরে বিকাশয়॥
ত্রিলোক পাবনী রাম-কথা রামায়ণ।
বাল্মীকি কোকিল অগ্রে করেন কীর্ত্তন॥
কালে রামায়ণে যবে সংশয় উঠিল।
ব্যাসদেব কৃপা করি তাহা মিটাইল॥
অধ্যাত্ম-রামায়ণ তুল্য গ্রন্থ আর নাই।
আদি-কবি-গুপ্ত-তত্ত্ব ব্যাসদেবে পাই॥
জীবের দুর্গতি দেখি মনে দুঃখ পাই।
[illegible]॥

ইহাঁদের পদরেণু হৃদয়ে মাখিয়া।
কমল ফুটাতে সাধ সেই রস দিয়া॥
তুমি ভৃঙ্গ সেই মধু কর যবে পান।
জনম সার্থক হয় মিটে মনস্কাম॥
নিরাকার শেষে—আগে নরাকারে প্রভু।
হৃদয়-কমলে ব'সে পান কর মধু॥
শান্ত সাধু ভগবান করুণ কল্যাণ।
সবার চরণে অব্ কোটি পরণাম॥

২৯ পৌষ বুধবার ১৩২
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। প্রাতে।

কোনখানে আছ।

১। অনেক দিনত হইল খাতায় নাম লেখাইয়াছ। কিন্তু কতদূর আসিলে? গমন-পথও যে বড় বিস্তৃত। কি হইল একবার দেখনা।

২। "কর্ম্ম কারণ মুচ্যতে" না "শমঃ কারণ মুচ্যতে"। আরুরুক্ষু ত বলিতে পারনা যোগ অভ্যাস ত বহুদিন করিতেছ। যোগারূঢ় হইলেত কর্ম্ম আর থাকে না—তখন একান্তে শম অভ্যাস করা চাই। আত্মসংস্থ হইবার জন্য শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য হইতে আরম্ভ করিয়া "কামান্ ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ মনসৈবেন্দ্রিয় গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"।

৩। যতদিন লয় আর বিক্ষেপ বা তম ও রজ ভাবনা না যায়, আলস্য অনিদ্রা বা বিষয় ভাবনা, এলোমেলো চিন্তা না যায়, ততদিন "কর্ম্ম কারণ মুচ্যতে" ততদিন কর্ম্ম করিতে হয়।

৪। এই কর্ম্ম লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দ্বিবিধ। প্রাতে, মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে জপ, আহ্নিক, সন্ধ্যাপূজা ইত্যাদি এবং অন্য সময়ে পঠন পাঠন,

যজন যাজন, দান প্রতিগ্রহ, আশ্রিত রক্ষা, দুর্ব্বল রক্ষা, লোক পালন, লোক শুশ্রূষা, লোক সেবা ইত্যাদি। এই সমস্ত কর্ম্মও সর্ব্বত্র ভগবান আছেন এই বোধে করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই আমার হৃদয়-বিহারী আছেন—ভিতরে জপ আহ্নিকে তাঁর পূজা, বাহিরে লোক সেবায় তাঁর পূজা, এ ভিন্ন তোমার লয় বিক্ষেপ যাইবে না। আবার শুধু বাহিরের কর্ম্মের বিস্তারে যদি ভিতরে কর্ম্মের সময় না পাও তবে বৃদ্ধ-কাল পর্য্যন্ত বাহিরের কর্ম্মেই আটকাইয়া থাকিলে। ভিতরে আর ঢুকিতে পারিলে না। আবার বাহিরের কর্ম্ম অগ্রাহ্য করিয়া যদি শুধু ভিতরের কর্ম্মের জন্য বসিয়া থাকিয়া চিন্তা করা অভ্যাস করিতে যাও তবে চিরদিন ধরিয়া লয় বিক্ষেপ লইয়াই থাকিবে। রোজ কাটাও রোজ আসুক ইহার শেষ আর হইল না।

৫। কোন্ অবস্থায় আছ ? "কর্ম্ম কারণ উচ্যতে" বা আরুরুক্ষু কি হইয়াছ ? অর্থাৎ বাহিরে সর্ব্বত্র তিনি আছেন ভাবিয়া লোক সেবা করিয়া শুদ্ধ চিত্ত লইয়া কি ঘরে ঢুকিতে পারিয়াছ ? যাহাকে বাহিরে লৌকিক কর্ম্মদ্বারা পূজিয়া আসিলে তাহার কাছে, তাহার সমীপে কি আসন করিয়া বসিতে পারিতেছ, উপাসনা করিয়া কি তাহার নাম জপে, তাহার ধ্যানে, তাহার বিচারে স্থিরত্ব লাভ করিতেছ অথবা ভিতরে প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, বৈদিক কর্ম্ম করিয়া আসিয়া শ্রীভগবানের নিকট হইতে উঠিয়া আসিয়া বাহিরের লোক সঙ্গে তাঁহাকে দেখিয়া তিনি সর্ব্বলোকে সর্ব্ব-বস্তুতে আছেন স্মরণ করিয়া, ভাবনা করিয়া, লোকসেবা, লোক শুশ্রূষা করিতে পারিতেছ ?

৬। কর্ম্ম কি ঐরূপভাবে করিয়া কর্ম্মকে যোগরূপে পরিণত করিয়া কর্ম্মযোগী হইয়াছ ? কর্ম্মযোগী হইয়া কি আরুরুক্ষু যোগী হইলে, না চিরদিন ধরিয়া সংসারপালন জন্য টাকা টাকাই করিতেছ অথবা চিরদিন ধরিয়া ভারত উদ্ধার ভারত উদ্ধার করিয়া এত ব্যস্ত যে ভিতরে দেখিবার আর অবসর পাওনা, ভিতরে তার কাছে বসিবার সময় পাওনা সন্ধ্যা, জপ আহ্নিক একবারেই পার না ? বল কোন্ অবস্থায় আছ ?

৭। এদিকে যে চিত্ত সংক্ষেপ হইয়া আসিল কবে আত্মসংস্থ হইবে? কবে একান্তে থাকিবে? কবে শমঃ কারণ উচ্যতে হইবে? কবে মনের কর্ম্মই করিবে? কবে যোগারূঢ় হইবে?

৮। যোগারূঢ় হইয়া যোগী হইয়া, তবে যে ভক্ত হইতে হয়? "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং" মনে কর—মনে কর "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং" কবে হইবে আর? এদিকে কি যাইতে পারিতেছ—না রোজ সেই লয় বিক্ষেপ দূর করিবার জন্য কর্ম্মই কর—রোজ এক কাজ উপরে উঠিতে আর পারনা!

৯। ভক্ত হইয়া ভগবৎরসে মনটি স্থায়ীভাবে ভিজাইয়া রাখিতে পারিলে তবে "জ্ঞানাভ্যাসং সদাভবেৎ"।

পরপারে।

এ কোথায় আসিলাম? নদীতীর।

কি ঘোর অন্ধকার। নদীতীরে কে আনিল? কি খরতর স্রোত! তৃণখণ্ড ফেলিয়া দিলেও বুঝি শতধা ছিন্ন হইয়া যায়। কেন আসিলাম? আহা! শুনি সে যে পরপারে। কিরূপে পার হইব? চুলের সেতু আর ক্ষুরের ধার। কিরূপে পার হইব?

পরপারে যে যাইতে হইবে। সকলকে। কি অজ্ঞান অন্ধকারে জীব রহিয়াছে। নিজের সংবাদ কিছুই জানি না। কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, কেন আসিলাম, এ কোন্ স্থান, কি করিব, কবে করা শেষ হইবে কোথায় যাইব কোন কিছুই জানিনা। আর এই নদী? রজস্তমের নদী। লয় বিক্ষেপের নদী। কি স্রোত নিরন্তর মন-নদীতে বহিতেছে। সর্ব্বদাই সঙ্কল্প-তরঙ্গ। পরিশ্রান্ত হইলেই মূঢ়তা—বহু-কালের আলস্য অনিদ্রা। কখন জানিয়া শুনিয়া ভাবনা করি, আবার

কখন চিন্তা না করিতে ইচ্ছা করিলেও বা সাধু চিন্তা করিতে যাইলেও অসম্বন্ধ প্রলাপ। আহা! এই নদী পার হইব কিরূপে?

আর যে উপায় নাই। হা গোবিন্দ! আমায় পার কর। হে গুরো! আমায় দেখা দাও। তোমায় না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার শান্তি নাই। হা নাথ! হা জগন্নাথ! আমায় দেখা দাও। মা! আমায় সেই রমণীয় দর্শনের সঙ্গে মিলন করিয়া দাও। এই রজস্তম সঙ্কট হইতে আমায় পরিত্রাণ কর। আহা! বড় নিঃসহায় আমি—বড় নিঃসহায় আমরা সবাই। মা! আমায় লইয়া চল। তুমিই সব। তুমিই ত সেই পরমপদে সর্ব্বদা যাইতেছ। জ্যোতির্ম্ময় অষ্টদল পদ্মোপরি শ্রীচক্র। শ্রীচক্রোপরি সেই ভাস্বর বিন্দু। সকল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল স্বপ্রকাশ দ্যুতিতে ঢাকিয়া গিয়াছে। সব স্বপ্রকাশেই আছে। অখণ্ডমণ্ডাকারের উপরে যে মিথ্যা মিথ্যা, মায়া মায়া, ছায়া ছায়া, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল তাহা মিলাইয়াই এক স্বপ্রকাশ যে, সেই ভাসিতেছে। অবিদ্যা-তৎকার্য্য এই প্রপঞ্চ। বলিতেছিলাম—

স্বাবিদ্যাপদ তৎকার্য্য শ্রীচক্রোপরি ভাস্বরম্।
বিন্দুরূপশিবাকারং রামচন্দ্রপদং ভজে॥

মা তুমি সেই পরম পদেরই বরণীয় ভর্গ। সেই আদিদেবতারই তুমি। তুমিই সেই আদিদেব পরমব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। তুমিই সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত। মা আমাকে লইয়া চল। তুমিই শ্রীগুরু। তুমিই সর্ব্ব-কারণভূতা শক্তি। ওঁ শ্রীগুরুঃ সর্ব্বকারণভূতা শক্তিঃ। গুরু! আমায় পার কর। আমায় লইয়া চল। ইহা ভিন্ন উপায় নাই। এখনও নিঃসহায়, শেষের দিনে আরও নিঃসহায় হইব। এখন তবুও দেবতারা অনুগ্রহ করিতেছেন তাই দেখি শুনি খাই শুঁকি ভাবনা করি। আর তখন! যখন সবাই ত্যাগ করিবেন তখন বড় অসহায়। তাই দিন থাকিতে শেষের দিনে, যেখানে সহায়শূন্য হইয়া চক্ষু ঢাকিয়া লইয়া যাইবে সেই হৃদ্পদ্মে তোমারে বসাইয়া তোমারে ডাকি। তোমার

কাছে প্রতি নিয়ত আরজী করিয়া রাখি। আমায় এখন পারের শেষের দিনেও পার করিও। মা! গুরু! গোবিন্দ সবই আমার রাম। ভোলারাম মাং উদ্ধার। ইতি

শ্রীচৈতন্য।

তুমি এস। হৃদয়ে এস। "হৃদয়—কমলে রাখিয়ে শ্রীপদ তিলআধ যদি দাঁড়াও হে শ্রীপদ"। যে ভাবেই তুমি এস তাহাতে আমার আপত্তি নাই। রাম রামা মনোরমা হইয়াই এস বা শিব সিমন্তিনী হইয়াই এস বা বৃন্দাবনবিহারিণী হইয়াই এস তাহাতে আমার বলার কিছুই নাই। মহালক্ষ্মীরূপেই এস বা মহাসরস্বতীরূপেই এস বা মহাকালীরূপেই এস আমি জানিয়াছি "তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ"। আমি জানিয়াছি রামই আমার সর্ব্বস্ব—জগতের সর্ব্বস্ব। আমার চৈতন্যই আমার রাম—রামই আমার আত্মা—রামই জগতের আত্মা, রামই—সকল দেহের আত্মা। রামই সকল নামরূপের আত্মা। আহা! চৈতন্যং মম বল্লভং এ কথা বড় সত্য। রামই আমার আমি—রামই আমার পরব্রহ্ম—রামই আমার সচ্চিদানন্দমদ্বয়—রামই আমার সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত সত্তামাত্রমগোচর। রামই আমার দয়িত, রামই আমার ঈপ্সিততম্ রামই আমার সকল সাধের সমষ্টি। চৈতন্যই আমার রাম, চৈতন্যই আমার আমি। জগৎ সত্তালাভ করিয়াছে আমার রামের সত্তায়—নতুবা জগৎ নাই। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরূপ সেত চৈতন্যেরই নামরূপ, শিবনাম শিবরূপ সেত চৈতন্যেরই নামরূপ, রামনাম রামরূপ সেত চৈতন্যেরই নামরূপ। সীতা নাম সীতারূপ সেত চৈতন্যেরই নামরূপ, কালী নাম কালীরূপ সেত চৈতন্যেরই নামরূপ, দুর্গানাম দুর্গারূপ সেত চৈতন্যেরই নামরূপ, রাধা নাম রাধারূপ—সবইত আমার চৈতন্যেরই নামরূপ।

চৈতন্য ভিন্ন আর কি আছে? আর সবই ত জড়। ভজনা চৈতন্যেরই হয়—চৈতন্য ভিন্ন যাহা তাহাই জড়। জড়ের ভজনা ত হয় না। চৈতন্য ভিন্ন নামরূপ কোথায় দাঁড়ায়? এস এস চৈতন্য মা রূপে এস, রামরূপে এস। যে রূপে পার সেইরূপে এস। আর কি বলিব? বলা আর হইল না। ইতি

ভিক্ষা।

তুমি যাহা চাও আমাতে গো দাও
তোমারি কারণে মাগি,
স্নেহ চক্ষে চাও মুকুল ফুটাও
শ্রীপদ-পূজায় লাগি।
দাও পবিত্রতা, প্রাণে একাগ্রতা
কঠোর বৈরাগ্য জ্ঞান
পুন কর দীক্ষা, দাও গো তিতিক্ষা
তোমার মধুর ধ্যান।
দাও শম, দম, যম ও নিয়ম
সর্ব্বাঙ্গে নামের মালা।
শ্রান্ত পথশ্রমে, দিক্‌ভ্রম ভ্রমে
ঘুচাও ত্রিতাপ জ্বালা।
এ সব রতন মনের মতন
চাহিব কাহার কাছে
বল এত দয়া—প্রেম প্রীতি মায়া
কার বা পরাণে আছে।
শেষ অভিলাষ করিব প্রকাশ
এস এস ধীরে ধীরে,

সাধের সমষ্টি—পদচিহ্ন দুটি

দেখিব গো ফিরে ফিরে।

কুসুম তুলসী হয়নি তো বাসি

বুঝি বা নয়ন জলে

নূতন রয়েছে (দেখ) কেমন সেজেছে

আমার দেওয়া গো ফুলে

পুলকিত মন সফল জীবন

সফল আমার কর্ম্ম,

অহঙ্কার শূন্য করুণায় পূর্ণ

শ্রীগুরুর বুঝি (গো) ধর্ম্ম।

উদ্দেশে অর্পণ কর গো গ্রহণ

সদ্য সিক্ত ফুল দলে

চির ভালবাসা সফল ভরসা

(আমি) লুটাব চরণতলে।

(বল) কি ভাষা শুনাব কোন্ গুণ গাব

যা প্রিয় তোমার লাগে

শান্ত দাস্য লীলা সখ্য মধু খেলা

(বল) কোন্‌টি বলিব আগে।

নির্গুণ বিচার শিবোহহম্ সার

এই কি তুমি গো চাও ?

খোল আবরণ আমিত্ব বন্ধন

আমারে তাই গো দাও।

তোমার ইচ্ছা—মানুষের ইচ্ছা।

মানুষ নিজের ইচ্ছায় চলিয়া মরে, আর তোমার ইচ্ছা ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়া তোমার কৃপায় অমর হয়। কোন্‌টি আমার ইচ্ছা আর কোন্‌টি বা তোমার ইচ্ছা ইহা কি বুঝিবার কোন উপায় আছে? আছে বৈকি। এই যে চোর চুরি করে, মাতাল নেশা ভাং খায়, লম্পট লাম্পট্য করে, স্ত্রীলোকে শ্বশুরশাশুড়ীর উপর দ্রোহ করে আর স্বামীকে অবজ্ঞা করিতে ভয় করে না, ঐ যে মানুষ আচার মানেনা অত্যাচার করে, ঐ যে মানুষ যা তা খায়, সত্য কথা কয় না ঐ যে মানুষ সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম করে না, বা সংক্ষেপে করে বা নিজের মনগড়া উপাসনা করে—এসব কি তোমার ইচ্ছায় করে—না নিজের ইচ্ছায় করে? প্রশ্ন জটিল মত লাগিলেও সহজে উত্তর করা যায়।

চৈতন্য তুমি—আত্মা তুমি। তুমি কিন্তু প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়াই মূর্ত্তি ধারণ কর। মানুষের এই প্রকৃতিটি হইতেছে অনাদিসঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কারের স্থূল আকৃতি। তুমি তোমার প্রকৃতিকে বশে রাখিয়া থাক মায়াধীশ হইয়া, আর মানুষ প্রকৃতির বশে আসিয়া হয় মায়াধীন জীব। মায়াধীন জীব মায়ার বশে আসিয়া কাম, ক্রোধ ও লোভের অধীন হইয়া যে ইচ্ছা তুলে সে ইচ্ছা জীবের। কামটা নিজের ভোগের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা মানুষের নিজের ইচ্ছা। আর তোমার ইচ্ছা যাহা তাহাই প্রেম। কামুক চলে নিজের ইচ্ছায় আর প্রেমিক চলে তোমার ইচ্ছায়।

তোমার ইচ্ছা জানিব কিরূপে? আহা! তোমার ইচ্ছা তুমি আপন মুখে ব্যক্ত করিয়াছ। একটা দৃষ্টান্ত দি।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

প্রকৃতির হাতে পড়িয়াই মানুষ ঐ কুহকিনীর কুহকে বহু ইচ্ছা

করে, করিয়া চলে মরিবার পথে। এইরূপ মানুষকে তুমি সাহস দিয়া বলিতেছ প্রকৃতির হাতে যতই পড়না কেন তথাপি আমার শরণাপন্ন হইবার শক্তি তুমি রাখ। আমার শরণাপন্ন হও, হইলে মায়ার হাত এড়াইবে এই যে আজ্ঞা করিতেছ, এটি তোমার ইচ্ছা। আর একটা দৃষ্টান্ত দি।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগে যে অনুরাগ ও বিদ্বেষের ব্যবস্থা এটা কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম। আর আমার ইচ্ছা কি জান? তুমি রাগ দ্বেষের বশে যাইও না, কেন না ঐ উভয়ই তোমার পরম শত্রু।

এইরূপ আমার ইচ্ছা ও তোমার ইচ্ছার কথা শাস্ত্র সর্ব্বস্থানেই প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্র হইতেছে শাসনবাক্য এই শাসনবাক্য শ্রীভগবানের ইচ্ছা। তুমি বলিতে পার শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্তও ত অনেক আসিয়া পড়িয়াছে? হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও শ্রীভগবানের ইচ্ছা কোন্‌গুলি তাহা সহজেই ধরা যায়। আর এমন কতকগুলি শাস্ত্র আছে যাহা কোন কিছু প্রক্ষিপ্ত হইবার উপায় নাই। ধর গীতা। গীতাতে কেহ কিছু প্রক্ষিপ্ত দেখাইতে পারে না—কারণ গীতাতে সব আটঘাট বাঁধা। আর গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী। এক গীতা যদি ভাল করিয়া বুঝিয়া পড় আর গীতার ভাবনা করিতে পার তবে তুমি শ্রীভগবানের ইচ্ছাগুলি বেশ করিয়া বুঝিবে। 'নিত্যকর্ম্ম করাই চাই ইহা শ্রীভগবানের ইচ্ছা। "যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ" ইহা শ্রীভগবানের ইচ্ছা। "তপঃস্বাধ্যায় ঈশ্বর-প্রণিধান্ ইহাও ঈশ্বরের ইচ্ছা। "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" ইহাও ঈশ্বরের ইচ্ছা। "পিতৃদেবোভব" ইহাও ঈশ্বরের ইচ্ছা। তুমি যদি বল শাস্ত্র কখন নির্ভুল হয় না কারণ সকল শাস্ত্রই মানুষে রচনা করিয়াছে তবে বলিব তুমি নষ্টবুদ্ধি। যাউক—শেষে আর একটি তোমার ইচ্ছার কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে ভগবান ব্যাসদেব বলিতেছেন—

এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্।
নাস্তি যস্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সন্ধ্যাত্রয়মকুর্ব্বাণঃ সূর্য্যং হন্তি চ পাপকৃৎ।
অস্নায়ী চ মলং ভুঙ্‌ক্তে অজপী পূয় শোণিতম্॥
অকৃত্বা তর্পণং নিত্যং পিতৃহা চোপজায়তে॥

প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যা এই সন্ধ্যাত্রয়েই ব্রাহ্মণ্য অধিষ্ঠিত আছেন। সন্ধ্যায় যাহার আদর নাই সে ব্রাহ্মণ নহে। যে সন্ধ্যা করে না সেই পাপাত্মা সূর্য্যদেবকে—জগতের প্রাণকে—হত্যা করে। যে আলস্যবশে স্নান করেনা সে মল ভোজন করে, যে জপ করেনা সে পূয় শোণিত ভোজন করে। যে প্রতিদিন তর্পণ করেনা সে পিতৃহত্যার পাপ করে। ঋষিগণ শ্রীভগবানের ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছেন। তোমার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছার মিলন না করিয়া কেহই ঋষি হইতে পারে না। 'আপাপন্থী' কখন ঋষি হয় না। শ্রীভগবানের আজ্ঞা আর একটি বলি।—

জপেৎ সহস্রং সাবিত্রীং ব্রাহ্মণোঽহরহ দ্বিজ।
তদশক্ত্যা জপেদ্দেবীং গায়ত্রীং শতধাপি চ॥
মধ্যমা পর্ব্ব যুগলং ত্যক্ত্বা চ দশপর্ব্বভিঃ।
দক্ষেণ পাণিনা জপ্যা ঘন্নীভূতাঙ্গুলেনবৈ॥
সাবিত্রীং প্রজপেৎ বিপ্রঃ প্রাতর্মধ্যাহ্ন উত্থিতঃ।
উষিত্বা প্রজপেৎ সায়ং পশ্চিমাভিমুখস্তথা॥

সংক্ষেপার্থ এই। প্রাতে ও মধ্যাহ্নে আসনের উপরে দাঁড়াইয়া হাজার জপ করিবে। যদি নিতান্ত অসমর্থ হও তবে শতবার। সায়ংসন্ধ্যা পশ্চিমমুখে বসিয়া করিবে। এই সময়ে গায়ত্রী জপ দাঁড়াইয়া নহে, বসিয়া।

শতবার গায়ত্রী জপে দিনগত পাপ ও সহস্র জপে নিখিল পাপক্ষয় হয়। গায়ত্রী জপ শেষ করিয়া—

মহেশমুখসম্ভূতা বিষ্ণোর্বক্ষসি সংস্থিতা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥
মন্ত্রেণানেন গায়ত্রীং সূর্য্যে খলু সমর্পয়েৎ॥

সন্ধ্যোক্ত বিসর্জ্জন মন্ত্রে সূর্য্যদেবেই জপ সমর্পন করিবে।

কলির ব্রাহ্মণ বড় উপদ্রুত সত্য। কিন্তু তুমিত "অবসর" লইয়া ৺কাশীবাস করিতেছ প্রতিসন্ধ্যায় হাজার জপ করিতে তোমার বাধা কি?

ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তাহাত বলা হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছাই ত ঈশ্বরের আজ্ঞা। এই আজ্ঞাপালনরূপ সারকর্ম্ম করিয়া এই জীবন সেই শেষ জীবন করিয়া ফেলিতে দোষ কি? একটু প্রাণায়ামে রুচি লাগিয়াছে বলিয়া সন্ধ্যা নিম্ন অধিকারীর জন্য ইহা বলিয়া আর অধঃপাতে না গেলে। প্রাণায়াম করিতে ভাল লাগে গায়ত্রীজপের সঙ্গেও প্রাণারাম বেশ চলে।

বলা ত হইল কিন্তু করে কে? সবাই পারিবেনা সত্য কিন্তু যাঁহারা কলির আক্রমণের বাহিরে যাইতে চান তাঁহারা ইহা দ্বারাই কলিমুক্ত হইবার প্রয়াস করিবেন ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীভরত।

(পুনরাবৃত্তি)

ভরত পরক্ষণেই ভাবিলেন, তিনি আমার মত দুর্ভাগা দীনকে চরণ সেবার অধিকারী করিবেন? ভরত এ নিদারুণ কথা স্মরণ করিয়া কেমনই হইলেন। পরে ভক্তিভরে মনে মনে রাম চরণে প্রণাম করিয়া ভাবিলেন, আমার এ আকাশকুসুম কল্পনা কখন সত্য হইতে পারে না। কই রামত কখন কাহারও উপর নির্দ্দয় হন নাই।

শ্রীরামের রূপগুণ স্মরণ হইবামাত্র ভরতের সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া গেল। পরক্ষণেই ভাবিলেন, আমার প্রভু যে সর্ব্বভূতে সমদর্শী কাকুস্থ করুণাময় গুণেরসাগর; অন্ধ, আতুর, অনাথ, নিরাশ্রয়, অকৃতি, অধম দেখিয়া তিনিত কাহাকেও তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার প্রিয় অপ্রিয় কেহই নাই। আজ অযোধ্যার নর-নারী কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত রাম দর্শনে চলিয়াছে, রাম যে সর্ব্বজনবল্লভ—সে দেবদুর্ল্লভ শ্রীরামের গুণ ও কর্ম্ম একবার স্মরণ করিলে অতি হীন পাতকীরও পাপরাশি মুছিয়া যায়। সর্ব্বান্তর্য্যামী রাম আমার অন্তরও দেখিতে-ছেন, তিনিত জানেন আমার একমাত্র তাঁহার সেই শমন-ভয়-বারণ অভয় চরণ ভিন্ন কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। তিনিত জানেন আমার হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর একমাত্র রাম, তাঁহার সেই নবজলধর রামরূপের ভাতিতে অন্তর ভরিয়া আছে তাঁহারই নামগুণ শ্রবণে শ্রবণমন মুগ্ধ হইয়া আছে। আর অজ্ঞান জীব প্রতিপদে তাঁহার চরণে অগনিত অপরাধ করিতেছে তিনি যদি সকল অপরাধের দণ্ডই দিতেন তবে কখন জীব পাপশূন্য হইয়া তাঁহার নিকট যাইতেই পারিত না। তাঁহার অপার অগাধ স্নেহবারিধি হইতে স্নেহদানে কাহাকেও ত কৃপণতা করেন নাই। কেবল অজ্ঞান জীবের চিত্ত অশুদ্ধ থাকায় সেই চিৎস্বরূপ চিন্মণির বিকাশ দেখিতে পায় না। সাধনার দ্বারা মাজিয়া ঘসিয়া চিত্তকে যে যতটুকু নির্ম্মল করিতে পারিয়াছে সে ততটুকু তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিতে পারে মাত্র। নতুবা অহং অভিমানী অজ্ঞান জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণা করিবার স্থান কোথায়? তবে দীনবৎসল রাম নিশ্চয় আমার শত দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহার সুন্দর, সুপবিত্র শীতল ক্রোড়ে স্থান দিয়া এ দগ্ধ হৃদয়ের দারুণ জ্বালা নির্ব্বাপিত করিবেন। আবার দর্শন লালসায় ভরতের হৃদয় উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে তাঁহার প্রভুকে বলিলেন, হায়! প্রভু অজ্ঞানকৃত কর্ম্মজাল জড়াইয়া অজ্ঞানে দুঃখের কল্পনা করিয়া অজ্ঞান জীব অনন্ত করুণাধার তোমাকে না জানিতে পারিয়া নিরন্তর জ্বালামালায়

দগ্ধ হইয়া তোমাতেই দোষরোপ করে। জানিনা এ ভ্রম জীবের কবে ঘুচিবে।

নতুবা সুখদুঃখে অবিচলিত, চিরশান্তির আধার, রাম চিরদিন স্থির, ধীর, গম্ভীর, রাম যে চিরকালই একরূপ, চিরদিনই শান্ত, সকলের দ্রষ্টাস্বরূপ প্রাণারাম, চিরদিনই আপনভাবে আপনি পূর্ণ। ভরত এইরূপ রাম চিন্তা করিতে করিতে রামময় হইয়া তাহার ভাবনারাজ্যে একমাত্র রামকেই দেখিতেছেন, তাই শ্রীরামের সেই অমৃতময় আদর-মাখা ডাক শুনিতে পাইয়া কখন বা ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন, কখনও বা নামের মাঝে ডুবিয়া শ্রীরামের পবিত্র অঙ্গস্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া চলিতে চলিতে গতি স্থির হইয়া যাইতেছে, আবার বহির্দৃষ্টি হইয়া দেখিতেছেন, রাম যে বনে আছেন, তাই আবার দ্রুতপদে গমন করিতেছেন। শ্রীরাম-বিরহ-ক্লিষ্ট জটাবল্কলধারী ভরত এই কয়দিনেই অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, তবুও কি যেন স্বর্গের সুষমায় তাঁহাকে ভরিয়া রাখিয়াছিল, সুন্দর, স্নিগ্ধ জ্যোতিতে যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছিল, হা রাম কমললোচন ভিন্ন ভরতের আর কোন বাক্য নাই, রাম চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তা নাই, রামের সুন্দর অঙ্গ, সুকুমার কান্তি, রূপগুণ কর্ম্ম সূক্ষ্মে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাই বাহিরের কোন কিছুতে তাঁহার আর দিক্‌পাত নাই, মহা কোলাহলে বনরাজি পূর্ণ করিয়া সকলে গমন করিতেছে। শ্রীভরতের ভিতরে এত জোরে রাম রাম শব্দ ঝঙ্কার দিতেছে যে অন্য কোন শব্দই তাহার শ্রুতিগোচর হইতেছে না, কত পথ কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া চরণ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, শ্রীভরত, শ্রীরাম চিন্তায় এতই অনন্যমনা যে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না।

কতক্ষণ পরে শৃঙ্গবেরপুরে বিষ্ণুপাদবহির্গতা মহাপাতকনাশিনী, মহাদেবের জটানিঃসৃতা ত্রিলোকতারিণী সাগরবণিতা গঙ্গানদীর নিকটস্থ হইলেন। ভরতের অনুগামী সকলেই সেই চক্রবাক সমূহে অলঙ্কৃত ক্রৌঞ্চনিনাদিত পূণ্যসলিলা সাগরগামিনী ভাগীরথীর নিকট গিয়া গমনে নিবৃত্ত হইল।

তখন ভরত অমাত্যগণ সকলকে বলিলেন তোমরা এখানে বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর কর। আমি এই নদীমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গগত মহীপতি দশরথের পারলৌকিক মঙ্গলার্থ তর্পণকার্য্য সমাধান করিয়া নদীপার হইয়া শ্রীরামকে আনিতে যাইব।

'নিবেশ্য গঙ্গামনু তাং মহানদীং চমূংবিধানৈঃ পরিবর্হশোভিনীম্।
উবাস রামস্য তদা মহাত্মনো বিচিন্তমানো ভরতো নিবর্ত্তনম্'। ২৬॥

ভরত সেই মহানদী গঙ্গাতীরে ভূষণাদিবিভূষিত চতুরঙ্গ সেনা সন্নিবেশ করিয়া মহাত্মা রামকে নিবৃত্ত করিবার উপায় চিন্তা করতঃ তথায় বাস করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

সেই প্রদেশে নিষাদজাতীয় গুহ নামে রামের প্রাণতুল্য এক সখা রাজা ছিলেন। মহাসমারোহে সৈন্যগণ সহিত ভরত আসিয়াছেন জানিয়া নিষাদরাজ গুহের ভয় ও সন্দেহ হইল, নিষাদ ভাবিল রামবিদ্রোহী ভরত পূর্ব্বে রাম মিতা, পরে শ্রীরামের অনিষ্ট করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবার মানসে এখানে আসিয়াছেন, অতএব জ্ঞাতিগণকে সশস্ত্র ও সাবধান করিয়া শীঘ্র ভরত সন্নিধানে ঘটনা জানিতে গমন করিল। কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতেই তার সকল সন্দেহ ঘুচিয়া চক্ষে জল আসিল—

"চীরাম্বরং ঘনশ্যামং জটামুকুটধারিনম্"।
রামমেবানুশোচন্তং রাম রামেতি বাদিনম্॥

তাহার পরিধানে চীরবস্ত্র বর্ণ মেঘবৎশ্যাম মস্তকে জটাভার কিরীট, তিনি সর্ব্বদা 'রাম' 'রাম' ধ্বনি করিতেছেন, এবং রামের জন্যই শোক করিতেছেন। গুহ ভক্তিভরে ভূতললুণ্ঠিত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন বশিষ্ঠদেব ভরতের নিকট রামমিত্র গুহের পরিচয়

প্রদান করিলেন, ভরত তাঁহাকে আদরে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক শ্রীরামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বলিলেন এই গঙ্গাসলিল-প্লাবিত প্রদেশ নিতান্ত গহন এবং দুর্গম, আমি কোন্ পথ দিয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে, রাম সন্নিধানে গমন করিব ?

কাননবাসী গুহ তখন ভরতকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত হইয়া, প্রণাম-পূর্ব্বক নিবেদন করিল, প্রভু! ইহা আপনারই রাজ্য, আপনার দাসগণ এবং আমিও আপনার অনুগমন করিব, আজিকার রাত্রি এই পরিশ্রান্ত জনগণ এখানে বিশ্রাম করিতে আজ্ঞা হয়।

ভরত, গুহকর্ত্তৃক তোষিত হইয়া সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, শত্রুঘ্নের সহিত শয্যা গ্রহণ করিতে গেলেন, সেই সময়ে সেই দুঃখ-ভোগের অযোগ্য ধর্ম্মনিরত মহাত্মা ভরতের রামচিন্তা জন্য যে ভীষণ শোক উপস্থিত হইল তাহা বর্ণনাতীত।

"অন্তর্দাহেন দহনঃ সন্তাপয়তি রাঘবম্"।
"বনদাহাগ্নি সন্তপ্তং গূঢ়োঽগ্নিরিব পাদপম্" ॥

যেরূপ দাবানলসন্তপ্ত বৃক্ষ নিজ অভ্যন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন অগ্নিদ্বারা অন্তরে সন্তাপিত হইতে থাকে, সেইরূপ ভরত শোকাগ্নিদ্বারা অন্তরে সন্তাপিত হইলেন।

প্রস্রুতঃ সর্ব্বগাত্রেভ্যঃ স্বেদং শোকাগ্নিসম্ভবম্।"
যথা সূর্য্যাগ্নিসন্তপ্তো হিমবান্ প্রস্রুতো হিমম্।"

সূর্য্যতাপে তাপিত হিমালয় পর্ব্বত হইতে যেরূপ হিমজল ক্ষরিত হয়, সেইরূপ তখন শোকাগ্নি তাপিত ভরতের সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইল। পরে সেই ভরত বিষম বিপদগ্রস্থ হইয়া মানস-জ্বরে পীড়িত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেক রহিত হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন।

"শমং ন লেভে হৃদয়জ্জরার্দ্দিতো"
নরর্ষভো যুথহতো যথর্ষভঃ ॥

যূথভ্রষ্ট বৃষভের ন্যায় ভরত কিছুতেই চিত্তের শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তখন গুহ কাতর হইয়া ভরতকে আশ্বাস দিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণের দেবচরিত্র এবং রামের প্রতি তাঁহার যে প্রীতি, যেরূপ সদ্ভাব ও ভক্তি সে সমস্ত বিস্তারিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, এবং আরও বলিলেন, লক্ষ্মণ ও সীতা রামের নিকট থাকায়, শ্রীরামের কোন অভাব থাকিবে না। ক্রমে ক্রমে রামের সহিত যাহা কথোপকথন হইয়াছিল, এবং তিনি যেমনভাবে শয়ন ভোজন গমন করিয়াছিলেন, সমস্ত বলিয়া পরে শ্রীরাম যে প্রকারে জটানির্ম্মিত করিয়াছিলেন তাহাও বলিলেন।

শ্রীরামের "জটাধারণ" এই অপ্রিয়বাক্য শুনিবামাত্র ভরত মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই সিংহসম বিক্রমশালী পদ্মতুল্য বিশাল নয়ন, দীর্ঘবাহু, সুকুমার প্রিয়দর্শন ভরত, মুহূর্ত্তকাল পরে আশ্বস্ত হইয়া সহসা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া অবসন্ন হইলেন। ভরতকে ভূমিতলে পতিত দেখিয়া শত্রুঘ্ন বার বার আলিঙ্গন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পতির মৃত্যুতে ক্ষীণা, দীনা ভরতের মাতাগণ আসিয়া ভূপতিত ভরতের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। পরে সেই শোকাকুলা, পুত্রবৎসলা, তপস্বিনী কৌশল্যাদেবী ভরতকে আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, পুত্ররে, অকস্মাৎ তোর হৃদয়ে কোন্ আঘাত লাগিল? বল্ বৎস! তোর কি কোন ব্যাধি হইয়াছে? আমি যে তোর রোদন, তোর কাতরতা আর সহ্য করিতে পারি না, আমি যে তোর মুখ দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি, তুমি যদি না আসিতে রামবিরহে আমার এ জীবন অনেক আগে চলিয়া যাইত, তোমার সহিত আমার রামের জগন্মোহন মূর্ত্তির অনেক সাদৃশ্য আছে তাই আমি পলকহীন নেত্রে তোমাকেই দেখি। বল পুত্র! বনবাসী রামের আমার কোন অমঙ্গল সংবাদ পাও নাই ত? তাহাহইলে আর কেন, এস আমরা সকলে মিলিয়া অনলে প্রবেশ করিয়া রামের জ্বালা জুড়াই, ইত্যাদি বাক্যে কৌশল্যাদেবী রোদন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যাদেবীর রোদনে ভরত নিজদুঃখ ভুলিয়া মাতাকে সান্ত্বনাবাক্য প্রদান করিলেন।

পরে ভরত গুহকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন ভাই তুমি পরম ভাগ্যবান যেহেতু তুমি সেই যোগীজনসেবিতমুনিমন-মোহনকারী তপস্যার সার শ্রীরামচরণ দর্শন লাভ করিয়াছ। ভাই! আবার বল তিনি কি বলিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, কোথায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন। যিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের পোষনকর্ত্তা—নানাবিধ ভোজ্য-দ্রব্য দিয়া যিনি জগতের জীবকে তৃপ্তি প্রদান করিতেছেন তাঁহাকে তুমি কোন্ আহার্য্য বস্তু প্রদান করিলে?

তখন গুহক বলিল ভাই! তিনি যে দীনদয়াল রাম দয়া করিয়া দীনের কুটিরে আপনি আসিয়াছেন আমার কিছুই নাই আমি তাঁহাকে কি দিব? আহারের জন্য সামান্য ফল যাহা লইয়া গিয়াছিলাম মহাত্মা রাম অপ্রতিগ্রহরূপ ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া সে সকল দ্রব্য স্বীকার মাত্র করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিলেন; পরে সীতাদেবী এবং তিনি, লক্ষ্মণের আনীত গঙ্গাজলমাত্র পান করিয়া উপবাসী রহিলেন, পরে তিনজনে সমাহিতচিত্তে সংযতবাক্যে সন্ধ্যা উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন; এবং ওই ইঙ্গুদী বৃক্ষতলে তৃণোপরি বহুতর কুশ আনিয়া লক্ষণ শয্যা রচণা করিয়া দিলেন আর রাম সীতা শয্যায় উপবেশন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাদিগের চরণ ধৌত করিয়া কিয়দ্দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ওই দেখ ভাই ঐ সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের তল, আর ঐ সেই তৃণপুঞ্জ, এখনও কুশশয্যা তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে। ভরত অত্যন্ত আগ্রহে সেই তরুতলে গমন করিয়া বহুপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

সেই শয্য-দর্শণ করিয়া ভরতের দুই নেত্রে শতধারা বহিতে লাগিল তিনি বলিলেন এই কি দশরথ রাজপুত্র, আমার প্রভুর শয্যা? ইহাত আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না, আমার মস্তিষ্ক কি বিকৃত হইয়া গেল, আমি কি জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্নদর্শন করিতেছি, অথবা আমার অন্তঃকরণ মোহাভিভূত হওয়া বশতঃ এইরূপ মনে হইতেছে। কিছু স্থির করিতে না পারায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন বল ভাই গুহ! আমায় সত্য করিয়া বল সেই প্রিয়দর্শন সুকুমার কমললোচন

রাম সীতার সহিত কোথায় শয়ন করিয়াছিলেন? তখন গুহ সেই কুশবিস্তৃত শয়নস্থল পুনরায় দেখাইয়া দিলেন। ভরত দেখিলেন কঠোর শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে জানকী পরিহিত অলঙ্কারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণখণ্ড পতিত রহিয়াছে। তখন ভরত বলিলেন অহো! বুঝিয়াছি,

"ইয়ং শয্যা মম ভ্রাতুরিদমাবর্ত্তিতং শুভম্।
স্থণ্ডিলে কঠিনে সর্ব্বং গাত্রৈর্ব্বিমৃদিতং তৃণম্"॥

আমার ভ্রাতা রামের এই শয্যা এই তাঁহার অঙ্গ পরিবর্ত্তনের মনোহর চিহ্ন রহিয়াছে, হায়! দশরথ তনয় রাম আর সেই বিদেহ রাজকন্যা দশরথের প্রিয়পুত্রবধূ সকলের প্রিয়দর্শনা রামপ্রিয়া সীতাদেবী ও যখন ভূতলশায়িনী হইয়াছেন, তখন আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, "ন নূনং দৈবতং কিঞ্চিৎ কালেণ বলবত্তরম্" যে কোন দৈবই কাল হইতে অধিক বলশালী নহেন।

"অহোঽতি সুকুমারী যা সীতা জনকনন্দিনী" আহা! অতি সুকুমারী কোমলাঙ্গী জনকতনয়া সীতা,

"প্রাসাদে রত্নপর্য্যঙ্কে কোমলাস্তরণে শুভে।
রামেণ সহিতা শেতে স কথং কুশবিষ্টরে॥

যিনি প্রাসাদে রত্নপর্য্যঙ্কে রামের সহিত শয়ন করিতেন, তিনি আজ রামের সহিত বৃক্ষতলে শয়ন করিতেছেন কিরূপে?

মন্যে ভর্ত্তুঃ সুখা শয্যা যেন বালা তপস্বিনী
সুকুমারী সতী দুঃখং ন বিজানাতি মৈথিলী"

ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, স্বামী যাহাতেই শয়ন করেন মহিলাদিগের সেই শয্যাই পরমসুখদায়িনী বোধ হয়, নতুবা সেই তপস্বিনী বালা সাধ্বী সীতা এই শয্যায় শয়ন করিয়াও দুঃখ জ্ঞান করেন নাই। রাজকন্যা রাজপুত্রবধূ শ্রীরামঘরণী সীতা আজন্ম সুখ

পালিতা, যিনি কখন দুঃখের মুখদর্শন করেন নাই তিনি কেমন করিয়া দণ্ডকারণ্যের এত ভীষণ কষ্ট সহ্য করিবেন ?

ধিক্ মাং জাতোঽস্মি কৈকেয্যাং পাপরাশি সমানতঃ
"মন্নিমিত্তমিদং ক্লেশং রামস্য পরমাত্মনঃ" ॥

আমাকে ধিক ! যেহেতু আমি মূর্ত্তিমানপাপরাশী সদৃশ্য কৈকেয়ী গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমার জন্য পরমাত্মা রামের এই ক্লেশ, আর আমার জন্য স্বয়ং লক্ষী সীতার এত দুর্দ্দশা।

হায় ! আমার অতি কঠিন প্রাণ ? তাহা না হইলে কেমন করিয়া এখনও এ দেহে আছে ? পুনরায় লক্ষ্মণকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, ভাই লক্ষ্মণ তুমি পরম ভাগ্যবান্ যেহেতু ধনুর্ব্বাণ লইয়া বিপদসময়ে রামের অনুগমন করিয়া রামসীতার সেবার অধিকার লাভ করিয়াছ, কোটীকল্পজন্ম তপস্যা করিয়াও যে সেবার অধিকারী হওয়া যায় না, তুমি অনায়াসে দেবতাবাঞ্ছিত সেই সেবাসুখ অনুভব করিতেছ। "অহং রামস্য দাসা যে তেষাং দাসস্য কিঙ্করঃ" "যদি স্যাং সফলং জন্ম মম ভূয়ান্নসংশয়ঃ"। আর যাহারা রামদাস আমি যদি তাঁহাদিগের দাসের দাস হই, তাহা হইলেই আমার জন্ম সফল হয়, সংশয় নাই। শ্রীভরত পুনরায় বলিলেন—

প্রসাদ্যমানঃ শিরসা ময়া স্বয়ং
বহুপ্রকারং যদি ন প্রপৎস্যতে।
ততোঽনুবৎস্যামি চিরায় রাঘবং
বনে চিরং নার্হতি মামুপেক্ষিতুম্।

আমি নতশিরা হইয়া বহুপ্রকারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেও যদি তিনি প্রতিশ্রুত প্রতিপালনে নিবৃত্ত না হন তবে আমি চিরকালই বনে তাঁহার সহিত বাস করিব তিনি কখনই বহুকাল আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

নবম অধ্যায়।

এই রূপ নিশ্চয় করিয়া ভরত সসৈন্যে শীঘ্র গঙ্গাপার হইয়া ভরদ্বাজাশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ভরত আশ্রমপীড়া নিবারণ মানসে, সৈন্যদিগকে যথাসুখে প্রয়াগবনে সংস্থাপিত করিয়া, পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া অনুজের সহিত মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর মহাতপস্বী ভরদ্বাজমুনি বশিষ্ঠদেবকে দেখিবামাত্র যথাবিহিত পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ভরত অতি ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন।

ভরদ্বাজ, দশরথপুত্র ভরতকে দেখিয়া বলিলেন, একি! তোমার এমন বেশ কেন? তুমি অযোধ্যার রাজ্যশাসন ছাড়িয়া মুনিবেশে শুষ্কমুখে এখানে কেন আসিয়াছ? এখনও কি তোমার মনোঅভিলাষ পূর্ণ হয় নাই? তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবার মানসে নিষ্পাপ রামের কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা কর নাই ত?

ভরদ্বাজ মুনির বাক্যে ভরতের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি স্থিরনেত্রে অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, পরে শ্রীরামরূপ স্মরণ করিবামাত্র অভিমানে, দুঃখে, হৃদয়ের বেদনা, চক্ষুজলরূপে প্রকাশ হইয়া বক্ষ ভাসিতে লাগিল। মনে মনে শ্রীরামচরণ স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে শত শত প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, এস গো, আমার তাপিত হৃদয়ে শান্তিদাতা রাম! আমার জ্বলিত মস্তক তোমার শীতলচরণে লুণ্ঠিত করিয়া সব যন্ত্রণার অবসান করি, এস গো দয়াল! ক্ষুদ্র অধমাধম দাসকে আর কত পরীক্ষা করিবে? প্রভু! তোমার খেলা তোমায় লয় করিয়া তোমার দাসকে তোমার করিয়া রাখ, তুমিই যে আমার একমাত্র বিপদকালের বন্ধু। আমি যে তোমার শ্রীমুখকমল না দেখিয়া মরণেও বাঞ্ছা রাখিনা। আমার যে বড় আশা প্রভু, তোমার চরণে সর্ব্বেন্দ্রিয় লুণ্ঠিত করিয়া তোমার বিরহের এ ভীষণ বহ্নি নির্ব্বাপিত করিব, অতএব তোমার দর্শনের জন্য, এ প্রাণ যেন কিছুক্ষণ দেহে থাকে।

আগে শ্রীরাম চরণে প্রণাম করিয়া, প্রার্থনা করিয়া সেই অনাহার ক্লিষ্ট অনিদ্রাপীড়িত ভরত কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া অতি বিনীতভাবে ভরদ্বাজ মুনিকে বলিলেন ঃ—

"হতোহস্মি যদি মামেবং ভগবানপি মন্যতে"
মত্তো ন দোষমাশঙ্কে নৈবং মামনুশাধি হি"

'ভগবন্' আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যদি এইরূপ মনে করেন, তবে আমার জন্মই বৃথা। আজ আমার দুর্ভাগ্যে আমি দোষী হইয়াছি, নতুবা, আমি দোষী কি নির্দ্দোষী আপনার কিছুই অবিদিত নাই। প্রভু! আপনি বলিলেন "তোমার কি এখনও বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই"? দয়াময়, আপনি অন্তর্যামী আপনি তো জানেন, আমার প্রভুর চরণ লাভই শুধু আমার বাঞ্ছা, শ্রীরামের চরণ দর্শন ব্যতীত আমার আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই পূর্ণ হইবে না। আর অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, একমাত্র রাম, রাম হেন রাজা থাকিতে অযোধ্যার রাজ্যশাসনে আমার কাজ কি? আমি মাত্র রামের দাসানুদাস চির কিঙ্কর। সেই দেব দুর্ল্লভ কমলাসেবিত অমূল্য চরণ রাজ্য থাকিতে কোন্ ছার অনিত্য অতি তুচ্ছ অযোধ্যার ধন, রত্ন, রাজ্য? রামশূন্য রাজ্য আমি কাকবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করিয়া সেই চরণ রত্নের আশায় এখানে আসিয়াছি, স্বামিন্! আপনার নিকট এ অধম সন্তানের এই মাত্র ভিক্ষা যেন এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর জগতের অনিত্য ধনৈশ্বর্য্য সমস্ত তুচ্ছ করিয়া, সেই মায়াতীত নিত্যধন, শ্রীরাম-চরণ-তরণী আশ্রয় করিয়া মোক্ষরাজ্য লাভ করিয়া, আমার আত্মারামে মিশিতে পারি। আমার রাজ্যধন সবই রাম! আপনি জানেন, আমার রাম কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন, কোন্ পথে কোথায় যাইলে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইব? আমি ছুটিয়া গিয়া শ্রীরামচরণে পতিত হইয়া তাঁহার রাজ্যভার তাঁহাকে দিয়া, এইখানেই তাঁহাকে অভিষেক করিয়া, এ দগ্ধ হৃদয় শীতল করিব। আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুমতি দিন, আমি রামদর্শনে যাই।

ভগবান্ ভরদ্বাজ ভরতের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া আনন্দচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বৎস! তোহার ঐকান্তিকতা ও ভক্তিতে অচিরেই তোমার সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি জানি, তুমি যখন রঘুবংশে জন্মিয়াছ তখন,—

"গুরুবৃত্তির্দমশ্চৈব সাধূনাঞ্চানুযায়িতা'।
জানে চৈতন্মনস্থং তে দৃঢ়ীকরণমস্ত্বিতি" ॥

গুরুশুশ্রূষা, চিত্তদমন, এবং সাধুগণের অনুবর্ত্তন, এই তিনটিই তোমাতে সম্ভব। তোমার মনোগত ভাব আমি জানি, তথাপি আজ সকলের সাক্ষাতে ব্যক্ত করাইয়া দৃঢ়তর করিবার জন্য এবং তোমার কীর্ত্তিকে অতিশয় বর্দ্ধিত করিবার জন্য, উক্তরূপ জিজ্ঞসা করিয়াছি। সাধক জীবনের সাধনপথে এ পরীক্ষা কতই হয়, ভগবানবিমুখ জনগণ পরীক্ষায় স্থির থাকিতে না পারিয়া কাম ক্রোধকে প্রশ্রয় দিয়া অধঃপতিত হইতে থাকে, কিন্তু সাধক যাঁহারা, মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পতনের' সঙ্কল্প করিয়া, সকল বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া বেগবতী নদীর ন্যায় ভগবৎ চরণ দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন তাঁহাদের ক্ষণিকের জন্য চিত্ত বিকৃত হইলেও, দুরন্ত সংসারের ত্রিগুণময়ী মায়া ভক্তের গতিরোধ করিতে পারে না, ভক্তের অবিচ্ছিন্ন মনোগতি পবিত্র গঙ্গার ধারার মত কুলকুল রবে ভগবদ্ গুণ গান করিতে করিতে সেই অবিচ্ছিন্ন গতিতেই সমুদ্রাভিমুখে ছুটিতেছে। শত বাধা থাকিলেও সকল অতিক্রম করিয়া সে ভগবৎ সমুদ্রেই প্রবেশ করে। বল কোন্ ব্যক্তি নদীকে এ পর্য্যন্ত সমুদ্র যাত্রায় বাধা দিতে পারিয়াছে? দুই পার্শ্বে প্রলোভনময় বিষয়ের কুল, মায়ার বিস্তৃত জাল চারিধারে বিস্তৃত, ভক্ত দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না, তাহার অবসর কোথায়? ভক্তের রসনা যে অমিয় রসাস্বাদনে তৃপ্ত, তাহাকে আর কোন্ বস্তুর আস্বাদ করাইয়া তৃপ্ত করাইবে? ভক্ত যখন গা ঢালিয়া গর্ভস্থ ভ্রূণের মত শ্রীভগবানের মুখাপেক্ষা করেন, ভগবান তখনই তাহাকে আপন ক্রোড়ে

উঠাইয়া ত্রিতাপের তাপিত দেহ শীতল করিয়া আপন আনন্দ-সাগরে মিশাইয়া লয়েন। শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সমুদয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমার শরণাগত হও আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব॥

ভগবানের প্রীতির জন্য নিষ্কাম কর্ম্মে পাপক্ষয় করিতে করিতে ও উপাসনা করিতে করিতে সাধক বুঝিতে পারেন তিনি তাঁহার করুণারূপ অমৃত পান করিতে করিতে তাঁহার দিকে যাইতেছেন, তিনি তাঁহার জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপ জ্বালিয়া সেই দীপ হাতে লইয়া ভক্ত হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া থাকেন।

সাধক যিনি তিনি জানেন, আপনার হ'তে আপনার সেই একজন,আর সব তুচ্ছ। ভক্ত যত বাধা পায়,যত দুঃখ পায় তত জোরে ভগবানের স্মরণ জাগে, তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করে, প্রাণপণে তাঁহার চরণ আঁকড়াইয়া ধরিয়া, বলে, কোথায় দীনের প্রভু! তোমার খেলা শেষ করিয়া, আমার দুরন্ত ভববন্ধন মুক্ত করিয়া দাও, আমি যে বড় বাধা পাইতেছি, আমার পথ পরিষ্কার করিয়া দাও, আমার যে তুমিই সব, আর কোন কিছুই নাই! প্রণাম, প্রার্থনা করিলেই অশান্ত চিত্ত শান্ত হয়। কারণ, ভক্তের প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তখন ভক্তের চিত্তাকাশে উদিত হইয়া, নিজ হস্তে নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিয়া, তাহাকে সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার ভক্তকে কোলে লইয়া বসেন। আর ভগবানের প্রসন্নমুখ দেখিলেই ভক্তের সকল দুঃখ, সুখবৎ মনে হয়। তাই সে তখন মরিয়াও মরিতে পারে না, কারণ সুখের ছবি যে একবার দেখিয়াছে, সে যে, আপন প্রিয়কে ত্যাগ করিয়া মরিতে পারে না, অথবা সে মরিতে দেয় না, সেই মুখ স্মরণে সব দুঃখ দূর হইয়া যায়।

শ্রীরামভক্ত ভরত তাই এ পরীক্ষায় আপনাকে হারাইবার পূর্ব্বে আপন প্রিয় রামমুখকমল স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইলেও ভরতের অটল হৃদয় টলিত না, কেবল রামের প্রসন্নতাই তাঁহার উপার্জ্জনের বস্তু। রামের করুণাই তাঁহার ভরসা, রামের তৃপ্তির অনুভবই ভরতের পরম পুরুষার্থের পূর্ণ সিদ্ধি। তাই ভরত, এ কঠোরোক্তিতে আপনাকে হারান নাই।

এই কর্ম্মক্ষেত্র জগতে শ্রীভরতের মত, প্রকৃতির তাড়নায় হতাশ না হইয়া, কাতর না হইয়া, যদি আপন ইষ্ট স্মরণ করিয়া, ইষ্টনাম জপ করা যায় তবে সাধকের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, কাম, ক্রোধাদি তাহার আর কি করিতে পারে? যাহারা কুপথে টানে, তাহারা তখন পরম মিত্র হইয়া সুপথে যাইবার সাহায্য করে, অশুভ কামনা আর থাকে না, শুভ কামনাতেই ভগবৎ লাভ হয়।

শ্রীভরদ্বাজ মুনি, ভরতকে সে রাত্রি সেখানে বিশ্রাম আহারাদির জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন, প্রভাতে রামদর্শনে চিত্রকূটে যাত্রা করিতে বলিলেন। তখন, মহামুনি, সৈন্যগণের সহিত সকলকে আনাইয়া, যথাবিহিত আতিথ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করাইলেন।

শ্রীভরত, শত্রুঘ্নের সহিত, রামকে হৃদয়ে ধ্যান পূর্ব্বক একাসনে বসিয়া রাম রাম জপ করিতে করিতে সে নিশি যাপন করিলেন। ব্রাহ্মমুহুর্ত্তে অযোধ্যাবাসী রাম রাম বলিয়া, রামগুণ গাহিয়া রাম জয় দিয়া যথাবিহিত প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে রাম দর্শনের জন্য উৎসুকতা জানাইল।

শ্রীভরত, গুরুচরণে এবং মুনিবরকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"আশ্রমং তস্য ধর্ম্মজ্ঞ ধার্ম্মিকস্য মহাত্মনঃ।
আচক্ষ্ব কতমো মার্গঃ কিয়ানিতি চ শংস মে"

ধর্ম্মজ্ঞ! সেই ধার্ম্মিকপ্রবর মহাত্মার আশ্রম কতদূর এবং কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে তাহা আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিন।

ভরদ্বাজ সেই ভ্রাতৃ দর্শন কাতর ভরতকে বলিলেন—

"ভরতার্দ্ধতৃতীয়েষু যোজনেষ্বজনে বনে।
চিত্রকুটগিরিস্তত্র রম্যনির্দ্দরকাননঃ।"

ভরত এইস্থান হইতে সার্দ্ধ যোজনদ্বয় দূরে জনশূন্য অরণ্যমধ্যে রমনীয় বিদীর্ণপাষাণ ও কানন সমাকীর্ণ, চিত্রকুট নামক পর্ব্বত আছে।

পুষ্পিত-তরুগণ-সমাবৃতা, রমণীয়-কুসুমিত-কাননা মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তরদিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। সেই নদীর পরপারে চিত্রকূট গিরি, এবং সেইখানেই তাঁহাদের পর্ণশালা দেখিতে পাইবে। তখন সকলে একে একে মুনির চরণে প্রণাম করিতে সমাগত হইলেন, তন্মধ্যে প্রথমেই—

"বেপমানা কৃশা দীনা সহদেব্যা সুমিত্রয়া"
"কৌশল্যা তত্র জগ্রাহ করাভ্যাং চরণৌ মুনেঃ"

কম্পমানা, কৃশাঙ্গী, দুঃখিনী কৌশল্যা, সুমিত্রাদেবীর সহিত হস্তদ্বয় দ্বারা মহর্ষির চরণযুগল গ্রহণ করিলেন।

তাহার পর ব্যর্থমনোরথা, সর্ব্বলোকনিন্দিতা কৈকেয়ী তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া, পরে অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরে ভরতেরই নিকটে রহিলেন।

তখন মহামুনি ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি মাতৃণাং তব রাঘব"।

"রাঘব! আমি তোমার মাতৃগণের সবিশেষ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।

তখন সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন।—ভগবন্! স্বয়ং নারায়ণ যাঁহার গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই পুত্র বিরহে ও স্বামীশোকে অনশনে ক্ষীণকায়া অত্যন্ত দুঃখাক্রান্তা এই যাঁহাকে দেখিতেছেন, ইনি সেই দেবীরূপিণী আমার পিতার প্রধানা মহিষী রাম জননী কৌশল্যা। অদিতী যেমন উপেন্দ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন সেই-রূপ ইনিই সেই সিংহসমবিক্রমপূর্ব্বক গমনশীল, পুরুষশ্রেষ্ঠ, রামচন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন। আর ইঁহার বাম বাহু ধরিয়া যিনি দাঁড়াইয়া আছেন—

কর্ণিকারস্য শাখেব শীর্ণ পুষ্পা বনান্তরে"
ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্ত্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ মধ্যমা"।

———

(শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপকার লিখিত।)

বর্ণবিবেক।

(পুনরাবৃত্তি)

ইংলিশাদি জাতির ন্যায় উন্নত হইতে হইলে বৈদিক আর্য্যবংশধরদিগের কি কর্ত্তব্য।

জিজ্ঞাসু—আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুসন্তানদিগের মধ্যে অনেকের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, শাস্ত্রিত পৌরুষ দ্বারা তাঁহাদের কল্যাণ হইবে না, যে পথ অবলম্বন পূর্ব্বক য়ুরোপাদি দেশসমূহের উন্নতি হইয়াছে, হইতেছে, শিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণ বলেন, আমাদিগকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা না করিলে, আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবেনা, আমাদের কদাচ উন্নতি হইবে না। য়ুরোপাদি দেশে যাহা নাই আমাদিগকে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, অতএব আমাদের দেশ হইতে এই সর্ব্বনাশকর, উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল যাহাতে উৎপাটিত হয়, আমাদিগকে তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। আহারের সহিত ধর্ম্মের যে কোন সম্বন্ধ আছে, অভ্যুদয়শীল সভ্য য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান তাহা স্বীকার করেন না। যদ্দ্বারা দেহ সবল হয়, উন্নতিসাধক কর্ম্মক্ষম হওয়া যায়, তাহাই ভক্ষ্য, বিজ্ঞানকুশল সুসভ্য য়ুরোপাদিদেশের ইহাই মত। অতএব আমাদিগকে এই মতের অনুসরণ করিতে হইবে। উন্নতিশীল য়ুরোপাদিদেশসমূহে সর্ব্বগৃহে অন্নাদি ভক্ষণের বিধি আছে, ইহাঁর হাতে খাইব, উহাঁর হাতে খাইব না, উন্নতিমার্গের প্রতিবন্ধক, অজ্ঞানাচ্ছন্ন সংকীর্ণ হৃদয়ের পরিচায়ক, একপ্রকার অহিতকর আচার ঐ সকল দেশে নাই, অতএব আমাদিগকে

অচিরে সর্ব্বান্নভুক্ হইতে হইবে, কাহার হাতে খাইলে জাতিভ্রষ্ট হয়, এইরূপ কুসংস্কারকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বক্তা—ইংলিশাদি জাতি যাহা করেন না, য়ুরোপাদিদেশসমূহে যে সকল আচার নাই, কুসংস্কার নাই, হিন্দুদিগকে ইংলিশাদিজাতির ন্যায় উন্নত হইতে হইলে যে তাহা নিষেধ করিতে হইবে, তাহা শুনিলাম, এখন য়ুরোপাদি দেশের মত উন্নত হইতে হইলে যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ইহাঁদের কিরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—জড়ত্বকে (Inertia) হিন্দুসমাজ হইতে যতদূর সম্ভব বিদূরিত করিতে হইবে, জড়ত্ব উন্নতির প্রতিবন্ধক। চেষ্টাই (Motion) প্রাণ (Life), চেষ্টা বা গতিশূন্য হইলেই দেহের যে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে তাহা স্থির হয়। সমাজশরীরও চেষ্টাশূন্য হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বা হইতেছে, এইপ্রকার নিশ্চয় হইয়া থাকে। যে জল নিশ্চল—প্রবাহহীন (Stagnant), তাহা দূষিত জল, শুদ্ধ জল নহে। প্রবাহবিশিষ্ট নদীর জল শুদ্ধ, লঘুত্বাদিগুণবিশিষ্ট। নিশ্চেষ্ট মনুষ্য-সমাজ প্রবাহবিহীন জলের সমান, উন্নতিশীল মনুষ্যসমাজ সদা সচেষ্ট, নিরন্তর কর্ম্মনিরত। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, বুঝিতে পারা যায়, সকলে সর্ব্বদা কর্ম্ম করুক, ক্ষণকালও কেহ কর্ম্মশূন্য হইয়া অবস্থান না করুক, প্রকৃতি যেন সকলকে ইহাই আদেশ করিয়াছেন। অতএব অভ্যুদয়শীল ইংলিশাদির ন্যায় উন্নত হইতে হইলে, সতত কর্ম্মশীল হইতে হইবে, কর্ম্মশূন্য হইয়া ক্ষণকালও থাকা হইবে না। ধর্ম্মজড়ত্বকে যিনি হিন্দুজাতির অবনতির কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, সেই বৈজ্ঞানিক কর্ম্মই বলিয়াছেন, "সামাজিক উন্নতি করিতে হইলে, সমাজ-শরীর হইতে জড়ত্বকে যতদূর সম্ভব অপসারিত করিতে হইবে। ইজিপ্‌সিয়ানেরা (Egyptians) জড়ত্বকে প্রধান পাপ বলিয়া মনে করিতেন সোলন নিশ্চেষ্ট জড় প্রজাগণকে, ইহারা অন্য লোকদিগকে দূষিত না করে, এই উদ্দেশ্যে, মারিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়াছিলেন। নিরাময় সামাজিক অবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বলপূর্ব্বক সকলকে শ্রম করিতে

প্রবর্ত্তিত করে এবং জাড্য দোষকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া থাকে।* বিনা উদ্যোগে, বিনা চেষ্টায়, কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে, কখন উন্নতি হইতে পারে না। অতএব উন্নতি করিতে হইলে, বিজ্ঞান, শিল্প, ও কলার যাহাতে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে উৎকর্ষ হয়, কৃষি ও বাণিজ্যের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি হয় তজ্জন্য সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিতে হইবে, বিলাতে যাইলে, অন্য জাতির অন্ন খাইলে, জাতি নষ্ট হইবে, এতাদৃশ অনিষ্ট-কর কুসংস্কার সকলকে বিদূরিত করিয়া অভ্যুদয়শীল ইংলিশাদি জাতির ন্যায় দেশে দেশে গমন করিতে হইবে, গৃহপ্রাঙ্গণকে (Court-yard) সমুদ্রজ্ঞান করিলে চলিবে না। যাঁহারা বেদ ও শাস্ত্রশাসন মানিতে চান, তাঁহাদিগকে বেদের প্রমাণেই বুঝাইতে হইবে, বৈদিক কালে জাতিভেদ ছিল না, আহারের সহিত ধর্ম্মের যে কোন সম্বন্ধ আছে, বৈদিক কালে তাহা কেহ জানিতেন না, সেকালে সমুদ্রযাত্রা করিলে জাতিভ্রংশ হইত না। বেদ অসভ্যাবস্থার সামগ্রী, ইহা নিতান্ত অসার গ্রন্থ, পুরাণাদিও ততোঽধিক, স্মৃতিশাস্ত্র স্বার্থপর ব্রাহ্মণাদির দ্বারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য রচিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষ বস্তুতঃ সভ্যতার আলোক কখনও দেখে নাই। ভারতবর্ষ যদি প্রকৃত সভ্যতার আলোক দেখিত, তাহা হইলে স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা শূদ্রাদির প্রতি অপ্রতিহত প্রভুত্ব করিতে পারিত না, তাহা হইলে অসভ্য কৃষকের অসার গানের (বেদের) এত সম্মান হইত না, বৃদ্ধা পিতামহীর গল্পকে (পুরাণ ও ইতিহাসকে) আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রামাণিক বলিয়া মনে করিত না, যে দেশে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদিকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে পূজা করা হইত, এবং এখনও করা হয়, সে দেশকে

---

* "Inertia was regarded as a capital crime by the Egyptians. Solon ordained that inert persons should be put to death, and not contaminate the community"

The Romance of Mathamatics, P. 36.

সত্য বলা সঙ্গত কি? প্রত্যেক হিন্দু সন্তান যাহাতে এই সকল কথা বিশ্বাস করে, বেদ-শাস্ত্র হইতে লব্ধ সর্ব্বনাশকর কুসংস্কারসমূহকে যাহাতে শীঘ্র পরিত্যাগ করে, তন্নিমিত্ত অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী শিক্ষিত হিন্দু-গণকে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিতে হইবে। ইংলিশাদি জাতির ন্যায় উন্নতি করিতে হইলে, অধঃপতিত হিন্দু জাতিকে যাহা করিতে হইবে, স্থির হইয়াছে, সংক্ষেপে তৎসমুদায় নিবেদন করিলাম।

বিনা উদ্যোগে, কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে উন্নতি হয় না, সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয় না, ইহা নূতন কথা নহে, ইহা সনাতন বেদেরই উপদেশ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ না করিলে উন্নতিহেতু উদ্যোগবিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব ইহা সৎ সিদ্ধান্ত নহে।

বক্তা।—বিনা উদ্যোগে, বিনা চেষ্টায়, কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন-রূপ সিদ্ধি হয়না ইহা নূতন কথা নহে। বেদে, বেদমূলক অখিল শাস্ত্রে কর্ম্মযোগের ভূয়সী প্রশংসা আছে, বেদ কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই কাণ্ডত্রয়াত্মক, যাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিবেন, তাঁহাদের কখনও কল্যাণ হইবে না, উদ্যোগবিহীন আলস্যাদি দোষযুক্ত মানুষের কদাচ শুভ হইতে পারে না, বেদশাস্ত্রে সর্ব্বত্র এই কথা আছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ না করিলে উদ্যোগবিহীন থাকিতে হয়, জড়ত্ব অপসারিত হয় না, ইহা নিতান্ত অদূরদর্শীর সিদ্ধান্ত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, "পুরুষের নিদ্রা-শয়ন, উপবেশন, উত্থান এবং অবাধিতভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা যথাক্রমে কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্য এই যুগচতুষ্টয়ের সমানার্থক। শয়নাদি অবস্থা ও কলি দ্বাপরাদি যুগচতুষ্টয় সত্ত্বাদিগুণ-ত্রয়ের তারতম্যবশতঃ হইয়া থাকে। উপবিষ্ট পুরুষের সৌভাগ্য যেমন তেমনি থাকে, বৃদ্ধিহেতু উদ্যোগের অভাবনিবন্ধন উহার বৃদ্ধি হয় না। উপবেশন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থানশীল পুরুষের সৌভাগ্য কৃষি-বাণিজ্যাদির উদ্যোগবশতঃ বাড়িতে আরম্ভ হয়। শয়ান পুরুষের সৌভাগ্য সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে, বিদ্যমান ধনাদির রক্ষণাদি চেষ্টার অভাব হেতু বিনষ্ট হয়। সৌভাগ্য বর্দ্ধনার্থ দেশে দেশে পর্য্যটনশীল পুরুষের সৌভাগ্য

দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।* শয়ন, উপবেশন, উত্থান এবং অবাধিতভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ, অত্যল্প চিন্তাতেই শক্তির এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়, প্রত্যেক জাগতিক পদার্থের জীবনে শক্তির শয়নাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থাই লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন জাগতিক পদার্থের অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনে এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনে শক্তির শয়নাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থা ভিন্ন আমরা আর কি দেখিতে পাই? গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—'সত্বগুণ যখন প্রবল হয়, মনঃ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ যখন সত্বগুণপ্রধান হয়, তখন 'কৃত' বা 'সত্য' যুগ চলিতেছে বুঝিতে হইবে। সত্বগুণপ্রধান পরিণাম সত্বগুণপ্রধানক্রিয়া বা সাত্বিক কালই সত্যযুগ, রজোগুণপ্রধান পরিণাম রজোগুণপ্রধানক্রিয়া বা রাজস কালই ত্রেতাযুগ; রজস্তমোগুণপ্রধান পরিণাম, রজস্তমোগুণ প্রধানক্রিয়া বা কালই দ্বাপরযুগ, এবং তমোগুণ প্রধান পরিণাম, তমোগুণ প্রধান ক্রিয়া বা কালই কলিযুগ। *

---

*"আস্তেভগ আসীনস্যোর্দ্ধস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠত। শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগশ্চরৈবেতি চরৈবেতি * * *

"কলিঃ শয়ানো ভবতি সংজিহানস্তু দ্বাপরঃ। উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরংশ্চরৈবেতি চরৈবেতি * * *।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

* "প্রভূতং চ যদা সত্বং মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
তদা কৃতযুগং বিদ্যাদ্দানে তপসি যদ্রতিঃ॥
যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু শক্তির্ষশসি দেহিনাম্।
তদা ত্রেতা রজোভূতিরিতি জানীহি শৌনক॥
যদা লোভস্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভোঽথ মৎসরঃ।
কর্ম্মণাঞ্চাপি কাম্যানাং দ্বাপরং তদ্রজস্তমঃ॥
যদা সদানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসাদি সাধনম্।
শোকমোহৌ ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তমসি স্মৃতঃ॥"

গরুড়পুরাণ।

জিজ্ঞাসু—উদ্যোগ বিনা, উন্নতি বা কোন প্রকার সিদ্ধি হইতে পারে না এই কথা বুঝাইতে যাইয়া, আপনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও গরুড় পুরাণ হইতে যুগতত্ত্বের যেরূপ বর্ণন করিলেন, তাহা আমার কাছে অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইল. আমি যুগতত্ত্বের ঈদৃশ ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে কখন শুনি নাই। "সৌভাগ্যবর্দ্ধনার্থ দেশে দেশে পর্য্যটনশীল পুরুষের সৌভাগ্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে" ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই উপদেশও মনোরম এবং বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ উপযোগী, উন্নতি করিতে হইলে দেশে দেশে গমন করিতে হইবে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে দেশে দেশে গমন সম্ভব হয় না, অতএব উন্নতি ঈপ্সিত হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে ত্যাগ করিতেই হইবে, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহাদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই কথাতে কর্ণপাত করা উচিত। বৈদিক যুগে, বৈদিক আর্য্যজাতি উন্নতির নিমিত্ত দেশে দেশে গমন করিতেন, এবং তাহা করিতেন বলিয়া

উৎসব।

—:*:—

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৪শ বর্ষ। } সন ১৩২৬ সাল, চৈত্র। { ১২শ সংখ্যা

को देवः सर्व्वदेवेषु ।

(१)

सर्व्वदेवात्मको रुद्रः सर्व्वे देवा शिवात्मकाः ।
रुद्रस्य दक्षिणे पार्श्वे रविर्ब्रह्मा त्रयोऽग्नयः ॥
वामपार्श्वे उमादेवी विष्णुः सोमोऽपि ते त्रयः ।
या उमा सा स्वयं विष्णुर्यो विष्णुः स हि चन्द्रमाः ॥
ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते नमस्यन्ति शङ्करम् ।
येऽर्च्चयन्ति हरिं भक्त्या तेऽर्च्चयन्ति वृषध्वजम् ॥
ये द्विषन्ति विरूपाक्षं ते द्विषन्ति जनार्द्दनं ।
ये रुद्रं नाऽभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम् ॥
रुद्रात् प्रवर्त्तते वीजं वीजयोनि जनार्द्दनः ।
यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा स हुताशनः ॥
ब्रह्मविष्णुमयो रुद्रः अग्नीषोमात्मकं जगत् ।
पुंलिङ्गं सर्व्वमीशानं स्त्रीलिङ्गं भगवत्युमा ॥
उमारुद्रात्मिकाः सर्व्वाः प्रजा स्थावरजङ्गमाः ।
व्यक्तं सर्व्वमुमारूपमव्यक्तं तु महेश्वरम् ॥

उमाशङ्करयोर्योगः सयोगो विष्णुरुच्यते ।
यस्तु तस्मै नमस्कारं कुर्य्यात् भक्तिसमन्वितः ॥
आत्मानं परमात्मानमन्तरात्मानमेव च ।
ज्ञात्वा त्रिविधमात्मानं परमात्मानमाश्रयेत् ॥
अन्तरात्मा भवेत् ब्रह्मा परमात्मा महेश्वरः ।
सर्व्वेषामेव भूतानां विष्णुरात्मा सनातनः ॥
अस्य त्रैलोक्यवृक्षस्य भूमौ विटपशाखिनः ।
अग्रं मध्यं तथा मूलं विष्णुब्रह्ममहेश्वराः ॥
कार्य्यं विष्णु क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरः ।
प्रयोजनार्थं रुद्रेण मूर्त्तिरेका त्रिधाकृता ॥
धर्म्मो रुद्रो जगत् विष्णुः सर्व्वज्ञानं पितामहः ।
श्रीरुद्र रुद्ररुद्रेति यस्तं ब्रूयाद्विचक्षणः ॥
कीर्त्तनात् सर्व्वदेवस्य सर्व्वपापैः प्रमुच्यते ।
रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः ।
रुद्रः विष्णु रमा लक्ष्मी तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रुद्रो सूर्य्य उमा छाया तस्मै तस्यै नमो नमः ।
रुद्रः सोम उमा तारा तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रुद्रो दिवा उमा रात्रि तस्मै तस्यै नमो नमः ।
रुद्रो यज्ञ उमा वेदि स्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रुद्रो वह्निरुमा स्वाहा तस्मै तस्यै नमो नमः ।
रुद्रो वेद उमा शास्त्रं तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रुद्रो वृक्ष उमा वल्ली तस्मै तस्यै नमो नमः ।
रुद्रो गन्ध उमा पुष्पं तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
रुद्रोऽर्थ अक्षरः सोमा तस्मै तस्यै नमो नमः ।
रुद्रो लिङ्गमुमा पीठं तस्मै तस्यै नमो नमः ॥
कुत्रचित् गमनं नास्ति तस्य पूर्णस्वरूपिणः ।
आकाशमिव सन्तुर्णं कुत्रचिन्नैव गच्छति ॥

(২)

ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শিবস্ত্বং জানকী শিবা।
ব্রহ্মা ত্বং জানকী বাণী সূর্য্যস্ত্বং জানকী প্রভা ॥
ভবান্ শশাঙ্কঃ সীতা তু রোহিণী শুভলক্ষণা।
শক্রস্ত্বমেব পৌলোমী সীতা স্বাহানলো ভবান্ ॥
যমস্ত্বং কালরূপশ্চ সীতা সংযমনী প্রভো।
নিঋতিস্ত্বং জগন্নাথ তামসী জানকী শুভা ॥
রাম ত্বমেব বরুণো ভার্গবী জানকী শুভা।
বায়ুস্ত্বং রাম সীতা তু সদাগতিরিতীরিতা ॥
কুবেরস্ত্বং রাম সীতা সর্ব্বসম্পৎ প্রকীর্ত্তিতা।
রুদ্রাণী জানকী প্রোক্তা রুদ্রস্ত্বং লোকনাশকৃৎ ॥

ভারতের সেদিন কেমন ছিল যেদিন সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে মানুষ কাহারও সাড়া পাইত? সেদিন কেমন ছিল যেদিন সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুকে প্রণাম করা ছিল, সকলের কাছে প্রার্থনা করা চলিত? এক কথায় সেদিন কেমন ছিল যখন ত্রিভুবনের সকল বস্তুই জীবন্ত ছিল, সকল বস্তুই কথা কহিত, সর্ব্ব জীবই কথা শুনিত? যেদিন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মমন্দির বলিয়া মনে হইত? যেদিন সকলের ভিতরে তাহার ভাবনা হইত? যেদিন সর্ব্বত্র সেই ইষ্টদেবদেবীকে স্মরণ করিয়া, প্রণাম করিয়া, সেই ইষ্ট দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করিয়া, মানুষ মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইত আর সকল জ্বালা জুড়াইয়া স্বস্থ হইয়া যাইত? এই দিন ভারতের ছিল। উপরের উদ্বৃত শ্রুতি তাহাই দেখাইছেন।

উমা রুদ্রাত্মিকাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।
ব্যক্তং সর্ব্বমুমারূপমব্যক্তং তু মহেশ্বরম্ ॥

স্থাবর জঙ্গম সমস্ত সৃষ্টবস্তু উমারুদ্রাত্মিকা। ব্যক্ত বস্তু সমস্তই উমা আর অব্যক্তটি মহেশ্বর। পুংলিঙ্গ সর্ব্বত্রই ঈশান আর স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্বত্রই ভগবতী উমা। নর রুদ্র, নারী উমা; বিষ্ণু রুদ্র, লক্ষ্মী উমা; সূর্য্য রুদ্র, ছায়া উমা; সোম রুদ্র, তারা উমা; দিবা রুদ্র, রাত্রি উমা;

যজ্ঞ রুদ্র, বেদি উমা; বহ্নি রুদ্র, স্বাহা উমা; রুদ্র বেদ, উমা শাস্ত্র, রুদ্র, বৃক্ষ, উমা লতা; রুদ্র গন্ধ, পুষ্প উমা; রুদ্র অর্থ, অক্ষর উমা; রুদ্র, লিঙ্গ, পীঠ উমা। আহা! কত সুন্দর এই ভাবনা!

যে নমস্যন্তি গোবিন্দং তে নমস্যন্তি শঙ্করম্। যাঁহারা গোবিন্দকে প্রণাম করেন তাঁহারা শঙ্করকেই প্রণাম করেন।

যেঽর্চ্চয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেঽর্চ্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্।

যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন তাঁহারা মহেশ্বরেরই অর্চ্চনা করেন। আর

যে দ্বিষন্তি বিরূপাক্ষং তে দ্বিষন্তি জনার্দ্দনং।
যে রুদ্রং নাঽভিজানন্তি তে ন জানন্তি কেশবম্॥

যাহারা শিবদ্বেষী তাহারা শ্রীকৃষ্ণকেও দ্বেষ করে। যাহারা রুদ্রকে জানে না তাহারা কৃষ্ণকেও জানে না। অথচ এই কৃষ্ণ, এই উমা মহেশ্বর সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

কুত্রচিৎ গমনং নাস্তি তস্য পূর্ণ স্বরূপিণঃ।
আকাশমেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি॥

যিনি স্বরূপে পূর্ণ তাঁহার গমনাগমন কোথাও নাই। আকাশ এক, পূর্ণ, গ্রামে আকাশ প্রবেশ করিল ইহা কি বলা চলে?

তোমার আমার সকলের ইষ্ট দেবতা ত এই। যে কথা বেদে সেই কথা রামায়ণে। ব্যাসদেব নারদের মুখে অধ্যাত্ম রামায়ণে বলিতেছেন—

রাম! তুমি বিষ্ণু জানকী লক্ষ্মী; তুমি শিবা জানকী শিব। তুমি রুদ্র জানকী রুদ্রাণী। বলিতেছেন—

লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং জানকী শুভা।
পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং ত্বং হি রাঘব॥

স্ত্রীবাচক যাহা কিছু সব জানকী আর পুরুষবাচক যাহা কিছু তাহাই তুমি রাম।

আজ ভারতের নরনারী ইহার বিনিয়োগ ভুলিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝগড়া বিষয়ে আটকাইয়া গিয়া বেদের রামায়ণের

আর্য্যের, এই বিশাল দৃষ্টি ছাড়িয়াছে। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র নররূপে আসিয়া এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন। মা জানকী আপনি আচরণ করিয়া এই শিক্ষাই ধরাইয়া গিয়াছেন। ঋষিগণ এই শিক্ষাই বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। আমরা ভগবান্ বাল্মীকির রামায়ণ হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই বর্ষ শেষ করিতেছি।

বনবাসকালে শ্রীভগবান্ যখন অযোধ্যার সীমা অতিক্রম করিলেন তখন—

অযোধ্যাভিমুখো শ্রীমান্ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥১

তখন শ্রীভগবান্ অযোধ্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন—

আপৃচ্ছে ত্বাং পুরিশ্রেষ্ঠে কাকুৎস্থপরিপালিতে।
দৈবতানি চ যানি ত্বাং পালয়ন্ত্যাবসন্তি চ ॥ ২
নিবৃত্ত বনবাসস্ত্বামনৃণো জগতীপতেঃ।
পুনর্দ্রক্ষ্যামি মাত্রা চ পিত্রা চ সহ সঙ্গতঃ ॥

হে কাকুৎস্থপরিপালিতে পুরীশ্রেষ্ঠে! তোমাকে এবং যে সমস্ত দেবতা তোমাতে বাস করেন ও তোমাকে রক্ষা করেন সকলকে আমি আমন্ত্রণ করিতেছি। বনবাস শেষ করিয়া মহীপতি দশরথকে অঋণী করিয়া মাতাপিতার সহিত মিলিত হইয়া আমি পুনরায় তোমাকে দর্শন করিব।

ভারতের নরনারী কি আবার এই দিন ফিরিয়া পাইবে? গঙ্গা পার হইবার সময় শ্রীভগবান্ আত্মহিতার্থ ক্ষাত্র নিয়মানুসারে বেদ বিহিত মন্ত্রজপ করিলেন। পরে—

আচম্য চ যথাশাস্ত্রং নদীং তাং সীতয়া সহ।
প্রণমৎ প্রীতি সংহৃষ্টো লক্ষণশ্চামিতপ্রভঃ ॥

অতুল্যপ্রভাশালী লক্ষ্মণও প্রীতিসহকারে সীতাদেবীর সহিত আচমন করিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিলেন। মা জানকী গঙ্গার মধ্যভাগে নৌকা আসিলে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিলেন দেবি গঙ্গে! রাম তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পিতৃআজ্ঞা পালন করুন। হে সৌভাগ্য-

দায়িনি! হে অভিষ্টপ্রদায়িনি গঙ্গে! আমরা মঙ্গলে মঙ্গলে ফিরিয়া আসিলে আমি প্রমোদসহকারে তোমার পূজা করিব।

ত্বং হি ত্রিপথগে দেবি ব্রহ্মলোকং সমক্ষসে।

*   *   *   *   *

সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে।

*   *   *   *

যানি ত্বত্তীরবাসীনি দৈবতানি চ সন্তি হি। ইত্যাদি

হে দেবি ত্রিপথাগামিনি! তুমি ব্রহ্মলোকব্যাপিয়া আছ আমরা ফিরিয়া আসিলে আমি তোমার পূজা দিব। তুমি প্রসন্না হও। আমরা ফিরিয়া আসিলে তোমার তীরে যে সমস্ত দেবতা থাকেন এবং যে সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র তোমার তীরে আছে আমি তাঁহাদের সকলকেই পূজা করিব।

মহামুনি ভরদ্বাজ চিত্রকূট গমনাকাঙ্ক্ষী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন—

ততো ন্যগ্রোধমাসাদ্য মহান্তং হরিতচ্ছদম্।

পরীতং বহুভির্বৃক্ষৈঃ শ্যামং সিদ্ধোপসেবিতং।

তস্মিন্ সীতাঞ্জলিং কৃত্বা প্রযুঞ্জীতাশিষঃ ক্রিয়াম্॥

পরে হরিদ্বর্ণপত্রসমন্বিত, বহুবৃক্ষে পরিবৃত, সিদ্ধগণসেবিত, শ্যামনামক মহান্ বটবৃক্ষের সমীপে যাইয়া সীতাদেবী যেন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তৎসমীপে মঙ্গল প্রার্থনা করেন।

দৃষ্টান্ত কতই আছে। কিন্তু আজ ভারতের নরনারীর হৃদয় কে আচ্ছন্ন করিল? এখনও একটা অভ্যাস ঐরূপ আছে কিন্তু সে ভাবনা কৈ? সে বিনিয়োগ কৈ? আহা!' যখন দেখি তুমিই সব সাজিয়া আমাকে তোমার শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইতে ডাকিতেছ, দুই আর নাই সব তুমি; "রামঃ সীতা জানকী রামভদ্রো ন ভেদো বৈ হেতয়ো রস্তি কশ্চিৎ" যখন দেখি রামই সীতা আর জানকীই রামভদ্র ইঁহাদের দুইজনে কিছু-মাত্র ভেদ নাই তখন কি হয়? তুমিইত সব সাজিয়া আছ-আমি মাত্র তোমার ঐরূপ ভাবনা করিতে পারিলেই, সর্ব্বত্র অতি সুলভ তোমার স্মরণমাত্র করিলেই ত সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকা হয়। হায়! কবে স্বরূপে দৃষ্টি পড়িবে?

আত্ম-পরীক্ষা।

বলিতে পার মৃত্যুসময়ে কোন্ চিন্তা উঠিবে? ভক্তের যে চিন্তা উঠে তোমার কি সেইরূপ চিন্তা উঠিবে মনে কর? না জ্ঞানী যাহা চিন্তা করেন সেই চিন্তায় তুমি স্থির থাকিয়া বলিতে পারিবে-মরণটা মিথ্যা—এটা অজ্ঞান বিজৃম্ভিত—বাস্তবিক যেটা নাই সেইটারই জননমরণ দেখা যায়—মিথ্যারই জন্ম হয়, মৃত্যু হয়, যাহা সত্য—তাহা নিত্য তাহার জননও নাই মরণও নাই তিনি সর্ব্বদা আছেন, সর্ব্বদা ছিলেন, সর্ব্বদা থাকিবেন।

আর ভক্তের কোন্ চিন্তা উঠে?

যিনি যোগী, তিনিত মৃত্যুকে আসিতে দেখিলে ঝট্ সমাধি লাগাইবেন—লাগাইয়া মৃত্যুকে ফাঁকি দিবেন অথবা যাঁহারা জানিতেছেন দেহরাখা আর উচিত নহে তাঁহারা প্রাণকে ভ্রূমধ্যে আনিয়া ওঁ উচ্চারণ করিয়া দেহ রাখিবেন। জ্ঞানীর মত ইঁহারাও নিজের পুরুষার্থে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। ভক্তও মৃত্যুকে ভয় করেন না কারণ তিনি নিজে কি পারেন কি পারেন না তাহাত দেখিতেও চাননা—তিনি সকল কর্ম্মে চিরদিন যাঁর অধীন তাঁহাকে মাত্র স্মরণ করিয়া স্থির থাকিবেন।

ভক্ত বলেন "তাই থাক্‌তে সময় দীনদয়াময় আরজী ক'রে রাখি।
তখন পড়ে কিনা পড়ে মনে পাছে পড়ি ফাঁকি॥

অথবা ভক্ত বলেন।

তিলেক দাঁড়াও রে শমন আমি বদন ভ'রে মাকে ডাকি।
আমার নিদানকালে ব্রহ্মময়ী আসেন কিনা আসেন দেখি॥

যিনি সকল কাজেই তাঁর মুখাপেক্ষা করেন তিনি এই কাজেও তাঁর মুখাপেক্ষাই করিবেন। যাঁর মুখ স্মরিয়া তিনি সকল যাতনা সহ্য করেন এই অসহ্য যাতনার সময়েও যদি বেশী কিছু না পারেন তবে মনে মনে পূর্ব্ব হইতেই একটা প্রণাম করিয়া বলিয়া রাখিবেন প্রভু "আমি তোমার" "তথাস্তু"। আমার বলিবার আর কিছুই নাই

তুমি যাহা কর তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যাহা আসিবার তাহাত আসিবেই তবে আমি চিরদিন যে প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি আমার এই নিদান কালেও সেই প্রার্থনা করিয়া রাখি যে যোনিতেই আমি যাইনা কেন যেন তোমায় কখন না ভুলি। আমি জীবিতকালে তোমায় জানাইয়া জানাইয়া সব সহ্য করিতে অভ্যাস করিতেছিলাম; কোন কিছু দুঃখ আসিলে—কোন কিছু বিপদ ঘটিলে বলিতাম—এই যে আমার বিপদ, এই যে আমার দুঃখ এ সব ত তোমার অজ্ঞাতে আমার উপরে আইসে নাই—এই অসীম জগতে যখন যাহা ঘটিতেছে—সর্ব্বজ্ঞ তুমি—তুমি জানিয়াইত তাহা সবার জন্য পাঠাইয়া দিতেছ—আহা! যাহা কিছু তোমার হাত হইতে আইসে তাহাতে কি কাহারও অনিষ্ঠ হইতে পারে? আসুক দুঃখ, আসুক বিপদ, আসুক মৃত্যু, এসকলও আমার মঙ্গলের নিমিত্ত। আমার কার্য্য তোমাকে স্মরিয়া সব সহ্য করা আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিতেছি—পারি বা না পারি চেষ্টাই আমার সম্বল। তার পরে তুমি আছ। যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে আমি যে শ্রীপদে আশ্রয় লইয়াছি। আমি যে অতি অধম—আমার যে নিজের শক্তি কিছুই নাই। আমি যে বড় পতিত আর তুমি পতিতপাবন—আমি যে বড় দীন আর তুমি দীনবন্ধু—আমি যে বড় কাঙ্গাল আর তুমি কাঙ্গালের হরি।

জ্ঞানী হও বা যোগী হও বা ভক্ত হও অথবা একাধারে তিনই যদি অবলম্বন করিয়া থাক—তবে একবার করিয়া নিত্য পরীক্ষা করিও কি তুমি পার। প্রত্যহ ত খণ্ডমৃত্যু ঘটে—যাতনা তাহাতে থাকে না বটে কিন্তু আর সব লক্ষণ ত মৃত্যুলক্ষণেরই মত। দেখিতে দেখিতে সেই সব ভুল হইয়া যায়—কোথায় যাইতেছি তাহাও জানি না—এমন অবস্থায় পড়ি যেখানে আদৌ আমার পুরুষার্থ কিছুই থাকে না। বলিতেছি এরূপ অবস্থা ত নিত্যাই হয়। হয় না কি? নিদ্রাকালে অবশ হইয়া কাহারও হাতে পড়ি না কি? অবশ হইয়া জাগ্রত হইতে স্বপ্নে যাইনা কি? অতি অবশ হইয়া স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে যাইনা কি? যে নাম সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার জন্য কতই করি নিদ্রার আক্রমণে তাহা ত

একক্ষণেই ভুল হইয়া যায়—তোমাকে স্মরণে ত রাখিতে পারি না। তাই বলিতেছি নিদ্রার পূর্ব্বে একবার করিয়া প্রত্যহ জ্ঞানীর বা ভক্তের শেষ কার্য্যটি করিয়া দেখা উচিত। যদি যথার্থ জ্ঞানী হও তবে ত মিথ্যা নিদ্রা, সত্য তুমি, তোমাকে অভিভূত করিতেই পারে না। যদি যোগী হও তাহা হইলেও তোমার মনকে তুমি এমন স্থানে লইয়া যাইতে পার যেখানে গেলে লয় বিক্ষেপজনিত—বা রজস্তমপ্রসূত নিদ্রা বা স্বপ্ন তোমায় ছুঁইতেই পারে না। কিন্তু জ্ঞানী হইয়া বা যোগী হইয়া যদি দেখ নিদ্রাও বেশ চলে তবে জানিও ঠিক জ্ঞানী বা যোগী তুমি নও। এই দুইটি পার না বলিয়াই বলি তুমি এখনও ভক্ত—ভক্তির সাধনাই তোমার করা উচিত। তুমি কিছু কিছু প্রাণায়াম অভ্যাসও কর এবং জ্ঞানের বিচারও তুমি কর সত্য তথাপি তুমি ভক্তের কোঠাতেই আছ। জ্ঞান বিচার কর বা যোগাভ্যাসই কর তোমাকে প্রথমে ভক্তই হইতে হইবে। বিনা ভক্তিতে যোগও হইবে না আর জ্ঞানও হইবে না। শয়নকালে তবে প্রত্যহ ভক্তের কার্য্যটি তুমি কর। শ্রুতি তাই বলিতেছেন ভক্তিপথ বড় নিরুপদ্রব। ফলে সর্ব্বশাস্ত্রমতে দেখা যায় বিনা ভক্তিতে যোগ বা জ্ঞান কোনটিই লাভ করা যাইবে না।

এইভাবে আত্মপরীক্ষা কর। জ্ঞানের বিচার নিত্য কর করিয়া দেখ মিথ্যা শোক মোহ, মিথ্যা ক্ষুধা পিপাসা, মিথ্যা জনন মরণ ভাবনা কতদূর চলে। যোগের স্থিরত্ব নিত্য অভ্যাস কর, করিয়া দেখ নিত্য কতটুকু স্থির হইতে পারিতেছ—আর স্থিরত্ব যখন ভাঙ্গে তখন শোকে দুঃখে তোমাকে কতটুকু বিচলিত করে। শেষে ভক্তি পথেও দেখ কতটুকু বিশ্বাস তুমি কর, কতটুকু সহ্য করিতে তুমি পার, কতটুকু নিশ্চিন্ত হইতে তুমি পার। এই আর কি। ইতি—

হোরি-স্মরণে।

১

কবে কোন্ অতীতের দোলপূর্ণিমায়
খেলেছিলে হোরি খেলা এই আঙ্গিনায়
লাল যমুনা জল লাল তমালতল
লাল তুলসীদল লালবক্ষস্থলে
লালে লাল নন্দলাল হৃদে নেচেছিলে॥

২

আমার হৃদয়ভূমি এই বৃন্দাবন
ভরিত-প্রেম—তরঙ্গ-মাখা শ্রীচরণ
ছুঁয়েছুঁয়ে হর্ষভরে কণ্টকিত কলেবরে
তুলিত যে মধুময় প্রাণের স্পন্দন
সে লহরী ধরা ঘুরে খেলিত কেমন!

৩

সে খেলা ছড়ায়ে যেত আকাশের গায়
সে তরঙ্গ নাচাইত শশি-তারকায়
নব নব কিশলয়ে সেই রঙ্গে রাঙ্গাইয়ে
তুমিই খেলিতে খেলা যেথায় সেথায়
একা বহু লালে লাল করিতে খেলায়॥

৪

মাঠে মাঠে এ ফাগুনে ফাগ ফুল লয়ে
এখনও দাঁড়ায়ে থাকি আবির ছড়ায়ে
কবে ছেড়ে গেছ তুমি পথ চেয়ে আছি আমি
কে আছে আমার আমি কি লইয়া থাকি
শুধিয়া ও মখশশী প্রাণমাত্র রাখি॥

৫

ধরম করম কোথা কোথায় সঙ্গিনী
লীলা সহচরী কোথা রাধা গরবিনী
ধর্ম্মের রক্ষক নাই কপটতা ঠাঁই ঠাঁই
তুমি গেছ গোলকেতে আমি আছি হেথা
কে ঘুচাবে হাহাকার কে ঘুচাবে ব্যথা ?

৬

এখনও আমার বক্ষে পুত্রকন্যা মিলে
এই দোল পূর্ণিমায় হোলি খেলা খেলে
কেহ খেলে এই হোলি কেহ পাড়ে গালাগালি
মা হইয়া আমি থাকি মৃত্যু করি সার
আসিবে কি নন্দলাল আর একবার ?

৭

সে দিন আসিবে কবে—যে দিনে আসিবে
দরশনে পরশনে সব ক্ষোভ যাবে
ভিতরে ভাবিয়া হরি বাহিরে খেলিবে হোরি
বাহিরে ভিতরে হবে শুভ সম্মিলন
এ খেলায় ধন্য হবে পুত্রকন্যাগণ ? *

কর্ম্মের কৌশল।

১৩২৬ আশ্বিনের শেষ শনিবারে সৎসঙ্গ সভায় আলোচনা হইল সর্ব্বদা শ্রীভগবানকে লইয়া থাকিবার সহজ উপায় প্রণাম করিতে করিতে সর্ব্বদা মন্ত্রজপের অভ্যাস। শ্রীভগবান বহুস্থানে বলিয়াছেন "মাং মনস্কুরু" বড় সহজ সাধনা। শ্রীগীতাতে ইহার বিধি আছে। মন্মনা হও—না পার তবে মদ্ভক্ত হও—ইহাও না পার মৎযাজী হও—ইহাও না পার "মাং নমস্কুরু" কর। অধিকারী ভেদে সাধনার এই চারি অবস্থা বড় সুন্দর। শ্রেষ্ঠ অধিকারী যিনি তিনি মনটি ভগবানকে দিতে পারেন। মনটি তাঁহাকে দিলেই তিনি হইয়া স্থিতি লাভ করা হয়। এতদূর যিনি না পারেন তিনি হন ভক্ত তিনি অনুরাগে ভজন করেন। আমার দেবতা যিনি বা মন্ত্র যেটি বা গুরু যিনি তিনি আমার আত্মারই প্রেমেরমূর্ত্তি। সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে ভাবনা করা কঠিন বলিয়া মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে ধরিতে হয়। সর্ব্বদা তাঁর জন্য অপেক্ষা করা, সর্ব্বদা তাঁর সেবার জন্য মনকে তাঁর কার্য্যে মনে মনে নিযুক্ত রাখা, সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে তাঁকে স্মরণ করিয়া মনে মনে তাঁর দর্শন জন্য উৎকণ্ঠাস্ফুটিত হওয়া, মনে মনে তাঁর রূপ, তাঁর গুণ, তাঁর কর্ম্ম, তাঁহার স্বরূপের স্মরণে কখন হাসি কখন কান্না কখন নৃত্য কখন স্থির এইরূপ বহুভাবে থাকা—এই সকল ভক্তের কার্য্য। ইহাও যিনি না পারেন তিনি ভিতরের পূজা ভিতরে সর্ব্বদা পাবার জন্য বাহিরে ফুলে জলে, বিল্বদলে, তুলসী মঞ্জরীতে তাঁর পূজা করিবেন তাঁর ভজন করিবেন। ইহাও যিনি না পারেন তিনি সর্ব্বভূতে আমি আছি বিশ্বাস করিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তু দেখিয়াই মনে মনে আমাকে প্রণাম করিবেন। এই ভাবে মাং মনস্কুরুর কথা গতবারে আলোচনা হইয়াছিল।

অধ্যাত্ম রামায়ণে রামগীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং
তাবন্মদারাধন তৎপরো ভবেৎ॥

যতদিন পর্য্যন্ত না এই নিখিল বিশ্ব রামময় দেখ ততদিন প্রতিমাদিতে আমার আরাধনা করিবে। আবার বলিতেছেন—

তাবন্মামর্চ্চয়েদ্দেবং প্রতিমাদৌ স্বকর্ম্মভিঃ।
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং চাত্মনি ন স্মরেৎ॥

শ্রীভগবান্ কৌশল্যা জননীকে উপদেশ দিতেছেন "সমস্ত প্রাণী মধ্যে আমি আত্মা হইয়া আছি। আত্মাকে না জানিয়া মূঢ়বুদ্ধি নরনারী যদি কেবল বাহিরের কর্ম্ম করে তবে অনেক উপকরণ বিশিষ্ঠ বিবিধ দ্রব্যে হে জননি! আমার তৃপ্তি হয়না। ভূতগণের অবমানকারী, প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করিলেও আমি সে অর্চ্চনা গ্রহণ করি না। আমি সর্ব্বভূতে আত্মরূপে আছি ইহা যতদিন বোধগম্য না হয় ততদিন আপন নিত্যকর্ম্ম দ্বারা প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করিবে।

শ্রীভগবান্ এইখানে বলিতেছেন—

চেতসৈবানিশং সর্ব্বভূতানি প্রণমেৎ সুধী।

সুধী ব্যক্তি মনে মনে সর্ব্বদা সর্ব্বকালে সর্ব্বভূতকে প্রণাম করিবেন।

১৩২৬ কার্ত্তিকের প্রথম শনিবার হইল ১ম দিন। এই দিনে সৎসঙ্গ সভায় কর্ম্ম করিবার কৌশলটি দেখান যাইবে।

কি লৌকিক, কি বৈদিক, কোন কর্ম্মই মানুষ মনের মত করিয়া করিতে পারে না। সেইজন্য বড় বড় সাধকও বলেন ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ ইত্যাদি।

মানুষ যদি কর্ম্ম ঠিক ঠিক করিতে না পারে তবে মানুষকে প্রথমেই শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমেই প্রার্থনা করিতে হইবে ঠাকুর! কতদিন ধরিয়াইত সন্ধ্যা, পূজা, জপ ধ্যান, প্রাণায়াম ধারণা ইত্যাদি করিতেছি। কিন্তু তবুও ত আমার হইল না। আমার দ্বারা কর্ম্ম ভবে হইবে না যতক্ষণ না তুমি আমার কর্ম্মনিষ্পত্তির ভার গ্রহণ কর। আমি তোমার আজ্ঞাপালনে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু তুমি আসিয়া আমার কর্ম্ম নিষ্পত্তি কর। আমি তোমার হাতে যন্ত্র হইয়া যাই তুমি এই যন্ত্রের ব্যবহার কর। কর্ম্ম করিয়া যেন কখন আমার

মনে না হয় আমি করিলাম। হাতের অস্ত্র কখন যেন না বলে আমি কাটিতেছি। এই যে কর্ম্ম প্রথমেই লুটাইয়া লুটাইয়া কর্ম্ম নিষ্পত্তির জন্য তাঁরে ডাকা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা, ইহাই হইল কর্ম্মের কৌশল। ইহা যতদিন কর্ম্মের ভিত্তিরূপে না দাঁড়ায় ততদিন কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন হইবেই। কর্ম্মের কৌশলটি ধরিয়া অভ্যাস করিতে পারিলে হইবে নিষ্কাম কর্ম্ম। এই নিষ্কাম কর্ম্মের সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিতেছেন—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

বর্ষশেষে-মোক্ষদাতাগুরু-কর্ম্মসঙ্কেত-অপেক্ষা-ধৈর্য্য।

কাহারও বা অনেক বাকী কাহারও বা এই শেষ। মোক্ষদাতা গুরু ভিন্ন জন্মশেষ কাহারও হইবে না। সকলের জন্যই জ্ঞানদাতা গুরু অপেক্ষা করিতেছেন। এ গুরু সবার জন্যই আছেন। গৃহী হও, সাধু হও, বা সন্ন্যাসী হও, মোক্ষদাতা গুরু জন্ম শেষ করিবার জন্য চাইই। কোথাও এই গুরুই সেই গুরু।

শ্রীগুরুই প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে পুরুষার্থ করাইতেছেন। তুমি শাস্ত্র মত পুরুষার্থ কর আর শ্রীগুরুর প্রতীক্ষা কর। প্রতিদিনের কর্ম্মশেষে প্রার্থনা কর হে নিরাকার! নরাকারে কবে আসিবে? কবে আমি তোমায় প্রত্যক্ষ করিব? যতদিন না করিতেছি ততদিন এই গুরু, মন্ত্র ও ইষ্টদেবতাও বটেন।

হঠযোগ আর রাজযোগ দুটি পথ। ভক্তিযোগ সব যোগের মূল। হঠযোগে প্রাণস্পন্দন নিরোধ আর রাজযোগে মনোনাশ। প্রাণের কর্ম্ম যাঁহারা করেন তাঁহারা বুঝেন প্রাণস্পন্দন অবরোধে মনের নাশ কিরূপে

হয়। এই মনোনাশ কিন্তু চিরতরে থাকে না সেইজন্য সঙ্গে সঙ্গে রাজযোগ অভ্যাস করা চাই। যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ গ্রন্থ রাজযোগের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সমস্ত সাধনার কথাও আছে কিন্তু রাজযোগটি জন্ম শেষ করিবার কার্য্য বলিয়া বিশেষভাবে আছে। মন কি, মনকে সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতে হয় কিরূপে, মনকে কোন বিচার দ্বারা স্থির করিয়া নাশ করা যায় অতি সুন্দর ভাবে গ্রন্থে এই সমস্ত ধরিয়া দেওয়া আছে।

প্রাণস্পন্দন নিরোধের সঙ্গে যাঁহারা মনোনাশের বিচারটি রাখিতে পারেন, সর্ব্বদা মনকে লক্ষ্য করিয়া, ইহার গতি, বিচার সাহায্যে ব্রহ্মের দিকে ফিরাতে পারেন, তাঁহাদেরই শেষ বিশ্রান্তি হয়। কিন্তু এই সমস্ত বড় বড় সাধনার সঙ্গে সব সময়ের জন্য ভক্তিযোগে নাম করা আর প্রণাম করা, গুণ কীর্ত্তন করা, আর লীলা চিন্তা করা এইগুলির পাকা অভ্যাস চাই। তবে কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান ক্রমানুসারে এই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে চলা হইল। সৎসঙ্গে ও সৎশাস্ত্রে ইহারই পুষ্টি।

ভক্তিযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ বর্ষশেষে ইহারই আভাষ দেওয়া রহিল। বর্ষারম্ভে যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় ইহারই বিস্তার করা যাইবে।

গুরু শাস্ত্র সব ধরাইলেন সব করাইলেন। আমিও সব ধরিলাম সব করিলাম। একবার দুইবার করিয়া সব অনুভব করিলাম কিছু লইয়া থাকিতে পারিলাম কৈ? আবার ছুটিয়া গিয়া গুরু শাস্ত্রে চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিলাম। ঠাকুর আমার অন্তর্য্যামী। আমার দুঃখ দূর করিলেন, বলিয়া দিলেন সব উপায় জানিয়াছ এখন সব কর আর সর্ব্বদা রাম রাম কর। একটি শ্বাসও যেন বৃথা না যায়। আর সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সবাই যে রাম রাম করিতেছে তাহা ভাবনা করিয়া মনে মনে প্রণাম করা অভ্যাস কর।

দুইটি কর্ম্ম গুরু আমায় কৃপা করিয়া বলিয়া দিলেন। সে দিন একাদশী। আমি উপবাসী থাকিয়া ভগবান্ বাল্মীকির বসিষ্ঠ [illegible] চিন্তা করিতেছিলাম। ঠিক ঠিক জানিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময়ে শ্রীগুরু আসিয়া উপদেশ করিয়া গেলেন।

আমি ভাবিতেছি নাম কর আর প্রণাম কর হইবে কিরূপে? ইহাইত সাধনা। আমার মত মূর্খকে তিনি ইহাই ধরাইলেন। আহা! তাঁর যে বড়ই করুণা। সেই উপায় করিয়া দিল। উপায় লবুপায়—আমি কৃতার্থ হইলাম। অনন্ত অনন্তকালের জন্য নিশ্চিন্ত হইলাম। যদি আপনার মানুষ আসিয়া চিনাইয়া দিয়া যায় তবে কি সবাই নিশ্চিন্ত হয় না? হয় বৈকি।

(৩)

এবার বর্ষ শেষের শেষ কথা ধৈর্য্য।

তুমি আসিবেই নিশ্চয়। অকস্মাৎ আসিবে। এ কথা কখনও মিথ্যা হইবে না। তবে সময়ে সময়ে অধৈর্য্য হওয়া কেন? ইহা উচিৎ নয়। সময় না হইলে তোমার দেখা মিলিবে না। এখনও ভাল কার্য্য যাহা করি তাহা তুমিই গোপনে থাকিয়া করাও। তবে আমার ব্যস্ত হইবার কোন কারণ থাকা উচিত নয়।

এই দেহটা বাধা দেয়? তা দিলেই বা—এটা প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই যাইবে না। আর প্রারব্ধে শেষকর্ম্ম যাহা আছে তাহা যতদিন না তুমি সাক্ষাতে আসিয়া করাইতেছ ততদিন এটা যাইতেই পারে না। তবে ভয় কি? ধৈর্য্য ধর।

দেহটা অপটু হইলে কাজ করা যায় না—এটা গোলমাল তুলে। কথাটা ঠিক নয়। অপটু দেহ লইয়াও মানুষ খুব বড় ২ কাজ করিয়াছে। একজন বিখ্যাত লোক বলিয়াছেন—যদি আমি চির রুগ্ন না হইতাম তবে আমি যা করিয়া গেলাম তাহার অর্দ্ধেক ও করিতে পারিতাম না। বেশ তাহাই হউক। আজ ১৩২৬ শিব-রাত্রির পারণের পর দিন! আজ হইতে আবার যে যে কার্য্য শেষ করিব বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া তাহা করিতে চেষ্টা করিবই। আর বলিব তোমার প্রসন্নতা তুমি একটু অনুভব সীমায় আনাইয়া দাও। ইতি—

শ্রীভরত।

(পুনরাবৃত্তি)

পুষ্প সকল বিশীর্ণ হইলে, কর্ণিকার বৃক্ষের শাখা যেমন বনমধ্যে শোভাশূন্য হইয়া থাকে, তেম্নি ইনিও দুঃখার্ত্তা আছেন, সত্যপরাক্রম বীরবর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইঁহার উভয় পুত্র। আর যাঁহার জন্য অযোধ্যা-বাসীর এই দুর্দ্দশা, যাঁহার জন্য রাম বনবাসে গিয়াছেন, যাঁহার জন্য আমার প্রভুর বিরহে আমার এই দশা, পিতার দেহত্যাগ, সেই ঐশ্বর্য্যলুব্ধা সূর্য্যবংশঅযশস্কর পুত্রবতী, পাষাণহৃদয়া কৈকেয়ী এই। ভরতের কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল, পুনরায় অতিকষ্টে বলিলেন, প্রভু! যাহার গর্ভে জন্মিয়া আজ আমি নরাধম, এই সেই হতভাগ্যের গর্ভধারিণী।

শ্রীভরদ্বাজ মুনি তখন ভরতকে বলিলেন, ভরত! "স্বপূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মৈব কারণং সুখদুঃখয়োঃ": নিজের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলই সুখ দুঃখের কারণ।

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতী কুবুদ্ধিরেষা
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্ম্মসূত্র গ্রথিতো হি লোকঃ।"

নতুবা কেহই কাহাকে সুখদুখ দিতে পারে না, পরে দুঃখ দান করে এই জ্ঞান ভ্রমাত্মক। 'আমি করি' ইহাও বৃথা অভিমান, কেননা লোকে আপন কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত।

অতএব ভরত! তুমি কৈকেয়ীকে নিন্দা করিও না।

পরে,—সকলে মুনিচরণে প্রণাম করিয়া, শ্রীরামের জয়ধ্বনি দিয়া, চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দশম অধ্যায়।

সৈন্যগণের সহিত ভরত গমন করিতেছেন, এখানে রামসীতার সহিত কালক্ষেপ করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার নিকট ভরতের গমনস্পর্শী সৈন্য পদরেণু ও সৈন্য কোলাহল সমুত্থিত হইল। ভীত, মত্ত বন্যজন্তুগণ আপন আপন দল ছাড়িয়া দশদিকে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া, রাম বিস্ময় পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে বলিলেন, দেখ লক্ষ্মণ! এই পর্ব্বতে "ভীমস্তনিত গম্ভীরং তুমুলঃ শ্রূয়তে স্বনঃ" মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দ হইতেছে, ওই দেখ ধূলিরাশিতে চারিদিক আর দেখা যাইতেছে না "সর্ব্বমেতদ যথা তত্ত্বমভিজ্ঞাতুমিহার্হসি" কি কারণে এস্থানে এরূপ সংঘটিত হইয়াছে তাহা তোমার যথার্থরূপে অবগত হওয়া উচিত। অগ্রজের আদেশানুসারে লক্ষ্মণ সত্বর পুষ্পিত শালবৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া হস্তী, অশ্ব সুসজ্জিত দেখিতে পাইয়া শ্রীরামকে বলিলে "আর্য্য! "অগ্নিং সংশমযত্বার্য্যঃ সীতা চ ভজতাং গুহাম" আপনি অগ্নি নির্ব্বাণ করুন ও সীতাদেবী গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকুন। তখন রাম বলিলেন, "লক্ষ্মণ! কস্যেমাং মন্যসে চমূম্" এ সেনা কাহার বোধ হইতেছে? রামবাক্য শ্রবণ করিয়া "দিধক্ষন্নিব তাং সেনাং রুষিতঃ পাবকো যথা"॥ লক্ষ্মণ ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া সেনাগণকে যেন দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করতঃ বলিলেন "যন্নিমিত্তং ভবান্ রাজ্যাচ্চ্যুতো রাঘব শাশ্বতাৎ" রঘুবীর! যাহার জন্য আপনি অক্ষয় রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সেই পরম শত্রু বধযোগ্য ওই ভরত আসিতেছে, "ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব" ভরতের বিনাশে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। কারণ—

"পূর্ব্বাপকারিণং হত্বা ন হ্যধর্ম্মেণ যুজ্যতে।
পূর্ব্বাপকারী ভরতস্ত্যাগে ধর্ম্মশ্চ রাঘব॥

প্রথামাপরাধী ব্যক্তিকে নিহত করিয়া কোন ব্যক্তি অধর্ম্মযুক্ত হয় না। ভরত পূর্ব্বে আমাদের অপকার করিয়াছে, ইহাকে নিধন করিলে বরং ধর্ম্মই হইবে। আর্য্য! আপনি পরমসুখে সসাগরা পৃথিবী শাসন করিবেন। মানদ! এতকাল যে ক্রোধ আমি সম্বরণ করিয়া ছিলাম আজ আমি তৃণমধ্যে তাহা অগ্নির ন্যায় শত্রুমধ্যে নিক্ষেপ করিব।

"ছিন্দগুত্রশরীরাণি করিষ্যে শোণিতোক্ষিতম্"
"শরৈর্নির্ভিন্ন হৃদয়ান্ কুঞ্জরাং স্তুরগাংস্তথা।"

আজিই আমি শাণিতশরসমূহদ্বারা শত্রু-শরীর ছিন্নভিন্ন করতঃ চিত্রকূট গিরির কাননকে রক্তাক্ত করিব। "সসৈন্যং ভরতং হত্বা ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ" সসৈন্যে ভরতকে আজ সংহার করিয়া ধনুর্ব্বাণের ঋণ পরিশোধ করিব সংশয় নাই।

তখন শ্রীরাম, অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্মণকে বলিলে, ভাই লক্ষ্মণ! অমি পিতৃসত্যপালনার্থ বনে আসিয়াছি, ভরত তাহাতে কোন্ দোষে দোষী হইল? আর লক্ষ্মণ! মিত্রগণের বিনাশে যাহা পাওয়া যায়, "নাহং তৎ প্রতীগৃহ্ণীয়াং ভক্ষান্ বিষকৃতানিব" বিষমিশ্রিত ভক্ষদ্রব্যের ন্যায় আমি তাহা গ্রহণে অভিলাষী নহি। ভাই! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তোমাদিগের জন্যই আমি ধর্ম্মঅর্থকাম কামনা করিয়া থাকি, তোমাদের প্রতিপালনের জন্যই আমার রাজ্যলাভের বাসনা, তোমাদের জন্যই আমি সত্যধর্ম্মে থাকিয়া অস্ত্রধারণ করি। নতুবা প্রিয়দর্শন!

"নেয়ং মম মহী সৌম্য দুর্লভা সাগরাম্বরা।
ন হীচ্ছেয়মধর্ম্মেণ শত্রুত্বমপি লক্ষ্মণ।"

লক্ষ্মণ! এই সসাগরা ধরা কিছু আমার পক্ষে দুর্লভ নহে, আমি অধর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও ইচ্ছা করি না।

"যদ্বিনা ভরতং ত্বাঞ্চ শত্রুঘ্নঞ্চাপি মানদ।
ভবেন্মম সুখং কিঞ্চিদ্ভস্ম তৎ কুরুতাং শিখী॥"

মানদ! ভরত, তুমি এবং শত্রুঘ্ন বিনা, আমার যে সুখ হয়, অগ্নি তাহা ভস্মসাৎ করুন। আর তুমি কি ভরতকে জান না? তুমি নিশ্চয় জানিও আমাগত প্রাণ, আমার প্রাণতুল্য প্রিয়তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত, শোকবিহ্বল হইয়া, পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাকে রাজ্যদান করিতে আসিতেছেন। ভাই লক্ষ্মণ! ভরত আমাদের অহিত করা দূরে থাক, সে যে, আমাকে না দেখিয়া কি করিয়া এতক্ষণ আছে, আমি তাই ভাবিতেছি,

আমি ছাড়া ভরতের গ্রহণ করিবার আর যে কিছুই নাই, সে যে আমাময় প্রাণ, ভাই, যতক্ষণ আমি ভরতকে না দেখিতেছি, ততক্ষণ আমি তাহার জন্য বড় ব্যাকুল হইতেছি, তুমি নিশ্চয় জানিও, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা হইতেও সে চাহে না। তাহার দেহ, মন, প্রাণ-রাজ্যের রাজা, যে আমি, তবে বল সে কি লইয়া রাজ্য করিবে? যে সর্ব্বান্তকরণে আমার শরণ লয়, আমি যে তাহার সব অহং ঘুচাইয়া, তাহার হৃদয় রাজ্যের রাজা হই। আমাকে যে পাইয়াছে তুচ্ছ তাহার অনিত্য ধন জন; অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য, গ্রহণ করা দূরে থাক্ ফিরিয়াও ইহা সে দেখে না, সে যে তখন আমাকে লইয়া পরিপূর্ণ, সে ভরিত হৃদয়ে আর সকল দ্রব্য উথলিয়া পড়ে, অল্প অনিত্য লইয়া থাকিলেই অভাব অশান্তি। ইহা তাহা গ্রহণ করিয়া লোকে পুনঃ পুনঃ আপনার মনকে প্রবোধ দিতে গিয়া দুঃখসাগরে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু যে 'ভূমার' আনন্দ বুঝিয়া অনন্তের সীমাশূন্য প্রেমে ডুবিয়া জগতের অনিত্যতা বুঝিয়াছে, সে কি অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করিতে পারে? সে যে, শত ইন্দ্রপদ তুচ্ছ করে, অতএব ভাই লক্ষ্মণ!

"ন হি তে নিষ্ঠুরং বাচ্যো ভরতো নাপ্রিয়ং বচঃ।
অহমপ্রিয়মুক্তঃ স্যাং ভরতস্য প্রিয়ে কৃতে"

ভরতকে নিষ্ঠুর বা অপ্রিয় বাক্য বলা তোমার উচিত নহে, ভরতকে কোন অপ্রিয় বাক্য বলিলে তাহা আমাকেই বলা হইবে। বল সৌমিত্রে!

"কথং নু পুত্রাঃ পিতরং হন্যুঃ কস্যাঞ্চিদাপদি।
ভ্রাতা বা ভ্রাতরং হন্যাৎ সৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ"॥

কোন বিপৎকালেও কি পুত্রেরা পিতাকে অথবা ভ্রাতা আপন প্রাণসম ভ্রাতাকে বিনষ্ট করিতে পারে?

ধার্ম্মিক ভ্রাতৃ হিতকার্য্যে রত শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলিলে,

"লক্ষ্মণঃ প্রবিবেশেরস্বানি গাত্রাণি লজ্জয়া"

লক্ষ্মণ, লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া, যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন। অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কি বলিবেন কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন

না, পরে বলিলেন, আর্য্য! তবে বোধ হয় পিতা দশরথ আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন—লক্ষ্মণকে তদবস্থা দেখিয়া তাহার লজ্জানিবারণ মানসে রাম লক্ষ্মণের কথায় অনুমোদন করিয়া কহিলেন, আমারও তাহাই বোধ হইতেছে, এই বিদেহনন্দিনী নিয়ত সুখসেবিনী, ইহাকে বন হইতে নিশ্চয় গৃহে লইয়া যাইবেন।

পুনরায় লক্ষ্মণ বলিলেন—

"ন তু পশ্যামি তচ্ছত্রং পাণ্ডুরং লোকবিশ্রুতম্।
পিতুর্দিব্যং মহাভাগ সংশয়ো ভবতীহ মে" ॥

আর্য্য কাকুস্থ রাম! কিন্তু পিতার সেই লোকবিখ্যাত দিব্য ছত্র দেখিতেছি না, অতএব আমার ইহাতে সংশয় হইতেছে।

শ্রীরাম তখন বলিলেন, ভাই। এখনই এ সন্দেহ ভঞ্জন হইবে তুমি এক্ষণে, বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর।

অগ্রজের কথা শ্রবণ করিয়া সেই সমরবিজয়ী লক্ষ্মণ তরুশীর্ষ হইতে অবরোহন পূর্ব্বক—

'লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ'

কৃতাঞ্জলি হইয়া রামের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন।—

শ্রীভরত কিছুদূর গমন করিয়া হংসসারসসেবিতা কুসুমিত তরুগণোপশোভিতা বিচিত্র পুলিনশালিনী মন্দাকিনী নদী দেখিতে পাইয়া পরিশ্রান্ত সৈন্যগণকে বলিলেন, এইবার আমরা মহর্ষি ভরদ্বাজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বোধ হয় আসিয়াছি, এই দেখ দূর হইতে বনসকল নীল মেঘের ন্যায় বোধ হইতেছে, চিত্রকূট পর্ব্বতের নিম্নে, খর প্রবাহিনী মন্দাকিন আনন্দোচ্ছ্বাসে দুকূল বহিয়া প্রিয় সঙ্গম আশায় ছুটিতেছে। বিবিধ ফলপুষ্প সুশোভিত ছায়া-সমন্বিত মনোরম বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ অতি রমণীয় শান্তিময় কানন। অতএব আমার মনে হইতেছে রামচন্দ্র এইখানেই আছেন, তোমরা যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান কর। এই বলিয়া ভরত, কম্পিত কলেবরে [illegible] সেই তরুনিকরে, আচ্ছন্ন অতি নির্জ্জন

অরণ্যে গমন করিয়া শূন্যপ্রাণে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দূর হইতে দেখিলেন—

দদর্শ দূরাদতি ভাস্বর শুভং
রামস্য গেহং মুনিবৃন্দসেবিতম্।
বৃক্ষাগ্রসংলগ্ন সুবল্কলাজিনং
রামাভিরামং ভরতঃ সহানুজঃ॥

অতি সুপ্রভ মুনিগণ নিষেবিত রাম-বাস-মনোহর শুভ রামাশ্রম। তত্রত্য বৃক্ষের শাখাগ্রভাগে উত্তম বল্কল ও চর্ম্ম আবদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীভরত, আনন্দে আশ্রম সমীপে গমন করিয়া, ভূতলে সীতারামের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশরেখাযুক্ত পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া, অষ্টাঙ্গ লুটাইয়া পদরজ মাখিয়া বলিলেন—

'অহো সুধন্যোঽহমমুনি রাম
পাদারবিন্দাঙ্কিত ভূতলানি।
পশ্যামি যৎ পাদরজো বিমৃগ্যং
ব্রহ্মাদি দেবৈঃ শ্রুতিভিশ্চ নিত্যম্॥

অহো! আমি অতীব ধন্য হইলাম, কারণ যাঁহার পদধুলি ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং বেদগণের সতত অন্বেষণীয়, সেই শ্রীরামের চরণ-কমল চিহ্নিত এই সকল ভূভাগ আমি নয়নগোচর করিতেছি।

ইত্যদ্ভূত প্রেমরসাপ্লুতাশয়ো
বিগাঢ়চেতা রঘুনাথ ভাবনে।
আনন্দজাশ্রু স্নপিতস্তনান্তরঃ
শনৈরবাপাশ্রমসন্নিধিং হরেঃ॥

এইরূপ অদ্ভুত প্রেমরশে আদ্রচিত্ত রঘুনাথ-চিন্তানিমগ্ন ভরত, আনন্দাশ্রু দ্বারা নিজ বক্ষস্থল অভিষিক্ত করতঃ আশ্রম সমীপে গমন করিতে করিতে অমাত্য প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন।

জগত্যাং পুরুষব্যাঘ্র আস্তে বীরাসনে রতঃ।
জনেন্দ্রো নির্জনং প্রাপ্য ধিঙ্মে জন্ম সজীবিতম্॥

এই ভূমণ্ডলে যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপুরুষ আর নাই, সেই নরনাথ রাম নির্জ্জন বনে যোগীর আসনে উপবেশন করিতে অনুরক্ত হইয়াছেন, অতএব আমার জন্মে ধিক্।

"মৎকৃতে ব্যসনং প্রাপ্তো লোকনাথ মহাদ্যুতিঃ।
সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য বনে বসতি রাঘব।"

মহাদ্যুতি, লোকনাথ রাম, আমার জন্যই বিপদগ্রস্থ হইয়া, সকল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনমধ্যে বাস করিতেছেন, অতএব আমার জীবনে ধিক্

"ইতি লোক সমাকৃষ্টঃ পাদেষ্বদ্য প্রসাদয়ন্।
রামং তস্য পতিষ্যামি সীতায়া লক্ষ্মণস্যচ॥"

এইরূপে আমি সর্ব্বলোকনিন্দিত হইয়াছি, আমি এখনই রামকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার পদতলে, এবং পরে সীতা ও লক্ষ্মণের চরণে পতিত হইব। দয়াসিন্ধু দয়াধার রাম কখন আমার প্রতি নিদয় হইতে পারিবেন না।

এই বলিয়া রাম-দর্শনাকাঙ্ক্ষী উন্মাদ ভরত কম্পিত কায়ে, বিবিধ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত শ্রীরামের কুটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন সেই কুটির মধ্যে অপূর্ব্ব বেদি, এই রাম দর্শনে ভরতের দিব্য চক্ষু ফুটিল। ভরত ক্ষণতরে সব ভুলিয়া, সব হারাইয়া দেখিলেন কুটির মধ্যে কোটিচন্দ্র সুশীতল কিরণ মত অতি স্নিগ্ধ জ্যোতি, সেই জ্যোতিরাশির মাঝে পুষ্পময় বেদিতে নবদূর্ব্বাদল শ্যাম, বিশাললোচন অগ্নিতুল্য তেজস্বী চীরবল্কলধারী অনন্তকোটি জগৎপতি নিজ শক্তিরূপ সীতার সহিত কুশাস্তরণযুক্ত মৃত্তিকায় বসিয়া আছেন, লক্ষ্মণ তাঁহাদের চরণ সেবায় নিযুক্ত আছেন।

নদী, অসংখ্য তরঙ্গ হৃদয়ে লইয়া উৎপত্তি স্থানে মিশিতে ছুটে, সাগর সঙ্গমে আর কিছুই থাকে না, আপনার নাম রূপ পর্য্যন্ত হারাইয়া তদাকারে কারিত হয়। আর এই উৎপত্তি স্থানে না মিলা পর্য্যন্ত নিবৃত্তি নাই। বিন্দুর যে বড় সাধ সিন্ধুর সহিত মিশিতে, কিন্তু কি এক অবিদ্যা বাঁধ মাঝখানে বাধা দেয়, তাই জীব শুধুই আছাড় কাছাড় খায়।

শ্রীগুরু যাঁহাদের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরই শুধু অবিদ্যা বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় ও আপন ক্ষুদ্রত্ব লয় করিয়া তাঁহারা সিন্ধুই হইয়া যান, তখন তাহারও নদীর মত উদ্বেলিত হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতা সকল ছুটাছুটি সহস্র বাসনা-কামনা-রূপ তরঙ্গ লয় করিতে পারেন। তাঁহারা তখন সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া আপনার খণ্ডত্ব ভুলিয়া শান্ত স্থির হইয়া স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারেন। তখন আর সুখদুঃখ, বন্ধন, বিচ্ছেদ বিয়োগ, ব্যথা, ভব বিকারের ভীষণ ব্যাধি কিছুই থাকেনা, শুধুই আত্মারামে ভরিত হইয়া তাঁহারা পরিপূর্ণ হইয়া যান।

শ্রীভরতের ক্ষণতরে অবিদ্যাবাধ ভাঙ্গিয়াছে, তাই সমস্ত অজ্ঞান হইতে সরিয়া জ্ঞানঘন সীতারাম মূর্ত্তি ভাসিতেছে, তিনি অনিমেষলোচনে, সেই নবজলধর মেঘের কোলে, স্থির বিজলি, কি অপরূপ শোভা পাইতেছিল, তাই দেখিতেছেন। দেখিলেন, কল্পতরুমূলে, পুষ্পময় মণ্ডপ মাঝে, পুষ্পময় বেদির উপরে নীলমণি প্রভা। দেখিলেন, আদিত্যমণ্ডলগত চিদানন্দময় প্রণবজ্যোতিরূপ আপন আত্মারাম। দেখিলেন, সর্ব্বক্লেশ হরণকারী, কাকুৎস্থ,কমলাপ্রিয়, ভক্তাভীষ্টসিদ্ধকারী শরণাগত-বৎসল,সত্যসন্ধ রাম! দেখিলেন, শুদ্ধ সূক্ষ্মসর্ব্বাধার সনাতন, লোকাভিরাম, প্রাণাভিরাম রাম।

হর্ষগদগদচিত্তে, শ্রীভরত মনে মনে বলিতেছেন, এই ত আমার মাতাপিতা স্বামী সখা, এই ত আমার আত্মার প্রকট মূর্ত্তি।আমার সব তুমি। "সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্র দয়ালুর্নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে" শ্রীভরত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন,"নমোঽস্তু রামদেবায় জগদানন্দ রূপিণে" নমো বেদান্তনিষ্ঠায় যোগিনে ব্রহ্মবাদিনে'' মায়া মোহ নিরা-দায় প্রপন্নজনসেবিনে''

> পরাৎপরতরং তত্বং সত্যানন্দ চিদাত্মকং।
> মনসা শিরসা নিত্যং প্রণমামি রঘুত্তমম্'' ॥

পুনরায় বলিলেন। "ভূতত্রিনাথং ভুবনাধিপং তং, ভজামি রামং ভবরোগবৈদ্যম্'' ।—

(ক্রমশঃ)

সকলের গল্প-কি করিতেছি ?

অতি বিশাল এক অটবী। সেই অটবীতে কত কি যেন আছে মনে হয়, বাস্তবিক কিন্তু তাহা শূন্যা-মৃগপক্ষীরহিতা-মিথ্যা। অটবী সদা আশান্ত্বা-সদা বিক্ষেপ-বহুলা।

অতি ভীষণ এই বন। শতযোজনও যাহা তাহা কিন্তু এই ভীষণ অটবীর কণামাত্র। সেই বনে সহস্রলোচন সহস্রকর এক পুরুষ দেখিলাম। তাঁহার বিরাট দেহ আর তিনি বাসনাময়, সদা আকুল।

স সহস্রেণ বাহূনামাদায় পরিঘান্ বহূন্।
প্রহরত্যাত্মনঃ পৃষ্ঠে সাত্মনৈব পলায়তে ॥

দেখিলাম লোকটি সহস্র বাহুতে সহস্র মুদগর লইয়া আপনার পৃষ্ঠে আপনি প্রহার করিতেছে আর আপনি পলায়ন করিতেছে লোকটী আপনার প্রহারে আপনি ভীত হইয়া শতযোজন দূরে পলায়ন করিতেছে। ঐ পলায়নপর পুরুষ কাঁদিতে কাঁদিতে বহুদূরে গমন করিয়া শ্রান্ত, শিথিল অবয়ব, শীর্ণ চরণ, শীর্ণ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির ন্যায় অতি গভীর কোটর এক অতি ভয়ঙ্কর অন্ধকূপে পতিত হইল। কতকাল গেল পরে সে অন্ধকূপ হইতে উঠিয়া আবার আপনাকে প্রহার করিতে লাগিল। আর পলায়ন করিতে লাগিল। বহুদূরে গিয়া পতঙ্গের পাবকে প্রবেশের মত এক কণ্টকপূর্ণ লতাসমাচ্ছন্ন করঞ্জবনে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল মধ্যে সে করঞ্জ বন হইতে বাহির হইয়া পুনরায় আপনাকে আপনি প্রহার করিতে লাগিল আর হৈ হৈ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিতে লাগিল। লোকটা অতি দূরে পলায়ন করিয়া হাস্য করিতে করিতে শশাঙ্ককর শীতল এক কদলি বনে প্রবেশ করিল। আবার সে কদলীবন হইতে বাহির হইয়া আপনাকে আপনি প্রহার করিতে লাগিল আর পলায়ন করিতে লাগিল। বহুদূরে পলাইয়া আবার গাঢ় অন্ধকূপে পড়িল, তথা হইতে উঠিয়া কদলীবনে, কদলীবন হইতে গভীর করঞ্জবনে—আবার কূপে আবার কদলীবনে এই ভাবে

পুনঃ পুনঃ আপনাকে আপনি প্রহার করে আর ঐ ঐ দশা প্রাপ্ত হয়।

আমি তাহার ব্যাপার দেখিয়া তাহাকে যোগবলে পথে অবরুদ্ধ করিলাম। কিছু সুস্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কে ? কি জন্য এরূপ করিতেছ ? লোকটা বলিল—

"নাহং কশ্চিন্নচৈবেদং মুনে কিঞ্চিৎ করোম্যহম্"

মুনে ! আমি কেহই নই—কিছুই করিতেছিনা। তুমি আমার গতিরোধ করিলে তুমি আমার শত্রু। আমি তোমার দ্বারাই দুঃখী সুখী-রূপে দৃষ্ট হইলাম আর নষ্ট হইলাম।

সে তখন আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিতে লাগিল—ভারি অসন্তুষ্ট হইল আর মেঘ যেমন গর্জ্জন আর বর্ষণ করে সেইরূপ সে রোদন ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ক্ষণিক পরে দেখি লোকটা নিজের দেহ দেখিয়া হাসিতেছে আর গর্জ্জিতেছে। কিছুক্ষণ পরে সে আমার সম্মুখে স্বীয় অঙ্গ সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। প্রথমে তাহার ভীষণতম মস্তক, পরে বাহু, পরে বক্ষ, পরে উদর নিপতিত হইল। তাহার পর সে কোন এক অনির্দ্দেশ্য স্থানে চলিয়া গেল।

বনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমি ঐরূপ কত লোককেই দেখিলাম। ইহারাও আপনাকে আপনি প্রহার করে আর পলায়ন করে। কূপে পড়ে, আবার উঠে, করঞ্জকাননের গর্ত্তে পড়ে আবার উঠিয়া কদলীবনে ছুটাছুটী করে। কখন কষ্ট করে, কখন সন্তুষ্ট থাকে আবার আপনাকে আপনি প্রহার করে। মত প্রথম লোকটার সকলকেই অবরুদ্ধ করিয়া সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিলাম। লোকটা প্রথম পুরুষের মত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখে আর কাঁদে আবার হাসে। শেষে বিচার করিয়া কোথায় যে গেল আর দেখা গেল না।

আর এক জনশূন্য স্থানে ঐরূপ একজনকে দেখিলাম। লোকটা ঐরূপ গর্ত্তে পড়িয়া বহুকাল উঠিল না। আমি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সে উঠিলে তারে যোগবলে স্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম হে

পদ্মপলাশলোচন! সে কিন্তু কিছুই বুঝিল না। আমাকে বলিল রে পাপিষ্ঠ দ্বিজ! তুমি অতি দুষ্ট অতি মূঢ় তুমি কিছুই জান না। লোকটা এই বলিয়া নিজের কাজ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

আমি সেই মহারণ্যে কতই ঐরূপ দেখিলাম। আমার প্রশ্নে কেউ স্বপ্ন সম্ভ্রমে নিকটে আসে—কেহবা আমার কথা গ্রাহ্য করে না। কেহবা অন্ধকূপ হইতে উঠিয়া আবার অন্ধকূপে পড়ে, কেহ কদলীবনে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হয় না, কেহবা করঞ্জবনে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

পাঠক! এই সুবিস্তৃত অটবী এখনও আছে। তথায় ঐরূপ পুরুষ ও আছে। তুমিও সেই অটবী দেখিয়াছ আর তন্মধ্যে ভ্রমিয়াছ। তুমি ঐরূপ আপনাকে আপনি প্রহার করিতেছ আর পলায়ন করিতেছ। কখন অন্ধকূপে পড়িতেছ কখন করঞ্জবনে কখন কদলীবনে পড়িতেছ। এই মহাটবী অতি ভীষণ। তথাপি মানুষ তথায় যাওয়া আসা করে আর পুষ্পবাটিকার ন্যায় তাহার সেবা করে। কেমন গল্প? গল্পটি কিন্তু বাজে গল্প নহে। প্রতি ব্যাপারের অর্থ আছে। প্রতি ব্যাপার আমাদের জানাও আছে করাও আছে। একটু ভাবিলেই সকল কথা বুঝা যাইবে। যাঁহারা এতটুকু করিতে রাজি নহেন তাঁহারা যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের উৎপত্তিপ্রকরণের ৯৮ সর্গ দেখিবেন আর ৯৯ সর্গে ইহার অর্থ পাইবেন।

চিত্ত যাহা হইতে উঠুক আর ইহা যাহাই হউক সে অনুসন্ধান লইয়া ব্যস্ত হইও না। কিন্তু আপনাকে ইহা হইতে এবং ইহার রচিত প্রপঞ্চ হইতে উদ্ধার জন্য এই চিত্তকে অতিযত্নে আত্মাতে যোজিত কর। স্মরণ রাখ।

গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং।
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

ইহা ধরাইবার জন্যই ভগবান্ বশিষ্ঠ এই গল্প করিয়াছেন এবং অর্থ ব্যাখ্যায় নিস্তার উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন। দেখিলেই হয় কিন্তু দেখে কে আর প্রয়োগ করে কে? নিজে কোন অবস্থায় আছি ইহার বিচার যিনি প্রতিনিয়ত করিতে পারেন তিনি বুঝিতে পারেন আমাদের দেশের

মূলটি কোথায় ? এইটী হইতেছে আমাদের মন বা চিত্ত। মনকে ধরিতে পারিলেই আমরা বিষাদ যোগী। আবার মনকে যখন সর্ব্বদা ধরার অভ্যাসটি পাকা হইয়া যায় তখন দেখা যায় এই মনই আমাদের বড় উপকারী বস্তু। ইহাই আমাদিগকে বিষাদযোগী করে আর পরম রমণীয় দর্শনকে নিত্য পাইবার পথে লইয়া যায়।" মনকে ধর ; মনের ক্লেশকার কার্য্য বিচার কর ; দুঃখ দূর করিবার জন্য মনের আগ্রহ বাড়িবে। তখনই কাতর হইয়া তারে ডাকিবে আর সেই জ্ঞান জাগাইয়া দুঃখ দূর করিবে।

(শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপকার লিখিত।)

বর্ণবিবেক।

(পুনরাবৃত্তি)

তাঁহাদিগকে যে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় নাই তাঁহারা যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে উন্নতির অন্তরায় বলিয়া বুঝেন নাই, প্রত্যুত বর্ণাশ্রধর্ম্মকেই তাঁহারা অভিবৃদ্ধির হেতু, সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টফলপ্রদ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই সকল বাক্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়।

(১৭)

যজ্ঞের স্বরূপ সম্বন্ধে দুই এক কথা।

বক্তা—উদ্যোগ বিনা উন্নতি হইতে পারে না, ইহা যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উপদেষ্টা সনাতন বেদের উপদেশ তাহা জানিতে পারিলে, এখন তোমার কি জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—উদ্যোগ বিনা উন্নতি হইতে পারে না, যথাবিধি কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন প্রকার সিদ্ধি হয় না, উন্নতি করিতে হইলে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে হয়, ইত্যাদি যে সনাতন বেদেরই

আত্ম্যচ্চারণ, তাহা শুনিলাম, কিন্তু জ্ঞাতব্য হইতেছে, বেদ কর্ম্ম বলিতে যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানই কি তাহা হইলে উন্নতির একমাত্র হেতু? সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ফলের প্রদাতা? বেদোপদিষ্ট অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞসম্পাদন দ্বারা উন্নতি হয়, এখন কি কেহ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন? যজ্ঞের স্বরূপ কি? উন্নতি করিতে হইলে, কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে বেদের কি উপদেশ?

বক্তা—"উন্নতি করিতে হইলে, কি করা কর্ত্তব্য, এতৎ সম্বন্ধে উন্নতিশীল পাশ্চাত্য কোবিদগণ যাহা বলিয়াছেন, সনাতন বেদও তাহা (অবশ্য বিশুদ্ধতরভাবে) বলিয়াছেন, এবং ইহাঁরা যাহা বলিতে পারেন নাই—যাহার সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠান না করিলে উন্নতির প্রান্তভূমিতে উপনীত হওয়া অসম্ভব, বেদ তাহাও বলিয়াদিয়াছেন। বেদের উপদেশ উন্নতি করিতে হইলে, জড়ত্বকে ত্যাগ করিতে হইবে, সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ফলপ্রদ, সর্ব্বপ্রকার উন্নতিহেতু 'যজ্ঞ করিতে হইবে, যজ্ঞ না করিলে, বদ্ধ জলের ন্যায় মনুষ্যসমাজ দূষিত—পূতীভাবাপন্ন (Putrid) হইবে। উন্নতি বলিতে আধুনিক উন্নতিশীল পুরুষবৃন্দ যাহা বুঝিয়া থাকেন, বেদ সেই অস্থির অপূর্ণ পার্থিব উন্নতিকেই উন্নতির চরমলক্ষ্য বলেন নাই বেদপ্রদর্শিত উন্নতির প্রান্তভূমি পাশ্চাত্য কোবিদকুলের নয়নে অদ্যাপি পতিত হয় নাই। বেদপ্রদর্শিত উন্নতির সীমা লোকত্রয়াতিবর্ত্তিনী, কেবল ভূলোকে নিবদ্ধ নহে। বেদোপদিষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, এখন তাহা বিশ্বাস করা অসম্ভব সন্দেহ নাই। বেদোপদিষ্ট সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টফলপ্রদ কায়িক, বাচিক ও মানস কর্ম্ম, যজ্ঞশব্দের অভিধেয়, মহাত্মা লগধ বলিয়াছেন, বেদ সকল যজ্ঞার্থ অভিপ্রবৃত্ত হইয়াছেন (বেদা হি যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তাঃ—বেদাঙ্গ জ্যোতিষ)।

জিজ্ঞাসু—যে যজ্ঞের জন্য বেদের অভিপ্রবৃত্তি হইয়াছে, যে যজ্ঞকে বেদ এবং বেদমূলক মহাভারতাদি শাস্ত্র সমূহ সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টফলের প্রসবিতা বলিয়াছেন,সেই যজ্ঞের স্বরূপ কি, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি অদ্য

বুঝিতে পারি নাই। আমাকে কৃপা পূর্ব্বক যজ্ঞের স্বরূপ প্রদর্শন করুন।

বক্তা—বৈদিক সংস্কারবর্জ্জিত পুরুষদিগের দুর্ব্বোধ্য সুগভীর যজ্ঞ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবার ইহা উপযুক্ত সময় নহে, তবে যথাপ্রয়োজন সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। 'যজ্ঞ' শব্দ দ্বারা বেদ কোন পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি জানিতে ইচ্ছা করি, 'শ্রীমদভগবদ্‌গীতা" পাঠপূর্ব্বক তুমি যজ্ঞ পদার্থ সম্বন্ধে কি জ্ঞান লাভ করিয়াছ ? 'যজ্ঞ' পদার্থ সম্বন্ধে গীতাতে ত অনেক কথা উক্ত হইয়াছে, অতএব তুমি যখন গীতা পাঠ করিয়াছ, তখন 'যজ্ঞ' পদার্থ সম্বন্ধে তোমার যে কোনরূপ ধারণা নাই আমি তাহা মনে করিতে পারি কি ? (ক্রমশঃ)

[শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রণেতা কর্তৃক লিখিত]

সদাশিবঃ শরণম্।

নমো গণেশায়।

শ্রী ১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

প্রেতিপরায়ণ শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ।

উন্নতি এবং সভ্যতার স্বরূপ, কারণ ও প্রান্তভূমি বিষয়ক বিচার।

Some Philosophical refictions on the nature, Cause and ultimate goal of Progress and Civilization.

প্রস্তাবনা।

জিজ্ঞাসু—উন্নতি এবং সভ্যতার স্বরূপ কি, কি কারণে উন্নতি হয়, সভ্যতাসোপানে অধিরোহণ করিতে পারা যায়, কি কারণেই বা অবনতি হইয়া থাকে, অসভ্যাবস্থায় থাকিতে হয়, উন্নতি হইয়া আবার অবনতি হয় কেন, সভ্য জাতি কি নিমিত্ত আবার অসভ্যাবস্থায় পতিত হইয়া থাকে, উন্নতি ও সভ্যতার প্রান্তভূমি কোথায়, কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে উন্নতি ও সভ্যতার পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তি হয়, উন্নতি

স্রোতস্বিনী কোন্ মহাসাগরের সহিত সঙ্গত হইবার নিমিত্ত সদা চঞ্চল, সভ্যতারমণী কোন্ সত্যতম মহাপুরুষরমণের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সতত উল্লাসিনী, আমার এই সকল বিষয় জানিবার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে; কোথায় যাইলে আর অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা থাকে না, কি পাইলে, আর কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষা হয় না, আমি তাহা জানিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

বক্তা—উন্নতি এবং সভ্যতার স্বরূপ, কারণ ও প্রান্তভূমি বিষয়ক জিজ্ঞাসা অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী সভ্যতা সোপানে অধিরোহণেচ্ছু মননশীল মনুষ্যমাত্রের হওয়া উচিত, উন্নতি ও সভ্যতার তত্ত্বজিজ্ঞাসা আত্মকল্যাণার্থীর না হইয়া থাকিতে পারে না। উন্নতি এবং সভ্যতার স্বরূপ, কারণ ও প্রান্তভূমি সম্বন্ধে আমি তোমাকে যথাজ্ঞান কিছু বলিব, কিন্তু এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি জানিতে চাই, তুমি বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সকল দ্বারা বর্ণিত উন্নতি ও সভ্যতার স্বরূপাদি জানিবার প্রার্থী, অথবা উন্নতি ও সভ্যতার যে রূপ আধুনিক উন্নতিশীল, সভ্য পুরুষবৃন্দের নয়নে পতিত হইয়াছে, উন্নতি ও সভ্যতা বলিতে ইদানীং সাধারণতঃ যাহা বুঝা হইয়া থাকে, উন্নতি ও সভ্যতার যে রূপে মুগ্ধ হইয়া বৈদিক আর্য্যবংশধরদিগের মধ্যে অধুনা অনেকে তাঁহাদের উন্নতির চরম পর্ব্বে অধিরূঢ়, সভ্যতার উচ্চতম বেদিতে অধিষ্ঠিত, শিষ্টাচারের প্রথম শিক্ষাদাতা, পরহৈতিকব্রত, জাগতিক সুখভোগে বিগতস্পৃহ, নিষ্কারণ সত্যানুরাগী, সত্যবচন, সর্ব্বত্র সমদর্শী, জগদ্গুরু পূর্ব্ব পুরুষগণকে 'অসভ্য বলিতেছেন, অজ্ঞ বলিতেছেন, হেয় স্বার্থপর বলিতেছেন, তাঁহাদের অবনতির, তাঁহাদের ক্লেশের একমাত্র কারণ বোধে ঘৃণা করিতেছেন, সেই উন্নতি ও সভ্যতার স্বরূপাদি অবগত হইবার অভিলাষী হইয়াছ?

জিজ্ঞাসু—যে অবস্থাতে উপনীত হইলে, অবস্থান্তরপ্রাপ্তির ইচ্ছা একেবারে উপশমিত হয়, যে অবস্থাতে উন্নীত হইলে, আর কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে না, আমার বিশ্বাস, তাহাই উন্নতির পর্য্যবসানভূমি, তাহাই সভ্যতার শেষ পর্ব্ব। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহ ব্যতীত অন্য কাহার

মুখ হইতে উন্নতি ও সভ্যতার [illegible] প্রান্তভূমির কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, অতএব আমি যে বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রবর্ণিত উন্নতি ও সভ্যতার স্বরূপাদি জানিবারেই বিশেষতঃ প্রার্থী, তাহা বলা বাহুল্য, তবে উন্নতি ও সভ্যতা বলিতে ইদানীন্তন উন্নতিশীল, সভ্যপুরুষবৃন্দ যাহা বুঝিয়া থাকেন, তৎস্বরূপাদিও আমার জিজ্ঞাসার বিষয়, সন্দেহ নাই। উন্নতি ও সভ্যতা বলিতে অভ্যুদয়শীল, সভ্য য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান যাহা বুঝেন, উন্নতি ও সভ্যতার যে রূপ অন্যকে দেখাইয়া থাকেন, তাহার সহিত বেদ ও শাস্ত্রবর্ণিত উন্নতি ও সভ্যতার সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিলে কি শিক্ষালাভ হয়, আমার তাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। সভ্যতার যে আলোক পাইলে, জ্ঞানালোকে বিশ্বদ্যোতক, বিশ্বপূজ্য পূর্ব্বপুরুষদিগকেও অসভ্য বলিবার সামর্থ্য জন্মে, অজ্ঞ বলিবার শক্তি আবির্ভূত হয়, নির্ভয়ে তাঁহাদিগকে হেয়-স্বার্থপর বলিবার ক্ষমতা বিকাশ প্রাপ্ত হয়, আমি ভগবানের কৃপায় সে আলোক অদ্যাপি পাই নাই, সভ্যতার সে আলোক যেন কখন না পাইতে হয়।

[illegible]—তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান যে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছেন, সভ্য হইতেছেন, পার্থিব জীবনকে যথাসম্ভব বাধা [illegible] করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং কিয়ৎপরিমাণে সফলকামও হইয়াছেন, কে তাহা অস্বীকার করিতে পারেন? উন্নতিশীল য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান এবং ইহাঁদের পদবীর অনুসরণ করিতে (তাহা করিবার ঠিক যোগ্যতা না থাকিলেও) নিয়ত সমুৎসুক বর্ত্তমান ভারতবর্ষ, উন্নতি বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহা পৃথিবী নিবদ্ধ, ঐহিক উন্নতিকেই ইহাঁরা পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, যথাসম্ভব পার্থিব উন্নতি বিধানার্থই ইহাঁরা, ইহাঁদের সমস্ত বল ও বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাঁদের সকল শক্তিই অস্থির-স্থায়ি-পার্থিব জীবনকে নির্ব্বাধ করিবার নিমিত্ত ব্যয়িত হয়। পৃথিবী ব্যতীত লোকান্তর আছে, ইহাঁরা তাহা ভাবেন না, তাহা ভাবিবার যে কিছু প্রয়োজন আছে, ইহাঁরা তাহা বুঝেন না।

(ক্রমশঃ)